

অনীশ দেব

পিশাচ সমগ্র

পিশাচ সমগ্র

অনীশ দেব

পিশাচ সমগ্র



পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ **ডিসেম্বর ২০২৩**
দ্বিতীয় মুদ্রণ **জানুয়ারি ২০২৪**

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী® ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।
অলংকরণ **কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল**
PISACH SAMAGRA
Frightening Tales of a Demonic Human *by* Anish Deb
Published by PATRA BHARATI®

সেইসব দিন

মনে পড়ে যাচ্ছে...

সে এক শনিবার। কিশোর ভারতী এবং পত্রভারতী নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলেছে অনীশদা এবং আমার মধ্যে।

অনীশদা বলছেন, 'নেম ভ্যালুর গুরুত্ব আপনাকে দিতেই হবে। নামি লেখকদের লেখা প্রতি সংখ্যায় নাহোক, বছরে অন্তত পাঁচ-ছ'টা সংখ্যা কিশোর ভারতীতে রাখতেই হবে। তাতে হয়ত শুরুতে আমাদের খরচ বাড়বে, কিন্তু তার ফল আমরা পাবই পাব। তাছাড়া পত্রিকার কভারের কাগজ, ছাপা, ভিতরের ছাপা—প্রোডাকশন একেবারে নিখুঁত করতে হবে।'

আমি রাজি নই, 'আপনি তো খালি খরচ বাড়াতে বলছেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে যে ডুবে যাবে প্রতিষ্ঠান।'

'একটুও ডুববে না। আমায় একটা কাগজ দিন, আমি হিসেব কষে দেখিয়ে দেব, পার কপিতে বড়জোর ২০ পয়সা কস্টিং বাড়বে। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যে সারকুলেশন বাড়বে। তখন ওই বাড়তি খরচ আর গায়ে লাগবে না।'

'টিক টিক টিক...।'

ঠিক মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছিল। তার খানিক দূরে একটা টিকটিকি এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। সেই উপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ডেকে উঠেছে। সেও যেন অনীশদাকে সাপোর্ট করে উঠল।

অনীশদা আর আমি একটু চমকে উঠে উপরে তাকিয়েছি। দেখি, অনীশদা একদৃষ্টে চেয়ে আছেন উল্টো হয়ে থাকা টিকটিকিটার দিকে।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'কী অদ্ভুত জীব, তাই না? দিব্যি উল্টো হয়ে সিলিং দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ যদি পারত!' একটু থেমে হেসে বললেন, 'মাথার মধ্যে দারুণ একটা ছবি ফুটে উঠছে।'

'অনীশদা! নিশ্চয়ই গল্প?'

'হ্যাঁ, আপনার কাগজেই লিখব। একজন টিচার...' বলতে বলতে থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখা যাক, দাঁড়ায় কিনা।'

সেবারের পুজো সংখ্যা কিশোর ভারতীতেই এল 'আমি পিশাচ।' ইউনিক ভাবনা, যা একমাত্র অনীশদার পক্ষেই সম্ভব। রক্তচোষা ড্রাকুলা নয়, আবার মানুষের হিংস্র নেকড়েতে পাল্টে যাওয়া ওয়ারউলফও নয়, পিশাচ...! এক এবং অদ্বিতীয়।

পিশাচ নিয়ে অনীশ দেব লিখেছেন ছয়টি ছোট-বড় কাহিনি—আমি পিশাচ, তুমি পিশাচ, পিশাচ প্রহর ১, ২, ৩ এবং পিশাচের রাত। সবক'টি অসাধারণ এবং সাহসী প্রাপ্তমনস্ক পাঠকের জন্য। অনীশদার বড় ইচ্ছে ছিল, আর একটা লিখে সাতটি কাহিনি নিয়ে বের করবেন 'পিশাচ সমগ্র।'

শেষ লেখাটা আর লেখা হয়নি।...

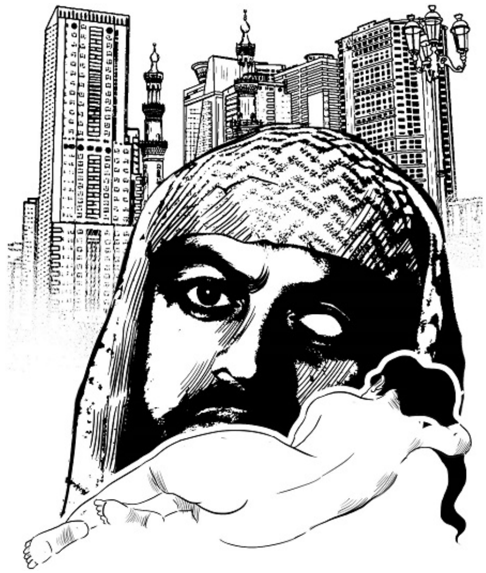
তবুও 'পিশাচ সমগ্র' প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই খুশি। লিখতে লিখতে মনে হল, অনীশদা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই পুরোনো কথাটাই আবার বলছেন, 'ত্রিদিববাবু, আপনার সঙ্গে কেন যে আরও দশ বছর আগে পরিচয় হল না!'

প্রণাম, অনীশদা।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

২১ নভেম্বর ২০২৩
কলকাতা

সূচিপত্র



পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই

বয়স্ক সাহিত্য

গোয়েন্দা অনীশ চৌধুরী সমগ্র
আমি সিরিয়াল কিলার বলছি
গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র
আগুন রঙের বুলেট
ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ
লাশতালাশ
ডট কম রহস্য
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বারোটি রহস্য উপন্যাস
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র
বিশ্বের সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ

কিশোর সাহিত্য

প্রতিঘাত সম্পূর্ণ
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভয়পাতাল
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

বিজ্ঞান। জানা অজানা

পাই নিয়ে রূপকথা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু

আমি পিশাচ



এক

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই। কবে কীভাবে আমার জন্ম, তা জানি না। আমার বয়েস কত তাও জানা নেই। শুধু জানি, রক্ত আমার একমাত্র খাদ্য। রক্তের পিপাসা আমাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখনও যে পথ চলছি সেও ওই রক্তের টানে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে আসছে আমার।

আমাকে কেমন দেখতে?

বলছি। তবে শুনে যেন অবাক হয়ে যেয়ো না।

আমার কোনও নির্দিষ্ট চেহারা নেই। যখন যেখানে থাকি সেইরকম চেহারা নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিই। যেমন, যখন জঙ্গলে থাকি তখন গাছের পাতা কিংবা গাছের বাকল হয়ে যাই। পুকুরপাড়ে থাকলে ঘাস-পাতা, আগাছা, কিংবা মাটির চেহারা নিই। এটা ছদ্মবেশ যদি বলো তো তাই।

ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, নোংরা জায়গায় আমি থাকতে ভালোবাসি। তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মানুষ বা পশুর শরীর। ওদের শরীরের ভেতরটা নরম, স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধময়, নোংরা—আবার একইসঙ্গে রক্তের তাপে উষ্ণ। ওদের শরীরে আমি নিশ্চিন্তে বহুদিন থাকতে পারি। আর ওদের দিয়ে আমার রক্তের তৃষ্ণা মেটাই। আমার ইচ্ছেয় ওরা অন্যের শরীরে ধারালো দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নেয়। ওরা বুঝতেও পারে না, ওরা আসলে আমার তেষ্টা মেটাচ্ছে। কারণ, ওদের শরীরে ঢুকে পড়ার পর থেকেই ওদের মস্তিষ্ক চলে আমার কথায়। অর্থাৎ, ওদের শরীর আর মন—দুই-ই দখল করে ফেলি আমি।

তবে পশুর চেয়ে মানুষই আমার বেশি পছন্দ। কারণ, মানুষের রক্তের স্বাদ সবার সেরা। আর মানুষ শিকার করাও সহজ। তারপর, আমার হয়ে সেই মানুষ—কিংবা অমানুষ রক্তপিশাচ—যখন মানুষ শিকার করে, তখন তার কাজটাও সহজ হয়ে যায়।

আঃ! ভাবতেই কত তৃপ্তি!

কিন্তু এ-কাজে বিপদও আছে।

আমার দখলে থাকা অমানুষগুলো যখন ধরা পড়ে যায় তখন ওরা শাস্তি পায়। অন্যান্য সুস্থ মানুষ ওদের খতম করে। তখন আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। এক দেহের আশ্রয় ছেড়ে ছুটতে হয় অন্য আস্তানার খোঁজে।

বুঝতেই পারছ, মানুষ-পিশাচগুলোর বিনাশ হলেও আমার বিনাশ নেই।

তা হলে কি আমি অমর? কে জানে!

তবে আত্মা যদি অমর, অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মা কিংবা পিশাচের অমর হতে অসুবিধে কী!

পথ চলতে-চলতে যখন ভীষণ একঘেয়ে আর ক্লান্ত লাগছে ঠিক তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই মেঘের সাজ-সাজ রব চোখে পড়েছিল, দুপুর পেরোতেই তার কান্নাকাটি শুরু হল।

চলতে আর ইচ্ছে করছিল না। তেষ্টায় আমার ভেতরটা ছটফট করছিল। তাই সামনের দোতলা বাড়িটায় ঢুকে পড়লাম।

প্রকাণ্ড বাড়ি। তার লাগোয়া খেলার মাঠ আর বাগান। মাঠে বর্ষার সবুজ ঘাস। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওরা বোধহয় এই তুমুল বর্ষার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এখন খুশিতে টগবগে হয়ে কলরোল শুরু করে দিয়েছে।

যাক, এবার আমার কাজ হল বিশ্রাম আর আরাম। আর তার জন্যে চাই একজন মানুষ—যার শরীরে আমি আশ্রয় নেব। তারপর...।

দুই

সত্যবানস্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। কালো বোর্ডের ওপরে ওঁর চক-ধরা আঙুল তাড়াহুড়ো করে আলপনা এঁকে চলেছে। অঙ্ক যেন স্যারের পোষা পাখি। কী সুন্দর স্যারের কথা শোনে! কোনও অঙ্কই স্যারের আটকায় না। ধরেই স্যাটাস্যাট করে দেন। সেইজন্যেই অচ্যুত, ঋদ্ধিমান, বাসব, সৌরভরা সত্যবানস্যারের নাম দিয়েছে 'স্যাটাস্যাট'।

স্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। আর ক্লাস নাইনের ছেলেরা মাথা নীচু করে চুপচাপ সেটা খাতায় টুকে নিচ্ছিল। অচ্যুত অঙ্কে দারুণ—সবসময় একশোয় একশো পায়। কিন্তু বীজগণিতের এই অঙ্কটা ওরও আটকে গেছে। হল অ্যান্ড নাইটের 'হায়ার অ্যালজেব্রা' থেকে এই অঙ্কটা স্যার আগের দিন করতে দিয়েছিলেন।

মাথা ঝুঁকিয়ে অঙ্ক টোকা শেষ হতেই কন্দর্প অচ্যুতকে আলতো করে খোঁচা মারল।

অচ্যুত পাশ ফিরে তাকাতেই কন্দর্প ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই, আমার ব্যাগ থেকে সাত টাকা চুরি গেছে।'

অচ্যুত অবাক হল না। কারণ, গত সাত-আটদিন ধরে ওদের সেকশানে এই চুরির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

প্রথম যে-চুরিটা ওদের নজরে পড়েছিল সেটা ঋদ্ধিমানের ব্যাগ থেকে চার টাকা উধাও হওয়ার ঘটনা। সেটা ওরা কেউই খুব একটা আমল দেয়নি। ভেবেছে ঋদ্ধিমানের হয়তো ভুল হয়েছে। ভুল করে টাকাটা অন্য কোথাও রেখে এসেছে।

কিন্তু তারপর, ওদের বন্ধু কুলদীপের ব্যাগ থেকে বারো টাকা উধাও হতেই অচ্যুতরা নড়েচড়ে বসেছে।

ক্লাসে কুলদীপের গায়ের জোরই সবচেয়ে বেশি। ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কেউ পারে না। তা ছাড়া ও রোজ ব্যায়াম করে, বক্সিং ক্লাবে বক্সিং শেখে।

টাকা চুরি যেতেই কুলদীপ তো রেগে আগুন। ও সবাইকে শাসিয়ে বলল, 'চোর ধরা পড়লে এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে বারো টাকার শোধ নেব।'

কিন্তু চুরির ব্যাপারটা থামল না। যেমন আজ কন্দর্পের টাকা চুরি গেছে। সুতরাং দুটো পিরিয়ডের ফাঁকে ওরা চার-পাঁচজন মিলে টিচার্স রুমে গিয়ে বাংলার অমিয়স্যারকে সব জানাল। স্যার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'হাতেনাতে তস্করকে না ধরা পর্যন্ত তো কোনও প্রমাণ নেই! যদি তোরা নক্তচরকে লাল হাতে ধরতে পারিস, তা হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আদ্যোপান্ত অবধান করিয়ে শাস্তি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

অচ্যুতরা আন্দাজ করতে পারল 'তস্কর' আর 'নক্তচর' মানে চোর। অমিয়স্যারকে নিয়ে এই এক মুশকিল! বাংলার স্যার বলে বড্ড বেশি বাংলায় কথা বলেন।

পরদিন থেকে ওরা পাঁচজন—অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, আর সৌরভ—চোর ধরার নানান মতলব আঁটতে লাগল।

এসব ব্যাপারে কুলদীপ ওদের লিডার। আর প্রতীক কুলদীপের সর্বক্ষণের সাথী। মাঝে-মাঝে কুলদীপকে দুষ্টু বুদ্ধির জোগান দেয় বলে প্রতীকের একটু কুখ্যাতি আছে। বাসব ক্লাসের মনিটর, এন. সি. সি-র ক্যাডেট। ডিসিপ্লিন নিয়ে সবসময় মাথা ঘামায়। হাঁটা-চলা করে সৈনিকের ঢঙে—যেন লেফ্ট-রাইট করে প্যারেড করছে। ক্লাসের অনেকেই ওর হাঁটার ঢং নকল করে ওকে বাঙ্গ করে—তবে আড়ালে। নইলে ও স্যারদের কাছে কমপ্লেন করে দেবে। আর যেহেতু সৌরভের ব্যাগ থেকে চব্বিশ টাকা চুরি গিয়েছিল, তাই চোর ধরার মতলবে ও একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টিফিনের সময় স্কুলের লাগোয়া খেলার মাঠে জামগাছতলায় বসে ওদের প্ল্যান আঁটার কাজ শুরু হল।

টিফিনের সময় অচ্যুতরা বেশির ভাগই ক্লাসরুম ছেড়ে খেলার মাঠে বেরিয়ে আসে। টিফিনটা কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে ওদের কলরোল, খেলাধুলো শুরু হয়। ওদের চেঁচামেচিতে গাছে বসে থাকা বুলবুলি, শালিখ, বসন্তবৌরি আর দোয়েল পাখিরা উড়ে পালায়। আধঘণ্টা পর ক্লাস বসলে মাঠটা হঠাৎ আবার ফাঁকা নির্জন হয়ে যায়। তখন পাখিরা বোধহয় হাঁফ ছেড়ে ফিরে আসে।

চুরির ঘটনাগুলো খতিয়ে বিচার করার পর প্রতীক বলল, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা যে নেয় সে টিফিনের সময় নেয়। ক্লাসে তখন যদি অন্যরা কেউ বসে থাকে তা হলে নেয় না। কিন্তু ফাঁক পেলেই ব্যাগ হাতড়ায়। টিফিনের সময় ক্লাসরুমটা ওয়াচ করতে হবে।'

তখন ঠিক হল, রোজ টিফিনের সময় সৌরভ ওদের ক্লাসরুমে ডেস্কের নীচে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। ক্লাসে কেউ ঢুকলে সৌরভকে দেখতে পাবে না। ফলে চোরবাবাজি ধরা পড়বেই।

যেমন মতলব তেমনি কাজ। এবং ফল পাওয়া গেল তিনদিনের মধ্যেই।

সৌরভ ক্লাসরুমে লুকিয়ে ছিল। ওদের ক্লাসে দুটো করে ডেস্ক পাশাপাশি তক্তা দিয়ে জুড়ে দুজনের বসার মতো ব্যবস্থা করা আছে। সেই জোড়া ডেস্কগুলোকে আবার পাশাপাশি সাজিয়ে ডেস্কের সারি তৈরি করা হয়েছে। আর ক্লাসরুমের মাঝ-বরাবর রয়েছে যাতায়াতের প্যাসেজ।

সৌরভ ক্লাসরুমের একেবারে শেষে এককোণে একটা জোড়া ডেস্কের নীচে লুকিয়ে ছিল। অত বড় ঘরে আর কেউ নেই। সব চুপচাপ। শুধু তিনটে সিলিং ফ্যান ঘোরার শব্দ হচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে সৌরভের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একটা জেদ ওকে দিয়ে এই কষ্ট সইয়ে নিচ্ছিল।

আগের দু-দিন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আজ ঘটল।

মিনিটদশেক যেতে না যেতেই একজোড়া পা দেখতে পেল সৌরভ।

খুব সাবধানে দুটো ডেস্কের পায়ার একচিলতে ফাঁক দিয়ে ও উঁকি মারল। দেখল, ওদেরই ক্লাসের রাজীব দাস প্রথম সারির ডেস্কের ব্যাগগুলো ব্যস্তভাবে হাতড়াচ্ছে। কোনও-কোনও ব্যাগের ভেতর থেকে কী যেন মুঠো করে নিয়ে পকেটে ঢোকাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্লাসরুমের দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

মাত্র পাঁচমিনিট। তার মধ্যেই দুটো ডেস্কের সারির তল্লাশি চটপট সেরে ফেলল রাজীব। যা পেল, পকেটে গুছিয়ে নিল। তারপর তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

না, সৌরভ 'চোর, চোর' বলে চেঁচায়নি। কারণ, সেইরকমই কথা ছিল। ও শুধু চুরির ঘটনাটা কুলদীপ, অচ্যুতদের জানিয়ে দিল। বলল, এই কুকীর্তি কার।

এই খবরটা জানার পর কুলদীপরা চোর ধরার ফাঁদ পাতল। ওরা পাঁচজন টিফিনের সময় ক্লাসরুমের পাঁচ জায়গায় ডেস্কের নীচে ঘাপটি মেরে রইল।

ওদের হতাশ হতে হল না। কারণ, চোর এল এবং চটপট কাজ সারতে লাগল।

কুলদীপ সকলের আগে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। ওর পিঠের ধাক্কায় একজোড়া ডেস্ক দড়াম করে মেঝেতে উলটে পড়ল।

ও চিৎকার করে রাজীবকে জাপটে ধরল, 'ব্যাটা চোর, রোজ বন্ধুদের টাকা চুরি করিস—লজ্জা করে না!'

ততক্ষণে সৌরভ, বাসব, প্রতীক আর অচ্যুত ওদের লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওরা সবাই রাজীবকে ঘিরে ধরল। তারপর রাজীবকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল টিচার্স রুমে।

এখন টিফিনের সময়। একটা প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরে স্যারেরা বসেছিলেন। কয়েকজন গল্পগুজব করছিলেন, কেউ-কেউ টিফিন সারছিলেন। বেয়ারা সেবকরাম একপাশে দাঁড়িয়ে চক-ডাস্টার গুছিয়ে রাখছিল।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কুলদীপরা চট করে ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিল। ওদের ক্লাসটিচার ভূগোলের কালীপদস্যারকে ওরা দেখতে পেল না। বোধহয় কোনও কাজে বাইরে বেরিয়েছেন। তবে

অমিয়স্যার আর সত্যবানস্যার ছিলেন। সত্যবানস্যার টিফিন করছিলেন। আর অমিয়স্যার খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

টিচার্স রুমের দরজায় ওদের জটলা দেখে কেউ-কেউ অবাক হয়ে দেখছিলেন।

বাসব অমিয়স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে আসব, স্যার?'

অমিয়স্যার কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। কুলদীপ, সৌরভ, বাসবদের দেখে বুঝলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কারণ, কুলদীপ রাজীবের কবজি শক্ত করে চেপে ধরে ছিল।

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অমিয়স্যার। খবরের কাগজটা একটা ডাস্টার চাপা দিয়ে রেখে চটপট চলে এলেন দরজার কাছে।

'কী রে, কী হয়েছে!'

ওরা হাঁফাতে-হাঁফাতে রাজীব দাসের কীর্তির কথা বলল।

অমিয়স্যার ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। ব্যাপারটা ওঁর মনে পড়ে গেল। তিনিই ওদের বলেছিলেন চোরকে হাতেনাতে ধরার কথা।

তিনি রাজীবকে বললেন, 'তুই এখানে থাক।' তারপর অচ্যুতদের দিকে ফিরে : 'তোরা শ্রেণিতে যা। আমি ব্যাপারটা দেখছি—।'

এমন সময় সত্যবানস্যার ওদের পাশ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের জটলা নিয়ে কোনওরকম কৌতূহল দেখালেন না। একজন অচেনা মানুষের মতো পাশ দিয়ে চলে গেলেন। অথচ দু-তিনদিন আগেও অচ্যুতকে দেখলে হেসে বলতেন, 'কী রে, দিনরাত শুধু ক্রিকেট নিয়ে পড়ে আছিস, নাকি অঙ্ক-টঙ্কও একটু-আধটু হচ্ছে? ভালো করে পড়। মাধ্যমিকে অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়া চাই-ই চাই।'

অচ্যুত বেশ অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ধরে ও সত্যবানস্যারের চলে যাওয়া দেখল।

আর ঠিক তখনই টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। স্কুলের দারোয়ান বানজারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল পিতলের ঘণ্টায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে তাল ঠুকে জানিয়ে দিচ্ছে টিফিনের আধঘণ্টা শেষ হয়েছে। এখন আবার ক্লাস শুরু হবে।

ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময় অচ্যুতের এরকম একটা পিতলের ঘণ্টা কেনার খুব শখ হয়েছিল। কিন্তু বাপি আর মা সেই শখের কথাটা শুনে হেসে এমন গড়িয়ে পড়েছিল যে, অচ্যুতের আর ঘণ্টা কেনা হয়ে ওঠেনি।

স্কুলের চওড়া বারান্দা ধরে ওরা ক্লাসের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। এখন দুপুর হলেও আকাশ মেঘলা। যখন-তখন বৃষ্টি হতে পারে। গত ক'দিন ধরেই ঝেঁপে বৃষ্টি চলছে। মাঝে-মাঝে এক-আধ-ঘণ্টার বিরতি। বৃষ্টিও বোধহয় তখন টিফিন করতে যায়—নয়তো ঘুমিয়ে পড়ে।

স্কুলের মাঠটা বৃষ্টিতে যাচ্ছেতাই হয়ে থাকে বলে এখন টিফিনের সময়ে খেলার হুল্লোড় অনেকটা মিইয়ে গেছে। আর সবসময় মেঘলা থাকলে অচ্যুতের কেমন যেন মনখারাপ লাগে।

ফিফ্‌থ পিরিয়ডের দশ-পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রাজীব ক্লাসে এসে ঢুকল।

রমেশস্যার তখন ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন, আর ক্লাসের অর্ধেক ছেলে তন্দ্রার টানে ঢুলছিল। ঘন-ঘন হাই উঠছিল সকলের।

কিন্তু রাজীব দাসকে দেখেই সবাই সোজা হয়ে বসল।

রাজীবের রং টকটকে ফরসা। ঘি-মাখন খাওয়া গোলগাল নধর চেহারা। চোখে চশমা। সবসময় ফিটফাট থাকে। কিন্তু এখন ওর চুল উসকোখুসকো, চোখের জল চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে নেমে এসেছে, হেঁচকি তুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রমেশস্যার দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন সাম্রাজ্যের সাতকাহন থামিয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘কী ব্যাপার? তুই কোথায় গিয়েছিলি?’

প্রশ্নটা করে কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে তিনি রাজীবকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন।

‘অমিয়স্যার আমাকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।’ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল রাজীব।

‘কেন রে? কী করেছিস তুই?’

রাজীব চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অচ্যুতের ভীষণ খারাপ লাগছিল। আহা রে! হেডস্যার মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওকে বেত দিয়ে মেরেছেন। কিন্তু রাজীবই-বা টাকা চুরি করে কেন? ওরা তো বেশ বড়লোক! রেল স্টেশনের কাছে ওদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। মারুতি জেন গাড়ি করে স্কুলে আসে।

মনিটর বাসবকে ডেকে রমেশস্যার ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। রাজীবকে বললেন, ‘তুই ডেস্কে গিয়ে বোস।’

রাজীব মাথা নীচু করে ডেস্কের দিকে এগোল।

অচ্যুতের ডেস্কের সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজীব ওকে মিনমিনে গলায় বলল, ‘ছুটির পর তোকে অমিয়স্যার দেখা করতে বলেছেন।’

অচ্যুত ঘাড় নেড়ে ‘আচ্ছা’ বলল।

রমেশস্যার বাসবের কাছে গোটা গল্পটা শুনে তারপর আবার সাতবাহন রাজবংশের কাহিনি শুরু করলেন।

রমেশস্যারের পিরিয়ড শেষ হতেই সবাই রাজীবকে ছেঁকে ধরল। কেউ-কেউ ওকে সান্ত্বনা দিল। আবার কেউ বলল, ‘ঠিক হয়েছে—অন্যায় করেছে তাই শাস্তি পেয়েছে।’

কুলদীপ, সৌরভ, বাসবরা খুঁটিয়ে জানতে চাইল অমিয়স্যার ওকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ঠিক কী-কী হয়েছে।

রাজীব থতিয়ে-থতিয়ে বলছিল আর ফুঁপিয়ে উঠছিল। হেডস্যারের দশ ঘা বেতের বাড়ি খেয়ে ও সহ্য করেছে। কিন্তু হেডস্যার বলেছেন, কাল ওর বাবা-মাকে স্কুলে এসে দেখা করতে। এটা ওকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বাপি-মাম্মি এসব ঘটনা জানতে পারলে ওকে হয়তো বাড়ি থেকেই বের করে দেবে। রাজীব তাই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে সিঁটিয়ে গেছে।

কুলদীপদের ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। ওরা রাজীবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘দাঁড়া, দেখছি কী করা যায়। তুই চিন্তা করিস না।’

সব শুনে অচ্যুত বলল, ‘অমিয়স্যার তো আমাকে ছুটির পর ডেকেছেন। তখন আমি স্যারকে বলব। হেডস্যারকে যেন রিকোয়েস্ট করেন—যাতে গার্জেন কল না হয়।’

অচ্যুতের কথায় রাজীব তেমন ভরসা পেল বলে মনে হল না।

চারটে বেজে দশমিনিটে বানজারা ছুটির ঘণ্টা বাজাল।

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে নানান ক্লাসের ছেলের দল পিলপিল করে বেরিয়ে এল ক্লাসরুমের বাইরে। তারপর স্কুল-বাড়ি ছেড়ে মাঠে নেমে এল ‘সাদা জামা কালো প্যান্টের’ ভিড়। সেখান থেকে সদরের লোহার গেট। আবার গেট পেরিয়ে রাস্তা।

আকাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে। এখনই বোধহয় আবার বৃষ্টি নামবে।

স্কুলের মাঠের একপাশে সারে-সারে দাঁড় করানো সাইকেল। এক ঝাঁক ছেলে হইহই করে ছুটল সাইকেলের দিকে। নীচু ক্লাসের কয়েকটা ছেলে জল-কাদাভরা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলতে লাগল। মাঠের এখানে-ওখানে জমে থাকা জলের ওপর পা ফেলে দাপিয়ে ছুটে গিয়ে কাদা-জল ছিটকে দিতে লাগল চারপাশে।

সদরের গেটের বাইরে বাবা-মায়েদের ভিড়। তাঁদের চোখ সাদা-কালো পোশাকের ভিড়ে নিজের-নিজের ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্কুল ছুটির সময় এই ভাঙাচোরা সরু রাস্তাটা সাইকেল, সাইকেল রিকশা আর স্কুটারে ছয়লাপ হয়ে যায়। যানজট চলে অন্তত আধঘণ্টা। এখন, বর্ষার সময়, তাই অবস্থা একেবারে বেহাল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও অচ্যুতরা কয়েকজন ক্লাস থেকে বেরোয়নি। অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রাজীবের ব্যাপারে অচ্যুত ঠিক কী কী বলবে তাই নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। রাজীব কুলদীপ-অচ্যুতদের হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়ল : 'তোরা আমাকে যেভাবে হোক সেভ কর।'

প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা ক্লাসরুম থেকে বেরোল।

কুলদীপরা সবাই চলে গেল। পিঠে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে অচ্যুত একা রওনা হল টিচার্স রুমের দিকে। যাওয়ার আগে ও কুলদীপকে বলল, 'রাজীবের ব্যাপারে অমিয়স্যারের সঙ্গে কী কথা হল, আমি তোকে রাতে ফোন করে জানাব। টা-টা!'

অচ্যুত খেয়াল করেনি কখন যেন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু আগের হুল্লোড় হইচই থেমে গিয়ে এখন সব একেবারে নিঝুম! শুধু বৃষ্টি ঝিরঝির করে পড়ছে। বাইরে কলাগাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার টপটপ শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে সাইকেল রিকশার 'প্যাঁকপ্যাঁক' ডাক শোনা যাচ্ছে। আর কখনও-কখনও মেঘের 'গুড়ুম-গুড়ুম'।

ছুটির পর স্কুল থেকে সবাই চলে যায়। তখন বানজারা স্কুলের সব ঘর ঘুরে-ঘুরে আলো আর পাখা অফ করে, দরজায়-দরজায় তালা দেয়। তারপর স্কুল বিল্ডিং-এর কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে নিজের ঘরে যায়। ওর ছোট্ট ঘর স্কুল-বাড়ির লাগোয়া, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া। পাশেই একটা টিউবওয়েল। আর তাকে ঘিরে নানান গাছপালা। বর্ষায় সেগুলো সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

টিউবওয়েল থেকে একটু দূরেই একটা ছোট গোয়ালঘর। সেখানে বানজারার পোষা গোরু রামুয়া আর ছোট একটা বাছুর আছে। ওরা বেশির ভাগ সময়েই মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ঘাস-পাতা খায়।

বানজারা বউ নিয়ে থাকে। ওর বউ স্কুলের সুইপারের কাজ করে। সবসময় পান খায়, আর মাথায় ঘোমটা টেনে থাকে।

টিচার্স রুমের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় অচ্যুতের বুটজুতোর খটখট শব্দ করিডরে কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। একতলা থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বানজারা ওর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

টিচার্স রুমের কাছে এসে অচ্যুত অবাক হয়ে গেল। ঘর খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই।

ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। খোলা জানলা দিয়ে ঘোর কালো মেঘ, গাছপালা আর বৃষ্টি চোখে পড়ছে। দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতা হাওয়ায় উড়ছে।

তা হলে কি বৃষ্টি আসার ভয়ে অমিয়স্যার একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছেন?

এমন সময় একটা শব্দ অচ্যুতের কানে এল।

মেঝেতে খুচরো পয়সা পড়ে যাওয়ার শব্দ।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে নজর ধারালো করল অচ্যুত। সামান্য কুঁজো হয়ে টেবিলের নীচ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

খুচরো পয়সা কোথায় পড়ল? কার পকেট থেকে পড়ল?

ঝুঁকে পড়ে নীচু হতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার দেওয়ালের গায়ে টিকটিকির মতো হেঁটে বেড়াচ্ছেন!

মেঝে থেকে অন্তত হাতদুয়েক ওপরে মেঝের সঙ্গে সমান্তরালভাবে স্যারের শরীরটা আঠার মতো আটকে রয়েছে। ঠিক সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

এরকম একটা মজার দৃশ্য দেখে অচ্যুতের হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু ও ভয় পেল। ওর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, বুকের ভেতরে বাতাস আটকে গেল। কারণ, সত্যবানস্যারের মুখে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর উল্লাস। ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুক করছে, চোখে এক অলৌকিক সবুজ আলো।

আর ঠিক তখনই কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। অচ্যুত চমকে উঠল। ওই অবস্থাতেও ও বুঝতে পারল খুচরো পয়সাগুলো স্যারের পকেট থেকেই পড়েছে।

এরকম একটা বিচিত্র ভয়ঙ্কর দৃশ্য অচ্যুতকে পাগল করে দিল। ও হেঁচকি তুলে শ্বাস টানল, বুক ভরে বাতাস নিতে চাইল। তারপরই ছুট লাগাল দোতলার বারান্দা ধরে। ওর বুটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল কোনও পাগলা ঘোড়া মৃত্যুভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

অচ্যুত যদি পিছন ফিরে তাকাত তা হলে দেখতে পেত সত্যবানস্যার ওর হেঁচকির শব্দে দেওয়ালের গা থেকেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন। সবুজ আগুনভরা চোখে ওর ছুটে পালানো দেখছেন।

আর স্যারের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে রহস্যময় হাসি।

তিন

পরদিন সাইকেল চালিয়ে স্কুলের গেটে পৌঁছে অচ্যুতের মনে হচ্ছিল গতকাল ও যা দেখেছে সবটাই স্বপ্ন —অথবা দুঃস্বপ্ন।

রং-চটা সীমানা-পাঁচিলের গায়ে বসানো জং-ধরা লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলা। অচ্যুত সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। তারপর সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মাঠের এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। মাঝখানের খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাদ দিলে মাঠের বাকি অংশে বড়-বড় ঘাস আর আগাছা। এ ছাড়া পাঁচিলের ধার ঘেঁষে কয়েকটা বট, অশ্বত্থ, কদম, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু গাছ। আর প্রকাণ্ড জামগাছটা আছে বানজারাদের ঘরের কাছাকাছি। গরমকালে পাকা জাম পড়ে-পড়ে গাছের নীচটা বেগুনি হয়ে থাকে। গাছটার নীচে বসার জন্য কয়েকটা সিমেন্টের বেদি আছে।

বৃষ্টি না-হলে এই মাঠেই স্কুলের প্রেয়ার হয়। আর বৃষ্টি হলে যার-যার ক্লাসরুমে।

মাঠের বাঁদিকে একটা দোলনা আর স্লিপ—নীচু ক্লাসের ছেলেদের খেলার জন্য। আর তার পিছনেই সাইকেল রাখার জায়গা।

সাইকেল রেখে অচ্যুত স্কুল-বাড়ির দিকে এগোল।

বড় মাপের ছড়ানো দোতলা বাড়ি। তার পলেস্তারা-খসা রং-চটা চেহারার দিকে খুব খুঁটিয়ে নজর করলে বোঝা যায় একসময়ে বাড়িটার রং গোলাপি ছিল।

স্কুল-বাড়ির একতলার দেওয়ালে তেল রঙে বড়-বড় করে আঁকা মনীষীদের রঙিন ছবি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, রামমোহন, সবাই সেখানে হাজির। বৃষ্টির জলে ধোয়া ছবিগুলো ঝকঝক করছে।

ওঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা অচ্যুত কিছুতেই সত্যি বলে মেনে নিতে পারছিল না।

গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই আকাশের দিকে তাকাল অচ্যুত। আবার শুরু হল। এবার পুজোয় বৃষ্টির পিছু ছাড়াতে পারলে হয়! ও একতলার বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল।

বানজারার ঘণ্টার পর ক্লাস শুরু হল বটে তবে অচ্যুত ভীষণ আনমনা হয়ে রইল। গতকালের ঘটনাটা ওর বুকের ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

প্রথম পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়তেই ও চমকে উঠল। কারণ, সেকেন্ড পিরিয়ডটা অঙ্কের—সত্যবানস্যারের ক্লাস।

অচ্যুত কুলদীপের দিকে তাকাল। কুলদীপ দুটো সারি পিছনে বসে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কুলদীপ ইশারা করল। যার অর্থ, এক্ষুনি স্যাটাস্যাট আসছেন।

এখনও পর্যন্ত অচ্যুত শুধু কুলদীপকেই ঘটনাটা বলেছে। আর কাউকে নয়। এমনকী বাপি-মা-কেও নয়।

সত্যবানস্যার ক্লাসে এসে ঢুকলেন।

টকটকে ফরসা রং। পিছনদিকে টেনে আঁচড়ানো তেলচকচকে চুল। চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। গাল সামান্য ভাঙা—চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। লম্বাটে নাকের নীচে সরু গোঁফ। গালে দাড়ির নীলচে আভা।

সত্যবানস্যারের পরনে সাদা হাফশার্ট আর গাঢ় বাদামি প্যান্ট। চেহারা বেশ রোগা হওয়ায় প্যান্টটা ঢলঢল করছে। গতকাল স্যার এই পোশাকই পরেছিলেন।

অচ্যুত খুব খুঁটিয়ে স্যারকে দেখছিল। অঙ্ক করতে-করতে মাঝে-মাঝেই কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছেন আর জিভ বের করে ঠোঁটজোড়া চেটে নিচ্ছেন। তেষ্টা পেলে মানুষ যেমন করে।

কিন্তু এরপরই এক অবাক কাণ্ড হল।

বীজগণিতের অনুপাত আর সমানুপাতের কুড়ি প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো বোর্ডে স্যার বোঝাচ্ছিলেন। সেই অঙ্ক হঠাৎই আটকে গেল!

অচ্যুত যতদূর জানে সত্যবানস্যারের অঙ্ক কখনও আটকায়নি। কিন্তু আজ এ কী কাণ্ড!

সত্যবানস্যার বোর্ডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। আঙুলে ধরা চকটা শূন্যে ঘুরিয়ে মনে-মনে যেন অঙ্কটা কষে ফেলতে চাইলেন।

অচ্যুতের মনে পড়ে গেল গতকালের কথা। টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে সত্যবানস্যার একজন অচেনা মানুষের মতো ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর স্কুল ছুটির পর টিচার্স রুমের দেওয়ালে ওই কাণ্ড! আর এখন, বরাবর যিনি স্যাটাস্যাট অঙ্ক করেন, তাঁর অঙ্ক গেছে আটকে!

স্যারের কি তা হলে কিছু হয়েছে?

সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর চেয়ারে বসে পড়লেন। অঙ্ক কষা নিয়ে এলোমেলো ধানাইপানাই করে চললেন। তারপর, ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার সময়, কুলদীপকে বললেন, 'কুলদীপ, তোরা কাল সন্ধেবেলা তো কোচিং-এ আসছিস, তখন ভালো করে এটা বুঝিয়ে দেব।'

অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, রাজীব আর সৌরভ সত্যবানস্যারের কোচিং-এ একই ব্যাচে পড়ে। স্যারের বাড়ি নৈহাটি। তবে প্রতিদিন স্কুলের পর কোচিং সেরে রাতের ট্রেন ধরেন। তবে কখনও-কখনও রাত হয়ে গেলে কোচিং-এর ঘরটাতেই থেকে যান।

পরের দুটো পিরিয়ড অচ্যুতের আর কাটতে চাইছিল না। ও ভাবছিল, কতক্ষণে টিফিন হবে আর ও কুলদীপকে নিয়ে আলোচনায় বসবে।

গতকাল বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মন বসাতে পারেনি অচ্যুত। সত্যবানস্যারের দেওয়ালে হাঁটার দৃশ্যটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। একটা লতানে গাছ যেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে সড়সড় করে বেড়ে চলেছে।

লেখাপড়ার চেষ্টা ছেড়ে টিভিতে ই.এস.পি.এন. আর স্টার স্পোর্টস চ্যানেল দেখতে বসে গিয়েছিল, কিন্তু স্যার টিভির পরদাতেও হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।

মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে ওকে দেখছিল। অনেকক্ষণ দেখার পর কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'তোর কী হয়েছে রে?'

'কিচ্ছু না।' অচ্যুত মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে টিভির পরদার দিকে চেয়ে রইল।

'তখন থেকে দেখছি কেমন উসখুস করছিস?'

কোনও জবাব দিল না অচ্যুত।

'স্কুলে ঝগড়া-মারপিট করেছিস?'

'না।' মাথা নাড়ল অচ্যুত। টিভির দিক থেকে চোখ সরাল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলের মনের ভেতরটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে গেল রান্নাঘরের দিকে। ভাবল অচ্যুতের বাবা এলে ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলবে। ছেলে বড় হচ্ছে। স্কুলে কী সমস্যা বাধিয়ে এসেছে কে জানে!

অচ্যুতের বাবা এখন বাড়িতে নেই। অফিস থেকে ফিরে বটতলার মিষ্টির দোকানের কাছে তাসের আড্ডায় মেতে আছে। ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা।

অচ্যুত যখন টিভি, রেডিয়ো, ওয়াকম্যান, বারান্দা, এ-ঘর, ও-ঘর করে ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে, ঠিক তখনই কুলদীপের ফোন এল।

অচ্যুত ফোন করেনি দেখে কুলদীপই ওকে ফোন করেছে।

নীচুগলায় ওর সঙ্গে কথা বলল অচ্যুত।

বলল, অমিয়স্যারের দেখা পায়নি। আর সত্যবানস্যারকে ওইরকম করতে দেখেছে।

কুলদীপ ও-প্রান্তে শিস দিয়ে উঠল, বলল, 'কীসব যা-তা বলছিস!'

অচ্যুত বলল, 'মা-কালীর দিব্যি—।'

কুলদীপ আবার চাপা শিস দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠলে ও শিস দেয়। আর মেজাজ ভালো থাকলে শিস দিয়ে গান শোনায়।

অচ্যুত এলোমেলোভাবে ওকে সব খুলে বলল। জট পাকানো হলেও গোটা গল্পটা বুঝতে কুলদীপের অসুবিধে হল না। সব শোনার পর ও বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'স্যাটাস্যাট আগের জন্মে বোধহয় টিকটিকি ছিল...'

কুলদীপের রসিকতায় অচ্যুতের হাসি পেল না। ওর মনে পড়ল, টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওর হাত-পা ঠকঠক করে কেঁপেছিল।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই অচ্যুতের চমক ভাঙল।

ক্লাসের অন্যান্য ছেলে বই-খাতা ডেস্কে ঢুকিয়ে হুড়মুড় করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। করিডরে ওদের হুটোপাটি ছুটোছুটিতে হুল্লোড় বেধে গেল। কার টিফিন বক্স ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঠং করে আওয়াজ হল। লুচি আর আলুভাজা ছড়িয়ে পড়ল। বুট পরা ছুটন্ত পা-গুলো নিমেষে সেগুলো মাড়িয়ে চলে গেল। কারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কতক্ষণে নীচের মাঠে গিয়ে পৌঁছবে সেই চিন্তায় সব মশগুল।

কুলদীপ আর অচ্যুত বেরোল সকলের শেষে। ওদের হাতে টিফিন বক্স।

সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে রাজীব দাসের সঙ্গে ওদের দেখা হল। মুখ কালো করে এক-পা এক-পা করে নামছে।

গতকাল অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় হেডস্যারকে ম্যানেজ করার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে। অচ্যুত রাজীবকে সেটা বলতেই ও কাচুমাচু মুখ করে বলল, 'আমি স্কুলে এসেই হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করেছি। বলেছি, আজ মাম্মি আর বাপি কলকাতায় গেছে, কাল এসে দেখা করবে। বিপদে পড়ে মিছে কথা বলতে

হল। তোরা আমাকে সেভ কর। তোরা আজ অমিয়স্যারকে একটু বল—প্লিজ! আচ্ছা, মানুষের কি ভুল হয় না?'

রাজীবের চোখে জল এসে গেল।

কুলদীপ বলল, 'অ্যাই, বাংলা সিনেমার লাস্ট সিনের মতো কাঁদবি না। আজ তোর ব্যাপারটা ফয়সালা করে দেব। এখন টিফিন খেয়ে বল খেল গিয়ে।'

অচ্যুত আর কুলদীপ জামগাছতলার সিমেন্ট বাঁধানো বেদির ওপরে গিয়ে বসল। প্রতীক ওদের কাছে বসতে এসেছিল, কিন্তু কুলদীপ ওকে বলল, 'কিছু মনে করিস না—অচ্যুতের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট টক আছে।'

প্রতীক সন্দেহের চোখে কুলদীপকে দেখল। আজকাল ওকে মাঝে-মাঝেই 'কমলাবালা গার্লস হাইস্কুল'-এর গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। সে-ব্যাপারে প্রাইভেট কথা কি না কে জানে!

কিছু না বলে প্রতীক ভুরু উঁচিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

মিহি বরফের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছে। বাদলা হাওয়ায় সেই গুঁড়ো মুখে উড়ে এসে আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘের চাপা গুড়গুড় শোনা যাচ্ছে কখনও-কখনও। একটু দূরে, স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে, বানজারার গোরু রামুয়া আর তার বাছুর আপনমনে ঘাস খাচ্ছে।

দুজনের টিফিন মিলিয়ে-মিশিয়ে খেতে-খেতে কুলদীপ বলল, 'স্ট্রেটকাট বল তো, স্যাটাস্যাটের এগেইনস্টে কী অ্যাকশন নিতে চাস?'

অচ্যুত কুলদীপের চোখের দিকে তাকাল : 'অ্যাকশন নেব কী, ব্যাপারটা ঠিক কী, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।'

'স্যাটাস্যাটকে একটু ওয়াচ রাখতে হবে।'

'যদি আমাকে ধরে কিছু বলে?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে কেমন যেন শব্দ হচ্ছিল।

'ধুস, কী আর বলবে! বলবে যে, আমি দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতো হাঁটছিলাম! তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না।...তা ছাড়া তোকে তো আর একা পাচ্ছে না যে বলবে!'

অচ্যুতের মুখ দেখে মনে হল না ও খুব একটা ভরসা পেয়েছে। ও চুপচাপ বসে বর্ষাভেজা প্রকৃতি দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কুলদীপ তাড়া লাগাল, 'চল, অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করে তারপর ক্লাসে যাব। রাজীবের ব্যাপারটা আগে বলা দরকার। নইলে ওর প্রবলেম হয়ে যাবে।'

বেদি ছেড়ে ওঠার সময় অচ্যুত বলল, 'সত্যবানস্যারের কেসটা কিন্তু কাউকে বলিস না।'

কুলদীপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মনিটর বাসব আর প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে অচ্যুত আর কুলদীপ টিচার্স রুমে গেল। অমিয়স্যারকে অনেক করে বলে-কয়ে ওরা রাজীবের গার্জেনকল ঠেকাল। অমিয়স্যার অচ্যুতকে বললেন, 'অ্যাই, তোর বাংলা খাতাটা আমার দেখা হয়ে গেছে। এত বানান ভুল করিস কেন রে? অভিধান অবলোকন করবি। ছুটির পর এসে খাতাটা নিয়ে যাস। কাল বর্ষণের জন্যে আমি একটু আথিবিথি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

আবার সেই 'ছুটির পর'! তার ওপর আবার 'আথিবিথি'! অমিয়স্যারের সঙ্গে পরিচয় না-হলে অচ্যুত কোনওদিন জানতেই পারত না ওর মাতৃভাষায় এত মারপ্যাঁচ আছে।

অচ্যুতের চোখ অনেকক্ষণ ধরেই চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্যারদের বসার বিশাল টেবিলের শেষ প্রান্তে সত্যবানস্যার বসে আছেন। কী একটা বইয়ের পাতায় ডুবে আছেন। চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কোনও হুঁশ নেই।

অচ্যুত অমিয়স্যারের কথার ওপরে কথা বলতে পারল না। শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ল। ছুটির পরই ও স্যারের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

টিফিন শেষের ঘণ্টা একটু আগেই বেজেছে। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ক্লাসে ফিরে চলল।

অচ্যুতের মনে অশান্তির ঝড় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও কি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে একা যাবে, নাকি কুলদীপ, বাসব, কিংবা সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে অমিয়স্যার বিরক্ত হতে পারেন। তা ছাড়া টিচার্স রুমে সত্যবানস্যার তো ওকে আর একা পাচ্ছেন না!

সুতরাং ছুটির ঘণ্টা পড়তে-না-পড়তেই অচ্যুত পা চালাল টিচার্স রুমের দিকে। দেরি করে গেলে টিচার্স রুম ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। সেই ঝুঁকি অচ্যুত নিতে চায় না।

টিচার্স রুমে গিয়ে দেখল অমিয়স্যার ছাড়া আরও অনেক স্যারই তখন সেখানে রয়েছেন। যদিও সত্যবানস্যারকে অচ্যুত দেখতে পেল না।

অনুমতি নিয়ে অমিয়স্যারের কাছে গেল অচ্যুত। স্যারের কাছ থেকে খাতা নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে করিডর ধরে হাঁটা দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওর কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

মুখ তুলে তাকাল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার। মুখে এক চিলতে হাসি। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটছেন।

আশেপাশে আরও কয়েকজন ছেলে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতেই মশগুল।

সত্যবানস্যার ওর সঙ্গে-সঙ্গে নামতে লাগলেন, আর চাপা গলায় কথা বলতে লাগলেন।

'জানিস তো, মানুষ অনেক সময় ভুল দ্যাখে! যেমন, তুই কাল বিকেলে যা দেখেছিস ভুল দেখেছিস। কারণ, তুই যা দেখেছিস সেটা প্রমাণ করতে পারবি না। আর প্রমাণ দিতে না পারলে কেউ তোর কথা বিশ্বাসও করবে না।' স্যার হিসহিস শব্দ করে হাসলেন : 'এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়।'

গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁধের ওপরে স্যারের আঙুলের চাপে ব্যথা লাগছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। অচ্যুতের মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

একতলায় নেমে সত্যবানস্যার বাঁদিকে কয়েক পা হেঁটে গেলেন। ক্লাস ফাইভের বি সেকশানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অচ্যুত কাঠের পুতুলের মতো স্যারের পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্যার থমকে দাঁড়াতেই ও-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

এদিকের বারান্দাটা এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং ওদের কথা শুনতে পাবে কাছাকাছি এমন কেউ নেই।

ক্লাসরুমের দরজার কাছটায় অচ্যুতকে একরকম ঠেলেই নিয়ে গেলেন সত্যবানস্যার। চাপা গলায় বললেন, 'শোন, কাউকে কোনও কথা বলবি না। অবশ্য বললেও কেউ আমল দেবে না। ওরে, মানুষের কি ভুল দেখার কোনও শেষ আছে! এই দ্যাখ!' বলেই স্যার অচ্যুতের চোখের দিকে তাকালেন।

অচ্যুত দেখল, সেখানে ধকধক করছে দুটো সবুজ টুনি বাল্ব। আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি হল চোখের মণি।

'এটাও তুই ভুল দেখছিস।' মিহি সুরেলা গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'কারণ, তুই এটা প্রমাণ করতে পারবি না। সুতরাং তোর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যবানস্যার। তার হিমেল ঝাপটা অচ্যুতের মুখ ছুঁয়ে গেল। অচ্যুতের গায়ে কাঁটা দিল।

ও লক্ষ করল, স্যারের চোখের সবুজ রং ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে সাদাটে হয়ে গেল। তারপর সামান্য ছাই-রং হয়ে কটা চোখের চেহারা নিল। তারপর কালচে হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'তুই কাউকে কিচ্ছু বলবি না! কারণ, তুই আসলে কিছুই দেখিসনি। কাল সন্ধেবেলা কোচিং-এ আসবি, কামাই করবি না। ভাবিস না, তুই পালিয়ে বাঁচবি। আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

অচ্যুত ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কাঁধের ওপর স্যারের বাঁকানো আঙুলের চাপ যেন ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছিল।

'এখন যা।' সত্যবানস্যার ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওকে আলতো করে ঠেলে দিলেন : 'তুই কিন্তু কিছুই দেখিসনি—।'

অচ্যুত আর-একটু হলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ও মাঠে নামার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল। ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতে পারল না।

জল-কাদা পেরিয়ে যখন ও সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছল তখন প্রতীক ওকে পিছন থেকে ডাকল।

অচ্যুত ফিরে তাকাতেই প্রতীক জিগ্যেস করল, 'তোকে স্যাটাস্যাট ওরকম হাসতে-হাসতে কী বলছিল রে?'

'কিছু না। কাল কোচিং-এর খাতা-বই ঠিকমতো নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল।' অচ্যুতের গলা সামান্য কেঁপে গেল।

'তোকে স্যার হেভি ফেভার করে।' বেজার মুখে বলল প্রতীক, 'অবশ্য ফেভার তো করবেই! তুই অঙ্কে একশোয় একশো পাস, আর আমার নম্বরটা চার কি পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তবে একশো হয়। তবে অঙ্ককে আমি মোটেই ভয় পাই না। পারি-না-পারি, লড়ে যাই।'

অচ্যুত হাসতে পারল না।

কারণ, সত্যবানস্যারের একটা কথা বারবার ওর মনে কাঁটার মতো বিঁধছিল।

বাড়ি ফিরেও ওর খচখচানিটা গেল না।

স্যার বলেছেন, '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

এর মানে কী?

চার

অচ্যুত রাতে কুলদীপ আর সৌরভকে ফোন করল। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলল, কোচিং নিয়ে কথা বলল, কিন্তু সত্যবানস্যারের কথা বলল না। বরং কুলদীপ উৎসাহ নিয়ে সত্যবানস্যারের রহস্য ভেদ করার ব্যাপারে নানান উদ্ভট পরামর্শ দিল। বলল, 'স্যারকে ফলো করতে হবে, বুঝলি! সবসময় নজরে-নজরে রাখতে হবে। তা হলেই কেসটা বোঝা যাবে।'

অচ্যুত তখন ভাবছিল, কুলদীপ তো আর স্যারের সবুজ চোখ দ্যাখেনি! দেখলে বোঝা যেত ওর এখনকার এত সাহস কতটা চুপসে যায়।

রাতে বিছানায় শুয়ে অচ্যুত একরকম জেগেই রইল। ওর ভেতর থেকে ভয়টা কিছুতেই যেতে চাইছিল না। পরদিন স্কুলে যাওয়া নিয়ে সামান্য ভয় করলেও সেটা মা-বাপিকে বুঝতে দিল না। মনে-মনে ঠিক করল, স্কুলে কখনও ও আর একা থাকবে না। যেখানেই যাক, দু-একজন বন্ধুকে সঙ্গে নেবে। এমনকী টয়লেটে গেলেও।

স্কুলের সময়টা শান্তিমতোই কেটে গেল। তবে একবার সত্যবানস্যার করিডরে অচ্যুতের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন—কিন্তু ওকে চিনতে পারেননি।

অচ্যুতের সঙ্গে প্রতীক ছিল। পরশুদিন সত্যবানস্যারের এরকম অদ্ভুত আচরণ ও নিজের চোখে দেখেছে। স্যার চলে যাওয়ার পর ও চাপা গলায় বলল, 'যা-ই বল, স্যাটাস্যাট কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে!'

অচ্যুত চুপ করে রইল। এই দেড় দিনে চুপ করে থাকাটা ওর দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে।

স্কুল ছুটির পর একটা বিচিত্র দৃশ্য অচ্যুতের চোখে পড়ল। ওরা যখন বেরোচ্ছে তখন দেখল সত্যবানস্যার মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বানজারার গোরু আর বাছুরকে আদর করছেন। ওদের গলার কাছে কুঁচি দেওয়া যে নরম চামড়া থাকে—যাকে গলকম্বল বলে—সেখানে হাত বোলাচ্ছেন। আর অবোলা জীব দুটো চুপটি করে দাঁড়িয়ে স্যারের আদর খাচ্ছে।

গোরু-বাছুরকে আদর করা নিশ্চয়ই খারাপ নয়। কিন্তু সত্যবানস্যারকে আগে কখনও কেউ এরকম আদর করতে দ্যাখেনি।

সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নানান দুশ্চিন্তা অচ্যুতের মাথার ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ঘণ্টাদুয়েক পর যখন ও সত্যবানস্যারের কোচিং-এ রওনা হল তখনও চিন্তাগুলো ওর মাথা থেকে যায়নি।

আকাশ ঘোলাটে মেঘলা। ভেজা মেঘের আড়ালে আবছাভাবে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বেহিসেবি বাদলা হাওয়া কখনও-কখনও গাছগাছালির পাতা দুলিয়ে দিচ্ছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় এখানে-ওখানে জল-কাদার নকশা। দোকানপাটে খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই।

পথচলতি সাইকেল রিকশা আর স্কুটারকে পাশ কাটিয়ে সাবধানে সাইকেল চালাচ্ছিল অচ্যুত। সত্যবানস্যারের কোচিং-এ স্কুলের পাশ দিয়েই যেতে হয়। যাওয়ার সময় দেখল, অন্ধকারে ভূতের মতো দোতলা স্কুল-বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বানজারার ঘরে আলো জ্বলছে।

কোচিং-এ পৌঁছে প্রথম-প্রথম একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোচিং-এর সময়টা বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাটল। গত সপ্তাহের মতো তুখোড় পেশাদার ঢঙেই পড়ালেন সত্যবানস্যার। অচ্যুতের অঙ্ক কষার কেরামতিকে তারিফ করলেন, ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। প্রতিটা অঙ্ক বেশ সহজ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখে দিলেন। সব মিলিয়ে কোথাও কোনও ছন্দপতন নেই।

তবে একটা ব্যাপারে সামান্য খটকা লাগল অচ্যুতের।

রাজীবের অঙ্কের অবস্থা প্রতীকের মতোই। তার ওপর রাজীবের আবার অঙ্ক নিয়ে আতঙ্ক আছে। অঙ্ক কষতে গিয়ে ও ঘন-ঘন আটকে যাচ্ছিল। সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ করছিলেন। তারপর ওর কাছে গিয়ে আলতো করে ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগলেন : 'চেষ্টা কর, ঠিক পারবি। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়—।'

রাজীবকে আজ যেন স্যার বড্ড বেশি যত্ন নিয়ে অঙ্ক দেখাচ্ছেন। আগে কখনও এই যত্ন অচ্যুতের চোখে পড়েনি। তার ওপর ঘাড়ে যেরকম মোলায়েম করে হাত বোলাচ্ছেন তাতে বানজারার গোরু-বাছুরকে আদর করার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

অচ্যুত মনে-মনে নিজেকে ধমক দিল। আজকাল ওর কী হয়েছে! সবকিছুতেই শুধু খটকা লাগছে! একজন স্যার কি হঠাৎই স্নেহপ্রবণ হতে পারেন না?

কিন্তু ধমক খেয়েও অচ্যুতের মন মানতে পারছিল না। বরং ভাবছিল, হঠাৎ করে কেউ যদি দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তার আচমকা স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে বাধা কী!

কোচিং শেষ করে ফেরার সময় রাজীব বলল, 'অচ্যুত, আমি তোর সঙ্গে যাব। আমাকে পরেশদার কেকের দোকানে নামিয়ে দিবি।'

রাজীবের সাইকেল নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হবে এই ভয়ে বাবা-মা কিনে দেননি।

কুলদীপ কোচিং ক্লাস চলার সময় অনেকবার অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে ইশারা করেছে। ঠোঁট উলটে মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ, সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ছে না।

অচ্যুত কোনও উত্তর দেয়নি।

কোচিং-এর বাইরে বেরিয়ে অচ্যুতের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কুলদীপ বলল, 'ধৈর্য চাই, ধৈর্য। সহজে এ-রহস্যের জট খুলবে না।'

অচ্যুত 'হুঁ—' বলে সায় দিল।

ওর সাইকেলে সামনের রডে বসার সময় রাজীব জিগ্যেস করল, 'আমাকে ক্যারি করতে পারবি তো? এই জল-কাদায় যদি ফেলে দিস তা হলে জামা-প্যান্টের বারোটা বেজে যাবে। তারপর মাম্মির হাজারটা কোশ্চেন—।'

'তোর কোনও ভয় নেই। আমি তিনমাস ধরে ডাবল ক্যারি করছি।'

ওকে বসিয়ে নিয়ে অচ্যুত সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল।

এখন বৃষ্টি নেই। তবে কখন শুরু হবে কেউ বলতে পারে না। কাগজে লিখেছে, কোথায় যেন নিম্নচাপ হয়েছে—তার জন্যই নাকি এরকম বাজে অবস্থা।

একটু পরেই ওরা স্কুলের কাছাকাছি চলে এল।

স্কুলের একরকম পাশেই এক প্রকাণ্ড পুকুর। তার ঢালু পাড়ে বড়-বড় মানকচু গাছ আর আগাছার ঝোপ। নাম-না-জানা লতানে গাছের দল আধো-অন্ধকারে সাপের মতো জড়াজড়ি করে রয়েছে।

পুকুরপাড়ের বেড়ে ওঠা আগাছার রমরমাকে রুখে দিয়েছে ছোট-ছোট চার-পাঁচটা দোকান। দরমা, বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘেরা চা-সিগারেট-পান-বিড়ির দোকান। সেখানে হ্যারিকেন বা কুপির আলো জ্বলছে।

দোকানগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে অন্ধকার আর কচু পাতার কালো ছায়া। সেখান থেকে নানান সুরে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক।

পুকুর পেরিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গোরুর 'হাম্বা' ডাক অচ্যুতের কানে এল।

অচ্যুত বলল, 'স্যাটাস্যাট আজ তোকে ব্যাপক আদর করছিল।'

'হ্যাঁ রে, আমিও তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। অন্যদিন কীরকম বকুনি দেয়! বলে, বাপিকে রিপোর্ট করবে...।'

'এবার তুই অ্যানুয়ালে অঙ্কে এইট্টি পারসেন্ট পাবি।'

'ভ্যাট!'

'দেখিস...।'

পরেশদার কেকের দোকান এসে গিয়েছিল। অচ্যুত দোকানের কাছ ঘেঁষে সাইকেল থামাল। কাঁচা ড্রেনের ওপরে পাতা সিমেন্টের স্ল্যাবে ওর সামনের চাকা ঠেকে গিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি লাগল।

রাজীব সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল : 'কাল টিফিনের জন্যে কেক আর প্যাটিস কিনব।'

অচ্যুত টিফিনে মায়ের হাতে তৈরি লুচি কিংবা পরোটা নিয়ে যায়—সঙ্গে আলুর তরকারি বা আলুভাজা। মাসে দু-একদিন কেক বা প্যাটিস। আর দু-তিন টাকা পকেটে থাকলে টিফিনের সময় স্কুলের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো বিভিন্ন 'ওলাদের' কাছ থেকে ঝালমুড়ি, ঘুগনি বা বাদাম খায়।

রাজীব হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'একটা সিগারেট টেস্ট করে দেখবি নাকি?'

'না না—আমার ওসব ভালো লাগে না।'

'সেদিন কুলদীপ দু-চার টান দিয়েছিল। মন্দ নয়। জানিস তো, ও মাঝে-মাঝে স্মোক করে!'

'জানি!'

রাজীব আবদারের গলায় বলল, 'যাই বল, আজ এরকম বৃষ্টি-বাদলার দিন...একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। অচেনা দোকান থেকে কিনব। তারপর দুটো টফি খেয়ে বাড়ি যাব—কেউ গন্ধ পাবে না। তুই খাবি না—শিয়োর?'

অচ্যুত হেসে বলল, 'না।'

তারপর রাজীবকে টা-টা করে চলে গেল।

রাজীব পরেশদার দোকানে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকল।

ঘুরে তাকাল রাজীব।

সত্যবানস্যার। সাইকেল পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজীবের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছেন।

রাজীব স্যারের কাছে এগিয়ে গেল, 'কিছু বলবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। কী কিনবি কিনে নে, তারপর চল, যেতে-যেতে বলছি। তোর বাড়ি তো স্টেশনের দিকে। চল, তোকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

'সিগারেট খাওয়াটা ভোগে গেল', মনে-মনে ভাবল রাজীব। স্যার যে পিছন-পিছন আসবেন তা ও কেমন করে জানবে! এরকম আগে কখনও হয়নি।

কিন্তু রাজীব অবাক ভাবটা চেপে রাখল। ছোট্ট করে বলল, 'একমিনিট ওয়েট করুন, স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

তারপর ছুট্টে ঢুকে পড়ল পরেশদার দোকানে।

পরদিন স্কুলে ঢুকে অচ্যুত দেখল বানজারার ঘরের সামনে অনেক ছাত্রের ভিড়। দু-একজন গার্জেন আর স্যারও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

সাইকেল জায়গামতো রেখে মাঠের কোণের দিকটায় ছুটে গেল অচ্যুত। ভিড় ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

দৃশ্যটা দেখার আগেই বানজারার বউয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছিল অচ্যুত। কাঁদছিল আর দেশোয়ালি ভাষায় বিলাপ করছিল। ওর কথার একটি বর্ণও অচ্যুত বুঝতে পারছিল না। শুধু 'রামুয়া' শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল আর এটুকু বুঝতে পারছিল, ভালোবাসার কেউ মারা গেলে মানুষ এরকম বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বৃত্তের ভেতরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখতে পেল অচ্যুত।

রামুয়া আর ওর বাছুর মাটিতে পাশাপাশি পড়ে আছে। ওদের চোখ বোজা। বানজারার বউ ওদের ওপর শরীর এলিয়ে কাঁদছে।

বানজারা একপাশে বেজার মুখে উবু হয়ে বসে ছিল। চোখ ছলছল। মাথাটা ডানহাতে ভর দিয়ে হেলানো।

অচ্যুত অবাক হয়ে দেখল, রামুয়ার ধপধপে সাদা গলায় রক্তের দাগ। খানিকটা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর বাছুরের দশাও তাই। ঠিক মনে হচ্ছে, কোনও হিংস্র জন্তু ওদের নরম গলায় কামড় দিয়েছে।

কিন্তু এই সামান্য ক্ষত থেকে কি এতবড় মাপের একটা গোরু মরে যেতে পারে?

তা ছাড়া কোন জানোয়ারই-বা গোরুর গলায় এভাবে কামড়ায়? সাপ, নাকি কুকুর?

বানজারা এবং আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কথাবার্তার টুকরো জুড়ে গোটা গল্পটা মোটামুটি আঁচ করতে পারল অচ্যুত।

আজ ভোর-রাতের দিকে গোয়ালঘর থেকে একটা ঝটাপটির শব্দ বানজারা শুনতে পায়। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে সব আবার চুপচাপ হয়ে গেছে। তখন বানজারা আর ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। অনেক সময় রামুয়া আচমকা খেপে উঠে পা ছোড়াছুড়ি করে। ব্যাপারটা সেইরকম কিছু একটা ভেবে বানজারা আবার শুয়ে পড়ে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা বউকেও আর ডাকেনি।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়েই বানজারার বউ চিৎকার করে ওঠে। সেই চিৎকার শুনে বানজারা ছুটে যায়। দ্যাখে রামুয়া গোয়ালঘরের বাইরে জলকাদার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে—তখনও দেহ একেবারে অসাড় হয়ে যায়নি। আর ওর বকনা বাছুরটা গোয়ালঘরের ভেতরে চোখ কপালে তুলে শেষ।

বানজারা আর ওর বউ মিলে বাছুরটার দেহ গোয়ালঘরের গুমোট অন্ধকার থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে আসে। তারপর ঘটির পর ঘটি জল ঢেলে মা-মেয়েকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সবই বেকার। দুজনেরই দেহান্ত হয়ে যায়।

অচ্যুতের দৃশ্যটা ভালো লাগছিল না। ও ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে কুলদীপ ওর কাঁধে হাত দিল।

অচ্যুত চমকে উঠল। কুলদীপ কখন এসেছে ও টের পায়নি।

কুলদীপ হাতঘড়ি দেখে বলল, 'চল, ক্লাস বসে যাবে। আজ তো আর ঘণ্টা পড়বে না।'

'ওই গোরু আর বাছুরটার কী করে এমন দশা হল বল তো!'

'কী জানি!' ঠোঁট ওলটাল কুলদীপ : 'শোন, আজ সকালে মউলি ফোন করেছিল। ও আজ হিস্ট্রি কোচিং-এ যাবে না। তোর নোটটা নেক্সট উইকে ফেরত দেবে।'

অচ্যুতরা কয়েকজন সুপারমার্কেটের কাছে ইতিহাস পড়তে যায়। ওখানে নগেনস্যারের কোচিং আছে। নগেনস্যার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের টিচার ছিলেন—প্রায় বছরদশেক হল রিটায়ার করেছেন। নগেনস্যার যখন ইতিহাস পড়ান তখন অচ্যুতদের মনে হয়, ওরা যেন সিনেমা দেখছে। ওদের চোখের সামনে চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, মেগাস্থিনিস চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

মউলি কমলাবালা গার্লস হাইস্কুলে পড়ে। অচ্যুতদের পাশের বাড়িতেই থাকে, অথচ সবসময় কুলদীপকে ফোন করে অচ্যুতকে খবর দেয়।

মউলি খুব ছটফটে, শাড়ি পরতে ভালোবাসে না, বেণী দুলিয়ে হাঁটে। একদিন বিকেলে ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল অচ্যুত। খেয়াল করেনি যে, ওদের ছাদে দাঁড়িয়ে মউলি ওর ঘুড়ি ওড়ানোর হাস্যকর চেষ্টা দেখছে।

'যারা সবসময় লেখাপড়া করে তারা ঘুড়ি ওড়াতে গেলে এরকমই হয়—।'

ঘুড়ি ওড়ানো থামিয়ে ফিরে তাকাল অচ্যুত। ওর ময়ূরপঙ্খী ঘুড়িটা গোঁত খেয়ে সামনের বাড়ির শিউলি গাছে আটকে গেল।

তাই দেখে মউলি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

অচ্যুত বলল, 'আমি মোটেই সবসময় লেখাপড়া করি না—তা হলে এখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছি কী করে।'

ঠোঁট ব্যাঁকাল মউলি : 'আজকের ব্যাপারটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি দিনরাত লেখাপড়া করো বলেই তো আমার পড়ায় মন বসে না—।'

ধুত, যত্তসব উলটোপালটা কথা। ওর অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল অচ্যুত। বলল, 'এরকম আবার হয় নাকি!'

'হয়। দেখবে, আজ আমার কী দারুণ পড়ায় মন বসবে। মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...তা হলে সব কাজে আমার মন বসবে।'

অচ্যুত কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। ও ছাদের পাঁচিলের কাছে এসে সাত-আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মউলিকে দেখছিল। মউলির মাথার পিছনে সূর্য অস্ত যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল।

মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...। তার মানে?

মউলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'সকালে আর বিকেলে ছাদে এসে একটু ফ্রেশ বাতাস তো নিতে পারো। তা হলে দেখবে, ভালো হবে।'

'কার?'

'দুজনেরই।'

মউলির মুখে সূর্যের তেরছা আলো পিছলে গেল। ও চটপট ঘুরে দাঁড়িয়ে একরকম ছুটেই চলে গেল।

সেদিন অচ্যুত ছাদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছিল। ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে মউলির এলোমেলো কথার মানে বোঝার চেষ্টা করেছিল।

তারপর থেকে অচ্যুত লক্ষ করেছে, মউলির কাজের কিছু বলার থাকলে ও কুলদীপের মারফত বলে পাঠায়। ইতিহাস কোচিং-এ যখন পড়তে যায় তখনও ও অচ্যুতের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। বরং ছাদে যখন দেখা হয় তখন অনেক সহজভাবে অনেক উলটোপালটা অকাজের কথা বলে। বলে, 'তুমি ভিতু, তোমার মাথায় বুদ্ধি নেই। কী করে অঙ্কে একশোয় একশো পাও কে জানে!'

অচ্যুত জবাব না দিলেও ওর কথাগুলো নিয়ে চুপচাপ বসে ভাবে।

এখন কুলদীপ যে-নোটটার কথা বলেছে সেটা মউলি চেয়ে পাঠিয়েছিল কুলদীপের মারফত। আবার সেটা ফেরতও আসবে কুলদীপের হাত দিয়ে। তা হলে তো মউলি কুলদীপের কাছ থেকেই নোটটা নিতে পারত! কারণ, নগেনস্যারের ডিকটেশান থেকে ওরা সবাই নোট নিয়েছিল। সেদিন মউলি আসেনি।

আবার একদিন ছাদে দেখা হতে অচ্যুত এই অদ্ভুত 'যোগাযোগ ব্যবস্থা' নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে মউলি হেসে বলেছিল, 'এতে একটা অন্যরকম মজা আছে—তুমি বুঝবে না।'

ওর ভ্যাবাচ্যাকা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু পরে মউলি বলেছে, 'ঠিক আছে, আমি দুটো এক্স্যাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝাচ্ছি। সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে টেলিফোনে কথা বললে কত ভালো লাগে। আবার সেই কথাগুলো চিঠি দিয়ে বলাবলি করলে...ওঃ, ফ্যান্টাস্টিক।'

একটু চুপ করে থেকে অচ্যুতকে দেখল মউলি। তারপর জিগ্যেস করল, 'কিছু বুঝলে?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল। সত্যিই ও কিছু বোঝেনি।

তাই এখন কুলদীপের কথায় ও শুধু ঘাড় হেলাল।

তখনই ওর চোখ গেল স্কুলের দোতলার বারান্দার দিকে।

সত্যবানস্যার বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেট খাচ্ছেন। নীচে বানজারার ঘরের কাছে যে অত হইচই, ভিড়, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই।

হঠাৎই মাঠে একটা শোরগোল ব্যস্ততা শুরু হল। ছাত্রের দল প্রায় ছুটে চলে গেল স্কুল বিল্ডিং-এর কাছে। হুড়মুড় করে যার-যার ক্লাসরুমের দিকে রওনা হল।

ওদের কথাবার্তার টুকরো শুনে অচ্যুতরা বুঝল হেডস্যার এসে গেছেন। পিছন ফিরে তাকাতেই ওরা হেডস্যারকে দেখতে পেল।

হেডস্যার মোহনলাল পুরকায়স্থ রোগা শরীরটাকে টান-টান করে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। মাথায় টাক, চোখে চশমা, ভাঙা গাল, চোয়াল শক্ত। দেখলেই বোঝা যায় বেশ কড়া ধাতের মানুষ। সবসময় ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে চান। কিন্তু আজ প্রেয়ার হবে কি না কে জানে! বানজারা ঘণ্টা বাজাতে পারেনি। তা ছাড়া অনেকটা দেরিও হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রেয়ারের ঘণ্টা বাজল—দেরিতে হলেও। হেডস্যার পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। এখন বানজারার গোরু-বাছুরের মৃতদেহের নিশ্চয়ই একটা গতি হবে। কিন্তু কোন প্রাণী ওদের গলার অমন হিংস্র কামড় বসিয়েছে সেটা জানা যাবে কী?

ক্লাস বসল। অচ্যুত ভালো করে পড়ায় মন দিতে পারছিল না। বারবার ভাবছিল, স্কুলে হঠাৎ এসব কী শুরু হল!

টিফিনের সময় প্রতীক ওকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, রাজীব আজ এল না?'

অচ্যুত বলল, 'দেখছি তো আসেনি—।' একইসঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল, রাজীব আজ টিফিনের জন্য কেক-প্যাটিস কিনতে পরেশদার দোকানে নেমেছিল।

তা হলে কি হঠাৎ করে ওর জ্বর-টর হল!

চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর থেকে রাজীব ওদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। নিজের অন্যায়ের জন্য বারবার ওদের কাছে দুঃখ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে। অচ্যুত ভাবল, রাতে একবার ফোন করে রাজীবের খবর নেবে। কিন্তু তখনই খেয়াল হল, ওর কাছে তো রাজীবের ফোন নম্বর নেই। তখন ও প্রতীককে বলল ফোন করে রাজীবের খবর নিতে।

টিফিনের সময় প্রতীক পকেট থেকে একটা পাতলা ক্যালকুলেটর বের করে অচ্যুতদের দেখাল : 'আমার ছোটমামা পরশু আমেরিকা থেকে ফিরেছে—আমার জন্যে এটা নিয়ে এসেছে।'

ওরা একে-একে ওটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দেখতে লাগল।

কুলদীপ বলল, 'এই, তোরা ক্যালকুলেটর পরে দেখবি—আগে শোন, সামনের শনিবার দুটোর সময় “সি” সেকশনের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ ঠিক করেছি। আজ ছুটির পর টিম ফাইনাল করে ফেলতে হবে।'

বাসব আর সৌরভ হইহই করে উঠল। ওরা দুজনে ফুটবলের পোকা।

তারপর ফুটবল নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য বিপজ্জনক অশুভ ঘটনাগুলো মুছে গেল ওদের মন থেকে।

সেদিন ছুটির পর অচ্যুত যখন সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিল তখন ওর মনটা বেশ হালকা লাগছিল। আজ সাতটার সময় নগেনস্যারের কাছে পড়া আছে। মউলি আজ আসবে না। কুলদীপকে দিয়ে মউলি যেমন খবর পাঠায়, অচ্যুতেরও কি পালটা কোনও খবর পাঠানো উচিত? নাকি কাল বিকেলে ছাদে উঠে ওর জন্য অপেক্ষা করবে? যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়! মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা একটুও বলা হয়নি। বলতে পারলে অচ্যুতের মন হালকা হত।

ইতিহাসের কোচিং সেরে অচ্যুত বাড়ি ফিরল প্রায় পৌনে ন'টা নাগাদ। আর ফিরেই শুনল প্রতীক ওকে ফোন করেছিল। কোচিং থেকে ফিরলে ফোন করতে বলেছে। খুব জরুরি দরকার।

বই-খাতা গুছিয়ে রেখে প্রতীককে ফোন করল অচ্যুত।

একবার রিং বাজতে-না-বাজতেই প্রতীক রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল।

'আমি অচ্যুত—।'

'ওঃ, তোর ফোনের জন্যেই ওয়েট করছিলাম। এক্ষুনি রাজীবের বাড়িতে যেতে হবে।'

'কেন?' অচ্যুত অবাক হয়ে গেল।

'সে অনেক ব্যাপার—গেলে সব জানতে পারবি। আমি কুলদীপকে ফোন করে দিচ্ছি, ও দশ মিনিটের মধ্যে রাজীবের বাড়ি পৌঁছে যাবে। তুইও চলে আয়।'

অচ্যুতের বুকের ভেতরে একটা ধকধকানি শুরু হল। রাজীব কাল টিফিনের কেক-প্যাটিস কিনেছিল, কিন্তু আজ স্কুলে আসেনি! ওর কি কোনও বিপদ হয়েছে?

'কী হয়েছে রাজীবের?' অচ্যুতের গলার স্বরটা খসখসে হয়ে গেল।

'বললাম তো, গিয়ে সব শুনবি—।'

ফোন রেখে দিল প্রতীক।

অচ্যুত মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'আমাকে এখুনি একবার সাইকেল নিয়ে বেরোতে হবে।'

'কেন রে, রাত ন'টার সময় কোথায় বেরোবি?'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে মিথ্যে কথা বলল অচ্যুত, 'প্রতীকের কাছে আমার একটা নোট রয়ে গেছে। সেটা আজ রাতেই লাগবে—পড়তে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না—আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরোল অচ্যুত। আকাশের দিকে একবার তাকাল। সেখানে ঘোলাটে লালচে মেঘ অপেক্ষা করছে।

তখনই চোখ গেল মউলিদের বারান্দায়। একটা মেয়েলি ছায়া সেখানে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে ধরা রেডিয়ো বাজছে।

সাইকেল চালিয়ে রাজীবদের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অচ্যুত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বুকের হালকা ভাবটা কখন যেন মিলিয়ে গেছে। তার বদলে মেঘলা আকাশটা চুপিচুপি সেখানে ঢুকে পড়েছে।

পাঁচ

রাজীবদের বাড়িতে পৌঁছে দেখল কুলদীপ আর প্রতীক আগেই সেখানে হাজির। অল্প আসবাব দিয়ে ছিমছামভাবে সাজানো ড্রয়িং-ডাইনিং-এ ওরা বসে রয়েছে। ওদের সামনে আখরোট কাঠের কারুকাজ করা টেবিলে কমলা রঙের শরবতের গ্লাস। ঘরের এককোণে রঙিন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল চলছে।

অচ্যুত ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসতে-না-বসতেই দেখল, রাজীব আসছে।

রাজীবের গায়ে একটা নীলরঙের চাদর জড়ানো। ওর মাম্মি ওকে ধরে-ধরে নিয়ে আসছেন।

রাজীবের ফরসা মুখ বেশ ফ্যাকাসে। অচ্যুতদের দেখে মলিন হাসল।

মাম্মি ওকে যত্ন করে সাবধানে একটা সোফায় বসালেন। অচ্যুতদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল রাত থেকে হাই ফিভার—মাথা তুলতে পারছে না। ডক্টর দেখিয়ে আজ সন্ধের পর জ্বর একটু কমেছে। ওর ঘাড়ে পোকা-টোকা কী একটা কামড়েছে—তাই থেকেই হয়তো ইনফেকশান হয়েছে। এখানকার ড্রেনেজ সিস্টেমটা তো একেবারেই প্রিমিটিভ, নন-হাইজিনিক...সাফার করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই...।'

রাজীবের মাম্মির সাজগোজ বেশ নজরে পড়ার মতো। ডানহাতের দু-আঙুলে দুটো পাথর বসানো সোনার আংটি।

'তোমাদের সঙ্গে রাজুর কী ইমপর্ট্যান্ট ডিসকাশন আছে—সেই সন্ধে থেকে ও একেবারে ছটফট করছে। তোমরা কথা বলো...,' তারপর অচ্যুতের দিকে ফিরে বলল : 'আমি তোমার শরবত পাঠিয়ে দিচ্ছি—।'

চলে যেতে-যেতে রাজীবের দিকে ঘুরে তাকালেন মাম্মি : 'রাজু, বেশি স্ট্রেইন কোরো না। ডক্টর ব্যানার্জি তোমাকে অ্যাবসলিউট রেস্ট নিতে বলেছেন...।'

মাম্মি চলে যেতে রাজীব শব্দ করে হাঁফ ছাড়ল। তারপর ওদের তিনজনের চোখের দিকে পালা করে তাকিয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা আমি মাম্মি-বাপি কাউকে বলিনি। বললে শোরগোল করে থানা-পুলিশ ঘেঁটে একেবারে দুনিয়া মাথায় তুলবে। আমার বিপদের কথাটা ভাববে না।'

'কীসের বিপদ?' এক চুমুকে শরবত শেষ করে কুলদীপ জানতে চাইল।

'বলছি।' ঢোঁক গিলল রাজীব। ওর মুখে একটা আলতো ভয়ের ছায়া নেমে এল। ও অচ্যুতের দিকে তাকাল : 'তুই কাল আমাকে পরেশদার দোকানে নামিয়ে দেওয়ার পর স্যাটাস্যাটের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল...।'

কুলদীপ চোখ বড়-বড় করে চাপা শিস দিয়ে উঠল।

অচ্যুত অপেক্ষা করতে লাগল। প্রতীক গালে হাত দিয়ে কৌতূহলভরা মুখে রাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। আর মাঝে-মাঝে আনমনাভাবে শরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

'সত্যবানস্যারের সঙ্গে সাইকেল ছিল। বললেন, আমার সঙ্গে কী কথা আছে...যেতে-যেতে বলবেন। আমি কেক-টেক কিনে ওঁর সাইকেলে উঠলাম—সামনে রডের ওপরে বসলাম। স্যারের চোখে-মুখে একটা চাপা ফুর্তি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারিনি।

'...সাইকেল চালিয়ে যেতে-যেতে স্যাটাস্যাট অঙ্ক নিয়ে খুব জ্ঞান দিতে লাগল।' অচ্যুতের দিকে ইশারা করে রাজীব বলল, 'তোর অঙ্কের মাথা নিয়ে খুব প্রেইজ করছিল। আর কথা বলতে-বলতে...।' রাজীবের চোখ সরু হয়ে
এল : 'আমার ঘাড়ের কাছে বারবার ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছিল। আমার বিরক্ত লাগছিল...কিন্তু কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। স্যাটাস্যাটের জড়ানো গলায় কথা শুনতে-শুনতে আমার ঝিম ধরানো নেশা মতন হয়ে গেল। ততক্ষণে সাইকেল ঘোষদের বাগানবাড়ি ছাড়িয়ে পুকুরের পাশের অন্ধকার রাস্তায় চলে এসেছে। আমি বললাম, ''স্যার, এ-রাস্তা দিয়ে এলেন কেন?'' আমার মাথার পেছন থেকে স্যাটাস্যাট খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, ''এটাই তো তোর বাড়ি যাওয়ার শর্টকাট রে বোকা!''

'আমি কিন্তু জানতাম যে, ওটা শর্টকাট নয়—তবুও কিছু বলতে পারলাম না। কেমন যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের ওপরে আর কোনও কন্ট্রোল ছিল না।

'স্যাটাস্যাট একটা বটগাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে সাইকেলটা দাঁড় করাল। বটগাছের ঝুরির ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। পুকুরের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছিল।

'আমার বেশ ভয় করছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারছিলাম না। গলার ভেতরে কেউ যেন খানিকটা তুলো গুঁজে দিয়েছে। এমন সময় পুকুরের কালো জলে কোনও মাছ বোধহয় ঘাই মারল—ছপাৎ করে শব্দ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ে কাঁটা ফোটার মতো ব্যথা পেলাম। তারপরই জায়গাটা চিনচিন করতে লাগল। আমি...।'

ডিসকভারি চ্যানেলে আচমকা বাঘের গর্জন শোনা গেল। ওরা চারজনেই সামান্য চমকে উঠল। এই গরমের মধ্যেও অচ্যুতের কেমন যেন শীত করছিল।

ওরা টিভির দিকে তাকিয়েছিল। তখনই দেখল, একজন মহিলা একগ্লাস শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

শরবতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন। রাজীব গ্লাসটা তুলে নিয়ে অচ্যুতের হাতে দিল, 'নে, শরবত খা।'

অচ্যুত এক ঢোঁকে শরবতের গ্লাস অর্ধেকটা শেষ করে জানতে চাইল, 'তারপর?'

রাজীব দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল :

'...আমি অসাড় হয়ে সাইকেলের রডের ওপরে বসে রইলাম। নড়াচড়ার শক্তি নেই। স্যারও কোনও কথা বলছিলেন না। একটা ঘোরের মধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল। চোখের সামনে থেকে চাঁদ মুছে গেল। ব্যাঙের ডাক আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু চিনচিনে ব্যথাটা টের পাচ্ছিলাম।

'...ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। একসময় আবার চাঁদ দেখতে পেলাম, ব্যাঙের ডাকও শুনতে পেলাম। শরীরটা খুব উইক লাগছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। টের পেলাম, স্যার আমার ঘাড়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। জামার কলারটা তুলে দিয়ে ঘাড়ের কাছটা ভালো করে ঢেকে দিতে চাইলেন। তারপর বললেন, "আমার দিকে একবার তাকা...।" আমি অন্ধ ভক্তের মতো ওঁর হুকুম মেনে তাকালাম...।'

রাজীব হঠাৎই শিউরে উঠল। পাশে বসে থাকা অচ্যুতের হাত খপ করে চেপে ধরল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'বাড়িতে এসব কথা একদম বলিনি। তোদের বলছি—।'

'তাকিয়ে কী দেখলি?' প্রতীক জিগ্যেস করল।

'দেখলাম...।' চোখ গোল-গোল করে তাকাল রাজীব। ওর মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল : 'দেখলাম, স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ—ধকধক করে জ্বলছে—আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি। ঠিক যেন বেড়াল বা চিতাবাঘের চোখ। চোখ তো নয়, মার্বেল পাথর বসানো! স্যার অদ্ভুতভাবে হেসে ভয়ানক গলায় বললেন, ''কাউকে এসব বলবি না। তুই এখন আমার! আমার কথায় উঠবি, আমার কথায় বসবি, আমার কথায় চলবি। আমার ইশারা তোর কাছে আদেশ। এ-কথা মনে রাখিস।''

'আশ্চর্য! বিশ্বাস কর, স্যারের ওপরে আমার একটুও রাগ হল না। ছুটে পালাতেও ইচ্ছে করল না। পাথরের স্ট্যাচুর মতো স্যারকে দেখছিলাম, স্যারের কথা শুনছিলাম।

'এরপর স্যার সাইকেল চালিয়ে আমাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিলেন। কানের কাছে মুখ এনে সাপ-খেলানো সুরে অনেক কথা বললেন। কথাগুলো সব আমার মনে নেই। তবে একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আমি বাড়ি এলাম। গলার পাশে, ঘাড়ের কাছটায় চুলকোচ্ছিল। হাত দিতেই কেমন চটচটে লাগল। দেখি রক্ত। তখনই আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই। তারপর বাপি-মাম্মির হইচই, ডাক্তার ডাকাডাকি, কত কী কাণ্ড!

'বাড়িতে আমি ভয়ে কোনও কথা বলিনি। বলেছি, অন্ধকারে ওই পুকুরের কাছটায় কী একটা পোকা যেন কামড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোদের সত্যি কথা বলছি, সত্যবানস্যারের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা হয়ে আছি। বারবার মনে হচ্ছে, কাল রাতের ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বপ্ন—একবর্ণও সত্যি নয়। কিন্তু আসলে তো সত্যি! এখন তোরা আমাকে বাঁচা। কী করব বলে দে—।'

রাজীবের কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। কুলদীপ ওর কদমছাঁট চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। প্রতীক বয়স্ক মানুষের মতো ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বসে। আর অচ্যুতের মনের ভেতরে তোলপাড় চলছিল।

কী করা উচিত এখন?

প্রতীক বিড়বিড় করে বলল, 'স্যাটাস্যাট আসলে ড্রাকুলা! আজকের যুগে এ তো বিশ্বাস করা মুশকিল!'

অচ্যুত ধীরে-ধীরে বলল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ব্যাপারটা বোধহয় মিথ্যে নয়। তা ছাড়া পিশাচের আবার যুগ আছে নাকি!'

কুলদীপ বলল, 'আমি ওসব ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। রাজীব, তোর মনে হয় ভুল হয়েছে। তোকে সত্যি-সত্যিই কোনও পোকা-টোকা কামড়েছে।'

রাজীব চোখ বড় করে জানতে চাইল, 'তা হলে ওই সবুজ চোখ দুটোও ভুল?'

'না, মোটেই ভুল নয়,' জবাব দিল অচ্যুত, 'আমিও ওই সবুজ চোখ দেখেছি। স্যারের মধ্যে যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে, সেটা আঁচ করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে এইরকম তা বুঝতে পারিনি। রাজীব, তুই এখন যা—শুয়ে পড় গিয়ে। কয়েকটা দিন রাস্তায় বেরোস না। আমরা একটু ভেবে দেখি, কী করা যায়। তোর ফোন নাম্বারটা আমাকে দে—।'

রাজীব ফোন নম্বর বলল। অচ্যুত সেটা কয়েকবার বিড়বিড় করে আওড়ে মুখস্থ করে নিল।

এমন সময় রাজীবের মাম্মি ঘরে ঢুকলেন। রাজীবকে লক্ষ করে বললেন, 'রাজু, চলো, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। এবারে ওষুধ লাগিয়ে রেস্ট নেবে। কাল ডক্টর ব্যানার্জি আবার চেক আপে আসবেন। তোমরা শরবত খেয়েছ তো?'

শেষ প্রশ্নটা অচ্যুতদের লক্ষ করে।

প্রতীক আর অচ্যুত গ্লাসের বাকি শরবত শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

কুলদীপ হাঁ করে টিভিতে বাঘ আর বাইসনের লড়াই দেখছিল, অচ্যুত ওকে খোঁচা মারল। কুলদীপ ফিরে তাকাতেই ওকে উঠতে ইশারা করল।

'আসি, আন্টি।'

রাজীবকে 'টা-টা' করে ওরা তিনজন দরজার দিকে এগোল। হঠাৎই প্রতীক ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজীবকে বলল, 'কাল তোকে ফোন করব—।' তারপর মাম্মিকে আড়াল করে এক চোখ টিপে হাতের ইশারায় বলতে চাইল, 'কোনও ভয় নেই।'

রাস্তায় বেরোতেই কুলদীপ অচ্যুতকে বলল, 'কী রে, স্যাটাস্যাটের সবুজ চোখের ব্যাপারটা আমাদের বলিসনি তো!'

'ভয়ে বলিনি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাট হেভি ডেঞ্জারাস। কিন্তু কী করে হঠাৎ এরকম চেঞ্জ হয়ে গেল বল তো?'

'হয়তো ওর ওপরে পিশাচ ভর করেছে।' অচ্যুত বলল, 'রক্তপিশাচ ড্রাকুলা যেমন ভর করত—আমি টিভিতে দেখেছি।'

প্রতীক কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'বানজারার গোরু-বাছুরকেও কি তা হলে পোকা কামড়েছে?'

কুলদীপ আর প্রতীকের দিকে তাকাল অচ্যুত। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, স্যাটাস্যাট-পোকা।'

ওর কথায় কেউ হাসল না।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

ওরা তিনজন যে-যার সাইকেলে উঠে রওনা হয়ে গেল। যেতে-যেতে কুলদীপ চেঁচিয়ে বলে গেল, 'কাল স্কুলে দেখা হবে—।'

রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে। সাইকেল রিকশা, স্কুটার, বা লোকজন চোখে পড়ে কি পড়ে না। অচ্যুত সাইকেল চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর মন রাস্তার দিকে ছিল না। দুটো ধকধকে ক্ষুধার্ত সবুজ চোখ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল।

ও মনে-মনে ঘটনাগুলো যতই চিন্তা করছিল ততই যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও মানে হয় না, কারণ, কেউ ওদের কথা বিশ্বাস করবে না।

তা হলে কী করা যায়? সত্যবানস্যারকে ওরা দশ-পনেরোজন মিলে ঘিরে ধরে কোণঠাসা করবে? জবাবদিহি চাইবে? নাকি হেডস্যারের কাছে দলবেঁধে গিয়ে সত্যবানস্যারের নামে নালিশ করবে?

তখনই অমিয়স্যারের কথা মনে পড়ল।

প্রমাণ চাই, প্রমাণ। স্যাটাস্যাটকে লাল হাতে ধরতে হবে। কিন্তু সেই সুযোগ কি কখনও পাওয়া যাবে?

এইসব এলোমেলো চিন্তা করতে-করতে অচ্যুত যখন বাড়ি ফিরল তখন দেখল মা একরাশ দুশ্চিন্তা মুখে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

একইসঙ্গে ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, মউলিদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় সেই মেয়েলি ছায়াটা এখনও একইরকমভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, 'সেই কখন থেকে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! একে রাত হয়েছে, তার ওপর বৃষ্টি—একটা বিপদ হলে তখন কী হবে বল তো!'

অচ্যুত সামান্য হাসল। সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে মা-কে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। মা-কে ও বলতে পারল না, 'বিপদ হলে তখন কী হবে' নয়—এর মধ্যেই ও বিপদের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। অভিমন্যুর মতো ওকে চক্রব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ভেদ করতে না পারে, তা হলে অভিমন্যুর মতোই হয়তো ওর...।

অচ্যুত আর ভাবতে পারল না।

রাজীবের ঘটনাটা ওর শিরদাঁড়ায় বরফ জমিয়ে দিয়েছে।

ছয়

পরদিন স্কুলে গিয়ে অচ্যুতরা জোট পাকাতে শুরু করল।

ও, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, সৌরভ সব বন্ধুদের রাজি করিয়ে কাছাকাছি ডেস্কে বসল। আর ক্লাসের মাঝে ফাঁক পেলেই ফিসফাস করে আলোচনা করতে লাগল।

একটার পর একটা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, ওদের সেদিকে মন নেই। আনমনা হওয়ার জন্য বাসব ভূগোলের পিরিয়ডে কালীপদস্যারের কাছে বকুনিও খেল। কিন্তু সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা এত সাঙ্ঘাতিক যে, ওরা কেউই পড়াশোনায় মন দিতে পারছিল না।

টিফিনের ঘণ্টা যখন পড়ল তখনও ওরা ক্লাসে বসে রইল। যে দু-তিনজন ঘরে বসেই টিফিন খায়, কুলদীপ তাদের মাঠে যেতে বলল, ‘তোরা নীচে গিয়ে টিফিন খা। আমাদের একটু প্রাইভেট কথা আছে।’

কুলদীপকে সবাই একটু সমীহ করে। তাই কেউই কথা বাড়াল না।

অচ্যুতের কাছে সব শোনার পর বাসব আর সৌরভ তো একেবারে থ হয়ে গেল।

প্রতীক বলল, ‘সেইজন্যেই তুই আর কুলদীপ অত গুজগুজ করতিস!’

কুলদীপ একটু হাসল। বলল, ‘চিন্তা করে দেখ, ব্যাপারটা কীরকম আজগুবি আর সিরিয়াস।’

বাসব বলল, ‘কুলদীপ বলছে স্যাটাস্যাটকে চোখে-চোখে রাখতে—যদি হাতেনাতে ধরা যায়।’

প্রতীক গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল : ‘হুঁ—প্রমাণ না পেলে কিছু করা মুশকিল...।’

‘স্যাটাস্যাটও আমাকে এই কথা বলেছিল—সবুজ চোখ দেখানোর সময়। প্রমাণ না পেলে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।’

সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, ‘আমার ছোট একটা অটোমেটিক ক্যামেরা আছে। ফটো তুলে নিলে কেমন হয়। সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ—।’

প্রতীক হাসল, ‘স্যাটাস্যাট কি তোর ক্যামেরার সামনে চোখ সবুজ করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবে?’

‘কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে!’

বাসব হাতের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল। তারপর বলল, ‘আমাদের পাঁচজনের কাজ এখন একটাই—প্রমাণ খোঁজা। সৌরভ যদি ক্যামেরা নিয়ে কিছু করতে পারে তো করুক। আর আমরা সত্যবানস্যারের ওপরে কড়া নজর রাখব। শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও। এই নজরদারির কাজে দরকার হলে আরও কয়েকজনকে দলে নেব।’

বাসবের কথাটা কুলদীপের মনে ধরল। প্রতীকও মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, ‘স্যার একা—আর আমরা অনেক। আমাদের সুবিধে অনেক বেশি।’

অচ্যুত বলল, ‘আমাদের গ্রুপের বাইরে কেউ যেন কিছু না জানতে পারে। ক্লাস টেনের দাদাদেরও কিছু বলার দরকার নেই। এখন সবকিছু সিক্রেট রাখাটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট।’

‘তুই বাড়িতে কিছু বলিসনি?’ কুলদীপ জিগ্যেস করল।

‘না, এখনও বলিনি। বললে পর হইচই বেধে যাবে—হয়তো এ-স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য স্কুলে ভরতি করে দেবে। আমার মা যা ভিতু!’

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত ওদের জল্পনা-কল্পনা চলল। স্কুল ছুটির পর মাঠের সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা না-ফুরোনো কথা বলছিল।

কুলদীপ বলল, ‘আগামীকালের ম্যাচ বাতিল করতে হবে।’

সৌরভ বলল, ‘আমি আমার ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরে তৈরি হয়ে থাকব।’

বাসব বলল, ‘সত্যবানস্যারের ওপরে সবসময় নজর রাখার জন্য পাড়ার বন্ধুবান্ধবদেরও বলতে হবে। কারণ, বাসবরা যদি রাস্তাঘাটে, স্টেশনে, সব জায়গায় স্যারের পিছু নেয় তা হলে স্যার সহজেই গোলমালটা ধরে ফেলবেন।’

ওরা চারজন বাসবের কথায় সায় দিল।

অচ্যুত আনমনা হয়ে কী ভাবছে দেখে প্রতীক ওকে ঠেলা মারল : ‘কী রে, কী ভাবছিস?’

‘ফটো তোলা যাবে কী করে তাই ভাবছি। সৌরভ, তোর ক্যামেরা যেন সোমবার থেকে রেডি থাকে—।’

সৌরভ প্রবল উৎসাহে ঘাড় কাত করে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। কালকেই ফিল্ম কিনে ক্যামেরা লোড করে নেব।'

অচ্যুত বলল, 'রাতে সবাই রাজীবকে ফোন করে একটু সাহস দিস...নইলে ওর ভয় কাটবে না। তা ছাড়া ওর শরীর কেমন আছে, সেটাও জানা দরকার।'

কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভ ঘাড় নাড়ল। বাসবের বাড়িতে ফোন নেই।

ছুটির পর ছেলের দল স্রোতের মতো মাঠ পেরিয়ে লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই স্রোত এখন একেবারে ফিকে হয়ে এসেছে।

ওরা দেখল, সত্যবানস্যার আরও দুজন স্যারের সঙ্গে স্কুল থেকে বেরোচ্ছেন। ওঁদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন। দেখে মনেই হয় না এতগুলো ভয়ংকর ঘটনা সত্যি।

কুলদীপ হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, নেক্সট উইকে স্যাটাস্যাটের কোচিং-এর কী হবে?'

অচ্যুত বলল, 'আমরা যেমন যাই যাব। শুধু রাজীবকে যেতে বারণ করব। আর শোন, স্যার যদি কাউকে একা ডাকেন তা হলে কেউ যাবি না। স্কুলে অতটা ভয় নেই...বেশি ভয় বাইরে।'

অচ্যুত লক্ষ করল, সত্যবানস্যার যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের জটলার দিকে একবার তাকালেন। ছোট্ট করে হাসলেন বলেও মনে হল। অবজ্ঞার হাসি।

একটু পরেই ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

আকাশে মেঘ আছে, তবে তেমন ঘন নয়। বাতাস বইছে, এলোমেলো। অচ্যুতের চুল হাওয়ায় উড়ছিল। মাঠে-ঘাটে কাশফুল ফুটেছে। জানিয়ে দিচ্ছে পুজোর আর খুব দেরি নেই। কিন্তু বর্ষার যা ঢং এবার, মনে হয়, মা দুর্গাকে প্রণাম না করে সে বাড়ি ফিরবে না।

দোকানপাটে ভিড় তেমন নেই। পুজোর বাজার এখনও লাগেনি। পুজো-পুজো গন্ধটাও অচ্যুতের নাকে আসছে না। অথচ আর কিছুদিন পরেই পুজোর ছুটি পড়বে। ওর বন্ধুদের অনেকেই বাইরে বেড়াতে যাবে। অচ্যুতরা খুব একটা যায় না। গতবারে শুধু দিঘা গিয়েছিল।

পথে একটা চুড়িদারের দোকান দেখতে পেল অচ্যুত। সেখানে অনেক বাহারি রঙের চুড়িদার ঝুলছে। তার মধ্যে একটা ওকে মউলির কথা মনে পড়িয়ে দিল। মউলির ওইরকম রঙের একটা চুড়িদার আছে।

কাল রাতে মউলি অতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কেন? অচ্যুত কখন ফেরে সেটা দেখার জন্য?

মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা বলতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু অচ্যুত তো এখনও পর্যন্ত মা-বাপিকেও কিছু বলেনি।

সময় আসুক, তখন বলবে।

রবিবার সকালে একটা ভয়ানক খবর অচ্যুতদের এলাকাটাকে একেবারে ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল।

ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে একটা বড় ধানকল আছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা চ্যাম্পিয়ানশিপের বড়-বড় খেলা সব এই মাঠে হয়। এলাকার লোকজন মাঠটাকে ধানকলের মাঠ বলে।

সেই মাঠে ভোরবেলা দু-দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেল।

দুটো মৃতদেহই রক্তহীন, ফ্যাকাসে। তাদের ঘাড়ের পাশে গভীর দুটো দাঁতের দাগ।

এরকম অদ্ভুত মৃতদেহ এলাকার কেউ কখনও দেখেনি।

যারা নিজের চোখে মৃতদেহ দুটো দেখেছে, তারা বলল, 'ঠিক মনে হবে ঘাড়ে পাইপ ঢুকিয়ে কোনও পিশাচ কোক কিংবা পেপসি খাওয়ার মতো রক্ত টেনে নিয়েছে।'

অচ্যুত পাড়ার হারানদার মুদিখানা দোকানে গুঁড়ো হলুদ আর চিঁড়ে কিনতে গিয়েছিল। সেখানে খবরটা শুনেই ওর গা গুলিয়ে উঠল। রাজীবের কথাগুলো মনে পড়ে গেল পলকে।

যারা মারা গেছে তারা বিহারি। ধানকলে কাজ করত, মাঝে-মাঝে ছুটি-ছাটায় দেশে যেত। দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে জোট বেঁধে ধানকলের কাছাকাছি ঝুপড়িতে থাকত।

কাল রাতে ওরা দুজনে হয়তো নেশা-টেশা করতে বেরিয়েছিল...তারপর রাত করে মাঠের ওপর দিয়ে ফেরার সময় ওইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

বহু চেষ্টা করেও খুনের উদ্দেশ্য কেউ খুঁজে পেল না। নেশাগ্রস্ত দুজন গরিব দেহাতিকে কে খুন করতে চাইবে? তা ছাড়া ঘাড়ের পাশে ওইরকম বীভৎস একজোড়া গর্তই বা কে করবে?

অনেকেই ধরে নিল, এ কোনও অপদেবতার কাজ।

পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু স্থানীয় লোকজনকে মামুলি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ডেডবডি চালান করে দিয়ে দায় সারলেন।

অচ্যুত বাড়ি ফিরে মা-বাপিকে এই জোড়া-খুনের খরব দিল।

মা তো ভয়েই সারা। বলল, 'কোচিং থেকে ফেরার সময় একা-একা ফিরবি না। এরকম কাণ্ড জীবনে শুনিনি বাবা!'

বাপি বলল, 'দ্যাখো গিয়ে, কারা হয়তো রক্তের ব্যবসা করার জন্যে সিরিঞ্জ দিয়ে সব রক্ত টেনে নিয়েছে!'

অচ্যুত বলল, 'তা হলে এক-একজনের ঘাড়ে দুটো করে সিরিঞ্জের ফুটো কেন?'

'কেন আর, দুটো সিরিঞ্জে তাড়াতাড়ি রক্ত টানা যাবে—।'

বাপির স্বভাব হচ্ছে যে-কোনও সমস্যাকে চটজলদি সমাধান করে দেওয়া। যেমন এখন। বাপি যুক্তি দিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দেবে রক্তের চোরাব্যবসার জন্যই ওই দুজন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যদি প্রত্যেকের ঘাড়ে পাঁচটা করেও ফুটো থাকত, তা হলেও বাপির ব্যাখ্যা করতে কোনওরকম অসুবিধে হত না।

এই জোড়া খুনের ঘটনাটার কথা শুনে অচ্যুত বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল, আজই স্কুলের ব্যাপারগুলো মা-বাপিকে খুলে বলবে। কিন্তু বাপির দায়সারা যুক্তি আর ব্যাখ্যা শুনে ও দমে গেল। কে জানে, ওর কথা শুনে বাপি হয়তো আজগুবি বলে হেসেই উড়িয়ে দেবে!

সত্যবানস্যার ঠিক বলেছিলেন। এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চাইবে। প্রমাণ না দিতে পারলে অচ্যুতের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকী মা-বাপিও হয়তো বিশ্বাস করবে না।

কিছুক্ষণ কী ভাবল ও। তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে সৌরভকে ফোন করল।

ফোন করতেই সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, 'জোড়া মার্ডারের খবর পেয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ—।'

'শোন, কুলদীপ আমাকে ফোন করেছিল, ওর পাড়ার দু-বন্ধুকে ও স্যাটাস্যাটের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা স্যাটাস্যাটকে কাল রাতে ধানকলের মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।'

'ক'টার সময়?'

'এই ধর দশটা। মাঠের ধারে জঙ্গলের কাছটায় স্যাটাস্যাট ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল। ওর সঙ্গে আরও একজন ছিল—তবে সে অন্ধকারে গাছের আড়ালে থাকায় ওরা লোকটাকে দেখতে পায়নি। স্যাটাস্যাট লোকটার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছিল। কুলদীপের বন্ধুরা কোনও কথা শুনতে পায়নি। তারপর...রাত বাড়ছিল বলে ওরা ভয়ে পালিয়ে এসেছে...।'

তা হলে কি দুটো খুন দুজনের কীর্তি? স্যাটাস্যাট একা করেনি?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অচ্যুত বলল, 'শোন, তোকে যে-জন্যে ফোন করেছি। তোর ক্যামেরাটা রেডি আছে তো?'

'হ্যাঁ রেডি—।'

'কাল স্কুলের পর তোর বাংলা কোচিং আছে না?'

'হ্যাঁ—তো কী হয়েছে?'

'তুই কোচিং সেরে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে আমাকে মিট করবি। পরেশদার কেকের দোকানের সামনে। সেখান থেকে আমরা স্যাটাস্যাটের কোচিং-এ যাব...শুধু তুই আর আমি...তার বেশি গেলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।'

সৌরভ বলল, 'ও. কে.।'

'শোন, ক্যামেরা নিয়ে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আমাদের গ্রুপের বাইরে কাউকে বলবি না।'

'আচ্ছা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর সৌরভ জানতে চাইল, 'কাল স্যাটাস্যাটের ফটো তুলবি?'

'হ্যাঁ। কাল তা হলে ঠিক সাতটায়...।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত।

তারপর পড়াশোনা নিয়ে বসল।

বই-খাতা চোখের সামনে খোলা, অক্ষর কিংবা শব্দগুলো দিব্যি নজরে পড়ছে—কিন্তু মাথায় সেগুলোর কোনওরকম অর্থ তৈরি হচ্ছিল না। সেখানে মাইলের পর মাইল লম্বা ঘুড়ির সুতো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আর জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অচ্যুত হাঁসফাঁস করছিল।

বারবার রাজীবের কথা মনে পড়ছিল। খুব কপালজোরে ও বেঁচে গেছে। নইলে ধানকলের মাঠের ঘটনার মতোই ওকে পুকুরপাড়ে আগাছার জঙ্গলে ভোরবেলা পাওয়া যেত।

অচ্যুতের বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল।

রাজীবও নিশ্চয়ই ধানকলের মাঠের খবরটা শুনেছে! ছোট জায়গায় খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগে না।

এ খবর কানে গেলে রাজীব হয়তো আরও ভয় পেয়ে যাবে।

নানান চিন্তায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই রাজীবকে ফোন করল অচ্যুত।

'হ্যালো—।'

ওপাশ থেকে কোনও মহিলা ইংরেজিতে রাজীবদের ফোন নম্বরটা বললেন। গলা শুনে মনে হল রাজীবের মাম্মি।

'রাজীব আছে?'

'হু ইজ স্পিকিং প্লিজ?'

'আমি অচ্যুত—রাজীবের ক্লাসমেট...।'

'হ্যাঁ, ধরো—।'

একটু পরেই রাজীব ফোনে কথা বলল, 'অচ্যুত, খবরটা শুনেছিস?'

'ধানকলের মাঠের কেসটা?'

'হ্যাঁ।' রাজীবের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'সেইজন্যেই তোকে ফোন করেছি। একটুও ভয় পাবি না—আমরা শিগগিরই যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করছি। স্যাটাস্যাটের কেসটা আমরা এসপার-ওসপার করে ছাড়ব।'

'শোন...একটা ব্যাপার...মানে...।' থতিয়ে থতিয়ে বলতে চাইল রাজীব।

'কী হয়েছে?'

'স্যাটাস্যাট কাল রাতে আমাকে ফোন করেছিল...।'

'বলিস কী!...কী বলল?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে ড্রাম বাজতে শুরু করল।

'আমাকে ওর কোচিং-এ যাওয়ার কথা বলছিল।'

'সে কী! কাল তো কোচিং ছিল না।'

'সেইজন্যেই তো ডাকছিল। বলছিল, আমার সঙ্গে ওর একা-একা কী দরকার...তাই...।'

'খবরদার যাবি না!' চেঁচিয়ে উঠল অচ্যুত।

'শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে যাইনি। তবে...তবে ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছিল...।' অপরাধীর সুরে বলল রাজীব, 'তুই বিশ্বাস করবি না, স্যার কীরকম অদ্ভুত গলায় আমাকে ডাকছিলেন। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা গল্পের নিশির ডাকের মতো। বারবার বলছিলেন, "আসতে তোকে হবেই। আমার ডাক তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি না। আজ না হয় কাল তোকে আসতেই হবে। আমার তেষ্টা তোর রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তোকে পাগল করে দেবে। তোর আমার যে রক্তের সম্পর্ক, তাকে কখনও ছিন্ন করা যায় না। কক্ষনো না।" '

'...তুই বিশ্বাস কর, অচ্যুত—আমি তখন মাতালের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। স্যার ছাড়া আমি আর তখন কিচ্ছু ভাবতে পারছিলাম না। মাথাটা হঠাৎ কেমন টলে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। টেবিলের একটা কোণা ধরে সামলে নিলাম। মাম্মি একটু দূরে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। আমাকে টলে যেতে দেখেই ছুটে আমার কাছে এসে আমাকে ধরে ফেলল। তারপরই..।'

'তারপর কী?'

'তারপর মাম্মির সঙ্গে আমার কী ঝামেলা! মাম্মি আমাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না, আর আমি বেরোবই! শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে...।'

রাজীব হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অচ্যুত ওকে কী বলবে ভেবে পেল না। রাজীব কাঁদছে কেন সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

কান্না থামিয়ে ভাঙা গলায় রাজীব বলল, 'কাল আমি খুব জোর বেঁচে গেছি, না রে?'

অচ্যুত অবাক হয়ে গেল, 'কেন বল তো?'

'আমি গেলাম না বলেই হয়তো ধানকলের মাঠের লোক দুটো খতম হয়ে গেল।'

'এসব তুই কী বলছিস!'

'ঠিকই বলছি। স্যারের সেই ডাকের টান যে কী মারাত্মক সে তোকে আমি বলে বোঝাতে পারব না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজীব ধরা গলায় জানতে চাইল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো? তোদের ব্যাগ থেকে আর কক্ষনো আমি টাকা চুরি করব না...বিশ্বাস কর।' রাজীব আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওর কান্নাটা এমন যেন ও জেনে গেছে, ওর কপালে কেউ সুনিশ্চিতভাবে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

অচ্যুতের খুব কষ্ট হল। ও বলল, 'তুই মিছিমিছি কাঁদছিস। তোর কোনও ভয় নেই। আমি এক্ষুনি কুলদীপ, প্রতীকদের ফোন করছি। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তোর বাড়িতে যাচ্ছি। আন্টিকে আমাদের জন্যে শরবত তৈরি করে রাখতে বল...।'

ফোন ছেড়ে দিল অচ্যুত।

ওর শরীরটা কেমন অবশ লাগছিল। দিশেহারাভাবে ও যে-কোনও একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

সাত

সোমবার সন্ধে সাতটার সময় সৌরভ পরেশদার কেকের দোকানের সামনে এল।

অচ্যুত আগে থেকে সাইকেল নিয়ে কেকের দোকানের পাশে একটা সাইকেল সারানোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সৌরভকে দেখেই ওর দিকে এগিয়ে গেল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ক্যামেরা এনেছিস তো?'

সৌরভ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'চল যেতে-যেতে প্ল্যানটা বলছি...।'

সাইকেলে উঠে পড়ল অচ্যুত। সৌরভও সাইকেল নিয়ে ওর পাশে-পাশে চলল।

সরু রাস্তায় ওদের বেশ কসরত করে সাইকেল চালাতে হচ্ছিল। আজ সারাদিনে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি, তাই রাস্তা মোটামুটি শুকনো। তবে বাতাস থমকে গিয়ে একটা গুমোট গরম চেপে বসেছে।

রাস্তায় মোটামুটি ভিড়। তারই মধ্যে দুটো সাইকেল-ভ্যান মাইক লাগিয়ে আগামী রবিবারে কী একটা মিটিং হবে বলে প্রচার চালাচ্ছে। 'দলে-দলে যোগ দিন' কথাটা বারবার ওদের কানে এসে ঝাপটা মারছিল।

কোনওরকমে যানজট কাটিয়ে সাইকেল-ভ্যান দুটোকে পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল।

কাল বিকেলে অচ্যুত, প্রতীক, কুলদীপ আর বাসব রাজীবের বাড়িতে গিয়েছিল। ওকে যতটা সম্ভব ভরসা দিয়ে এসেছে। কিন্তু অচ্যুত বুঝতে পারছিল, একটা সাংঘাতিক ভয় রাজীবের মনে গেঁথে গেছে। ওর কাছে ঘণ্টাদেড়েক থেকে তারপর অচ্যুতরা যার-যার বাড়ি ফিরে গেছে।

সাইকেল চালাতে-চালাতে সৌরভ আর অচ্যুত স্কুলের কাছে চলে এল। স্কুল পেরিয়ে, পুকুর পেরিয়ে, যতই এগোতে লাগল রাস্তার লোকজন ততই ফিকে হতে লাগল। সেই সঙ্গে আলোও।

বর্ষার টইটম্বুর নালা থেকে ব্যাঙের দল ডাকছিল। তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ঝিঁঝির দল সঙ্গত করছিল। বড়-বড় গাছের মাথা আকাশের মেঘের সঙ্গে কখন যে মিশে গেছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না। পথের এখানে-ওখানে কয়েকটা ঝুপড়ি-দোকানে পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা বিক্রি হচ্ছে। তার টিমটিমে আলো দোকান ছাড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছতে পারছে না।

একটু পরেই সত্যবানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল ওরা।

দেড়খানা ঘর নিয়ে পলেস্তারা-খসা একটা একতলা বাড়ি। তার একপাশে টিনের চাল। বাড়ির ডানপাশে আর পিছনদিকে গাছ-আগাছার দল যেমন খুশি বেড়ে উঠেছে। আর বাঁ-দিকে একটা জং-ধরা ঘাড় কাত করা টিউবওয়েল।

বাড়ির বাইরে আলো বলতে হাতদশেক দূরে ইলেকট্রিক পোস্টের মাথায় ঝোলানো একটা বালব।

এই আস্তানাটা ভাড়া নিয়ে সত্যবানস্যার কোচিং চালান।

বড় ঘরটার চারটে ছোট-ছোট জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। জানলাগুলো একটু উঁচুতে হাওয়ায় শুধু ঘরের ড্যাম্প ধরা দেওয়াল চোখে পড়ছে।

কোচিং-এর ঘর থেকে একটু দূরে সাইকেল থামাল অচ্যুত আর সৌরভ। আগাছার জঙ্গলের ওপরে সাইকেল দুটো ওরা কাত করে শুইয়ে দিল। তারপর অচ্যুত নীচু গলায় সৌরভকে বলল, 'তুই আস্তে-আস্তে পেছনদিকে চলে যা। সাবধানে জানলা দিয়ে উঁকি মারবি। যেই দেখবি স্যাটাস্যাট পিকিউলিয়ার কিছু করছে অমনি ফটো তুলে নিবি। শিয়োর হওয়ার জন্যে দরকার হয় দু-তিনটে শট নিবি। তারপর সোজা সাইকেল নিয়ে পালাবি—কোনওদিকে তাকাবি না। রাতে তোর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলে নেব।'

সৌরভের মুখে আলো-ছায়া নড়ছিল। ওকে একটু যেন বিভ্রান্ত দেখাল। ও জিগ্যেস করল, 'স্যাটাস্যাট হঠাৎ পিকিউলিয়ার কিছু করবে কেন?'

অচ্যুত কোচিং ক্লাসের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'সে-দায়িত্ব আমার। তুই যা—রেডি হয়ে থাক...।' সৌরভকে ঠেলা মারল অচ্যুত।

সৌরভ পা টিপে-টিপে বাড়ির পিছনদিকে চলে গেল।

আর অচ্যুত সটান হেঁটে গিয়ে কোচিং ক্লাসের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ওর বুকের ভেতরে যে মেঘ গুড়গুড় করছিল সেটাকে ও জোর করে ভুলে যেতে চাইল।

'স্যার—।'

অচ্যুতের ডাকে সত্যবানস্যার চোখ তুলে তাকালেন।

ঘরে আর কেউ নেই। মেঝেতে পাতা শতরঞ্চির ওপরে বসে স্যার খাতা দেখছেন।

খুব শিগগিরই স্কুলে কোনও পরীক্ষা হয়নি। এগুলো নিশ্চয়ই স্যারের কোচিং-এ নেওয়া পরীক্ষার খাতা।

'তুই হঠাৎ এসময়ে?'

'স্যার, আপনার কথা আমি কাউকে বলিনি।'

হাসলেন সত্যবানস্যার : 'আয়, আয়—এখানে এসে বোস।'

অচ্যুত দরজার কাছে চটি ছেড়ে শতরঞ্চির ওপরে গিয়ে বসল। চোখের আন্দাজে মেপে দেখল স্যারের কাছ থেকে ওর দূরত্ব মাত্র তিন হাত।

স্যারকে লক্ষ করছিল অচ্যুত। তেলচকচকে চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। কিন্তু মাথা ঝুঁকিয়ে থাকায় কয়েকগোছা চুল চশমার ওপরে ঝুলে পড়েছে। পাশ থেকে স্যারের নাকটাকে আরও খাড়া মনে হচ্ছে। আর গলার পাশে একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

শিরাটার ওপরে চোখ পড়তেই অচ্যুতের বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ওর ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মনের জোরে ইচ্ছেটাকে ও রুখে দিল। রাজীবের কথা মনে করে ও চোয়াল শক্ত করল।

সত্যবানস্যার আবার মাথা নীচু করে খাতা দেখছিলেন। সেই অবস্থাতেই জিগ্যেস করলেন, 'তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? তুই আমার সবচেয়ে ফেভারিট স্টুডেন্ট...।'

'পড়াশোনায় একদম মন বসছে না, স্যার।' অনুযোগ করে বলল অচ্যুত।

'কেন রে?' স্যার খাতার দিক থেকে চোখ সরালেন না।

'আপনার জন্যে।'

চমকে চোখ তুলে তাকালেন : 'তার মানে!'

'আপনার...ইয়ে...ওইগুলো আমি এখনও...মানে...বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি সত্যি-সত্যিই ভুলভাল দেখেছি। আপনি কী করে দেওয়ালে হাঁটবেন! কী করে আপনার চোখ সবুজ হবে! অসম্ভব!' একদমে কথাগুলো বলে গেল অচ্যুত।

'ভুলভাল? অসম্ভব?' হাতে ধরা লাল পেন ছেড়ে দিলেন সত্যবানস্যার। ওঁর টকটকে ফরসা গালে অপমানের রক্ত ছুটে এল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কোমলভাবে হাসলেন : 'যাকগে, ওসব কথা ছাড়। তুই কী দরকারে এসেছিল বল...।'

'আপনি রাগ করবেন না, স্যার। ওরকম অলৌকিক ব্যাপার...তাই সত্যি বলে মানতে কষ্ট হচ্ছে। আমি এরকম ভুল দেখলাম! আমি, স্যার, ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না...।'

সত্যবানস্যার স্নেহের হাসি হাসলেন। বললেন, 'বুঝেছি...বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে তোর মেন্টাল ডিসটারবেন্স হচ্ছে। তা কী করলে তুই খুশি হবি? কী করলে তোর পড়ায় মন বসবে?'

কয়েকবার ঢোঁক গিলল অচ্যুত। তারপর দমকা হাওয়ার মতো বলে বসল, 'আমাকে আর-একবার করে দেখাবেন, স্যার?'

অদ্ভুত হেসে সত্যবানস্যার উঠে দাঁড়ালেন। স্যারকে অনেক লম্বা দেখাচ্ছিল। অচ্যুতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যস, এই?'

অচ্যুত দম বন্ধ করে ঘাড় নাড়ল। বলতে চাইল, 'হ্যাঁ—এই।'

স্যার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। তারপর শূন্যে কয়েকবার হাত নেড়ে দরজার পাশের দেওয়ালে থাবা বসিয়ে দিলেন। এবং টিকটিকির মতো দেওয়ালে শরীরটাকে লেপটে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন।

অচ্যুতের শীত করতে লাগল। ওর মনে হল, একটা কদাকার সরীসৃপ দেওয়ালে কিলবিল করছে। একটা ভয়ের চিৎকার ওর গলা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় অচ্যুত সেটাকে রুখে দিল। আর মনের জোরে শতরঞ্চির ওপরে স্থির হয়ে বসে রইল।

মাথার ওপরে পুরোনো সিলিং পাখার খটখট আওয়াজ হচ্ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে অচ্যুত যেন কয়েকবার অটোমেটিক ক্যামেরার 'চিঁউ-চিঁউ' শব্দ শুনতে পেল।

স্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ঘাড় কাত করে হাসিমুখে অচ্যুতের দিকে তাকালেন : 'কিছুদিন আগে যখন এই ক্ষমতাটা আবিষ্কার করি তখন খুব তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলি। তারপর খেয়াল করলাম, আমার মনের ভেতরে কেমন একটা তোলপাড় চলছে। কখনও অঙ্ক মনে থাকে, কখনও থাকে না। কখনও চেনা লোককে চিনতে পারি, কখনও পারি না। প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। আর...।' স্যার সিলিং-এর দিকে বেয়ে উঠতে লাগলেন : '...আর অদ্ভুত একটা তেষ্টা শুরু হল। যখন তেষ্টা পায় তখন কোনও জ্ঞান থাকে না। তখন তো আর আমি আমি থাকি না! আবার যখন তেষ্টা পায় না তো পায় না। অ্যাই, রাজীব কেমন আছে রে?'

'ভ-ভালো আছে।' চাপা শব্দের টুকরোগুলো অচ্যুতের ঠোঁট থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

'ওকে আমি খুব ভালোবাসি। অবশ্য তোকেও ভালোবাসি...।' স্যার দেওয়াল বেয়ে মেঝের দিকে নেমে আসতে লাগলেন : 'তোকে ভালোবাসি তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান বলে। আর রাজীবকে...থাকগে, সে অন্য ব্যাপার।'

সার্কাস শেষ করে সত্যবানস্যার শতরঞ্চির ওপরে নেমে এলেন। হাততালি দেওয়ার ভঙ্গিতে শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপরে সেট করে বললেন, 'কী রে, এবার তুই খুশি তো? এখন থেকে পড়ায় মন বসবে তো?'

অচ্যুত কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। বাতাসে ঘরের জানলার পাল্লা নড়ে উঠল। একটা জংলি গন্ধ ঘরে ঢুকে পড়ল যেন।

'সবুজ চোখ কী আর দেখতে চাস?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। না, ও দেখতে চায় না।

'আসলে কী জানিস, এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়। তাই আমার এসব নিজের চোখে না দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না। প্রথম-প্রথম তো আমারই বিশ্বাস হতে চায়নি।' বলে মিহি গলায় খিলখিল করে হেসে উঠলেন সত্যবানস্যার।

স্যারের গলাটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় অচ্যুত একটু চমকে গেল। দেখল, স্যার হাসতে-হাসতেই মাথাটা এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছেন। স্যারের চোখ দুটো নিজে থেকেই কেমন কটা রঙের হয়ে যাচ্ছে।

স্যারের হাসিটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোঙানির মতো হয়ে গেল। তিনি খপ করে অচ্যুতের ডান হাতের কবজি চেপে ধরলেন। তীব্র চোখে তাকালেন ওর দিকে।

স্যারের হাতটা কী গরম! যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

অচ্যুত ঝটকা মেরে হাতটা টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না।

কেমন যেন ভাঙা খনখনে গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'বাঁচতে চাস তো এক্ষুনি পালা। তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান। তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না।' ওর হাতটা ছেড়ে দিলেন স্যার। একরকম যেন ছুড়ে

দিলেন অচ্যুতের কোলে : 'পালা! পালা শিগগিরই!'

অচ্যুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। একছুটে চলে গেল দরজার কাছে।

সত্যবানস্যার তখন শরীরটাকে পিছনদিকে বেঁকিয়ে বুকে হাত বোলাচ্ছেন আর বুক-ফাটা তেষ্টায় চাপা শব্দ করছেন, 'ওঃ! ওঃ!'

হঠাৎই নিজের ডানহাতে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

অচ্যুতের মাথাটা যেন ঘুরে গেল, দরজা ধরে নিজেকে সামলে নিল।

স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ হয়ে গেল। হাত কামড়ে ধরা অবস্থাতেই তিনি অচ্যুতের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গোঙানির মতো শব্দ করে কিছু একটা বলতে চাইলেন। তারপর কামড়ে ধরা জায়গাটা প্রবল টানে শব্দ করে চুষতে লাগলেন।

এতক্ষণ গলা টিপে ধরে রাখা চিৎকারটা এইবার অচ্যুতের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। একটানে দরজা খুলে ও ছিটকে চলে এল বাইরে। চোখ-মুখে অসহ্য তাপ। মাথা ঝিমঝিম করছে। কোনওরকমে ও ছুটে গেল শুইয়ে রাখা সাইকেলের কাছে। তারপর অচ্যুত নামের একটা রোবট অমানুষিক গতিতে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

ঠিক তখনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে গেল আকাশ থেকে।

অচ্যুতের ভয় ক্রমশ কমছিল। কারণ, ও বোধহয় পালটে যাওয়া সত্যবানস্যারের ধরনধারণ এখন অনেকটা স্পষ্টভাবে আঁচ করতে পারছিল। বুঝতে পারছিল, সত্যবানস্যারের একটা ভয়ানক অসুখ হয়েছে। এ-অসুখ কখনও সারে কি না অচ্যুতের জানা নেই।

মঙ্গলবার স্কুলের দিনটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কারণ, পরদিনই ওরা সৌরভের তোলা ফটো দেখতে পাবে।

অচ্যুত টিফিনের সময় সৌরভকে বলল, 'তুই ফটোর দোকানে বলবি, ওগুলো আমাদের স্কুলের একটা নাটকের রিহার্সালের ফটো—এমার্জেন্সি প্রিন্ট দরকার।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাটকে যদি চিনে ফ্যালে?'

বাসব বলল, 'তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় স্যাটাস্যাটের মুখ ভালো করে দেখা যাবে না।'

কুলদীপ চোখ পাকিয়ে বলল, 'চিনতে পারল তো বয়েই গেল—।' তারপর বাসবের টিফিন বক্স থেকে আধখানা সন্দেশ নিয়ে মুখে পুরে দিল।

সৌরভ বলল, 'ফটোর প্রিন্ট হাতে এলে অমিয়স্যারকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়?'

অচ্যুত বলল, 'জানালে অমিয়স্যার হয়তো হেডস্যারকে জানাতে বলবেন। হেডুর সঙ্গে দেখা করতে আমার ভয় করে।'

কুলদীপ বলল, 'ভয়ের কী আছে! স্যাটাস্যাটের ফটো নিয়ে আমি তোর সঙ্গে হেডুর কাছে যাব।'

'ঠিক আছে প্রিন্টটা আগে হাতে আসুক...।'

ওদের আলোচনা-পরিকল্পনার যেন কোনও শেষ নেই। স্কুলে যে-কথা শেষ হয় না, সেগুলো রাতে টেলিফোনে চলতে থাকে।

অচ্যুত যে ইদানীং ফোন বড্ড বেশি করছে সেটা ওর মায়ের নজরে পড়ল। এমনিতে ওরা খুব দরকার ছাড়া ফোন ব্যবহার করে না। কারণ, অচ্যুতের বাপিকে বেশ কষ্ট করেই ফোনের খরচ চালাতে হয়। তাই বাড়াবাড়িরকম ফোন করা নিয়ে মা অচ্যুতকে বারদুয়েক বকাবকি করল।

'মা যদি জানত কেন এত ফোন করতে হয়, তা হলে ভয়ে কেঁপে উঠত।' মনে-মনে ভাবল অচ্যুত।

বুধবার সকালে ও ফোন করে রাজীবের খবর নিল। রাজীব এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছে। তবে মনের জোর ততটা ফিরে পায়নি।

সেদিন সন্ধেবেলা সত্যবানস্যারের কোচিং-এ সময়টা বেশ সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। স্যারকে দেখে কে বলবে, গত পরশু রাতে এই কোচিং-ঘরের দেওয়ালে তিনি বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন!

স্যার দু-তিনবার রাজীবের কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর আচমকা মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে বুকে কয়েকবার হাত বোলালেন।

কোচিং-এর শেষে বাড়ি ফেরার সময় ওরা সৌরভের সঙ্গে ফটোর দোকানে গেল। ফটোগুলো ডেলিভারি নিয়ে ওরা একটু দূরে সরে গেল।

ধীরে-ধীরে খাম থেকে প্রিন্টগুলো বের করল সৌরভ।

ওরা সবাই হাঁ করে সত্যবানস্যারের ছবিগুলো গিলতে লাগল।

অচ্যুত একটা প্রিন্ট নিজের কাছে রেখে দিল। মউলিকে ঘটনাগুলো যখন বলবে তখন ছবিটা দেখাবে।

কুলদীপ বলল, ‘আমি বাসবকে একটা ফটো দেখিয়ে দেব।’

প্রতীক বলল, ‘তোরা যদি বলিস, তা হলে রাজীবকেও দেখাব।’

অচ্যুত বলল, ‘না, না—রাজীবকে এক্ষুনি দেখানোর দরকার নেই। ও আগে সেরে উঠুক, রেগুলার স্কুলে আসুক—তখন দেখানো যাবে।’

তারপর ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

রাজীবের কথা ভাবতে-ভাবতে অচ্যুত বাড়ি ফেরামাত্রই মা বলল, ‘একটু আগেই রাজীবের মা ফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন, রাজীব আমাদের বাড়িতে এসেছে কি না।’

‘তার মানে!’ চমকে উঠল অচ্যুত।

সঙ্গে-সঙ্গে ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করল।

‘হ্যালো, আন্টি, আমি অচ্যুত বলছি।’

‘দ্যাখো না, রাজু আধঘণ্টা মতন আগে কাউকে না বলে কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমি ওর ফোনবুক দেখে পসিবল সব জায়গায় ফোন করলাম। বাট নোবডি নোজ হোয়্যার হি ইজ। রাজু এখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি—শরীর এখনও উইক...আমি যে এখন কী করি! ওর বাপি গতকাল ভাইজাগ গেছে—ফ্রাইডেতে ফিরবে...।’ রাজীবের মাম্মির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে গেছে। ওঁর গলা বেশ অসহায় শোনাচ্ছে।

‘আচ্ছা, আজ সন্ধের পর রাজীবের কি কোনও ফোন এসেছিল?’ অচ্যুতের বুকের ভেতরে গুমগুম শব্দ শুরু হয়ে গেল। ও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

‘হ্যাঁ...কে একজন ফোন করেছিলেন। বলছিলেন, রাজুর স্যার...।’

‘ক’টার সময় ফোনটা এসেছিল?’

‘অ্যাবাউট এইট থারটি...।’

অচ্যুতদের কোচিং শেষ হয়েছে আটটা নাগাদ। তা হলে তার পরে সত্যবানস্যার রাজীবকে ফোন করে থাকতে পারেন।

রবিবার রাজীবের সঙ্গে অচ্যুতের ফোনে কথা হয়েছিল। রাজীব তখন কান্নাকাটি করছিল। বলছিল, স্যাটাস্যাট ওকে অদ্ভুত গলায় ডাকছিল। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

সেদিনটা ছিল শনিবার।

তা হলে আজও কি সেইরকম কিছু হয়েছে? রাজীবের মাম্মি আজ আর ছেলেকে আটকাতে পারেননি।

‘কী হল?’ রাজীবের মাম্মি ওপাশ থেকে জিগ্যেস করলেন, ‘তুমি কিছু বলছ না কেন?’

অচ্যুত ঠোঁট কামড়াল। একপলক তাকিয়ে রইল ফাঁকা দেওয়ালের দিকে। তারপর বলল, ‘আপনি চিন্তা করবেন না। আমি খোঁজ করে দেখছি। কোনও খবর পেলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।’

'তুমি একটু সিরিয়াসলি দ্যাখো, অচ্যুত। আমি ভীষণ উয়ারিড হয়ে আছি।'

ওঁকে আবার আশ্বাস দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত।

ওর মন বলল, সত্যবানস্যারের কোচিং-ঘরে গিয়ে একবার খোঁজ করা দরকার।

ও চটপট কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভকে ফোন করল।

প্রতীককে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বাকি দুজনকে ও তৈরি হয়ে সত্যবানস্যারের কোচিং-এ আসতে বলল।

তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাপির বালিশের পাশ থেকে তিন ব্যাটারির টর্চটা তুলে নিল। একবার 'অন' করে দেখে নিল ঠিকঠাক জ্বলছে কি না।

টর্চ হাতে নিয়ে বেরোনোর সময় রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'মা, আমি একটু কুলদীপের বাড়ি যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তুমি দরজাটা দিয়ে দাও।'

মা তাড়াতাড়ি খুন্তি-কড়াই সামলে রান্নাঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে অচ্যুত সাইকেল টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে।

মা সদর দরজার কাছে যখন এল তখন অচ্যুতের সাইকেল অনেকটা দূরে চলে গেছে। মায়ের পিছুডাক ও শুনতে পেল না। দরজা বন্ধ করতে-করতে মা ভাবল, অচ্যুতের বাবার কী যে এক তাসের নেশা! সে বাড়িতে থাকলে যা-হোক করে ছেলেটাকে হয়তো আটকাতে পারত। এই বয়েসটা যে ভালো নয়, সেটা মানুষটা বুঝলে আর চিন্তা ছিল না। ছেলেটা এমন তাড়াহুড়ো করে কুলদীপের বাড়ি গেল কেন, কে জানে!

মায়ের জন্য অচ্যুতের খারাপ লাগছিল। কিন্তু আরও খারাপ লাগছিল রাজীবের জন্য।

জোরে প্যাডেল করে দশমিনিটের মধ্যেই ও সত্যবানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল। দেখল, কুলদীপ আর সৌরভ তখনও এসে পৌঁছয়নি।

বাড়িটার কাছ থেকে একটু দূরে সাইকেল থামিয়ে দিল অচ্যুত। অবাক হয়ে দেখল, কোচিং-ঘরের জানলাগুলো খোলা, কিন্তু কোনও জানলাতেই আলো চোখে পড়ছে না।

আলো নেভানো অথচ জানলা খোলা কেন?

সাইকেল থেকে নেমে পা টিপে-টিপে কোচিং-এর দরজার দিকে এগোল অচ্যুত। ডানহাতের শক্ত মুঠোয় টর্চটা ধরা রয়েছে।

রাত সবে ন'টা পেরিয়েছে, কিন্তু এই অঞ্চলটা এমন যেন ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। চারপাশে অন্ধকার গাছপালার মাঝে একতলা বেখাপ্পা বাড়িটাকে আরও অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল।

কোচিং-এর দরজার কাছে পৌঁছে অচ্যুতের, ও একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল।

এ-হাসি ওর চেনা। মিহি খিলখিল হাসি।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা অচ্যুত ততটা ভয় পেল না। কারণ, সত্যবানস্যার নিজেই পরশুদিন বলেছেন, 'তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না...।'

স্যার নিশ্চয়ই অচ্যুতের কোনও ক্ষতি করবেন না।

কৌতূহল ওকে টানতে লাগল। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে কেন? কুলদীপ, সৌরভ যখন আসে আসুক—ওর একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ঘরের ভেতরের রহস্যটা কী।

দরজায় আলতো করে চাপ দিল অচ্যুত। দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল।

ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। তারই মধ্যে জ্বলছে দুটো সবুজ চোখ। বোধহয় দরজার শব্দ পেয়েই এদিকে তাকিয়েছে।

সেদিকে তাক করে অচ্যুত টর্চ জ্বালল। এবং দৃশ্যটা ওকে পাথর করে দিল।

রাজীব উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর ওপরে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে রয়েছেন সত্যবানস্যার। স্যারের দাঁতের সারি চকচক করছে। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। তার আশেপাশে কয়েক জায়গায় লিপস্টিকের মতো লালচে ছোপ। সবুজ চোখ দুটো তীব্রভাবে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে।

স্যার তখনও খিলখিল করে হাসছেন।

অচ্যুত বুকফাটা চিৎকার করে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝুঁকে পড়া নেকড়েটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবং অচ্যুতকে তাক করে লাফিয়ে পড়ার জন্য সামান্য কুঁজো হল।

অচ্যুত পাগলের মতো ছুট লাগাল। ওর হাতের টর্চ কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। টর্চের আলোর বৃত্তটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে এপাশ-ওপাশ দুলে আগাছার জঙ্গলে কোথায় হারিয়ে গেল।

ভয়ংকর মৃত্যু তেড়ে এলে মানুষ যেভাবে মরিয়া হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়, ঠিক সেভাবে দৌড়ল অচ্যুত। হাঁকপাঁক করে পৌঁছে গেল সাইকেলের কাছে। সাইকেল টানতে-টানতেই একলাফে তাতে চড়ে বসল। তারপর শুরু হল একা-একা সাইকেল রেস।

তারই মধ্যে পিছনে তাকিয়ে দেখল সত্যবানস্যার আর-একটা সাইকেলে চড়ে ছুটে আসছেন। অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান হয়েও আজ আর অচ্যুতের রক্ষা নেই।

প্যাডেল করতে-করতে ভয়ে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। মায়ের পিছুডাকটা না শুনে ও আজ মারাত্মক ভুল করেছে। পোষা সাইকেলটাকে ও মনে-মনে বলতে লাগল, ‘আজ আমাকে বাঁচাতেই হবে। নইলে আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব মিথ্যে। ছোট—ছোট...আরও জোরে ছোট...।’

রাস্তার দু-চারজন লোক অচ্যুতের ছুটন্ত সাইকেল দেখে ভাবল, এক্ষুনি ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে। কয়েকটা সাইকেল রিকশা চটপট পাশে সরে গিয়ে ওর বেপরোয়া গতির সাইকেলকে পথ করে দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছে সাইকেলে ব্রেক কষল অচ্যুত। একলাফে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেলে ফেলে দিল একপাশে। তারপর দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিল আর একইসঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকল, ‘মা! মা! দরজা খোলো—জলদি।’

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অচ্যুত উসখুস করতে লাগল। গলা উঁচু করে দেখল, সত্যবানস্যার তিরবেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে আসছেন। ওঁর সবুজ চোখ এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দরজা তখনও খুলছে না দেখে একলাফে মউলিদের দরজায় চলে গেল অচ্যুত। ঠেলা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ঝটপট দরজায় খিল তুলে দিল। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে হাপরের মতো হাঁফাতে লাগল।

আট

দরজা বন্ধ করার সময় দড়াম করে শব্দ হয়েছিল। খিল দেওয়ার সময়েও।

অচ্যুত চোখ বুজে হাঁফাচ্ছিল। আর ভাবছিল, সত্যবানস্যার ওকে মউলিদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন কি না। মউলিদের বাড়িতে এর আগে কোনওদিন ও ঢোকেনি।

এমন সময় দরজার কাছটায় একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠল।

‘এ কী, তুমি! এ সময়ে!’

মউলি।

চোখ খুলল অচ্যুত। কয়েক হাত দূরেই চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে মউলি। পরনে সাদা টপ, নীলচে স্কার্ট, কপালে টিপ, আর জোড়া বিনুনি।

এই বিপদের মুহূর্তে মউলিকে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে হল অচ্যুতের। ও হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, ‘শিগগির ওপরে চলো—।’

‘কেন, কী হয়েছে?’

‘পরে বলব। আগে চলো, দোতলা থেকে উঁকি মেরে একটা জিনিস দেখতে হবে।’

অচ্যুতের মুখ-চোখ দেখে মউলি আর কথা বাড়াল না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠল। উঠতে-উঠতে বলল, ‘তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছ...।’

অচ্যুত কোনও জবাব দিল না।

দোতলায় উঠে মউলির মা-কে দেখতে পেল ও। মউলি মায়ের কাছে গিয়ে চাপা গলায় কী যেন বলল। তারপর অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এসো।’

একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরের লাগোয়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে রাস্তা দেখা যায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে মউলি এই বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

অচ্যুত চাপা গলায় মউলিকে বলল, ‘সাবধানে উঁকি মেরে দ্যাখো তো, আমাদের বাড়ির দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না...।’

ওকে বিছানার ওপরে বসতে বলে মউলি বারান্দায় গেল।

অচ্যুত ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখল।

দেওয়ালে তিনটে রঙিন পোস্টার। এক কোণে পড়ার টেবিল—বই-খাতায় ভরতি। তার পাশে বইয়ের র‍্যাক। র‍্যাকের পাশে দড়িতে মউলির জামাকাপড় ঝুলছে।

অচ্যুত তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। বুঝল, ও মউলির ঘরে বসে আছে।

পড়ার টেবিলের পাশে মেঝেতে একটা জলের জগ ছিল। অচ্যুতের বুকটা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। জগটা দেখে তেষ্টাটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও উঠে গিয়ে জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল।

জগটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল মউলি বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকছে।

অচ্যুতের কাছে এসে মউলি বলল, ‘একজন ফরসা রোগামতন লোক তোমাদের দরজায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মায়ের সঙ্গে কীসব কথা বলছে। আর রাস্তায় পড়ে থাকা একটা সাইকেল দেখিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে—যেন কাউকে খুঁজছে।’

‘লোকটার চোখে চশমা আছে?’

‘হ্যাঁ—।’

‘রাস্তায় যে-সাইকেলটা পড়ে আছে, ওটা আমার—।’

মউলি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, ‘লোকটা কে?’

‘আমাদের স্কুলের অঙ্কস্যার। ওঁর তাড়া খেয়েই তো আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। মা দরজা খুলতে দেরি করছিল...।’

মউলির মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ও হাঁ করে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুত মউলিকে দেখছিল। ডিয়োডোর‍্যান্টের হালকা গন্ধ কোথা থেকে যেন ভেসে আসছিল।

একটু পরে ও মউলিকে বলল, ‘দ্যাখো তো, লোকটা চলে গেছে কি না।’

মউলি আবার বারান্দায় গেল।

মিনিটপাঁচেক পর ও ফিরে এল, বলল, ‘চলে গেছে। তবে কাকিমা এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।’

‘আমি তা হলে এখন যাই। মা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।’

‘তুমি আমাদের বাড়িতে আজ প্রথম এলে। চা-টা কিছুই...।’

‘এটা আবার আসা না কি!’ হেসে বলল অচ্যুত, ‘এটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট।’

'অ্যাক্সিডেন্ট?' তারপর নীচু গলায় সেই পুরোনো কথাটাই বলল মউলি, 'মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...।'

'আজ আসি। তুমি আমাদের বাড়িতে একদিন এসো।'

অচ্যুত চলে যাচ্ছিল। মউলি ওকে পিছন থেকে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের ওই অঙ্কস্যার তোমাকে তাড়া করছিল কেন বললে না তো? অঙ্ক পারোনি?'

পিছন ফিরে তাকাল অচ্যুত, হাসল : 'হ্যাঁ, খুব কমপ্লিকেটেড অঙ্ক। পরে সব বলব। অনেক সময় লাগবে।'

অনেকটা জেদি ভঙ্গিতে মউলি অচ্যুতের কাছে এগিয়ে এল। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল। তারপর বেশ চাপা গলায় বলল, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ। সেদিন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম...দেখলাম, তুমি সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরোলে...বেশ রাত করে ফিরলে। তারপর...তারপর...আজকে এইরকম...কী হয়েছে, অচ্যুত?'

অচ্যুত অবাক হয়ে মউলির মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখে নিজের নামটা এই প্রথম শুনল...শুনে খারাপ লাগল না। সত্যি, এই মুহূর্তে মউলিকে সব বলতে পারলে খুব ভালো লাগত। ওর চোখে কী সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসের ছাপ! কী আশ্বাসে ভরা ওর দৃষ্টি!

অচ্যুত দোটানায় দুলছিল। মউলিকে সবকিছু খুলে বলবে? এখনই?

'আমাকে তুমি সব বলবে না?' মউলির গলায় একইসঙ্গে শাসন আর অভিমানের ছোঁওয়া।

'বলব। সত্যি বলছি, বলব। আজ নয়। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। মা চিন্তা করছে।...আসি।' বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল অচ্যুত।

তরতর করে সিঁড়ি নামার সময় চেঁচিয়ে বলল, 'কাকিমা, আমি যাচ্ছি—।'

ওর মনে হল, মউলির ডিয়োডোর‍্যান্টের গন্ধটা ওর সঙ্গে যেন সদর দরজা পর্যন্ত এল।

দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই ও মায়ের মুখোমুখি হল।

অচ্যুতকে দেখামাত্রই মায়ের চোখে জল এসে গেল। অভিমানভরা চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'কোথায় ছিলি তুই? আমি...।' আর বলতে পারল না...গলা ভেঙে গেল।

'ভেতরে চলো, সব বলছি—।'

সাইকেলটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকল অচ্যুত। রাজীবের কথা ভেবে ও শিউরে উঠল।

রাজীব বোধহয় আর...।

রাজীবের কথাগুলো ওর মনে পড়ল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো?'

ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে গুছিয়ে বসতে-না-বসতেই মা আর বাপি এসে হাজির।

মা বলল, 'তলে-তলে তুই কী করছিস বল তো? আজ তোকে সব খুলে বলতেই হবে।'

বাপি কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই ও-ঘরে বসে টিভি দেখছিল, মা জেদ করে ডেকে এনেছে। ছেলেকে শাসন করে না বলে দু-চার কথা হয়তো বাপিকে শুনিয়েও দিয়েছে।

আমতা-আমতা করে বাপি বলল, 'শেষকালে আবার কী-না-কী বিপদে পড়বি...।'

অচ্যুত হাত নেড়ে বলল, 'সব বলছি। শুধু তার আগে রাজীবের বাড়িতে একটা ফোন করতে দাও—।'

অচ্যুতের কথায় কী যেন ছিল, মা-বাপি ওকে বাধা দিল না। ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করে বলল, 'অঙ্কস্যারের কোচিং-এ গিয়ে রাজীব বিপদে পড়েছে।'

রাজীবের মাম্মি খবরটা শুনেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। অচ্যুতকে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অচ্যুত দিশেহারাভাবে বলল, ‘অ্যান্টি, আমি এর বেশি কিচ্ছু জানি না। আপনি শিগগিরই পুলিশে খবর দিন! দেরি করবেন না...এক্ষুনি...কে জানে, এখনও হয়তো সময় আছে!’

ফোন নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ হাঁফ ছাড়ল অচ্যুত। লক্ষ করল, মা-বাপি ওর দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে যেন ও ভিনগ্রহের প্রাণী।

একটু পরে আবার রিসিভার তুলল ও। একে-একে প্রতীক, সৌরভ আর কুলদীপকে খবর দিতে চাইল। সৌরভ আর কুলদীপকে বাড়িতে পেল না—তবে প্রতীক বাড়িতে ছিল। ওকে সংক্ষেপে রাজীবের বিপদের কথা জানাল অচ্যুত। বলল, ‘কাল স্কুলে জরুরি মিটিং করতে হবে।’

ফোনের পালা শেষ হলে ও মা-কে বলল, ‘খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। খেতে-খেতে ব্যাপারটা বলছি...।’

মা আর বাপি অবাক হয়ে অচ্যুতের কাছে গোটা গল্পটা শুনল।

শুনে মায়ের মুখ ভয়ে বদলে গেল।

বাপি বলল, ‘হাতে-পায়ে ফেভিকল লাগিয়ে তোর অঙ্কস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়ায়নি তো! টিভিতে ফেভিকলের যেরকম বিজ্ঞাপন দেখায়!’

এত সমস্যার মধ্যেও অচ্যুত হেসে ফেলল। বলল, ‘না, একেবারে জেনুইন ম্যাজিক।’

তারপর ফটোগ্রাফটা বের করে মা আর বাপিকে দেখাল।

বাপিকে তার জায়গা থেকে নড়ানো মুশকিল। কারণ, ফটোটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বাপি বলল, ‘তুই ঠিক জানিস, তোদের স্যারের ব্লাড ব্যাঙ্ক টাইপের কোনও সাইড বিজনেস নেই!’

অচ্যুত মাথা নেড়ে ‘না’ বলল।

‘এখন কী করবি?’ মা ভয়-পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

‘এই টাইপের ব্লাডসাকারদের আগুন ছাড়া খতম করা যায় না...।’ বিড়বিড় করে বলল বাপি।

মা বলল, ‘কাল থেকে তুই স্কুলে যাস না—।’

‘কখখনও না!’ রুখে দাঁড়াল অচ্যুত : ‘এইজন্যেই তোমাদের কিছু বলতে নেই! ভুলে যেয়ো না, স্যার একা, আর আমরা অনেক! কাল স্কুলে গিয়ে ব্যাপারটা অন্য স্যারদেরও জানাব। রাজীবের যদি কিছু হয়...।’

রাত বারোটার পর কুলদীপ অচ্যুতকে ফোন করে খবর দিল, রাজীব মারা গেছে।

অচ্যুত ভেবেছিল, এইবার বুঝি সত্যবানস্যারকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, হাজাররকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু তার কিছুই হল না।

কারণ, রাজীবের মৃতদেহ পাওয়া গেল স্যারের কোচিং থেকে অন্তত বিশ হাত দূরে আগাছার ঝোপের ভেতরে। ফলে পুলিশের কাছে সমস্যাটা ধানকলের মাঠের জোড়া খুনের মতোই দাঁড়াল।

এলাকায় খবরটা খুব তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে গিয়ে অচ্যুত শুনল ক্লাস হবে না। রাজীবের জন্য শোকপালন করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে।

শোকসভায় দাঁড়িয়ে রাজীবের জন্য নীরবতা পালন করার সময় অচ্যুতের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। একইসঙ্গে ভীষণ রাগ হল ওর। ওরা এতজন বন্ধু মিলে শেষ পর্যন্ত রাজীবকে ধরে রাখতে পারল না!

শোকপালন শেষ হলে অচ্যুত, কুলদীপ, বাসবরা জোট পাকাল।

অচ্যুত গতকালের ঘটনাটা ওদের খুলে বলল।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, ‘রাজীবের বডিটা কোচিং-এর বাইরে গেল কী করে?’

‘হয়তো স্যারই ওটা বাইরে আগাছার ঝোপের মধ্যে ফেলে এসেছেন।’

কুলদীপ শিস দিয়ে উঠল।

বাসব অচ্যুতকে বলল, 'এইবার পুলিশ তোকে হ্যারাস করবে।'

'সে করে করুক—যা সত্যি তাই বলব।'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা এবার স্যারদের জানানো উচিত।'

প্রতীক আর সৌরভও বাসবের কথায় সায় দিল।

অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল ওরা অমিয়স্যারকে পুরো ব্যাপারটা জানাবে।

স্কুলের ভিড় ফিকে হয়ে এসেছিল। স্যাররাও অনেকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। হঠাৎই বাসবের নজরে পড়ল, একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমিয়স্যার দুজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছেন।

বাসব বলল, 'চল, এখনই যাই—স্যারকে গিয়ে বলি।'

অচ্যুত আর প্রতীক ইতস্তত করছিল। কিন্তু কুলদীপও যেন খেপে গেল : 'আর দেরি করলে হবে না, অচ্যুত। রাজীব গেছে, এরপর কার পালা কে জানে! যা করার এখনই করতে হবে। চল—।'

ওরা পাঁচজন অমিয়স্যারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্যার ওদের দিকে একবার জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে অন্য দুজন ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন।

'কী ব্যাপার রে! রাজীবের জন্যে দুঃখ হয়। কী অরুন্তুদ ঘটনা বল তো!' হাতের একটা ভঙ্গি করে মাথায় চুল ঠিক করলেন অমিয়স্যার।

'স্যার, রাজীবের ব্যাপারেই কয়েকটা কথা আমরা আপনাকে বলতে চাই।' মনিটর বাসব বলল।

'তার মানে!' অমিয়স্যারের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বাসব : 'ও আপনাকে সব বলবে। আপনাকে যে-করে-হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে আমাদের স্কুল ছারখার হয়ে যাবে।'

'বলিস কী রে! আমাদের স্কুল অবনমিত হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ, স্যার—ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। প্লিজ, ওই জামগাছটার তলায় চলুন।' অচ্যুত অনুনয় করে বলল।

অমিয়স্যার বেশ হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু পাঁচটা নিষ্পাপ মুখের আকাঙ্ক্ষায় তিনি জল ঢেলে দিতে পারলেন না। আলতো করে বললেন, 'চল...।'

আকাশ ঘোলাটে। বৃষ্টি হবে কি হবে না বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন বুলবুলির ডাক ভেসে আসছিল। একটু দূরে ইলেকট্রিকের তারে একটা বাঁশপাতি পাখি পোকার আশায় বসে আছে। দুটো ছোট মাপের হলদে প্রজাপতি স্কুলের মাঠের ওপর দিয়ে এলোমেলোভাবে উড়ে যাচ্ছে।

অচ্যুত ভাবছিল, প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের কোনও খবর রাখে না। তাই এরকম বিপদের সময়েও উদাসীন হয়ে সেজেগুজে বসে আছে।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপরে পা ফেলে ওরা সবাই জামগাছ-তলার বেদির কাছে গেল। স্যারকে বসিয়ে শুরু করল ওদের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

মনোযোগী ছাত্রের মতো অমিয়স্যার গোটা গল্পটা শুনলেন। তারপর 'হুম' শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'সবাই বলবে, এ তোদের খপুষ্প কল্পনা। কোনও প্রমাণ কি তোদের কাছে আছে?'

এ-কথা বলামাত্রই তিনটে হাত ছিটকে এল অমিয়স্যারের চোখের সামনে। তিনটে হাতে ধরা রয়েছে তিনটে রঙিন ফটোগ্রাফ। সত্যবানস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

অমিয়স্যার অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'তোরা আজকালকার ছেলে—ভূত-প্রেত-পিশাচে তোদের তেমন বিশ্বাস নেই। এখন বুঝতে পারছিস তো,

বিজ্ঞানটাই সব নয়, যুক্তি-প্রযুক্তিই সব নয়! তার বাইরেও একটা রহস্যময় অন্ধকার জগৎ আছে। তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে...।' কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করলেন অমিয়স্যার। তারপর : 'মনে হয়...একমাত্র বীতিহোত্র ছাড়া এ-পিশাচকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।'

'বীতিহোত্র! সেটা কি কোনও ফলের বীজ বা গাছের শিকড়?' ভাবল অচ্যুত।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, 'বীতিহোত্র কী স্যার...কোনও মন্ত্র?'

অমিয়স্যার মোলায়েম হেসে কুলদীপের দিকে তাকালেন : 'ওঃ, বীতিহোত্র জানিস না! বীতিহোত্র মানে আগুন!'

ওরা পাঁচজন লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাব্বাঃ, স্যার পারেনও বটে!

অচ্যুত বলল, 'স্যার, আমার বাপিও তাই বলছিল...।'

অমিয়স্যার সামান্য ঘাড় দোলালেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা স্কুলকে জড়িয়ে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আগে পুরকায়স্থবাবুকে জানানো দরকার। তোরা আমার সঙ্গে চল, ওঁকে এখনই গিয়ে এইসব সান্নিপাতিক ঘটনাবলির কথা খুলে বলি।'

ওরা স্যারের সঙ্গে স্কুল-বাড়ির দিকে হাঁটা দিচ্ছিল, দেখল সত্যবানস্যার হাসিমুখে ওদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন।

'কীরে, তোরা সব কোথায় চললি? এখনও বাড়ি যাসনি? যা-যা, বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা কর।'

এত স্বাভাবিক কথা বলার ঢং, এত সহজ পা ফেলার ভঙ্গি যে, অচ্যুতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অমিয়স্যার অপছন্দের চোখে সত্যবানস্যারের দিকে তাকালেন। একটু বোধহয় ভয়ও পেলেন। কারণ, অমিয়স্যারের মোটাসোটা শরীরটা পলকের জন্য কেঁপে উঠল।

অচ্যুত বেপরোয়া ঢঙে এক পা এগিয়ে গেল সত্যবানস্যারের দিকে। বেশ জোরালো গলায় বলল, 'স্যার, শুনেছেন তো, রাজীব মারা গেছে!'

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'হ্যাঁ রে, শুনেছি। ভেরি স্যাড। তবে চিন্তার তো কিছু নেই! তোরা তো আছিস!'

কথাটা বলেই সত্যবানস্যার আচমকা ঘুরে চলে গেলেন।

অমিয়স্যার রাগে ফেটে পড়লেন : 'চোরের মায়ের বড় গলা! কী স্পর্ধা! কী আটোপটংকার! চল, এখনই হেডস্যারের কাছে চল!'

স্যারের কথায় ওরা পা বাড়াল।

স্কুল এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওরা দেখল, বানজারা নীচের ক্লাসরুমগুলোর দরজা বন্ধ করে তালা লাগাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে অমিয়স্যার বললেন, 'পুরকায়স্থবাবুকে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে বলব ভাবছি। উনি বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইবেন না। হয়তো বলবেন...।'

'কেন, স্যার, ফটো তো আছে!' বাসব বলল।

'হুঁ, তা আছে। আসলে কী জানিস, আমারই বিশ্বাস হতে চাইছে না। যদিও জানি, তোরা সব সত্যি কথাই বলছিস।'

কথা বলতে-বলতে হেডস্যারের ঘরের দরজায় চলে এল ওরা।

ঘরের বাইরে কালো কাঠের নেমপ্লেট—তার ওপরে সাদা হরফে নাম লেখা : মোহনলাল পুরকায়স্থ, এম. এসসি., এম. এড.।

দরজায় খয়েরি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না।

অমিয়স্যার একটু উসখুস করতে লাগলেন। বললেন, 'এতজন একসঙ্গে ঢোকার দরকার নেই। উনি হয়তো কিছু মনে করবেন। বাসব আর অচ্যুত আমার সঙ্গে আয়।' হাতের ইশারায় ওদের কাছে ডাকলেন স্যার।

প্রতীক, কুলদীপ, আর সৌরভকে লক্ষ করে বললেন, 'তোরা বাইরে প্রতীক্ষমাণ হয়ে থাক। দরজা ছেড়ে কোথাও যাবি না, বুঝলি...।'

ওরা তিনজন পরদা সরিয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছোট্ট ঘর। রং-খসা ড্যাম্প-ধরা দেওয়াল। সিলিং-এ কাঠের কড়িবরগা। শুধু জানলা-দরজার পরদাগুলোই যা বেমানানরকম আধুনিক।

পুরোনো কাঠের চৌকো টেবিলের ওপারে বসে মোহনলালবাবু কী একটা ফাইল খুলে পড়ছিলেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট।

'আসতে পারি, স্যার?' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অমিয়স্যার কুণ্ঠিতভাবে জিগ্যেস করলেন।

হেডস্যার মুখ তুলে তাকালেন। হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন—বসুন...।'

তারপরই বাসব আর অচ্যুতকে দেখে বললেন, 'আরে তোরা! কী ব্যাপার?'

'ওরা আমার সঙ্গে এসেছে। ক্লাস নাইনের ''এ'' বিভাগের ছেলে—অচ্যুত আর বাসব।' ওদের পিঠে একে-একে হাত দিয়ে অমিয়স্যার বললেন, 'ইশকুলের ভয়ংকর বিপদ, স্যার...আপনাকে কিছু একটা করতে হবে। ওরা আপনাকে সব...।'

'কী, রাজীবের ব্যাপারে কিছু?' হেডস্যার সিগারেটে টান দিলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের গলা কেঁপে গেল।

'ফাঁড়ি থেকে বড়বাবু আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি বলেছি, আজ কনডোলেন্স-এর ব্যাপার আছে—স্কুল তাড়াতাড়ি ডিজলভ করে যাবে। কাল দুপুরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

অমিয়স্যার বললেন, 'মাত্র পাঁচ-দশমিনিট সময় নেব, স্যার। অচ্যুত, তুই বল—সংক্ষেপে বলবি।'

অচ্যুত ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করল। রাজীবের মায়া মাখানো করুণ মুখটা কল্পনা করে ও নিজেকে জেদ আর সাহস জোগাল।

একটানা গল্পটা ও বলে গেল। আগ্রহ আর চাপা কৌতুক নিয়ে মোহনলালবাবু ওর সব কথা মন দিয়ে শুনে গেলেন।

গল্প বলা শেষ হলে পকেট থেকে সত্যবানস্যারের ফটোগ্রাফটা বের করল অচ্যুত। ঘন-ঘন শ্বাস নিয়ে বলল, 'যদি স্যার, আপনার বিশ্বাস না হয়, স্যার...তা হলে এটা দেখুন...সত্যবানস্যার দেওয়ালে হাঁটছেন...।' ফটোটা হেডস্যারের দিকে এগিয়ে দিল ও।

অমিয়স্যার বললেন, 'একেবারে অবিশ্বসনীয় ঘটনা, স্যার...।'

'অবিশ্বাসের কী আছে!' টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন হেডস্যার। বললেন, 'আপনারা কি আর আমার কাছে এসে মিথ্যে কথা বলবেন!'

'আপনার অবাক লাগছে না?'

'না, অবাক লাগবে কেন! পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কত কী আছে। সেগুলো কি মিথ্যে, বলুন?'

অমিয়স্যার থতমত খেয়ে চুপ করে রইলেন। মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওঁদের সবাইকে পাগল ভাবছেন। মনস্তত্ত্ববিদরা যে-ঢঙে কথা বলেন উনি অনেকটা যেন সেই ঢঙে কথা বলছেন।

'দেওয়ালে সত্যবানবাবু ঠিক কেমন করে হাঁটছিল বল তো? এইরকম?'

ওরা অবাক হয়ে দেখল, হেডস্যার সিগারেটটা ঠোঁটে নিলেন। তারপর দু-হাত টান-টান করে পিছনের দেওয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হাতের পাতা দুটো চুম্বকের মতো দেওয়ালে সেঁটে গেল। তারপর ওঁর গোটা শরীরটা যেন বাতাসে ভেসে দেওয়ালে পৌঁছে গেল।

ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা অবস্থায় তিনি টিকটিকির মতো দেওয়ালে হাঁটতে লাগলেন। তারপর সিগারেটটা ডানহাতে নিয়ে ঘাড় কাত করে তাকালেন অচ্যুতদের দিকে। খিলখিল করে হেসে বারবার

জিগ্যেস করতে লাগলেন, 'দ্যাখ তো, এইরকম?'

অমিয়স্যার চেয়ারে কাত হয়ে পড়লেন। ওঁর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল।

বাসব অচ্যুতকে ভয়ে জাপটে ধরল। ফটো দেখা আর সামনাসামনি দেখায় অনেক তফাত আছে।

অচ্যুত অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় ততটা পায়নি। এই কসরত দেখে-দেখে ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। সত্যবানস্যারের কথাটা ওর মনে পড়ল : '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না...।' 'আমাদের' মানে তা হলে হেডস্যার আর সত্যবানস্যার! ধানকলের মাঠে কুলদীপের বন্ধুরা নিশ্চয়ই স্যাটাস্যাটের সঙ্গে হেডস্যারকেই দেখেছিল! আর তারপরই জোড়া খুন!

অচ্যুত আর ভাবতে পারছিল না।

হেডস্যার তখন দেওয়াল থেকে সিলিং-এ চলে গেছেন। হাতের সিগারেটে টান দিতে-দিতে তিনি শরীরটাকে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলিয়ে দিলেন। পায়ের চেটো সিলিং-এ এঁটে আছে, মাথাটা নীচের দিকে।

সেই অবস্থাতেই সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মোহনলালবাবু। ধোঁয়াটা ওঁর পায়ের দিকে যেতে শুরু করল।

'দ্যাখ তো, এইরকম সবুজ চোখ?'

অচ্যুত দেখল, কখন যেন হেডস্যারের চোখ স্যাটাস্যাটের মতো সবুজ হয়ে গেছে। ও সেই সবুজ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। একটা নেশার ঘোর ওকে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরছিল।

'আমি আর তোদের অঙ্কস্যার—আমরা অনেক কিছু পারি। আসলে আমরা কিন্তু আলাদা নই, বুঝলি...একই...।' মিহি খিলখিল হাসি। তারপর : 'এ নিয়ে পাঁচকান করে কোনও লাভ নেই, শোরগোল কিংবা থানা-পুলিশ করেও কোনও লাভ নেই। এ পর্যন্ত যা-কিছু দেখেছিস, বা এখন দেখছিস—সবকিছু ভুলে যাওয়াই ভালো।'

স্রেফ পায়ে হেঁটে সিলিং থেকে দেওয়ালে, এবং দেওয়াল থেকে মেঝেতে নেমে এলেন মোহনলালবাবু। টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ছোট-হয়ে-যাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিলেন। তারপর ধীরেসুস্থে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অমিয়স্যার তখন থরথর করে কাঁপছেন। বাসব চোখ বুজে অচ্যুতকে জাপটে ধরে রয়েছে। অচ্যুত সোজা হয়ে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে—একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না।

ওর রাজীবের কথা মনে পড়ছিল, আর উলটোদিকের চেয়ারে বসা টাকমাথা, চশমা পরা লোকটাকে দেখে বমি পাচ্ছিল। ভাবছিল, কীভাবে এই একজোড়া রক্তপিশাচকে খতম করা যায়।

মোহনলালবাবুর চোখ এখন কটা রং থেকে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তিনি হাতছানি দিয়ে অচ্যুতকে কাছে ডাকলেন।

ডাকটা অনেকটা নিশির ডাকের মতন। অচ্যুতের সেরকমই মনে হল।

অতিকষ্টে বাসবের বাঁধন ছাড়িয়ে ও টেবিলের পাশ ঘুরে হেডস্যারের কাছে গেল। বাসব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

হেডস্যার ছোবল মারার মতো পলকে হাত বাড়িয়ে অচ্যুতের চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকায় ওকে কাছে টেনে নিলেন। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে দাঁত খিঁচিয়ে হিসহিস করে বললেন, 'তুই-ই যত নষ্টের গোড়া! তোকে ছেড়ে রেখে আমরা ভুল করেছি। তোকে কতকগুলো জরুরি কথা বলার আছে...।' ওকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে গালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন হেডস্যার। আচমকা পালটে গিয়ে স্নেহ আর ভালোবাসার হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে। থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুই বড় দুরন্ত আর দুষ্টু। তবে লেখাপড়ায় ফার্স্টক্লাস। দেখবি, সামনের পরীক্ষায় তুই ফার্স্ট হবি—আমরা তোকে ফার্স্ট করাব। কোনও চিন্তা

নেই। আজ রাত আটটার সময়ে ধানকলের মাঠে চলে আয় দেখি। আমি আর সত্যবানস্যার থাকব। তোর সঙ্গে আমাদের খুব জরুরি আলোচনা আছে। মনে করে আসবি কিন্তু।' অচ্যুতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বারবার : 'অবশ্য না এসে তুই পারবি না...আসতে তোকে হবেই...। আমি জানি তুই আসবি।'

সম্মোহন করার ভঙ্গিতে একদৃষ্টে অচ্যুতের চোখে তাকিয়ে রইলেন হেডস্যার। আর সাপ-খেলানো সুরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...আসতে তোকে হবেই...না এসে তুই পারবি না...।'

অচ্যুতের কেমন ঘোরের মতো লাগছিল। ও ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, যাব। যাব, যাব, যাব।'

'লক্ষ্মী ছেলে।' হেডস্যার আদরের গলায় বললেন, 'তুই এখন যা। আর শোন, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে, অমিয়বাবু আর বাসবের এসব কিছুই মনে থাকবে না। তবে তুই কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবি না।'

অচ্যুত টেবিলের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে সরে এল।

হেডস্যার এবার অমিয়স্যার আর বাসবের দিকে পালা করে তাকালেন। ওঁর চোখ আবার সবুজ হয়ে গেল। অমিয়স্যার আর বাসব অপলকে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুতের মনে হল, কোনও অদৃশ্য রশ্মি যেন হেডস্যারের চোখ থেকে বেরিয়ে অমিয়স্যার আর বাসবের চোখ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

প্রায় একমিনিট পর হেডস্যারের চোখ আবার স্বাভাবিক হল। তিনি বেশ সহজ গলায় অমিয়স্যারকে বললেন, 'ঠিক আছে, অমিয়বাবু... আপনারা তা হলে আসুন। ওই কথাই রইল...।'

অমিয়স্যার ঘাড় নেড়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। বাসবের হাত ধরে সাবধানে পা ফেলে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন। অচ্যুত ওঁদের পাশে-পাশে হেঁটে চলল।

বাসব আর অচ্যুতের দিকে পালা করে তাকিয়ে অমিয়স্যার যান্ত্রিক স্বরে মিনমিন করে বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, বুঝলি?'

বাসব ফ্যালফ্যাল করে অমিয়স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অচ্যুতের মাথায় কিছুই ঢুকল না।

ওর মনে শুধু পাগলাঘণ্টি বাজছিল : ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত...।

ওরা তিনজন হেডস্যারের ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রতীক, কুলদীপ আর সৌরভ দেখল যে-তিনজন মানুষ হেডস্যারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের মুখ-চোখ দেখে মনে হয় এইমাত্র ওরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

প্রত্যেকেরই চোখে হতভম্ব শূন্য দৃষ্টি। যেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে সদ্য পা ফেলেছে পৃথিবীর মাটিতে।

ওদের পাশাপাশি হেঁটে যেতে-যেতে একের পর এক প্রশ্ন করে চলল কুলদীপ।

উত্তরে অচ্যুত অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কীসব বলে একরকম দৌড়ে চলে গেল ওর সাইকেলের দিকে।

কুলদীপরা এবার বাসবকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু বাসবও কোনও কথা বলতে পারল না। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও কাঁদতে শুরু করে দিল।

সৌরভ একটু রুক্ষভাবেই অমিয়স্যারকে বলল, 'স্যার, হেডস্যার কী বললেন? সত্যবানস্যারের ব্যাপারে উনি কি কোনও স্টেপ নিচ্ছেন?'

অমিয়স্যার সিঁড়ি নামতে-নামতে খোলা উঠোনের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। সেই অবস্থাতেই আলতো করে বললেন, 'ওই কথাই রইল...ওই কথাই রইল।...বীতিহোত্র, বীতিহোত্র...বীতিহোত্র ছাড়া নিস্তার নেই রে...নিস্তার নেই।'

ওদের তিনজনকে বোকার মতো মাঠের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখে অমিয়স্যার চলে গেলেন। বাসবও ওঁর পিছন-পিছন ছুট লাগাল।

কুলদীপরা বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ওরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা শুরু করল।

হঠাৎ ওরা দেখল, সত্যবানস্যার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন।

প্রতীক আর সৌরভকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে কুলদীপ সত্যবানস্যারের পিছু নিল।

দোতলায় এসে সত্যবানস্যার সটান এগিয়ে গেলেন হেডস্যারের ঘরের দিকে। এবং পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কুলদীপও পা টিপে-টিপে পৌঁছে গেল হেডস্যারের ঘরের কাছে। তারপর ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে দরজার পাশে আড়ি পাতল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর ঘরের ভেতরে থেকে রক্ত-হিম-করা খিলখিল হাসি শোনা গেল।

হেডস্যার বলছেন, ‘ছেলেটাকে আজ রাত আটটায় ধানকলের মাঠে আসতে বলেছি...।’

সত্যবানস্যার বলছেন, ‘হ্যাঁ, অচ্যুতটা বড্ড ডিসটার্ব করছে। ভেবেছিলাম ওকে কিছু করব না...কিন্তু ও এমন শুরু করেছে যে, এখান থেকে হয়তো পাততাড়ি গোটাতে হবে।’

হেডস্যার হেসে বললেন, ‘তোমার ছবি তুলেছে দেখলাম। তুমি দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছ।’

‘তাই! কখন তুলল কে জানে! অবশ্য ও-ছবি দেখিয়ে কোনওরকম সুবিধে করতে পারবে না। যদি পুলিশে গিয়ে জানায় তা হলে পুলিশও কোনও আমল দেবে না...।’

‘কিন্তু বারবার যদি ও পুলিশকে বিরক্ত করতে থাকে তা হলে একসময় পুলিশও আমল দেবে। তখন...। প্র্যাকটিক্যালি সেইজন্যই একটা কড়া স্টেপ নিতে হল। তুমি সময়মতো গৌরী বস্ত্রালয়ের মোড়ে চলে এসো। দুজনে একসঙ্গে ধানকলের মাঠে যাব।’

‘ওঃ...দারুণ হবে। একইসঙ্গে তেষ্টার তৃপ্তি, আর ছেলেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি...।’

‘তোমার দেখছি জিভে জল এসে গেছে।’ খিলখিল করে হাসলেন হেডস্যার।

‘আর তোমার আসেনি বুঝি!’ সত্যবানস্যারও খিলখিল করে হাসলেন।

দুজনের হাসি যেন আর থামতেই চায় না। দুই পিশাচের রক্ত-হিম-করা হাসি।

কুলদীপ বেড়ালের পায়ে ছুট লাগাল। ঘাম ফুটে বেরোল ওর কপালে। উত্তেজনায় ও চাপা সুরে শিস দিয়ে উঠল।

দুদ্দাড় করে একতলায় নেমে এসেই ও সৌরভ আর প্রতীকের হাত ধরে টান মারল। দৌড়ে সাইকেল স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে বলল, ‘শিগগিরই আয়...সামনে এখন অনেক কাজ...।’

সাইকেল চালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ওরা মরিয়া হয়ে একটা সমাধান খুঁজতে লাগল।

ভেতরে-ভেতরে ওরা ভয় পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আরও ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, ‘কিছুতেই হার মানা চলবে না! কিছুতেই না!’

অমিয়স্যারের কথাগুলো কুলদীপের মনে পড়ছিল বারবার।

নয়

চাঁদ মেঘে ঢাকা ছিল। হয়তো সেইজন্যই জোনাকির ঝাঁক বাড়াবাড়িরকম উড়ছিল।

অচ্যুত যখন সাইকেল নিয়ে ধানকলের মাঠে পৌঁছল তখন উড়ন্ত আলোর বিন্দুগুলো ওর প্রথম চোখ টানল। একটা ঘোরের মধ্যে থাকলেও ও মুগ্ধ হয়ে জোনাকির খেলা দেখতে লাগল।

আশপাশের অন্ধকারে আরও অন্ধকার গাছপালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বাদলা বাতাস ওদের পাতায় ঝাপটা মারতেই ফিসফাস শুরু হল।

অচ্যুতের মনে হল, ওরা বলেছে, 'অচ্যুত এসে গেছে...অচ্যুত এসে গেছে...।'

ঠিক সেইসময়ে ওর ঠিক পাশ থেকে ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল, 'এসে গেছিস! গুড বয়। সাইকেল রেখে দিয়ে মাঠের মাঝে চল। হেডস্যার ওখানে অপেক্ষা করছেন...।'

অচ্যুত মোটেই চমকে উঠল না। ধীরে-ধীরে পাশ ফিরে তাকাল।

সত্যবানস্যার ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর নিঃশ্বাস অচ্যুতের গায়ে এসে পড়ছে। ঠান্ডা নিঃশ্বাস। কিন্তু তাতেও অচ্যুত অবাক হল না। ওর মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

বিকেলে দু-পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর একটু রোদও দেখা গিয়েছিল—শরতের রোদ। তখন অচ্যুত একটা পুজো-পুজো গন্ধ টের পেয়েছিল।

ওর ভীষণ মন খারাপ লাগছিল। মনের ভেতর থেকে ফিসফিস করে কেউ যেন বলছিল, 'এ-পুজো আর দেখা হবে না।' তাই রোদ উঠতেই ও ছাদে গিয়েছিল বিকেলের শেষ রোদটা গায়ে মাখতে।

'এই যে, মিস্টার অ্যাক্সিডেন্ট!'

মউলি। হলুদরঙের একটা চুড়িদার পরেছে। ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে, বিকেলের রোদ দিয়ে তৈরি।

অচ্যুত ওর দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

'কাল রাতে কী হয়েছিল? অঙ্কস্যারকে দেখে পালিয়েছিলে কেন বলো। তোমার মতো গুড বয়রা কখনও এমন পালায়! তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ আমাকে সব বলবে। কখন বলবে বলো।'

অচ্যুতের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও কিছুই বলতে পারল না। কয়েকবার ঠোঁট নড়ল শুধু।

মউলি অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত অচ্যুত বিড়বিড় করে বলতে পারল, 'বলব।'

কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মউলির ভুরু কুঁচকে গেল। পাঁচিলের কাছে এসে অচ্যুতদের ছাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

অচ্যুত সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'পুজোয় তুমি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করবে?'

'হ্যাঁ। তুমি করবে না?'

ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকাল অচ্যুত। সেদিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওটা কী আনন্দ?'

'কী ব্যাপার! তোমার কী হয়েছে?'

অচ্যুতের চোখে জল এসে গেল। হাতের পিঠ দিয়ে মোছার চেষ্টা করে জড়ানো গলায় বলল, 'কিচ্ছু না। তোমার কথা বলো।'

'হঠাৎ আমার কথা জানতে চাইছ?' চোখ পাকিয়ে হাসল মউলি।

'আজ খুব জানতে ইচ্ছে করছে। পরে যদি আর জানতে না পারি...।'

'ও—। ঠিক আছে, বলছি।' স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের কাছে হাত জড়ো করে সোজা হয়ে দাঁড়াল মউলি। তারপর পড়া মুখস্থ বলার ঢঙে বলল, 'আমার নাম মউলি মিত্র। তোমাদের পাশের বাড়িতে থাকি। পড়াশোনায় মন নেই। রোজ বিকেলে অ্যাক্সিডেন্টের লোভে ছাদে উঠে ঘোরাঘুরি করি। ব্যস! আপাতত এইটুকুই।'

ঠিক এইসময় সিঁড়ির কাছ থেকে মা অচ্যুতকে ডাকল।

অচ্যুত ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের দরজার দিকে একবার তাকাল। তারপর হাত নেড়ে মউলিকে 'টা-টা' করে বলল, 'কাল যদি ছাদে দেখা হয় বেশ হবে...।'

বলেই দৌড়ে চলে গেল ছাদ থেকে।

মউলি অবাক বিষণ্ণ চোখে অচ্যুতের চলে যাওয়া দেখল। ও যেন কতকিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

সত্যবানস্যারের গুড বয় কথাটা মউলিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আশপাশের অন্ধকার, জঙ্গলের গন্ধ, সব কিছু কেমন ভুলে গিয়েছিল অচ্যুত। ভুলে গিয়ে মউলির কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু ঝিঁঝিঁপোকার কান্না, ব্যাঙের ডাক, জোনাকির আলো, সত্যবানস্যারের ঠান্ডা নিঃশ্বাস, অচ্যুতকে আচমকা ঝাঁপিয়ে ঘিরে ধরল।

স্যারের হাত ধরে ও মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বড়-বড় ঘাস কিংবা জল-কাদা টের পেল কি পেল না।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ও হেডস্যারের কালো ছায়াটা ঠাহর করতে পারল।

ওকে দেখেই হেডস্যার দু-হাত শূন্যে তুলে নাচের ভঙ্গি করলেন।

সত্যবানস্যার অচ্যুতের ঠিক পিছনে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর হিসহিস করে বললেন, 'আজ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তৈরি হবে...তেষ্টার সম্পর্ক...রক্তের সম্পর্ক। তারপর...তারপর তুই মুক্তি পাবি।'

অন্ধকারে হেডস্যারের ধূসর ছায়া খিলখিল করে হাসল।

আকাশের তুলো-তুলো মেঘ জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কয়েকটা দলছুট তারা চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে পালাই-পালাই চাঁদের একটা টুকরো।

প্রবল বাতাসের ঝাপটা হঠাৎই ওদের ঘিরে পাক খেয়ে গেল।

অচ্যুতের চুল উড়তে লাগল। মায়ের কথা মনে পড়ল। বাপির কথা মনে পড়ল। মউলির কথাও।

আর ঠিক তখনই দুটো রক্তপিশাচ অচ্যুতকে ঘিরে নাচ শুরু করল।

অন্ধকারের ওদের সিলুয়েট ছায়ামূর্তিগুলো কীরকম লম্বাটে দেখাচ্ছে। লিকলিকে হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে আঙুলে নানারকম মুদ্রা ফুটিয়ে ওরা পাগলের মতো নাচছে...নাচছে।

অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'মা...মা...মাগো...।'

ওর বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল। ও উবু হয়ে ভিজে মাঠের ওপর বসে পড়ল।

সাপ-খেলানো সুরে হেডস্যার তখন ফিসফিস করে বলছিলেন, 'এ আমাদের বলির নাচ। তোর জীবন আমাদের তেষ্টা মেটাবে। আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দেবে...।'

অচ্যুত জড়ভরতের মতো ফ্যালফ্যাল করে ওঁদের নাচ দেখছিল। আর শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটু পরে ওঁরা অন্ধকার মাঠের ওপরে শুয়ে পড়লেন। সাপের মতো বুকে হেঁটে অচ্যুতকে ঘিরে পাক খেতে লাগলেন।

একসময় হেডস্যার গলা উঁচু করে অচ্যুতের ঘাড়ে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। অচ্যুত সাপের মুখে-পড়া ব্যাঙের মতো নিশ্চল হয়ে গেল।

ঠিক তখনই ধানকলের মাঠের সীমানায় ফুলঝুরির মতো একটা সাদা আলো ফিনকি দিয়ে জ্বলে উঠল।

প্রথমে একটা।

তারপর আর-একটা।

তারপর একে-একে অসংখ্য।

সাদা, সবুজ, নীল, লাল—নানান রঙের রংমশাল জ্বলে উঠল মাঠের কিনারায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঠ ঘিরে রংমশালের রঙিন আলোর এক বৃত্ত তৈরি হয়ে গেল।

শ'য়ে শ'য়ে রংমশাল উদ্দাম ফুর্তিতে জ্বলছে। অন্ধকার মাঠে আলোর উৎসব শুরু হয়ে গেল যেন।

'দুর্গাপুজো কি এসে গেছে? নাকি কালীপুজো!' ঝাপসাভাবে ভাবতে চেষ্টা করল অচ্যুত।

ও চমকে তাকিয়েছিল আলোর দিকে। ঝলসানো আলোয় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে অনেকগুলো মুখ। ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলের দল হাজারো রংমশাল জ্বেলে নতুন এক অকালবোধন শুরু করে দিয়েছে।

সত্যবানস্যার আর হেডস্যারও থমকে গেলেন। ওঁরা চটপট সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আলোর রেখার দিকে।

রংমশালের আলোগুলো এবার তিরবেগে ছুটে আসতে শুরু করল ওঁদের দিকে। আলোর বৃত্তটা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল।

অচ্যুত ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। চোখ কচলে ও ছোট হয়ে আসা বৃত্তটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

অসংখ্য ছেলে, তাদের হাতে জ্বলন্ত রংমশাল—চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

একটু পরে চিৎকারটা বুঝে উঠতে পারল অচ্যুত। জিহাদ মিছিলের স্লোগানের মতো ওরা গলায় গলা মিলিয়ে বারবার বলছে, 'রক্তপিশাচ নিপাত যাক! রক্তপিশাচ নিপাত যাক!'

আনন্দে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। পুজোয় ও তা হলে মউলির মতো আনন্দ করতে পারবে!

ওই তো কুলদীপ! ওই তো সৌরভ! ওই তো বাসব!

সঙ্গে আরও অসংখ্য চেনা-অচেনা মুখ।

হইহই চিৎকার এতক্ষণে একেবারে কাছে এসে গেছে। জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। সত্যবানস্যার আর হেডস্যার ফাঁদে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো ভয়ে এলোমেলো দৌড়চ্ছেন।

অচ্যুত দৌড়ে গেল কুলদীপের কাছে।

কুলদীপ রংমশাল একহাতে সামলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এক অদ্ভুত আনন্দের ঢেউ ওর বুকের ভিতরে উথলে উঠে ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিল।

আর ঠিক তখনই কয়েকশো জ্বলন্ত রংমশাল ছুটন্ত সত্যবানস্যার আর হেডস্যারকে ছুঁয়ে ফেলল।

রক্ত-হিম-করা এক ভয়ংকর আর্তনাদ ধানকলের মাঠের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল। দপ করে জ্বলে উঠল দুই পিশাচের অভিশপ্ত শরীর। ওদের শরীরের ধুনি থেকে কালো ধোঁয়ার গাঢ় কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

সবাই মুখ তুলে সেই ধোঁয়ার দিকে দেখতে লাগল।

রংমশালের আগুন নিভলে অন্ধকারে কয়েকটা টর্চ এদিক-ওদিক জ্বলে উঠল। দেখা গেল দুই পিশাচের তালগোল পাকানো মৃতদেহ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। দুটো সাপবাজির ট্যাবলেট পাশাপাশি পোড়ানোর পর যেরকম দশা হয় অনেকটা সেইরকম।

আকাশে ভেসে যাওয়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে তখনও আর্তকান্না শোনা যাচ্ছে।

সৌরভ, প্রতীক আর বাসব অচ্যুতকে একেবারে জাপটে ধরল।

অচ্যুতের চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কাঁদতে-কাঁদতেই ও বলল, 'তোরা আমাকে এত ভালোবাসিস!'

কুলদীপ হাতের মাসল ফুলিয়ে বলল, 'এসবের জন্যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে জানিস! রাজীবের মাম্মি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন রংমশাল কেনার জন্যে। পাড়ার দোকানে পাওয়া যায়নি—তাই বাজির আড়তে যেতে হয়েছে।'

আবেগে অচ্যুত কোনও কথা বলতে পারছিল না। ও কুলদীপের গালে একটা চুমু খেল।

এমন সময় কে একজন ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, ‘বলেছিলাম না, বীতিহোত্র!’

ওরা পাঁচজন অন্ধকারেই হেসে উঠল। তারপর কী ভেবে অমিয়স্যারকে ঢিপ-ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল।

অমিয়স্যার অচ্যুতকে লক্ষ করে বললেন, ‘তুই শুধু যে ভালো ছেলে তা নয়—অসাধ্বসও বটে!’

বাসব জিগ্যেস করল, ‘অসাধ্বস মানে কী, স্যার?’

অমিয়স্যার হেসে বললেন, ‘এও জানিস না! অসাধ্বস মানে হল সাহসী, শঙ্কাহীন।’

অচ্যুত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর শরীরটা সামান্য কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। অমিয়স্যারের ‘ভালো ছেলে’ কথাটা থেকে ওর ‘গুড বয়’ মনে পড়ল। তারপর ‘গুড বয়’ থেকে ‘অ্যাক্সিডেন্ট’। আর সবশেষে ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ থেকে একজনের কথা মনে পড়ে গেল।

ওকে এবার সব খুলে বলতে হবে।

দশ

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই।

এখন আমাকে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে।

আগেই তো বলেছি, আত্মা যদি অমর অবিনশ্বর হয় তা হলে আমার অমর হতে অসুবিধে কী! গীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ‘নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।’ অর্থাৎ, কোনও শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না।

তা হলে আমাকে অগ্নি দহন করবে কেমন করে!

তাই আকাশে, বাতাসে, ধুলোয় মিশে আবার শুরু হোক আমার পথ চলা।

চলতে-চলতে আবার আমাকে খুঁজতে হবে নতুন আশ্রয়। নিতে হবে আবার কোনও নতুন পরিচয়। তারপর আবার বিশ্রাম আর আরাম।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, শুরু হবে আমার নতুন জীবন।

আঃ, ভাবতেই কী তৃপ্তি!

তুমি পিশাচ



এক

আমার চলার কোনও শেষ নেই। আমি সত্যিকারের পথিক—পথই যার জীবন। আমার চলার পথের যেমন কোনও শেষ নেই, তেমন আমারও কোনও শেষ নেই। এমনই আমার জীবন।

মানুষের সঙ্গে আমার মিল অনেক—কিন্তু আবার গরমিলও প্রচুর। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তাই বুঝতে পারি মানুষ কেমন হয়। অর্থাৎ, মানুষের মন আর চেহারা দুই-ই দেখতে পাই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না—শুধু অনুভব করতে পারে।

মানুষ আমার খুব পছন্দের, খুব প্রিয়। তাই মানুষ দেখলে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ি। এক অদ্ভুত টানে দু, তিন, কিংবা চার টুকরো হয়ে নানান মানুষের ভেতরে আশ্রয় নিই। তাই আমার বাসা হল মানুষ—মানুষই আমার ঠিকানা। কারও মধ্যে আমি পঞ্চাশ, ষাট কি একশো বছর ধরে থাকি। আবার কারও শরীরে থাকি পাঁচ, সাত কি দশ দিন। কতদিন কোথায় থাকব সেটা নির্ভর করে আমার মরজির ওপরে।

যে-যে মানুষের মধ্যে আমি আশ্রয় নিই তাদের মধ্যে অনেকগুলো নতুন-নতুন গুণ দেখা যায়। কিন্তু সেই গুণগুলো হয়তো মানুষের চোখে দোষ। তাই আমি খুব চেষ্টা করি গুণগুলো আড়াল করে রাখতে।

কী আশ্চর্য আমার জীবন! মানুষের এত কাছাকাছি আমি বাস করি অথচ তা সত্ত্বেও মানুষ আমাকে ভাবে অমানুষ। আমাকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারে না।

আমি জানি, এক ঠান্ডা গভীর অন্ধকার থেকে আমার উৎপত্তি। তারপর পথ চলা। শুধু পথ চলা। আমার বিনাশ বলে কিছু নেই। মানুষ আমাকে কখনও-কখনও ধ্বংস করে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। তখন আমি ফিরে যাই সেই ঠান্ডা অন্ধকার গহ্বরে। শীতঘুমে সময় কাটিয়ে দিই। তারপর...

তারপর? তারপর যখন আবার খিদে টের পাই, তেষ্টা টের পাই, মানুষের টান টের পাই—তখন আমি জেগে উঠি। শীতঘুম ছেড়ে বেরিয়ে আসি বাইরের আলোর জগতে, লোকালয়ে। যেমন এখন।

ওই তো চোখে পড়ছে একটা বিশাল পাঁচিল ঘেরা এলাকা। তার ভেতরে, অনেকটা দূরে, একটা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন প্রাসাদ। না, শুধু প্রাসাদও নয়—তার সঙ্গে রয়েছে ছোট-ছোট কয়েকটা বাড়ি আর ঘিরে থাকা বাগান। বাগানে কত বড়-বড় গাছ। গাছে কত পাতা। সেই পাতার ছায়ায় গাছের নীচটা দিনের আলোতেও অন্ধকার-অন্ধকার দেখাচ্ছে। আর সেই অন্ধকারে মাথাচাড়া দিয়েছে অজস্র আগাছা।

প্রকাণ্ড এলাকাটা রং-চটে-যাওয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারই এক জায়গায় সিং-দরজা। সব কিছু দেখে মনে হয় রাজা-রাজড়াদের ফেলে যাওয়া বাগান আর প্রাসাদ। এককালে তাদের হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আজ সবই পুরোনো স্মৃতি। শুধু রাজবাড়িটা অতীতের সাক্ষী হয়ে চুপচাপ মনের দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে ঘিরে বিষণ্ণ গাছগুলো।

কিন্তু তাই কী? এখানে এখন কেউ থাকে না তা তো নয়!

কারণ, আমি মানুষের ঘ্রাণ পাচ্ছি। একটা-আধটা নয়, অনেক মানুষের।

শুধু তাই নয়, এত দূর থেকেও আমি কত মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ছেলেদের গলা, মেয়েদের গলা।

উঁহু, বাড়িটা পুরোনো জীর্ণ হলেও এখানে অনেক মানুষ থাকে। আমাকে ওরা কোনও অদৃশ্য টানে টানছে—কাছে টানছে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছিল সকাল থেকেই। তার সঙ্গে দম আটকানো গুমোট। বৃষ্টি যে হবে তার গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম। এও বুঝতে পারছিলাম, মেঘ আরও ঘন হবে, আরও কালো হবে। এখন দেখলাম

আকাশটা একেবারে ছাই রঙের হয়ে গেছে। আর সেই রং-টা ক্রমশ কালোর দিকে ঢলে পড়ছে।

বৃষ্টির জল আমার ভালো লাগে না। বৃষ্টির জল ওপর থেকে আসে। প্রাকৃতিক পবিত্র জল। ওই জল গায়ে লাগলে আমরা—মানে, আমি আর আমার মতো যারা—নিস্তেজ হয়ে পড়ি। তাই ঠিক করলাম, আপাতত এই বাড়িটায় আমি আশ্রয় নিই। অনেক মানুষে ভরা এই আস্তানাটা আমার মন্দ লাগবে না।

সেদিকে এগোতে গিয়েই সিং-দরজার মাথায় বসানো হোর্ডিং-টা আমার চোখে পড়ল। তাতে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে :

রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুল

ও, এটা তা হলে স্কুল!

ওঃ, ক'শো বছর আগে যে আমি স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু যুগে-যুগে আমি মানুষের কাছ থেকে শিখেছি। যখনই আমি কোনও মানুষের শরীর আর মন দখল করেছি তখনই তার সব অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান আমার অস্তিত্বে মিশে গেছে। আমি বহু শতকের প্রাচীন হলেও সবসময় নবীনের কাছাকাছি থেকে শিখেছি। তাই প্রাচীন হলেও আমি সবসময় আধুনিক।

এখনও চিনতে পারোনি আমাকে?

আমি একজন পিশাচ—যার মধ্যে রয়েছে অতি প্রাচীন এক অমানুষ প্রেতাত্মা।

আমি একা। তবে ইচ্ছে হলেই অনেক হতে পারি—অ্যামিবার মতো।

আর যদি আমি তোমার ওপরে ভর করি, তোমার মধ্যে বাসা বাঁধি, তা হলে তখন তুমি পিশাচ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি।

আকাশ থেকে বৃষ্টির দু-একটা ফোঁটা পড়ল।

নাঃ, আর দেরি নয়। আমি সিং-দরজার দিকে এগোলাম। তালাবন্ধ দরজার জং ধরা লোহার রডের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দারোয়ানরা কেউ আমাকে দেখতে পেল না—কারণ, আগেই বলেছি, আমাকে দেখা যায় না—শুধু টের পাওয়া যায়।

সুন্দর পিচবাঁধানো রাস্তা আর ঘাসজমির ওপর দিয়ে প্রাচীন বাড়িটার দিকে যাওয়ার সময় আমি হঠাৎই একটা চেনা গন্ধ পেলাম। স্কুলবাড়ির দিক থেকেই আসছে গন্ধটা।

চমকে উঠলাম আমি। এ তো আমার মতোই গন্ধ! আমার একজন বন্ধু তা হলে রয়েছে ওই স্কুলবাড়িতে! আমার আগেই আমার মতো কেউ এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে! অথবা আস্তানা গেড়েছে ওই বাড়ির মানুষজনের ভেতরে! আনন্দ আর খুশিতে মনটা নেচে উঠল।

বৃষ্টির ফোঁটা হঠাৎই জোরে ঝরতে লাগল।

আর আমিও দেরি না করে ঢুকে পড়লাম স্কুলবাড়ির ভেতরে।

দুই

ইতিহাসের ক্লাস এমনভাবে চলছিল যেন টিভির নিউজ চ্যানেলে কোনও রোবট পরপর দুঃখের খবর পড়ে চলেছে।

রনিতা ম্যাডাম এভাবেই ক্লাস নেন বরাবর। আর সেই জন্যই পড়ার দিকে ইলিনার মন ছিল না। ও অনুষ্কার কথা ভাবছিল। মাত্র সাতদিন হল অনুষ্কা ওদের ক্লাসে ভরতি হয়েছে।

ইলিনার ডেস্কের ওপরে ইতিহাস বইয়ের পাতা খোলা ছিল। তার নীচে একটা রাফ খাতা। সেই খাতার শেষ পাতায় ইলিনা বারবার নিজের নাম লিখছিল। একবার ইংরেজিতে, আর-একবার বাংলায়। বেশ সুন্দর ডিজাইন করে অক্ষরগুলো তৈরি করছিল ও। সেগুলোর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় ওর অলঙ্করণের হাত বেশ ভালো।

ইলিনার খুব শখ ও ট্যাটু আর্টিস্ট হবে। এ পর্যন্ত ও প্রায় চল্লিশটা ট্যাটুর ডিজাইন এঁকেছে—লাল আর নীল কালি দিয়ে। সেগুলো একটা বাঁধানো ড্রইং খাতায় আঁকা আছে। সেটার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর নিত্য-নতুন নকশার আইডিয়া মাথায় আসে।

মাঝে-মাঝে ও বন্ধুদের হাতে বা পায়ে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে ছোট-ছোট ট্যাটু এঁকে দেয়। অবশ্য বন্ধুদের পারমিশান নিয়ে তবেই। একবার গীতাঞ্জলির কনুইয়ের ওপরদিকটায় একটা বাজপাখির ডিজাইন এঁকে দিয়েছিল। সেটা রনিতা ম্যাডামের চোখে পড়ে গিয়েছিল। গীতাঞ্জলিকে তিনি বেশ বকুনি দিয়েছিলেন। কিন্তু গীতাঞ্জলি ইলিনার নাম বলেনি। বরং ট্যাটু আঁকার দায়টা ওর এক কাল্পনিক ভাইয়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল।

ইলিনার নামের অক্ষরের ডিজাইনগুলো অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা সেগুলো বেশ খুঁটিয়ে বিচার করছিল। হঠাৎই ক্লাসরুমের খোলা জানলায় একটা শালিখ এসে বসায় ওর সেদিকে চোখ গেল।

ক্লাসরুমের বাইরের দিকের দেওয়ালে দুটো বড়-বড় জানলা। তাতে ঝিলমিল লাগানো বিশাল পাল্লা। পাল্লার ওপরে ফুটদুয়েক চওড়া ঝিলমিল বসানো কাঠের পাটি। বহু পুরোনো আমলের রাজা-রাজড়াদের বাড়িতে যেমন থাকত। রাজা চন্দ্রভানুও বোধহয় সেরকম কেউকেটা কোনও রাজা কিংবা মহারাজা ছিলেন। তাঁর সেই রাজপ্রাসাদ প্রায় একশো বছর আগে স্কুল হয়ে গেছে।

শালিখ দেখতে গিয়ে ইলিনার চোখ গেল অনুষ্কার দিকে। মনে হল, ইলিনার মতো ওরও ইতিহাসে মন নেই, আর ও-ও যেন আনমনাভাবে খাতায় আঁকিবুকি কেটে চলেছে।

অনুষ্কাকে কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয় ইলিনার। মাত্র সাতদিন আগে মেয়েটা ক্লাস টেন-এ ওদের সেকশানে এসে ভরতি হয়েছে। ওর বাবা সরকারি চাকরি করেন। ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসে পড়েছেন। তাই অনুষ্কা এই স্কুলে ভরতি হতে পেরেছে। নইলে ইলিনাদের স্কুলে ক্লাস টেন-এ কাউকে ভরতি নেওয়া হয় না।

অনুষ্কাকে দেখতে খুব সুন্দর। এত সুন্দর যে, অন্য মেয়েরা যখন-তখন ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ইলিনার খুব বিশ্বাস, কোনও ফিল্ম ডিরেক্টর ওকে দেখামাত্র সিনেমা কি টিভি-তে চান্স দিয়ে দেবে।

রনিতা ম্যাডাম আনমনা অনুষ্কাকে খেয়াল করেছিলেন। তাই ওকে 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য ওর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'অনুষ্কা, তুমি বলো..।'

অনুষ্কা শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। নিষ্পাপ ফুটফুটে মুখে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

রনিতা ম্যাডাম ক্লাস নাইন-এর কয়েকটা চ্যাপ্টার রিভাইজ করাচ্ছিলেন। তাই সম্রাট অশোকের ধর্মের বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন।

অনুষ্কাকে রনিতা ম্যাডাম জিগ্যেস করলেন, 'সম্রাট অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম তফাত কোথায় ছিল?'

রনিতা ম্যাডামের রোগা চেহারা। চশমার পিছনে চোখ দুটো বেশ রাগি। কপালে ভাঁজ। সবসময় ছাত্রীদের হেনস্থা করেন, শাস্তি দেওয়ার ফিকির খোঁজেন।

ইলিনা বুঝল, আজ অনুষ্কার রেহাই নেই। কপালে চূড়ান্ত বকুনি আছে। তারপর, যদি কপাল আরও খারাপ হয়, তা হলে ক্লাস সিক্সের রুমের সামনে গিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ইলিনার বুকের ভেতরটা অকারণেই ঢিপঢিপ করতে লাগল। ও স্থির চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

অনুষ্কা মিষ্টি গলায় ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অশোকের প্রচার করা ধর্ম অনেক বেশি উদার আর মানবতাবাদী ছিল। অশোক তাঁর ধর্মে ব্যক্তিগত জীবন আর সমাজজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি দান, দয়া প্রভৃতি বারোটি গুণের অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচলিত ধর্মে নানা ধর্মের সার কথাগুলো জায়গা পেয়েছিল...।'

রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। শিকার হাতছাড়া হওয়ার দুঃখের চেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠল ওঁর মুখে। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, মেয়েটা অন্যমনস্ক হয়ে খাতায় কী যেন করছিল। তা হলে কী করে ওঁর এইমাত্র পড়ানো লাইনগুলো হুবহু বলে দিল!

অনুষ্কা কি ওঁর বলা কথাগুলো খাতায় টুকছিল? তারপর প্রশ্নের উত্তরে সেই লেখাগুলোই রিডিং পড়ে দিল?

কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় মেয়েটা তো খাতার দিকে তাকায়নি!

মরিয়া হয়ে ডায়াস থেকে নেমে এলেন রনিতা ম্যাডাম। মেয়েটার খাতাটা একবার দেখা দরকার।

'দেখি, তোমার খাতাটা দেখি—।' চটপটে পায়ে জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে অনুষ্কার কাছে চলে এলেন।

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে ডেস্কের ওপরে রাখা খোলা খাতাটা দিদিমণির দিকে এগিয়ে দিল।

রনিতা ম্যাডাম দেখলেন। পাতা দুটোয় কিছু লেখা নেই। শুধু ডানদিকের পাতার নীচের কোনার দিকে কয়েকটা হিজিবিজি দাগ।

খাতাটা ওকে ফেরত দিয়ে সামান্য ধমকের সুরে 'বোসো' বলে ডায়াসের দিকে ফিরে গেলেন। ওঁর ফিরে যাওয়ার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা 'হেরে যাওয়া' ভাব ছিল।

ইলিনার খুব আনন্দ হচ্ছিল। ওর মনে হল অনুষ্কা যেন রনিতা ম্যাডামকে পালটা একটা 'শিক্ষা' দিল। অনুষ্কাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করল ওর। ওর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতেও ইচ্ছে করল।

কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম দিন থেকেই ইলিনা লক্ষ করেছে, অনুষ্কা ভীষণ একা-একা আর চুপচাপ থাকে—কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। ইলিনা দু-একবার আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথাবার্তা তেমন এগোয়নি।

রনিতা ম্যাডাম মঞ্চে উঠে আবার পড়াতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওঁর যান্ত্রিক আত্মবিশ্বাসে কেমন যেন চিড় ধরে গিয়েছিল। তাই পড়ানোর তাল আর লয় বারবার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

ইলিনা ভাবছিল, পিরিয়ডটা শেষ হলে বাঁচি। কারণ, তারপরই টিফিন। তখন অন্তত আধঘণ্টা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

আজ ওর পড়াশোনার মুড নেই। শুধু গল্প করতে ইচ্ছে করছে আর গান শুনতে ইচ্ছে করছে। কে জানে কেন—হয়তো আকাশটা মেঘলা বলেই। আর তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মনখারাপের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

হঠাৎই টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনের ঘণ্টার একটা বিশেষ ঢং আছে। ছুটির ঘণ্টারও তাই। ঠিক ফুটবল খেলায় হাফটাইম আর গোলের বাঁশি বাজানোয় যেমন তফাত থাকে।

ওদের স্কুলের ঘণ্টাটা দারুণ। একতলার বারান্দায় সিলিং থেকে ঝোলানো বড় পিতলের ঘণ্টা—ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মতো। বৃদ্ধ বলাইদা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সেই ঘণ্টাটা টাইমে-টাইমে বাজিয়ে দেয়। টিফিন হতেই গোটা ক্লাসটা স্বাধীন এবং এলোমেলো হয়ে গেল। কেউ-কেউ জানলার কাছে চলে গেল। আকাশ, বৃষ্টি আর গাছপালা দেখতে লাগল। বেশ কয়েকজন মেয়ে স্কুলব্যাগ থেকে টিফিনবক্স বের করে টিফিন খেতে বসল।

আজ বৃষ্টির মধ্যে অন্য দিনের মতো একতলার উঠোনে কিংবা বাগানে গিয়ে ছুটোছুটি করে খেলার উপায় নেই। তাই অনেকে ক্লাসরুমের লাগোয়া করিডরে গিয়ে হইহুল্লোড় করতে লাগল।

ইলিনা টিফিনবক্সটা ব্যাগ থেকে বের করে নিল। তারপর তাকাল অনুষ্কার দিকে।

অনুষ্কা একটা খাতা খুলে তাতে মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছিল। ওর দু-পাশে পারমিতা আর সুচন্দ্রা বসে। এখন ওরা কেউ সিটে নেই। বোধহয় টিফিন খেতে বাইরের করিডরে কোথাও গেছে।

ইলিনার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। আজ ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করবেই। গায়ে পড়ে হলেও ওর সঙ্গে আজ আলাপ করতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তাই ইচ্ছে আর জেদ সঙ্গী করে ও সরাসরি অনুষ্কার কাছে চলে গেল। ওর ডানপাশের খালি চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে বলল, 'কী করছ?'

অনুষ্কা চোখ তুলে তাকাল ইলিনার দিকে।

কী সুন্দর গভীর দুটো চোখ! টানা-টানা, ঘন চোখের পাতার সীমানায় ঘেরা। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কাজল পরে এসেছে। ওর চোখের মণির ভেতরে চক্রের মতো অনেকগুলো বৃত্ত। সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় বৃত্তগুলো কোন পাতালে চলে গেছে।

'একা-একা বসে কী করছ?' ইলিনা আবার জিগ্যেস করল।

'কিছু না।' নীচু গলায় অনুষ্কা বলল।

ওর খাতার দিকে চোখ গেল ইলিনার। সেখানে অদ্ভুত একটা ছবি বারবার আঁকা—ছোট-বড় নানান মাপে। একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

দেখে কোনও একটা প্রতীকচিহ্ন গোছের ছবি বলে মনে হয়। অথবা কোনও ট্যাটুর নকশা।

'এটা কীসের ছবি?' ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইল।

'ও কিছু না...।'

'দারুণ হয়েছে কিন্তু। অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো। তুমি তো জানো আমি ট্যাটুর ডিজাইন আঁকি। খাতাটা পরে আমাকে দিয়ো—আমি ডিজাইনটা তুলে নেব।'

কথাটা শুনেই শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল অনুষ্কা। কেমন একটা ভয়ের চোখে তাকাল ইলিনার দিকে : 'না, না—এটা বাজে ছবি। এটার কোনও মানে হয় না। ওয়ার্থলেস—।'

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্কা ছবিগুলোর ওপরে এলোমেলো কাটা-কুটি দাগ আঁকতে লাগল। ছবিগুলো নিপুণভাবে নষ্ট করতে লাগল।

'কী করছ! কী করছ! সুন্দর ছবিগুলো নষ্ট করছ কেন?'

কিন্তু অনুষ্কা ইলিনার কথায় মোটেই কান দিল না। কাটাকুটি দাগ কাটতে-কাটতেই বিড়বিড় করে বলল, 'সুন্দর নয়, বাজে ছবি...বাজে ছবি...।'

ইলিনা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ওর আলাপের শুরুটা এভাবে ধাক্কা খাবে ও ভাবেনি।

প্রসঙ্গ পালটাতে ও টিফিনবক্স খুলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্টের জিভে-জল-আনা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। মা-মণি টিফিনবক্সে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। একটা খোপে চার পিস ফ্রেঞ্চ টোস্ট। তার পাশের খোপে একটা মিষ্টি। আর একটা ছোট পলিপ্যাকে টমেটো সস।

'এসো, আমার টিফিন শেয়ার করো...।'

'টিফিন?' খানিক যেন দিশেহারা হয়ে ইলিনার দিকে তাকাল অনুষ্কা : 'টিফিন তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে...।'

ইলিনা বেশ অবাক হয়ে গেল। স্কুল বসেছে সকাল এগারোটায়। তারপর, চারটে পিরিয়ড শেষ হলে এই টিফিন ব্রেক। সুতরাং টিফিন ব্রেকের আগে টিফিন খাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাহলে অনুষ্কা এসব কী বলছে? ওর টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে!

'কখন টিফিন খেলে তুমি! আমাকে এত বোকা পেয়েছ!' বন্ধুত্বে ভরা মজার সুরে বলল ইলিনা, 'নাও, ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাও! আমার মা-মণি ভেজে দিয়েছে—।'

'না, মানে...আমার ঠিক খিদে নেই।' নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না...।'

অনুষ্কার মিষ্টি মুখে কাতর এক অনুনয় ফুটে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা আর কিছু বলতে পারল না। তবে একইসঙ্গে ওর মনে পড়ল এই ছ'দিনে অনুষ্কাকে ও কোনওদিন টিফিন খেতে দেখেনি। অর্থাৎ, অনুষ্কা টিফিন খাচ্ছে এমন দৃশ্য ওর চোখে পড়েনি।

মুহূর্তের মধ্যে খটকাটা ডিঙিয়ে ও ফ্রেঞ্চ টোস্ট টমেটো সস-এ ছুঁইয়ে কামড় বসাল। খেতে-খেতে প্রসঙ্গ পালটে চলে গেল রনিতা ম্যাডামের দিকে।

'রনিতা ম্যাডামকে তুমি আজ দারুণ টাইট দিয়েছ। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি ওই সাডেন অ্যাটাকের মুখে ওরকম ঠিক-ঠিক আনসার দিতে পারবে...।'

'উঁ।' বলে ছোট্ট একটা শব্দ করল অনুষ্কা।

'কী করে পারলে বলো তো!' ইলিনা বলেই চলল, 'ফ্যানট্যাস্টিক! তুমি যে ক্লাসে এত মনোযোগ দিয়ে শোনো সেটা তোমাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না...।'

অনুষ্কা শান্ত চোখে তাকাল ইলিনার দিকে। বলল, 'মনোযোগ দিতে হয় না। আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে...।'

ইলিনা ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় দিতে গিয়ে থমকে গেল।

'আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে' মানে?

সে-কথাই ও জিগ্যেস করল, ' ''আমাদের'' বলছ কেন? আমাদের মানে?'

চমকে উঠল অনুষ্কা। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'আমাদের মানে আমার। আমার এমনিতেই সব মনে থাকে...।' কথা শেষ করে হাসল।

ইলিনা অবাক চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। একে তো অপরূপ সুন্দরী, তার ওপর এত গুণ! বাব্বাঃ! এমনিতেই সব মনে থাকে!

ভগবানের ওপরে রাগ হল ইলিনার। একজনকে উজাড় করে সবকিছু দেওয়ার কী দরকার ছিল? মনে থাকার ব্যাপারটা তিনি যদি কাইন্ডলি ইলিনাকে দিতেন তা হলে পরীক্ষার রেজাল্টটা অনেক ভালো হতে পারত। বাপি আর মা-মণির কাছ থেকে রেগুলার বকাবকি শুনতে হত না।

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশটা আরও কালো হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ সেই কালোর ওপরে মাঝে-মাঝেই সাদা তরোয়াল ঘোরাচ্ছিল।

ইলিনা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে, ছুটির সময় ঠিক বৃষ্টি হবে। তুমি ছাতা এনেছ তো? আমি এনেছি...।'

অনুষ্কা হাসল : 'হ্যাঁ, এনেছি। ছাতা ছাড়া আমি চলতেই পারি না। তা ছাড়া বৃষ্টি আমার একদম ভালো লাগে না...।'

'কেন?'

বৃষ্টি পড়ছিল—তবে তেমন জোরে নয়। সেদিকে অপছন্দের চোখে তাকাল অনুষ্কা। বলল, 'পরিবেশবিদরা বলেন, বৃষ্টির জলে অ্যাসিড থাকে...।'

'যাঃ, সে তো রেয়ার! তোমার এটা ভুল ধারণা—।'

'ভুল ধারণা হোক আর যা-ই হোক, বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না...।'

মেঘের গর্জন শোনা গেল আকাশে।

তিন

স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান আর বেশি দূরে নেই—মাত্র দু-মাস বাকি। নাচ, গান, আবৃত্তি আর নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের যে-কোনও কালচারাল প্রোগ্রামে শম্পা ম্যাডাম আর কাকলি ম্যাডাম সবসময় দায়িত্ব নেন।

শম্পা ম্যাডাম বেশ লম্বা, খুব সুন্দর নাচতে পারেন। আর সবসময় মুখে হাসি।

কাকলি ম্যাডাম মাথায় খাটো। মোটাসোটা। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ফাটাফাটি। কিন্তু ওঁর ভীষণ ভূতের ভয়।

ইলিনাদের কালচারাল প্রোগ্রামের রিহার্সাল হয় ফেস্টিভ্যাল হলে। হলটা বিশাল বড়। ওলটানো 'ভি' অক্ষরের মতো টিনের চালে ঢাকা। অনেক সময় ছোটখাটো প্রোগ্রাম হলে এই হলঘরটাতেই সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান মানে ঘ্যাম ব্যাপার। তখন খেলার মাঠে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বাঁধা হয়।

গত বছর ইলিনারা ফেস্টিভ্যাল হলে সন্ধেবেলা গানের রিহার্সাল দিচ্ছিল। কাকলি ম্যাডাম ওদের 'চিত্রাঙ্গদা'-র গানগুলো তোলাচ্ছিলেন। তখন পাশের বাস্কেটবল গ্রাউন্ড থেকে অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে এসেছিল।

স্কুলের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডটা বড় মাপের, কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। তার চারপাশটা লোহার জালের উঁচু রেলিং-এ ঘেরা। যখন খেলা-টেলা থাকে না তখন গ্রাউন্ডে ঢোকার লোহার গেটটায় তালা দেওয়া থাকে। সেদিনও তাই ছিল। তবুও সেখান থেকে ভেসে আসছিল খটখট-খটখট শব্দ। যেন অনেকগুলো টগবগে ঘোড়া বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিটের মেঝেতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

এরপর ওদের গানের রিহার্সাল ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল।

ইলিনা স্কুলের কাজের মাসি আশাদির কাছে শুনেছে, এই স্কুলটাতে নাকি সাহেবি আমলে সৈন্যদের ছাউনি ছিল। স্কুলের বিশাল এলাকার নানান সব বিল্ডিং-এ সৈন্যরা থাকত। আর মেইন স্কুল বিল্ডিংটা ছিল হেস্টিংস সাহেবের কোয়ার্টার। একসময় হেস্টিংস রাজা চন্দ্রভানুকে এই বিশাল সম্পত্তি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দেন।

এই স্কুল ক্যাম্পাসে যে সন্ধেবেলা কখনও-সখনও ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হয় এমন দুর্নাম বরাবরই ছিল।

কখনও মাঠের বড়-বড় গাছপালার ফাঁকে আলোর ফুটকি দেখা যায়। সেগুলো খসে পড়া তারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

কখনও বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়।

একবার ক্লাস টেন-এর একটা মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে আর-একটা মেয়েকে নীচে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল—কিন্তু মেয়েটির পড়ার কোনও শব্দ শোনা যায়নি বা একতলায় ছুটে গিয়ে কোনও বডি পড়ে থাকতে দেখা যায়নি।

কিন্তু এতসব গুজব, রটনা কিংবা দুর্নাম থাকলেও স্কুলটা যে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ পড়াশোনা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুলের রেজাল্ট বরাবরই ঈর্ষা করার মতো।

আজ অ্যানুয়াল ফাংশানের গানের রিহার্সাল চলছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে একসঙ্গে বসিয়ে একটা গান তোলাচ্ছিলেন। পাশে বসেছিলেন শম্পা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। রবিনা ম্যাডাম খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন। ইলিনাদের প্রোগ্রামে সঞ্চালনা আর আবৃত্তির ব্যাপারটা তিনিই দেখাশোনা করেন। ম্যাডামের বয়কাট চুল আর মুখে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে বলে ওঁকে একটু রুক্ষ দেখায়। তবে ওঁর ব্যবহার খুব মিষ্টি আর দারুণ সাহস। একবার নাকি হেডমিসট্রেসের ভূতের ভয় তাড়াতে সন্ধে সাতটার সময় টর্চ ছাড়াই অন্ধকারে গোটা ক্যাম্পাসটা চক্কর দিয়ে এসেছিলেন।

রবিনা ম্যাডাম ইলিনাদের সবসময় বলেন, 'শোন, ভূত বলে কিছু নেই। আসলে তোরাই এক-একটা ভূত।'

তখন ক্লাসের আর-একটি মেয়ে, সজনী, ফোড়ন কেটে বলে উঠেছিল, 'ভূত না, ম্যাডাম—পেতনি...।' তাতে ক্লাসের সবাই হেসে উঠেছিল। আর রবিনা ম্যাডামও হাসি চাপতে পারেননি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘও ডাকছিল আপন খেয়ালে। হলের টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছিল। খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে পড়ছিল।

হলের মেঝেতে বিশাল মাপের তিনটে শতরঞ্চি পাতা। তার ওপরে সবাই বসেছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে গান তোলাচ্ছিলেন আর ইলিনারা দশ-বারো জন একটু দূরে বসে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় গল্পগুজব করছিল।

হঠাৎই ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওদের। মনে হল, বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিট বাঁধানো চাতালে যেন অনেকগুলো ঘোড়া এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ইলিনা চমকে উঠল। ওর মনে পড়ল, প্রায় বছরখানেক এই শব্দটা শোনা যায়নি।

শব্দটা যে কাকলি ম্যাডামও শুনতে পেয়েছেন সেটা বোঝা গেল। কারণ, তিনি গান থামিয়ে দিয়েছেন। আশা-আশঙ্কার চোখে রবিনা ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন ভূত তাড়াতে রবিনা ম্যাডামই একমাত্র ভরসা।

ইলিনার পাশে বসে ছিল সমর্পিতা—সম্পি। ওর দশাসই মোটাসোটা চেহারা, আর ডাকাবুকো বলে স্কুলে বেশ খ্যাতি আছে।

সমর্পিতা এমন লম্বা-চওড়া যে, স্কুল-ইউনিফর্ম পরে থাকলেও ওকে ইলিনাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় বলে মনে হয়। লেখাপড়া ছাড়া অন্য যে-কোনও কাজে ওর উৎসাহ অনেক বেশি। স্কুলের সবরকম অ্যাক্টিভিটিতে সম্পি সবার আগে হাজির। দিদিমণিদের কোনও ব্যক্তিগত কাজের জন্যেও ওর ডাক পড়ে। দিদিরা সবাই ওকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আর বন্ধুদের মতোই ওর বড় মাপের নামটাকে ছোট করে 'সম্পি' বলে ডাকেন।

ইলিনা সম্পির গায়ে ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী রে, কীসের আওয়াজ?'

সম্পি বলল হাত নেড়ে, 'ছাড় তো, ও কিছু নয়। ওই লাস্ট ইয়ারে যেমন শোনা গিয়েছিল। তারপর খোঁজ নিয়ে দেখবি হয়তো কাকু কিংবা মাসিদের কোয়ার্টারে কোনও ছেলেপিলে মেঝেতে নারকোলের মালা ঠুকে আওয়াজ করে খেলছে...।'

এটা ঠিকই যে, স্কুলের অনেক কর্মী—বলাইদা কিংবা আশাদির মতো—ক্যাম্পাসের মধ্যেই সংসার নিয়ে কোয়ার্টারে থাকে। টিনের চালে ছাওয়া ছোট-ছোট পাকা ঘরগুলোই ওদের কোয়ার্টার। ওদের কোনও ছেলেমেয়ে এই ভূতুড়ে কাণ্ড করতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলিনার তেমন ভরসা হচ্ছিল না।

যেন ওকে সাহস দিতেই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল। তারপর গটগট করে পা ফেলে এগিয়ে গেল খোলা জানলার দিকে।

কাকলি ম্যাডাম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সম্পি, কী করছ! যেয়ো না, যেয়ো না...।'

ম্যাডামের কথা সমর্পিতা শুনল না। জানলার কাছে পৌঁছে গেল। এবং ওর পিছু-পিছু রওনা হল ইলিনা, সজনী আর অঙ্গনা।

ভয় যে ওদের করছিল না তা নয়—কিন্তু কৌতূহলটাও কিছু কম ম্যাথাচাড়া দিচ্ছিল না।

রবিনা ম্যাডামের ভয়-টয়ের কোনও বালাই নেই। তিনিও কখন যেন ইলিনাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্য মেয়েরা তখন শতরঞ্চিতে বসে ভয় আর কৌতূহলের চোখে ইলিনাদের দিকে দেখছে।

জানলার বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার। আকাশে মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। তারই মধ্যে নজর চালিয়ে সম্পি ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে ঠিকই, কিন্তু সাদা আলোর দু-একটা বিন্দুও চোখে পড়ছে যেন। মাপে জোনাকি পোকার মতো, কিন্তু অনেক উজ্জ্বল। বিন্দুগুলো চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক ছিটকে বেড়াচ্ছে।

আকাশে গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকল। কিন্তু তাতে ঘোড়ার টগবগ শব্দ চাপা পড়ল না।

অঙ্গনা জিগ্যেস করল, 'ওই আলোগুলো কীসের? মনে হচ্ছে কারা যেন মিনি সার্চলাইট জ্বেলেছে।'

একইসঙ্গে ইলিনা টের পেল অঙ্গনা ওর গায়ের কাছে সরে এসেছে।

সমর্পিতা বলল, 'কীসের আলো সেটা গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।'

কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়ামের কাছে বসেছিলেন। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, না—যাওয়ার কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে দেখছ না!'

রবিনা ম্যাডাম জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, 'এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না—।'

এ-কথা শেষ হতে-না-হতেই সম্পি দৌড়ল হলের দরজার দিকে।

পিছন থেকে কাকলি ম্যাডাম, অঙ্গনা, ইলিনা সবাই 'সম্পি! সম্পি!' বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু সেসব ডাক সম্পির কানে বোধহয় ঢুকল না। ও ততক্ষণে হলের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

রবিনা ম্যাডাম আর দেরি করলেন না। সম্পির পিছন-পিছন দৌড়লেন। আর ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল ইলিনা আর সজনী।

বাইরেটা অন্ধকার, জলে ভেজা। সামনে পিচের রাস্তা, তারপর ছোট্ট একটা পার্কের মতো। এই পার্কে পতাকা তোলার ফাংশান হয়।

পার্কের চারপাশের রেলিং বেশ খাটো। ওরা দেখল, শর্টকাট করার জন্য সম্পি লাফিয়ে পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছে গেছে। ইলিনা আর রবিনা ম্যাডামরা পার্কটাকে পাশ কাটিয়ে সম্পিকে ধরার জন্য দৌড়ল।

পার্ক পেরিয়ে একটা সবুজ মাঠ। তারপর বাস্কেটবল গ্রাউন্ড। সম্পি সেখানে পৌঁছে কয়েক লহমা দাঁড়াল। তারপর রেলিং ঘিরে দৌড়তে যাবে তখনই রবিনা ম্যাডাম ওকে ধরে ফেলল। একটু পরেই ইলিনা আর সজনী সেখানে পৌঁছে গেল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের রেলিং উঁচু, তাই সেটা ডিঙোনোর প্রশ্ন ওঠে না। সেইজন্যই সম্পি বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভাবছিল এরপর কী করবে। তা ছাড়া ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা এখন আর শোনা যাচ্ছিল না।

কিন্তু সাদা আলোর বিন্দুগুলো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

স্কুল-ক্যাম্পাসের নানা জায়গায় পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। রাস্তার একপাশে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইটপোস্ট। তার ঝিমিয়ে পড়া আলো অন্ধকারের সঙ্গে অসম লড়াই করছে।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছিল আর হাঁপাচ্ছিল। তাকিয়ে ছিল খাঁ-খাঁ বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে। রাস্তার আলো সেখানে ছিটকে এসে পড়েছে। কংক্রিটে বাঁধানো গ্রাউন্ড বৃষ্টির জল পড়ে চকচক করছে।

রবিনা ম্যাডাম বললেন, 'এবার ফিরে চল। ওই ঘোড়ার খুরের শব্দ...ওটা হয়তো ভুল শুনেছি। তা ছাড়া ওটা শুধু শব্দ...ভয়ের কিছু নেই। তোদের কাকলি ম্যাডাম একটুতেই ভয়-টয় পায়। চল...।'

রবিনা ম্যাডামের কথার পিঠে সমর্পিতা বলল, 'সে না হয় বুঝলাম, ম্যাডাম। কিন্তু ওই আলোগুলো কীসের? এখন দেখছেন, ওগুলো কেমন এদিক থেকে ওদিকে লাফাচ্ছে!'

সত্যিই তাই। আলোগুলো এখন লাফিয়ে উঁচু থেকে নীচে নামছে, আবার নীচ থেকে লাফিয়ে ওপরে উঠছে। কখনও ওগুলো আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে।

রবিনা ম্যাডাম একটু ইতস্তত করলেন। বোধহয় ভাবলেন, ছাত্রীর কাছে সাহসের পরীক্ষায় তিনি হেরে যেতে চান না। তাই বললেন, 'চল তা হলে, একবার কাছ থেকে দেখে আসি...।'

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। সামনে বড়-বড় গাছপালা, আর তার পরেই বিশাল খেলার মাঠ। এই মাঠে খেলাধুলো ছাড়াও স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়। সেই মাঠটার একপাশে প্রায় তিনতলা সমান উঁচু একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে। ওই গাছটা দেখলেই ইলিনার ভয় করে। কারণ, অত বড় গাছটায় একটিও পাতা নেই। শুধু অসংখ্য শুকনো ডালপালা কঙ্কালের মতো আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেছে। হঠাৎ করে মনে হয়, কেউ যেন একশো হাতের পাঁচশো আঙুল আকাশের দিকে তুলে ভগবানের কাছে মুক্তি চাইছে।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ড পেরিয়ে গাছপালার গাঢ় অন্ধকার এলাকায় ঢুকে পড়ল ওরা। ইলিনার এবার বেশ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ওরা কোনও অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে।

গাছপালার পাতায় বৃষ্টি আটকালেও পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছিল। সজনী ইলিনার হাত চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, এইভাবে ওদের শরীরে আর মনে ভরসার আদানপ্রদান হচ্ছিল।

সমর্পিতা রবিনা ম্যাডামকে বলল, 'ওই দেখুন ম্যাডাম, আলোগুলো আরও কতটা দূরে...।'

'মনে হয়, ওই মরা গাছটার কাছে...।' রবিনা ম্যাডাম বললেন।

ওরা জলের ওপরে পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে এগোতে লাগল।

আরও অনেকটা এগোতেই ওরা দৃশ্যটা ঠিকঠাক দেখতে পেল। কারণ, সেই মুহূর্তেই আকাশে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে, আর বাজ পড়ার শব্দ কানে আসার আগেই ওরা শুনতে পেল খিলখিল হাসির শব্দ।

মরা গাছটা ইলিনাদের কাছ থেকে এখন অন্তত তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে। কিন্তু তার জন্য দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তিনটে প্রাণী ওই মরা গাছটার ডালে নানান উচ্চতায় উবু হয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছাতা। আর ছাতার নীচের অন্ধকারে দুটো করে সাদা আলোর চোখ জ্বলছে।

ওরা খিলখিল করে হাসছে আর বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এ-ডাল থেকে সে-ডাল লাফাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে ভিজে মাঠে নেমে আসছে, কখনও-বা মাঠ থেকে সোঁ করে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে ডালে। ওদের হাতে ধরা ছাতাগুলো অনেকটা প্যারাশুটের মতো লাগছে।

সজনী ভয়ে চাপা চিৎকার করে উঠতেই ইলিনা চট করে ওর মুখে হাত চাপা দিল।

রবিনা ম্যাডাম মরা গাছটার দিকে চোখ রেখেই ভয়ের গলায় জিগ্যেস করলেন, 'ওগুলো কী—মানুষ, না পশু?'

প্রশ্নটা কাকে লক্ষ্য করে সেটা বোঝা যায়নি বটে কিন্তু সমর্পিতা উত্তর দিল, 'ওগুলো মানুষ নয়, ম্যাডাম। মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু...।'

সেই 'খারাপ কিছু'-টা যে কী সেটা ওরা চারজন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল।

এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ওদের হাসির শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। তারপরই বাজ পড়ার বিকট শব্দে সেটা কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়ে গেল।

ইলিনারা অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেই অলৌকিক সার্কাস দেখতে লাগল।

সজনী কাঁপা গলায় বলল, 'ম্যাডাম, ফিরে চলুন। আমার...আমার ভয় করছে...।'

'ফিরে যাব কেন?' বকুনির সুরে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন রবিনা ম্যাডাম। আঁচলে জড়ানো হাতের মুঠোয় ধরা টর্চটা বের করে মাটির দিকে তাক করে জ্বেলে ধরলেন। টর্চের জোরালো সাদা আলোয় বৃষ্টি-ভেজা ঘাস আর পাতা চোখে পড়ল। রবিনা ম্যাডাম বললেন, 'আমরা চারজন আছি—ভয় কীসের! আমরা সবাই মিলে তাড়া করলে ওরা...মানে, ওই অ্যানিম্যালগুলো পালাবে।'

রবিনা ম্যাডামের কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা চমকে ওঠার মতো ঘটনা ঘটে গেল। সমর্পিতার ভেতরে কেউ যেন আচমকা সাহস এবং অ্যাকশনের সুইচ অন করে দিল। মেয়েটা 'অ্যাই, তোরা কে রে?' বলে কান-ফাটানো চিৎকার করে ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে মরা গাছটা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে 'চোর! চোর!' বলে চেঁচাতে লাগল।

রবিনা ম্যাডাম 'সম্পি! সম্পি!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে সেটাকে সামনে পিস্তলের মতো বাগিয়ে ধরে সম্পির পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করলেন। অবাক হয়ে ভাবলেন, মেয়েটা চেহারায় দশাসই হলেও বেশ জোরে ছুটতে পারে দেখছি!

রবিনা ম্যাডাম 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করছিলেন আর ইলিনাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন।

ইলিনা আর সজনী ভয় পেয়ে গেল। কারণ, ওদের দুই সাহসী সদস্য এখন আর ওদের পাশে নেই। তাই ওরাও রবিনা ম্যাডামকে লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল। আর একইসঙ্গে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করতে লাগল।

ওদের চারজনের চিৎকারে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকার আর বৃষ্টির জন্য ওরা ভালো করে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না।

সম্পিদের 'চোর! চোর!' চিৎকারে প্রাণীগুলো কিন্তু মোটেই ভয় পায়নি। বরং ওদের হাসাহাসি আর লাফালাফির খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্পি খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা লাফিয়ে মাটিতে নামল। তারপর হাসি বন্ধ করে মাথার ওপরে ছাতা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রবিনা ম্যাডাম সম্পিকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। শাড়ি পরে থাকলেও ওঁর অ্যাথলেটিক শরীর ওঁকে দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করছিল।

ঘোলাটে অন্ধকারে রবিনা প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সম্পি রবিনার তুলনায় খানিকটা এগিয়ে ছিল। কিন্তু ও-ও ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু গাঢ় কালচে তিনটে ছাতার নড়াচড়া বুঝতে পারছিল।

যদি ওরা প্রাণীগুলোকে ঠিকমতো দেখতে পেত তাহলে আর এগোত না।

এমন সময় আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরপর দু-বার।

সম্পিরা দেখতে পেল ওদের। সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাবুকো সম্পি আর রবিনা ম্যাডাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁদের চিৎকার থেমে গেল।

ছাতার নীচে তিনটে ফ্যাকাসে সাদা বিকৃত মুখ। চোখগুলো পুরোটা কালো—তাতে সাদা অংশ বলে কিছু নেই। শুধু মাঝখানে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। ওদের ঠোঁট জোড়া টুকটুকে লাল—যেন লিপস্টিকে রাঙানো। তিনজনেরই ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে। আর সেই ফাঁক দিয়ে ওদের দাঁত দেখা যাচ্ছে। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসানো ঝকঝকে ইস্পাতের দাঁত। দাঁতগুলো মাপে ছোট, কিন্তু অসংখ্য।

এরা কারা? কোথা থেকে এল এখানে?

বিদ্যুতের আলো নিভে গেল। চারপাশ আবার ছায়া-অন্ধকার।

রবিনা ম্যাডামের হাত থরথর করে কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতে তিনি টর্চের আলো ছুড়ে দিলেন একজনের মুখে। তারপর আর-একজনের। তারপর...।

আবার দেখা গেল সেই ভয়ংকর মুখ। আরও ভয়ংকর ওদের পোশাক।

একজনের পরনে রঙিন শাড়ি। আর অন্য দুজনের গায়ে স্কুল-ড্রেস। সবুজ স্কার্ট আর সাদা টপ। মাথায় জোড়া বিনুনি করে ফিতে বাঁধা।

টর্চের আলোয় সাদা টপে রক্তের দাগ চোখে পড়ল যেন।

সঙ্গে সঙ্গে সম্পি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

রবিনা ম্যাডামের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। ওঁর হাতে ধরা টর্চের আলোটা ভীষণ কাঁপছিল। তখনই বিদ্যুৎ চমকে উঠল আবার। তারপর কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বৃষ্টি আরও জোরে শুরু হল।

তিনটে মানুষ—কিংবা অমানুষ—আচমকা শূন্যে লাফ দিল। হাউইবাজির মতো ছিটকে চলে গেল দূরে।

তারপর আবার লাফ। আরও দূরে।

শেষে মিশে গেল অন্ধকারে।

এরকম লাফ মানুষ দিতে পারে না।

একটা অদ্ভুত 'গোঁ-গোঁ' শব্দ করে রবিনা ম্যাডাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ওঁর হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল দূরে।

সম্পি ওঁর শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়ে 'ম্যাডাম! ম্যাডাম!' বলে ডাকতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখল অনেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ফেস্টিভ্যাল হলের আলো আর সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের আলোর পটভূমিতে মানুষগুলোর ছায়া দেখা যাচ্ছে।

চার

পরদিন স্কুলে হইচই যেটা হল সেটার ধরনটা অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো।

মেয়েদের মধ্যে চাপা ফিসফাস, তর্কবিতর্ক চলতে লাগল। আর সমর্পিতাকে ঘিরে যত উত্তেজনা, যত আলোড়ন। ও যেন সাহসের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছে। ওকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি ভিড়। তারপর হালকাভাবে ঘেরাও হয়েছে ইলিনা, সজনী, আর রিহার্সালে হাজির থাকা বাকি মেয়েরা।

ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে কিংবা ক্লাসের মধ্যেই সম্পিকে একই কাহিনি বারবার বলতে হচ্ছে। অন্য মেয়েরা এক-একটা ক্লাসের পর পালা করে বসার জায়গা পালটে সম্পির পাশে গিয়ে বসছে। এইভাবে গতকাল রাতের ভয়ংকর কাহিনি ছড়িয়ে গেল প্রায় সব ক্লাসেই।

স্কুলের হেডমিসট্রেস মিসেস প্রীতি দত্ত বেশ রাশভারী মানুষ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ওঁকে খুব কম সময়েই হাসতে দেখা যায়।

তিনি সকাল থেকে প্রতিটি ক্লাসে ভিজিট করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি গুজব না ছড়ায়।

ইলিনাদের ক্লাসে হেডমিসট্রেস এলেন। তখন কাকলি ম্যাডামের বাংলা ক্লাস চলছিল। ছাত্রীদের লক্ষ করে বড়দি বললেন, 'শোনো, মেয়েরা। কাল রাতে যা হয়েছে, সেটা আমার কানে এসেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সিম্পলি একটা...মানে...অ্যাক্সিডেন্ট। একে তো রাত, তার ওপরে মেঘ-বৃষ্টি। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা হ্যালুসিনেশান...মানে, দেখার ভুল হতে পারে। তা ছাড়া রবিনার তো শরীর ভালো নয়—লো প্রেশারে ভোগে। তাই ও হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেছে...।

'যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কারও সঙ্গে আর আলোচনা কোরো না। বরং বেস্ট হবে, যদি তোমরা সবাই এই ইনসিডেন্টটা ভুলে যাও। তা না হলে কথার পিঠে কথা ছড়াবে...তারপর কোন সময় দেখবে পুলিশ আর টিভি চ্যানেলের লোকজন স্কুলে এসে হাজির হবে, আর হাজারটা কোয়েশ্চেন করে আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে খাবে। তা ছাড়া আমাদের স্কুলের একটা নামডাক আছে। সম্মান আছে।

'তা হলে মনে থাকবে তো? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়...রাতবিরেতে দেখার ভুল। বুঝলে?'

ক্লাসের সব মেয়ে একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'মনে থাকবে, বড়দি।'

কাকলি ম্যাডামও কাঁচুমাচু মুখে ঘাড় কাত করলেন।

হঠাৎই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল : 'বড়দি—।'

প্রীতি দত্ত ভুরু কুঁচকে বড়সড় চেহারার ছাত্রীটির দিকে তাকালেন।

ইলিনা আর সজনীর বুক দুরদুর করে উঠল। ওরা আঁচ করতে পারল সম্পি কী বলতে চলেছে। এই বোধহয় ও বড়দির বকুনি খেল!

'বড়দি, আমি কাল রাতে রবিনা ম্যাডামের সঙ্গে ছিলাম।'

'হ্যাঁ। জানি। তো?' ভুরুজোড়া আরও কাছাকাছি চলে এল।

'রবিনা ম্যাডাম...অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হইনি। আমি...সবটা নিজের চোখে দেখেছি—।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। রবিনা বলেছে। কিন্তু এখন আর কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি, ইলিনা আর সজনী বরং টিফিনের সময় আমার রুমে এসো—তখন সব শুনব, আর আমার যা বলার বলব।' চোখের চশমাটা ঠিকঠাক করে নাকের ওপরে বসালেন প্রীতি দত্ত : 'মোট কথা, এ-ব্যাপারে যেন একটা শব্দও বাইরে না যায়। আমাদের স্কুলের সুনামই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ কথা। বুঝেছ?' শেষ শব্দটায় ধমকের সুর আরও স্পষ্ট শোনাল।

সমর্পিতা বেশ দমে গেল। ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল। আর কোনও কথা না বলে ও গুম হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে একটা রাগ তৈরি হল। সবকিছু ও নিজের চোখে দেখেছে। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা ওকে 'দেখার ভুল' বলে মানতে হবে!

এটা ঠিকই যে, আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিল, অন্ধকার ছিল। কিন্তু বিদ্যুতের আলোও তো ছিল! তার সঙ্গে টর্চের আলো। তা ছাড়া ওদের চোখগুলো জ্বলছিল!

বড়দি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সজনী আর ইলিনা ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে সম্পির দু-পাশে এসে বসে পড়ল। তারপর চাপা গলায় ফুসুর-ফুসুর শুরু করল। টিফিনের সময় বড়দির মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কাকলি ম্যাডামের ক্লাসের দিকে ওদের আর মন রইল না।

সম্পি চাপা গলায় ইলিনাকে বলল, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি, দুজনের গায়ে আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস ছিল। আর-একজনের ছিল শাড়ি।'

সম্পিদের কাছ থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও স্কুল-ড্রেস-এর ব্যাপারটা ইলিনা আর সজনীরও নজরে পড়েছিল। তাই 'হুঁ' বলে ওরা দুজনে ঘাড় নাড়ল।

সম্পি বলল, 'তার মানে, দুজন আমাদের স্কুলেরই স্টুডেন্ট—নাইন অথবা টেন-এর...।'

ওর এ-কথা বলার কারণ, সিনিয়ার স্কুলের ক্লাস নাইন আর টেন-এর স্টুডেন্টদের ড্রেস সাদা টপ আর সবুজ স্কার্ট। ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত স্কুল-ড্রেসটা অন্যরকম—সাদা ফ্রক, সবুজ টিউনিক। আর জুনিয়ার স্কুলের বিল্ডিংও আলাদা, ড্রেসও আলাদা : সবুজ পাড় আর পাইপিং লাগানো সাদা ফ্রক।

সম্পি আবার বলল, 'আর শাড়িটা দেখেছিলি? ওটার রং ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি, তবে পাড়ের চওড়া ডিজাইনটা আমার মনে আছে...।'

'তাতে কী হয়েছে?' ইলিনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সম্পি ফিসফিস করে বলল, 'কাল ওই ডিজাইনের শাড়ি পরে আমাদের একজন ম্যাডাম স্কুলে এসেছিল...।'

ইলিনা আর সজনীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

কাল ওদের একজন ম্যাডাম সেই একই ডিজাইনের শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন? তারপর সেই ম্যাডাম অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে খেলার মাঠের ওই মরা গাছটার ডাল থেকে ডালে ছাতা মাথায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? এ কী সর্বনেশে ব্যাপার!

'তুই জানিস কে সেই ম্যাডাম?' উত্তেজনায় কেঁপে যাওয়া গলায় জানতে চাইল সজনী।

'হ্যাঁ, জানি।' দুষ্টুমির চোখে একে-একে ইলিনা আর সজনীকে দেখল সম্পি। তারপর : 'কিন্তু নামটা তোদের এখন বলব না। আমি চুপচাপ থেকে ক'টা দিন ওই ম্যাডামের ওপরে নজর রেখে দেখি। তারপর...।'

ইলিনা সম্পির দিকে তাকাল।

সম্পির ফোলা-ফোলা গাল, অথচ তা সত্ত্বেও চোয়ালের শক্ত রেখা বেশ স্পষ্ট। ক্লাসরুমের পাখা বনবন করে ঘুরছে, কিন্তু সম্পির গালে, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

দেখে মনে হচ্ছিল, সম্পি ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো ছানবিন করবে বলে শপথ নিয়েছে।

ইলিনার ভয়-ভয় করে উঠল। কারণ, কাল রাতের তিনটে প্রেতিনীর মড়ার মতো মুখ ও অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পেয়েছে। তা ছাড়া ওই খিলখিল হাসি!

ইলিনা আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করল, 'বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবি?'

'এসব কিচ্ছু বলব না। বলব আমি যা দেখেছি...।'

কথাটা সম্পি আর শেষ করল না। কারণ, ঠিক তখনই বাংলার ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

টিফিনের স্বতঃস্ফূর্ত হইচই আজ বেশ কম মনে হল। কারণ, গতকালের অদ্ভুত খবরটা ফিসফিসে প্রচারে অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে।

অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চোখ গেল ইলিনার। ও আজ আসেনি। সকাল থেকেই ইলিনার চোখ বারবার অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চলে যাচ্ছে। কেন কে জানে!

ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা তাড়াহুড়ো করে টিফিন খাওয়া শেষ করল। বড়দির ঘরে ডাক পড়েছে বলে তিনজনের বুক দুরদুর করছিল। ইলিনা ক্লাসরুমের বড় জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল। আকাশ

মেঘলা। তার সঙ্গে সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবে সেটা সম্পি, ইলিনা আর সজনী বেশ কয়েকবার চাপা গলায় রিহার্সাল দিল। সম্পি বারবার বলছিল, 'আমি যা দেখেছি সেটাই স্ট্রেটকাট বড়দিকে বলব। যা সত্যি, তাই। লুকোনোর কী আছে?'

ইলিনা আর সজনী ওকে বোঝাতে লাগল।

এ নিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনে প্রায় হাতে হাত ধরে বড়দির ঘরের দিকে রওনা হল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

একতলায় প্রীতি দত্তর বিশাল ঘর। ঘরের দু-পাশে দুটো করে জানলা। তাদের মাপ এত বড় যে, সাধারণ বাড়ির দরজাকেও হার মানায়। ডানদিকের খোলা জানলা দিয়ে স্কুলের লাগোয়া ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে। বাগান পেরোলেই চোখে পড়ছে খাটো পাঁচিল ঘেরা এলাকা—তার ভেতরে ছোট-ছোট সার্ভেন্টস কোয়ার্টার।

সময়ের আঁচড়ে ময়লা হয়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড মাপের সেক্রেটারিয়াট টেবিল। তার পিছনে বড়দি মুখ ভার করে বসে আছেন। টেবিলের ওপরে পেন স্ট্যান্ড, রাইটিং প্যাড, একটা মোবাইল ফোন, আর রাজ্যের খাতাপত্র ছড়ানো। টেবিলের একপাশে একটা পুরোনো মডেলের কম্পিউটার। আর বড়দির সামনে একটা গোলাপি রঙের কোঁচকানো রুমাল, তার পাশে একটা প্লাস্টিকের চাকতি দিয়ে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

বড়দির মুখোমুখি চারটে হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ার। চারটেই খালি। চেয়ারের পিঠ ধরে ইলিনারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড়দির কথার অপেক্ষা করতে লাগল।

মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা ঢাউস সিলিং ফ্যান 'ক্যাঁচক্যাঁচ' শব্দে ঘুরছিল। সেই বাতাসের ঝাপটায় ট্যালকাম পাউডারের হালকা গন্ধ ওদের নাকে আসছিল। আর বড়দির গলায় পাউডারের ছোপ চোখে পড়ছিল।

প্রীতি দত্ত ঠান্ডা চোখে সম্পির দিকে তাকালেন। অন্তত দশ সেকেন্ড স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন—যেন ওকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছেন।

তারপর অতিরিক্ত মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সমর্পিতা...তাই তো নাম তোমার?'

সম্পি চুপচাপ মাথা নাড়ল। যার মানে, হ্যাঁ।

'...এবার বলো তো, কাল রাতে তুমি ঠিক কী দেখেছ?'

ইলিনা বড়দির শাড়িটা লক্ষ করছিল। আজ বড়দি একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে এসেছেন। চওড়া পাড়ে গাঢ় সবুজ রঙের নকশা তোলা। হালকা সবুজ জমির ওপরে গাঢ় সবুজের কলকা বোনা।

'মনে হয়...মনে হয়...' মেঝের দিকে তাকিয়ে আঙুল খুঁটতে লাগল সম্পি। বারকয়েক হোঁচট খেয়ে বলল, 'মনে হয়...মনে হয় আমি...ভুল দেখেছি, বড়দি। ওই অন্ধকার, মেঘ, তার ওপরে বৃষ্টি...।'

ইলিনা আর সজনী অবাক চোখে সমর্পিতার দিকে তাকাল।

এসব কী বলছে সম্পি? একটু আগেই না বলছিল, একজনের শাড়ির পাড়ের ডিজাইনটা ও লক্ষ করেছে! গতকাল একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন। সেই ম্যাডামের ওপরে ও নজর রাখছে। এবং যা সত্যি তাই বলবে বড়দিকে।

তা হলে?

ইলিনা আর সজনীকে আরও অবাক করে দিয়ে সম্পি বড়দিকে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বড়দি। কাল রাতে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। মানে, ব্যাপারটা মনে হয় আমার দেখার ভুল। মানে...ওই

যে আপনি বললেন না...হ্যালু...।'

'হ্যালুসিনেশান।' একগাল হেসে ওকে কথাটা ধরিয়ে দিলেন প্রীতি দত্ত, 'এই তো ভালো মেয়ের মতো কথা। গুড গার্ল।' এবার তিনি ইলিনা আর সজনীর দিকে তাকালেন : 'তোমরা কিছু বলবে?'

অবাক ভাবটা কাটিয়ে ইলিনা আর সজনী একইসঙ্গে মাথা নাড়ল : 'না, বড়দি, আমরা কিছুই দেখতে পাইনি—।' ওরা তখনও আড়চোখে বারবার সম্পিকে দেখছিল।

'গুড।' খুশির গলায় বললেন প্রীতি। তারপর স্নেহমাখা মোলায়েম গলায় আরও বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়েছ। স্কুলের ভালোমন্দ অনেকটাই বুঝবে। জানো, সুনাম তৈরি করতে বহু বছর লেগে যায়! কিন্তু দুর্নাম?' একটু থামলেন। তারপর : 'দুর্নাম হওয়ার জন্যে একটা দিনই যথেষ্ট। আসলে...।'

বড়দির বক্তব্যের স্রোতে বাধা পড়ল। কারণ, মলিনাদি ঘরে এসে ঢুকল।

মলিনাদি বড়দির খাসবেয়ারা। তা ছাড়া ক্লাসে-ক্লাসে নোটিস নিয়ে যায়।

মলিনাদি বেশ মোটাসোটা। রং কালো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা—তার একটা ডাঁটিতে তাপ্পি লাগানো।

ইলিনারা লক্ষ করল মলিনাদি বেশ হাঁপাচ্ছে, আর চোখগুলো গোল-গোল।

'কী হয়েছে, মলি?' কথা থামিয়ে প্রীতি দত্ত প্রশ্ন করলেন।

বড়-বড় শ্বাস টেনে-টেনে মলিনা বলল, 'বলাইদার ছেলে...বলাইদার ছেলে...পরান...পরান...।'

'কী হয়েছে পরানের? কী হয়েছে?' বড়দি প্রশ্ন করতে-করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'পরান...পরান মারা গেছে গো, দিদি, মারা গেছে!' এ-কথা বলেই মলিনা চাকরিজীবনে কখনও যা করেনি তাই করে বসল। বড়দির সামনেই ধপাস করে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল এবং বুকে দু-হাত চেপে উত্তেজনাটাকে সামাল দিতে চেষ্টা করল।

মলিনার অসংলগ্ন কথা থেকে প্রীতি দত্ত অনেক কষ্টে গোটা গল্পটা উদ্ধার করলেন।

স্কুলের ঘণ্টা বাজায় যে-বলাইদা, সে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে।

তার বয়েস অনেক। মাথার মাঝখানে টাক। তার চারদিকে সাদা ঝালরের মতো চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। খানিকটা কুঁজো হয়ে থাকা বৃদ্ধ শরীর। ধীরে-ধীরে হাঁটা-চলা করে। কিন্তু বলাইদার ঘণ্টা বাজানোর জোর অবাক করে দেওয়ার মতো।

সেই বলাইদার জোয়ান ছেলে পরান কাছাকাছি একটা রেশন-দোকানে চাকরি করে। অনেক সময় হিসেবনিকেশের চাপে পরান রাতে সেই দোকানেই থেকে যায়। কাল রাতেও সেরকম কিছু একটা হয়েছে বলে বলাইদারা ভেবেছিল। কিন্তু আজ সকালে পরান না ফেরায় বলাইদারা অপেক্ষা করে-করে শেষ পর্যন্ত বেলায় পরানের খোঁজ করতে সেই দোকানে যায়। গিয়ে শোনে, গতকাল রাতে পরান বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ও দোকান থেকে শুধু একটা পলিথিনের প্যাকেট নিয়েছিল।

তখন বলাইদারা পাগলের মতো পরানের খোঁজ করতে থাকে। হাসপাতালে, থানায়, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে—সব জায়গায়।

কিন্তু পরানকে পাওয়া যায়নি।

তারপর, একটু আগে, কোয়ার্টারের একটা বাচ্চা ছেলে স্কুলের পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে 'ছোট বাইরে' করতে গিয়ে পরানের ডেডবডি দেখতে পায়।

চারটে বড়-বড় আমগাছ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের মাঝে বৃষ্টির জলে ভেজা আগাছা আর ঘাস-পাতার ওপরে পরানের দেহটা পড়ে ছিল। ওর মাথাটা ছিল একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢাকা।

বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে না পেরে 'পরানদা, পরানদা—' বলে পলিথিনের প্যাকেটটা ধরে টান মারে। জলে ভেজা প্যাকেটটা খুলে আসতেই পরানের ফ্যাকাসে মুখটা দেখা যায়।

পরানের গায়ের রং শ্যামলা হলেও দেখা গেল, ওর সারাটা শরীর সাদাটে, রক্তশূন্য। চোখ দুটো বড়-বড়, যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর ঘাড়ে-গলায় চার-পাঁচ জায়গায় গভীর ক্ষতের দাগ। সেখানে কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এসব কথা শুনে প্রীতি দত্তের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মলিনাদি বলল, সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের কারা যেন বড়দির পারমিশান না নিয়ে এর মধ্যেই পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছে।

ইলিনা, সম্পি আর সজনী ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিল। পরানের মৃতদেহের যে-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মলিনাদি দিয়েছে তাতেই ওরা রক্তশূন্য ছাইরঙা ডেডবডিটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল।

প্রীতি দত্ত টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে দু-ঢোঁক জল খেলেন। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নেওয়ার পর কিছুটা সামলে উঠলেন। তারপর তড়িঘড়ি সম্পিদের বিদায় দিলেন। আপনমনেই বললেন, 'কী-সর্বনাশ! মনে হচ্ছে, স্কুল ক'দিন ছুটি দিতে হবে...।'

মলিনা ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'আমি বডিটা স্বচক্ষে দেখে এলুম, দিদি। এ একেবারে অপঘাতে মিত্যু। নিঘঘাৎ ডাকিনি-পিশাচের কাজ। সারা শরীরটায় রক্ত নেই। একেবারে সাদা। এবারে কী হবে, দিদি?'

মলিনার আর্ত আবেদন বড়দির কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না। তিনি তখন টেবিল থেকে মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিয়েছেন। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে মলিনার উচ্চারণ করা মারাত্মক দুটো শব্দ নিয়ে ভাবছেন।

এই স্কুলে ডাকিনি আর পিশাচ এল কোথা থেকে?

.

পাঁচ

তিন দিন স্কুল ছুটি দেওয়া হল। তার সঙ্গে রবিবার জুড়ে গিয়ে চার দিন। সেই চারদিনে পুলিশি তদন্ত মোটামুটি একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু পরানের দেহের রক্তশূন্যতার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। পুলিশের রিপোর্টে হায়েনা, গোসাপ কিংবা বড়সড় কোনও বেজির আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বলা হল—যদিও পুলিশের লোকজনের কাছে প্রচুর প্রশ্নচিহ্ন থেকে গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা যাতে কম হয় সেইজন্য প্রীতি দত্ত পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে শুধু রবিনা ম্যাডামের কথা বলেছেন। বলেছেন, সেই রাতে ওইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানা রবিনা ম্যাডাম একা দেখেছেন—ছাত্রীরা কেউ দেখেনি। তাই ইলিনারা পুলিশের জেরা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

সোমবার স্কুলে গিয়ে স্কুলটাকে নতুন চোখে দেখতে চাইল ইলিনা।

আজ বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘের চেহারা অনেক ফিকে। কিন্তু সেই রাতের ঘটনাটা চোখের সামনে থেকে কিছুতেই সরে যাচ্ছে না।

কালো মেঘ। লিকলিকে শাখা-প্রশাখা ছড়ানো মরা গাছ। অন্ধকার রাত। আর সেই উজ্জ্বল আলোর চোখ।

ঘটনার পরদিন সকালে স্কুলের দিকে আসার সময় মরা গাছটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ইলিনা। ওটার চারপাশে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নজর বুলিয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতের ওই ঘটনার কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তা সত্ত্বেও ওর গা ছমছম করছিল।

তারপর, পরানের অপঘাতে মারা যাওয়ার খবরটা পাওয়ার পর, ওর মনে হয়েছে, ওই ‘খারাপ’ প্রাণীগুলো কখনও চিহ্ন রেখে যায় না।

আজ সকালেও স্কুলে আসার সময় দূর থেকে ওই মরা গাছটার দিকে ইলিনা তাকিয়ে থেকেছে। আর তখনই এক অদ্ভুত শিরশিরানি টের পেয়েছে শরীরে।

আজ ক্লাসে ঢুকে অনুষ্কাকে দেখতে পেয়ে ওর খুব ভালো লাগল। সুন্দর টলটলে মুখটি নিয়ে চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে আছে। ওর মুখের ডানপাশে জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় ওকে কেমন যেন স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকা এক রূপসী।

অনুষ্কার দু-পাশে রেখা আর সঞ্চিতা বসে। দুজনের মধ্যে রেখার সঙ্গে ইলিনার রিলেশানটা বেটার। তাই ও রেখাকে বলে বসার জায়গা অদলবদল করল। পিঠের ব্যাগ হাতে নিয়ে অনুষ্কার পাশের ডেস্কে বসে পড়ল।

‘অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।’ ইলিনা হেসে বলল।

‘স্কুল তো ছুটি ছিল। তা ছাড়া সেই বাজে দিনটায় আমি তো আসিনি...তার পরের দিনও আসিনি।’

না এলেও অনুষ্কা ফোনে-ফোনে সব ঘটনাই জেনে গেছে। বড়দি যতই বারণ করে থাকুন, এই ভয়ংকর বিচিত্র ব্যাপারটা নিয়ে চাপা কথাচালাচালি মোটেই বন্ধ হয়নি।

ইলিনাও এই ছুটির মধ্যে অনুষ্কাকে ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে ইলিনার মনে হয়েছিল অনুষ্কা যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

ক্লাস শুরু হতে এখনও সাতমিনিট বাকি। তাই গোটা ক্লাসে ভোমরার গুনগুন চলছিল। ইলিনা অনুষ্কার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, ‘জানো, আমার না এখন স্কুলে আসতে ভয় করে...।’

‘কেন?’ অনুষ্কা ভুরু তুলে তাকাল।

‘ওই রাতটার কথা বারবার মনে পড়ে...।’

অনুষ্কা একটা হাত রাখল ইলিনার হাতে। ওর ছোঁয়া ইলিনার ভালো লাগল। সেই ছোঁয়ায় কেমন যেন একটা ভরসা ছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, ‘আজ ছুটির পর তুমি বরং আমার বাড়িতে চলো। বাপি গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে আসবে। তারপর বাড়িতে গিয়ে আমরা অনেক গল্প করব। সময়টা দারুণ কাটবে। তুমি—।’

‘তোমার কোনও প্রবলেম হবে না তো!’ ইলিনা কথাটা বলল বটে, কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সেই প্রথম দিন থেকেই ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে। আর আজ অনুষ্কা নিজে থেকেই ওকে ওর বাড়িতে যেতে বলছে! এই প্রথম।

‘না, না, প্রবলেম কীসের!’ অনুষ্কা তাড়াতাড়ি বলল, ‘আমিই তো তোমাকে আসার জন্যে রিকোয়েস্ট করছি।’

‘কিন্তু বাড়িতে ফোন করে একটু বলতে হবে—নইলে মা ভীষণ টেনশান করবে।’

স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা শুধু নয়, সঙ্গে করে নিয়ে আসাটাই বারণ। এ নিয়ে গত বছরে একটা বড়সড় গোলমাল হয়েছিল। সুতরাং ইলিনার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। ওদের কারও কাছে সেলফোন নেই। মা-কে ফোন করে খবরটা দেবে কেমন করে!

ওর মনের কথা অনুষ্কা বোধহয় টের পেল। বলল, ‘তোমার কোনও চিন্তা নেই। বাপির সঙ্গে মোবাইল থাকে। ছুটির পর বাপির ফোন থেকে তুমি আন্টিকে ফোন করে দিয়ো। তার সঙ্গে বোলো, আন্টি যেন তোমার ফেরার চিন্তা না করেন। বাপি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসবে—অবশ্য বাপির সঙ্গে আমিও থাকব।’ হেসে কথাটা শেষ করল অনুষ্কা। কিন্তু তারপরই হঠাৎ চাপা গলায় বলল, ‘আমার বাড়িতে যাচ্ছ এ-কথাটা কাউকে এখন বোলো না...প্লিজ...।’

'বলব না।' মাথা হেলিয়ে বলল ইলিনা। ভাবল, অনুষ্কাটা এত মুখচোরা কেন কে জানে! তা ছাড়া ওর বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন করারই বা কী আছে?

ইলিনার একটু অবাক লাগছিল। যে-অনুষ্কা সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করার ব্যাপারটা সবসময় এড়িয়ে চলে সে হঠাৎ ইলিনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করছে! এ-ক'দিনে ও হঠাৎ পালটে গেল কেন?

সে যাই হোক, ইলিনার মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। আর তখনই স্কুলের প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

একটার পর একটা ক্লাস পেরিয়ে সময়টা ক্রমশ বিকেলের দিকে গড়াতে লাগল, আর ইলিনার উৎফুল্লতা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল।

টিফিনের সময় অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ইলিনা বুঝল, এমনিতে সবাই চুপচাপ থাকলেও পরানের ব্যাপারটা নিয়ে ভালোরকম ফিসফাস কানাকানি হচ্ছে।

খবরটা কোনও নিউজ চ্যানেলে দেখায়নি কিংবা কাগজেও ছাপেনি। হয়তো প্রীতি দত্তের অনুরোধে কিংবা প্রভাবে পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে আর মিডিয়া হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। কিন্তু 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' বসে থাকেনি।

টিফিনের সময় ইলিনা একা-একাই টিফিন খেল। ওর শত অনুরোধেও অনুষ্কা ওর টিফিন শেয়ার করল না। বারবার সুন্দর করে হেসে বলল, 'আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া আমার চট করে খিদে পায় না।'

ইলিনার বেশ খটকা লাগলেও কিছু বলল না।

ছুটির সময় যতই এগিয়ে এল আকাশ ততই কালো হয়ে উঠল। মেঘও ডেকে উঠল দু-চারবার। অনুষ্কা অপছন্দের মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বর্ষাকালটা খুব বিচ্ছিরি। আমার ভাল্লাগে না।'

ইলিনা ওর দিকে তাকাল শুধু—কিছু বলল না।

সাড়ে চারটের সময় ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এল একতলায়। গাড়িবারান্দার বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকাল। মেঘের যা চেহারা তাতে মনে হচ্ছে জলকণার ভারে মেঘের দল কাবু হয়ে পড়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে মেঘের চাদর ফুঁড়ে জলের ধারা নীচে নামবে, পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে।

অনুষ্কা ইলিনার হাত ধরে টান মারল : 'শিগগির চলো। বাপি গাড়িটাকে ওপাশটায় দাঁড় করায়—।'

পিচের রাস্তা ধরে ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালাল। অন্য মেয়েরাও চটপট এগিয়ে চলেছে মেন গেটের দিকে। কেউ-কেউ আবার ছুটছে। নিউ কাটের খটখট শব্দে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের ভূতুড়ে ঘোড়সওয়ারদের কথা মনে পড়ে গেল ইলিনার।

পিচের রাস্তার বাঁ-দিকটা বলতে গেলে জঙ্গলে ঢাকা। আগাছার জংলা ঝোপ, আর তার মাঝে-মাঝে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। গাছের পাতার আড়াল থেকে কোকিল ডাকছে। দুটো ফিঙে ঘূর্ণি নাচের ভঙ্গিতে উড়ছে। বোধহয় উড়ন্ত পোকামাকড় ধরছে। একটা কাঠবিড়ালি একটা বড় গাছের ডালে বসে ইলিনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে সামান্য ছুতোয় ছুটে পালানোর জন্য সে বেশ তৈরি বলেই মনে হল। মেঘলার জন্য ঘোলাটে ছায়া থাকলেও কাঠবিড়ালিটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অনুষ্কা কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে আকাঙ্ক্ষার আলতো ছোঁয়া দেখতে পেল ইলিনা। জিগ্যেস করল, 'কাঠবিড়ালি তুমি ভালোবাসো?'

অনুষ্কা চমকে ঘুরে তাকাল : 'দারুণ ভালোবাসি।'

‘তা হলে ধরে নিয়ে চলো—পুষবে।’

কথাটা ইলিনা খুব হালকাভাবেই বলেছিল। কিন্তু ওর কথা শেষ হতে না হতেই অনুষ্কা একটা আজব কাণ্ড করে বসল।

রাস্তা ছেড়ে পলকে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে। এবং কাঠবিড়ালিটাকে লক্ষ্য করে শূন্যে লাফ দিল।

কাঠবিড়ালিটা আর দেরি করেনি। অনুষ্কা তাকে তাক করে লাফানো মাত্রই সে গাছের ডাল বেয়ে সড়সড় করে আরও ভেতরদিকে ছুটে গেল।

কিন্তু অনুষ্কাও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। ও-ও তৎপর ভঙ্গিতে লাফের পর লাফ মেরে আগাছা আর গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ইলিনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিঠে স্কুল-ব্যাগের বোঝা চাপানো অবস্থায় অনুষ্কা যে-স্পিডে কাঠবিড়ালিটাকে তাড়া করল তাতে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, অনুষ্কা যেন লং জাম্প আর ট্রিপল জাম্পে তুখোড় কোনও অ্যাথলিট।

অনুষ্কার ব্যাপারটা আরও দু-চারজন মেয়ের চোখে পড়েছিল। তারাও মজা দেখার লোভে ইলিনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আগাছার ঝোপ আর গাছের পাতা নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু মেঘলা ছায়াতে অনুষ্কাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর সাদা টপের ঝলক দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরেই অনুষ্কা গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। ওর স্কার্ট আর টপের এখানে-সেখানে গাছের পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটা কাঠবিড়ালি। চিঁ-চিঁ করে ডাকছে।

ইলিনা তো অবাক। ছুটে গিয়ে কেউ কাঠবিড়ালি ধরেছে, এমনটা ও কখনও শোনেনি। আর অনুষ্কার ক্ষিপ্রতা কোনও শিকারি চিতাকেও হার মানাবে!

অবাক হল বাকি সব মেয়েরাও। ওরা অনুষ্কাকে ঘিরে কাঠবিড়ালি দেখতে লাগল।

অনুষ্কা বাঁ-হাতে স্কার্ট ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, ‘কী কিউট, না? এটা আমি পুষব।’

ইলিনা বলল, ‘বাব্বা, তোমার কী স্পিড! স্পোর্টসে নাম দিলে তুমি অনেক প্রাইজ পাবে।’

অনুষ্কা হাসল শুধু—কোনও কথা বলল না।

এমন সময় মেঘ ডাকল আবার। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্কা যেন শক খেয়ে চমকে উঠল। ‘শিগগির চলো—বৃষ্টি পড়ছে’ বলে পিচের রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

অন্য মেয়েগুলো একটু অবাক হয়ে গেল। এ-বৃষ্টি ভেজার মতন কিছু নয়। তাই অনুষ্কার দৌড়টা ওদের বেখাপ্পা মনে হল। আর ইলিনার মনে পড়ে গেল প্রথম দিন আলাপের সময় অনুষ্কা বলেছিল, ‘...বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না...।’

ইলিনা একটুও দেরি না করে অনুষ্কার পিছন-পিছন দৌড়ল।

দূরে মরা গাছটা দেখা যাচ্ছে। সেই রাতের দৌড়টার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

পিচের রাস্তা ধরে বাঁ-দিকে বাঁক নিতেই সার বেঁধে পার্ক করা কয়েকটা প্রাইভেট কার চোখে পড়ল। তার পাশে হলদে রঙের তিনটে স্কুলবাস।

একটা সাদা গাড়ির সামনে বড় একটা ছাতা মাথায় দিয়ে সুপুরুষ একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, আর মুখে একগাল হাসি। ওঁকে দেখতে এত সুন্দর যে, স্রেফ দেখেই বোঝা যায় উনি অনুষ্কার বাবা।

ছুটন্ত অনুষ্কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর একইসঙ্গে গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে ধরলেন। ইলিনা লক্ষ করল, গাড়ির জানলায় টিন্টেড গ্লাস লাগানো।

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অনুষ্কা বলল, ‘বাপি, ও ইলিনা—আমার ক্লাসমেট...আমার খুব বন্ধু। ও আমাদের সঙ্গে এখন যাবে—।’

‘তাই?’ চওড়া করে হাসলেন অনুষ্কার বাপি : ‘গুড—ভেরি গুড। এসো, এসো—উঠে পড়ো গাড়িতে। বৃষ্টিতে ভিজো না।’ পিছনের একটা দরজা খুলে ইলিনাকে গাড়িতে ওঠার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ইলিনা গাড়িতে উঠে পিঠের স্কুল-ব্যাগটা খুলে সিটের ওপরে রাখতেই বাপি দরজাটা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলেন। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময় ছোট্ট কাঠবিড়ালিটা বাপিকে দেখাল অনুষ্কা।

‘এই দ্যাখো, বাপি, এই কাঠবিড়ালিটা স্কুলের বাগান থেকে ধরেছি। এটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুষব...।’

কাঠবিড়ালিটা তখন কিচকিচ করে শব্দ করছে, ওর কালো চোখের তারা চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক দেখছে।

কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাপি। তারপর জোরে হেসে বললেন, ‘ওটা আগেই আমি দেখেছি। বাঃ, গুড—ভেরি গুড। কিন্তু কত কিছুই তো তুমি পুষবে বলে ধরে আনো। তারপর কতটুকু কী পোষা হয় তা তুমি ভালোই জানো!’ মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে কী এক গোপন রসিকতায় হেসে উঠলেন। তারপর একপলক ইলিনাকে দেখে নিলেন।

কাঠবিড়ালিটার গায়ে একবার আদরের হাত বুলিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করলেন বাপি।

অনুষ্কা বলল, ‘বাপি, তোমার ফোনটা দাও। ইলিনা ওর বাড়িতে একটা ফোন করবে—নইলে ওর মা-বাবা চিন্তা করবে...।’

‘ওহ শিয়োর—এই নাও।’ জামার বুকপকেট থেকে রুপোলি রঙের একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন বের করে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অনুষ্কা আর ইলিনা চটপট বোতাম টিপে ফোনের কাজটা সেরে নিল।

গাড়ির ভেতরে একটা অদ্ভুত পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল ইলিনা। মনে হচ্ছিল, মিহি দারচিনি গুঁড়ো কেউ বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে।

এই গন্ধটা ও অনুষ্কার কাছে কখনও পায়নি। তা হলে কি ওর বাপি এরকম অফবিট পারফিউম লাগিয়েছেন? নাকি এটা স্পেশাল টাইপের কোনও কার পারফিউম?

অনুষ্কার বাপি গাড়ি চালাতে-চালাতে নানান বিষয়ে বকবক করছিলেন আর মাঝে মাঝেই হেসে উঠছিলেন। তবে ওঁর বেশি আগ্রহের বিষয় যে সিনেমা আর নাটক সেটা বোঝা যাচ্ছিল। গল্প করার ফাঁকে তিনি থেকে-থেকেই বলছিলেন, ‘এই তো, এসে গেলাম...।’

গাড়ি নানান রাস্তা ধরে চলছিল। ইলিনা কোনও রাস্তাই চিনতে পারছিল না। অবশ্য ওর চেনার কথাও নয়। ওর শুধু মনে হচ্ছিল, অনুষ্কা ওর ‘বেস্ট ফ্রেন্ড’ হতে চলেছে। আর সেই চিন্তাটা ওর মনে খুশির বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরেই গাড়ি যে-বাড়িতে এসে ঢুকল সেটা মাপে ছোট হলেও অনায়াসে তাকে বাগানবাড়ি বলা যায়। কারণ, অবহেলায় ফেলে রাখা বাগানের একপাশে একটা ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ি আর বাগান জং ধরা রেলিঙে ঘেরা। তার কোথাও-কোথাও এমনভাবে ভাঙা যে, কুকুর-বেড়াল কি অন্যান্য ছোট প্রাণী সহজেই ঢুকে পড়তে পারে।

বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের, তবে সদ্য রং করা হয়েছে। সেই রংটা গরিব পথশিশুর গায়ে ঝকঝকে নতুন জামা-প্যান্টের মতো দেখাচ্ছে।

বাড়ির ছাদের কার্নিশে অনেক গোলাপায়রা বসে আছে। মাঝে-মাঝে পায়রাগুলো এদিকে-ওদিকে উড়ে যাচ্ছে।

আকাশ মেঘে-মেঘে কালো। বৃষ্টি এখন নেই, কিন্তু যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে।

গাড়ি বাড়ির কাছে গিয়ে থামল। ওরা তিনজনে নেমে বাড়িতে ঢুকল। অনুষ্কার হাতে ধরা কাঠবিড়ালিটা তখনও কিচকিচ করে শব্দ করছে।

বাড়িতে ঢোকার সময় অনুষ্কার বাপি ইলিনাকে বললেন, 'ওয়েলকাম, ইলিনা—ওয়েলকাম টু আওয়ার লিটল হাউস। যাও, অনুষ্কার সঙ্গে ওপরে যাও। ওর ঘরে বসে গল্প করো, টিভি দ্যাখো, চুটিয়ে আড্ডা মারো—এনজয় করো...।' একটু থেমে অনুষ্কার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা গলায় বললেন, 'দাও, ওটা আমাকে দাও। জায়গামতো রেখে দিই...।'

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে কাঠবিড়ালিটা বাপির হাতে দিল। ওটার মাথায় ছোট্ট করে হাত বুলিয়ে বাপি বললেন, 'সুইট স্কুইরেল...।'

এই কথা বলে বাপি একতলার একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। আর ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বলে ইলিনা রঙের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দারচিনির মিষ্টি গন্ধটাও ওর নাকে আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাড়িটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল ইলিনা। ছিমছাম সাজগোজে বাড়িটাকে যথেষ্ট আধুনিক করার চেষ্টা হয়েছে।

দরজা-জানলায় ভারী পরদা, দেওয়ালে ওয়াল হ্যাঙার, সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ পেইন্টেড পট।

এসব দেখতে-দেখতে অনুষ্কার ঘরে পৌঁছে গেল ইলিনা।

অনুষ্কা আলো জ্বালতেই ঘরটা চোখের সামনে প্রকাশিত হল।

একটা আলমারি, বুককেস, এল. সি. ডি টিভি আর পড়াশোনার টেবিল। তার পাশে কম্পিউটার টেবিল। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে পাতা সিঙ্গল খাট। তার বিছানার রঙিন চাদর এলোমেলো। তার ওপরে পড়ে আছে একটা বড়সড় হেডফোন।

বিছানার একটু ওপরে দেওয়ালে জন আব্রাহাম আর মাইকেল জ্যাকসনের বিশাল পোস্টার। তার পাশেই একটা অন্যরকম ডিজিটাল প্রিন্ট।

এই অন্যরকম ছবিটায় দেখা যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্না ধোওয়া প্রান্তরে—একটা বিশাল প্রাসাদ—অতিকায় ডাইনোসরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাসাদের একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে—বাকিটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

সেই ছবিটার পাশে একটা ছোট কাগজ দেওয়ালে সেলোটেপ দিয়ে লাগানো। তাতে লাল কালিতে একটা প্রতীক চিহ্ন আঁকা : একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ, তাদের লেজের ডগা দুটো জড়াজড়ি করে আছে। এই ছবিটা ইলিনা আগে অনুষ্কার খাতায় দেখেছে।

হেডফোনটা ছুড়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অনুষ্কা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানার কোণে রাখল। তারপর ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল, ইলিনাকেও বসতে বলল।

ইলিনা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানায় নামিয়ে রাখল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। কিন্তু বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছিল ফুল আর সাপের ছবিটার দিকে।

ইলিনা স্বপ্নেও ভাবেনি হঠাৎ করে এরকমভাবে অনুষ্কা ওকে এত কাছে টেনে নেবে। তাই একটা অপ্রত্যাশিত খুশির ঢেউ ওকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। অনুষ্কার 'আহা মরি' মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে প্রাণখোলা গল্পে মেতে উঠল। আর তারই মধ্যে কখন যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ওদের গল্প আর হাসাহাসির ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ করেই পরানের ডেডবডির কথা ভেসে উঠল।

অনুষ্কা টেলিফোনে ব্যাপারটা জেনেছে ঠিকই, কিন্তু মনে হল তাতে ওর কৌতূহল মেটেনি। কারণ, ও ইলিনাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

সেই রাতের ঘটনা খুব ধীরে-ধীরে স্লো-মোশান সিনেমার মতো পরপর দু-বার বলতে হল ইলিনাকে।

কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে গভীর মনোযোগে ইলিনার কথামালা শুনল অনুষ্কা।

'তোমরা ঠিক দেখেছ, দুজন টপ আর স্কার্ট পরে ছিল? মানে, আমাদের স্কুল-ড্রেস?'

'হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি।'

'আর-একজন শাড়ি?'

'হ্যাঁ। আমাদের একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে সেদিন স্কুলে এসেছিল। পাড়ের ডিজাইনটা দেখে সম্পি চিনতে পেরেছে।'

'কোন ম্যাডাম?'

'সম্পি জানে। ও আমাদের এখনও বলেনি। লাস্ট দিন যখন ওর সঙ্গে কথা হয় তখন ও বলেছিল, ম্যাডামের নামটা এখন ও কাউকে বলবে না। কয়েকটা দিন ও ম্যাডামের ওপরে নজর রাখতে চায়...।'

এ-কথা শুনে অনুষ্কা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আনমনাভাবে বলল, 'এতে তো সম্পির বিপদ হতে পারে! যদি সেই ম্যাডাম সম্পির ব্যাপারটা জানতে পেরে যায় তা হলে...।'

ইলিনা হাত নেড়ে বলল, 'জানলে জানবে! সম্পির গায়ে অনেক জোর—ও কাউকে ভয় পায় না...।'

ইলিনার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল অনুষ্কা। মলিন হেসে বলল, 'সম্পি ওদের সঙ্গে পারবে না। ওদের গায়ে অমানুষিক শক্তি। ওরা লোহা চিবিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারে—।'

ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল : 'তুমি জানলে কী করে?'

অনুষ্কা চুপ করে রইল। ওরা দুজনে বৃষ্টির ধারাপাত শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ইলিনা আবার জিগ্যেস করল, 'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি জানি। সব জানি—।'

'কী জানো, বলো—।' অনুষ্কার আরও কাছে সরে এল ইলিনা।

'পরান ছেলেটা কীভাবে মারা গেছে আমি জানি।'

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। পড়ল ইলিনার বুকের ভেতরেও। উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডের ধকধক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল ও।

ফ্যালফেলে মুখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে ছিল ইলিনা। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে প্রশ্ন করল, 'কী-কীভাবে ম-মারা গেছে পরান?'

'ওর সব রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ...।'

ইলিনার শীত-শীত করে উঠল।

ঘরের দুটো জানলাতেই কাচের শার্সি লাগানো। বৃষ্টির ফোঁটা কাচের ওপরে আছড়ে পড়ছিল। তারপর কাচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ল্যাম্পপোস্টের ছিটকে আসা আলোয় মনে হচ্ছিল কাচ বেয়ে কতকগুলো স্বচ্ছ ব্যাঙাচি সাঁতরে নামছে।

ইলিনা শুধু যে অনুষ্কার কথায় ভয় পেয়েছে তা নয়। অনুষ্কা কী করে এসব জানল, সে-কথা ভেবেও ওর ভয় করছে। অথচ অনুষ্কার প্রতি ওর টানটাও তো মিথ্যে নয়! তাই ভয় পেলেও ইলিনা এক অদ্ভুত টানে অনুষ্কার কাছে বসে রইল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর নানান কথা ভাবতে লাগল।

তা হলে সেই ছাতাওয়ালা প্রাণীগুলো পিশাচ? ওরাই কি পরানের রক্ত শুষে নিয়েছে? কিন্তু ওদের স্কুলের দুজন ছাত্রী আর একজন ম্যাডাম ওরকম পিশাচ হয়ে গেল কী করে?

ইলিনার চিন্তাগুলো দিশেহারাভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল আর বারবার অদৃশ্য এক পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

অনুষ্কা বলল, 'ইলিনা, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি! শুধু সম্পিকে বোলো খুব কেয়ারফুল থাকতে। ও যেন বেশি রিসক না নেয়।'

ইলিনা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। দারচিনির মিষ্টি গন্ধটা ওর নাকে এল আবার।

অনুষ্কা প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টিটা যে কখন থামবে কে জানে! রেইনি সিজনটা খুব বিচ্ছিরি।' মুখ ফিরিয়ে ইলিনার দিকে তাকাল : 'আমার মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ হল না। মা বিকেলে কীসব কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে—মনে হয়, বৃষ্টিতে আটকে গেছে। একটু পরে বাপি মা-কে ফোন করে দেখবে। যদি মায়ের ফিরতে প্রবলেম হয় তা হলে তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে বাপি মা-কে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তোমার মা একা বেরিয়েছেন? রাত হয়ে গেলে যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়! তার চেয়ে আমি এখনই চলে যাই—তোমার মা তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন...।'

'তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ—' মিষ্টি করে হাসল অনুষ্কা : 'বিপদ-আপদকে আমরা ভয় পাই না। তা ছাড়া বাপি এখুনি তোমার জন্যে স্ন্যাক্স-ট্যাক্স কিছু নিয়ে আসবে। আর বাড়িটাও তো তোমাকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়নি—চলো।' অনুষ্কা ওর হাত ধরে টানল। তারপর ঘর ছেড়ে ওরা চলে এল বাইরে, অলিন্দে।

বাড়ির সব জায়গাতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সাদা টিউবলাইট অথবা নানান চেহারার সি. এফ. এল.। দোতলার ঘরগুলো দেখাতে-দেখাতে অনুষ্কা বলল, 'আমাদের বাড়ির দুটো ফ্লোর একই প্যাটার্নে তৈরি। একতলার দুটো ঘরে উলটোপালটা জিনিস বোঝাই করা আছে, আর থার্ড ঘরটায় আমার...পোষা...মানে, পেটসরা থাকে। কাঠবিড়ালি, পায়রা, শালিখ, চড়াই এসব।'

দোতলার তিনটে ঘর শেষ হতেই অনুষ্কা বলল, 'ওপাশে ওই যে দুটো ছোট-ছোট ঘর—ওগুলো টয়লেট আর কিচেন—দেখানোর কিছু নেই।'

ইলিনা জিগ্যেস করল, 'তুমি রান্না জানো?'

'ওরে বাবা!' ভয় পাওয়ার কপট ভঙ্গি করল অনুষ্কা : 'রান্না-টান্না আমি একটুও জানি না।'

'তোমার মা—মানে, আন্টি নিশ্চয়ই ভালো রান্না জানেন?'

'উহুঁ—' অনুষ্কা মাথা নাড়ল : 'মা রান্না-টান্না তেমন জানে না...।'

'সে কী? তা হলে রোজ রান্না করে দেয় কে? তোমার স্কুলের টিফিন কে তৈরি করে? রান্নার মাসি?'

অনুষ্কাকে দেখে মনে হল, ও কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। কী বলবে ভাবছে।

'না, মানে...রান্নার মাসি...আমাদের রান্নার মাটি-টাসি কেউ নেই।'

অনুষ্কার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছে ইলিনা।

এবং বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

রান্নাঘর একেবারে পরিষ্কার। কয়েকটা থালা-বাসন, ছুরি-চামচ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। তাকে মশলাপাতির কোনও কৌটো নেই। এমনকী কোনও উনুন, স্টোভ, গ্যাস আভেন, গ্যাস সিলিন্ডার, বা মাইক্রোওয়েভ আভেন—কিচ্ছু নেই।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ইলিনা ঘুরে তাকাল বন্ধুর দিকে।

দুজনেই চুপচাপ। যেন ক্যামেরার ফ্রিজ শটে দুজনে ধরা পড়েছে। ওদের মুখে কোনও কথা নেই। শুধু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বাজছিল।

'আমাদের রান্নাবান্নার কোনও ব্যাপার নেই। আমরা সবসময় কেনা খাবার খাই—।'

অনুষ্কা এ-কথা বলতে না বলতেই ওর বাপির গলা পাওয়া গেল।

'ইলিনা, এই কেনা খাবারগুলো খেয়ে দ্যাখো—দারুণ লাগবে। খুব ফেমাস দোকান থেকে কেনা...।'

সেই কথার দিকে লক্ষ করে চোখ ফেরাল ইলিনা। এবং সরাসরি অনুষ্কার বাবাকে দেখতে পেল।

অনুষ্কার ঘরের দরজায় বাপি দাঁড়িয়ে। হাতে একটা খাবারের প্লেট।

ওরা বাপির কাছে এগিয়ে গেল। বাপি খাবারের প্লেটটা অনুষ্কার হাতে দিলেন : 'নাও, বন্ধুকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াও।' ইলিনার দিকে তাকালেন : 'লজ্জা কোরো না, ইলিনা—পেট ভরে খাবে। তা কেমন লাগছে বলো। এনজয় করছ তো?'

ইলিনা সামান্য হেসে ঘাড় নাড়ল। নীচু গলায় বলল, 'করছি—এনজয় করছি।'

'গুড—ভেরি গুড।' জোরে হেসে উঠলেন বাপি। তারপর চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন : 'হ্যাঁ, ভালো কথা। তুমি ফেরার সময় হলে বোলো। তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব...।'

বাপি সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলেন।

ঘরে ঢুকে ইলিনার সামনে প্লেটটা এগিয়ে দিল অনুষ্কা : 'নাও—খেয়ে নাও।'

ইলিনা প্লেটটা নিয়ে বিছানায় বসল। ওর খুব খিদে পাচ্ছিল। খাবারগুলো সামনে পেয়ে খিদেটা যেন আরও অনেক বেড়ে গেল। মনজিনিসের ফিশ এনভেলাপ, চিকেন বার্গার—তার পাশে দুটো বড় সন্দেশ।

খাওয়া শুরু করার আগে ও অনুষ্কাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি খাবে না?'

ইলিনা জানত অনুষ্কা কী বলবে। কারণ, স্কুলে টিফিন শেয়ার না করার ব্যাপারটা ওর মনে ছিল।

অনুষ্কা ঠিক তাই বলল, 'নাঃ, আমার খিদে নেই—।'

ইলিনা চিকেন বার্গারে কামড় বসিয়ে হাসল : 'তোমার দেখছি কখনও খিদে-টিদে পায় না।'

অনুষ্কা অস্বস্তি পেয়ে হাসল, বলল, 'বোধহয় তাই। ডাক্তার দেখাব ভাবছি—।'

এরপর ওদের গল্প ঘুরে গেল গানের দিকে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ তখন অনেকটা কমে এসেছে।

অনুষ্কা যে মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত সেটা দেওয়ালের পোস্টারটা দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তার সঙ্গে জানা গেল ও নিজেও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের চর্চা করে।

ইলিনার গানের 'চর্চা' বলতে শুধু গান শোনা। ওর প্রিয় বিষয় হল ছবি আঁকা আর ট্যাটুর ডিজাইন। দেওয়ালে লাগানো পূর্ণিমার রাতের ছবিটা অনেকক্ষণ ধরেই ওর চোখ টানছিল। তাই ও হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'এই ছবিটা এখানে কী জন্যে লাগিয়েছ? এটার কি স্পেশাল কোনও ব্যাপার আছে?'

অনুষ্কা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, 'না, মানে... স্পেশাল কোনও ব্যাপার নেই। ছবিটা আমার ভালো লাগে, তাই—।'

'ওরে বাবা, আমার তো ওটার দিকে তাকালেই গা-টা কেমন শিরশির করছে! ভয়-ভয় করছে। ওই বাড়িটা যেন কেমন।'

হাসল অনুষ্কা : 'আমার ভয়-টয় একটু কম...।'

অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল ইলিনা। হঠাৎই ওর মনে একটা প্রশ্ন উঠে এল।

অনুষ্কা ওকে আজ হঠাৎ বাড়িতে 'নেমন্তন্ন' করল কেন? আগে ও যখন গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেছে তখন অনুষ্কা এতটুকুও আগ্রহ দেখায়নি। অথচ আজ হঠাৎ উলটো ব্যাপার।

তা হলে কি অনুষ্কা স্কুলের ওই ভয়ানক কাণ্ডটা ইলিনার কাছ থেকে সামনাসামনি বসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনতে চেয়েছিল? সব শোনার পর সেটা নিয়ে গোয়েন্দার মতো অনেক প্রশ্নও করেছে ও। ওর কথাবার্তায় ইলিনার মনে হয়েছে অনুষ্কা যেন এই রহস্যের গভীর পর্যন্ত জানে। কারণ, ও বলেছে, 'আমি জানি। সব জানি—।'

খাওয়া শেষ করে ইলিনা উঠে দাঁড়াল। পড়ার টেবিলে রাখা একটা জলের বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিল অনুষ্কা। আলতো গলায় বলল, 'তুমি খুব সাবধানে থেকো।'

ঢকঢক করে জল খেল ইলিনা। তারপর বিছানা থেকে ওর স্কুল-ব্যাগটা তুলে নিল : 'রাত হয়ে যাচ্ছে—এবার আমি যাই...।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা দুজনে সিঁড়ির দিকে এগোল।

ছয়

অনুষ্কাকে ঘিরে ইলিনার মনে কিছু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা আর রহস্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওর প্রতি অলৌকিক এক টান এইসব দ্বিধা আর সংশয়কে ফিকে করে দিয়েছিল। শুধু একটা কথা ওর কানে বারবার বেজে উঠছিল : 'আমি জানি। সব জানি—।'

ক্লাসের পড়ায় ইলিনার মন বসছিল না। ও একটা খাতার শেষ পাতায় একটা ট্যাটুর ডিজাইন আঁকছিল : একটা ফুল—তাকে ঘিরে দুটো সাপ। এই নকশাটার মধ্যে কী আছে কে জানে! এটা অনুষ্কার এত প্রিয় কেন?

ইলিনা আজ সমর্পিতা আর সজনীর মাঝে বসেছে। ক'দিন ধরেই তাই বসছে। সমর্পিতার পাশে বসলে ও কেমন যেন ভরসা পায়। ওর মনে হয়, কোনও বিপদ-আপদ হলে দশাসই সম্পি সেটা ঠিক রুখে দেবে। কিন্তু ঠিক কীরকম বিপদ-আপদ সেটা ইলিনা জানে না।

অরুণিমা ম্যাডাম বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন। ওঁর ভীষণ রোগা চেহারা, মাথায় অনেক সাদা চুল। খুব শিগগিরই রিটায়ার করে যাবেন। ক্লাসে শুধু হাই তোলেন আর চেয়ারে বসে মাঝে-মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েন।

অরুণিমা ম্যাডাম খুব ঠান্ডা আর ভালোমানুষ টাইপের। পড়া না পারলে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা বকাবকিও করেন না। শুধু ক্লাসে গোলমাল না করলেই হল।

সেই 'নিয়ম' মেনে ইলিনারা চাপা গলায় কথা বলছিল।

ইলিনা ট্যাটু আঁকা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'সম্পি, তোর সেই শাড়ির পাড়ের ডিজাইনের গল্পটা তো দেখলাম অনেকেই জেনে গেছে। বড়দিকে তুই কী বলেছিলি মনে নেই—যে সবটাই তোর দেখার ভুল?'

সম্পি বাঁকাভাবে হাসল। বলল, 'সবাই যা বলে তাই করে নাকি? আমি ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা একটু রটিয়ে দিয়েছি।'

সজনী জিগ্যেস করল, 'কেন রে?'

‘যাতে কথাটা সেই শয়তান ম্যাডামের কানে যায়। তা হলে সেই ম্যাডাম একটু চাপে থাকবে।’

‘চাপে থাকলে কী হবে?’

‘দেখাই যাক না কী হয়।’ ঠোঁট টিপে বলল সম্পি, ‘হয়তো শয়তান ম্যাডামটা চালে কোনও ভুল করে ফেলতে পারে...।’

হঠাৎই সম্পি প্রসঙ্গ পালটে ইলিনাকে জিগ্যেস করল, ‘সেদিন দেখলাম তুই ছুটির সময় অনুষ্কার গাড়িতে উঠলি...।’

ইলিনা অপ্রস্তুতভাবে বলল, ‘আমার শরীরটা ভালো লাগছিল না। ওকে বলেছিলাম—তাই ও আমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েছে।’

‘ওরা খুব বড়লোক, না রে?’ সজনী গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল।

‘কী জানি!’ ঠোঁট ওলটাল ইলিনা : ‘তবে অনুষ্কা বলছিল, ও সব জানে। ও তোকে—’ সম্পির দিকে তাকাল ইলিনা : ‘খুব কেয়ারফুল থাকতে বলেছে, কোনও রিসক নিতে বারণ করেছে।’

সম্পি এ-কথায় ভয় তো পেলই না, উলটে ‘ডোন্ট কেয়ার’ হাসি হাসল। তারপর কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করল, ‘অনুষ্কা সব জানে মানে?’

‘কী জানি! সেসব ক্লিয়ার করে বলেনি।’

‘তোরা চিন্তা করিস না। ব্যাপারটার পেছনে আমি লেগে আছি।’

‘তুই কিন্তু কেয়ারফুল থাকিস...।’ ইলিনা ফিসফিস করে সম্পিকে আবার বলল।

সম্পি কোনও কথা বলল না। শুধু চোখের ইশারায় বোঝাল, ও কেয়ারফুল থাকবে।

বাংলা ব্যাকরণের পর আরও দুটো ক্লাস পার হয়ে গেল। সম্পি কেমন যেন ছটফট করছিল। কোনও কিছুতেই ঠিকমতো মন বসাতে পারছিল না।

ইলিনা খেয়াল করেছে, সম্পি ক’দিন ধরেই স্কুল ক্যাম্পাসের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মরা গাছটার কাছে গিয়ে তার আশপাশটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। গত পরশু স্কুল ছুটি হওয়ার পর ও সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলাইদার সঙ্গে কীসব যেন কথাবার্তা বলছিল। তারপর গতকাল টিফিনের সময় আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক চষে বেড়াচ্ছিল।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ইলিনার মনে হচ্ছিল, সমর্পিতা যেন শখের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। এটা যেমন ইলিনাদের চোখে পড়ছে তেমন অন্যদেরও নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে। তা হলে সেই রাতের ওই ভয়ংকর তিনজন...তারাও নিশ্চয়ই সমর্পিতার পাগলামো দেখছে। তারপর যদি...।

ইলিনা আর ভাবতে পারছিল না। অনুষ্কার রহস্যময় কথাগুলো ওর মাথার ভেতরে ঝড় তুলছিল।

টিফিনের পরের পিরিয়ডটায় রনিতা ম্যাডামের ইতিহাস ক্লাস। তিনি ক্লাসে এসে নিজস্ব বিরক্তিকর স্টাইলে পড়াতে লাগলেন। তারপর আজকের ‘বলির পাঁঠা’ হিসেবে সম্পিকে বেছে নিলেন। যত কঠিন-কঠিন প্রশ্ন ওর দিকে ছুড়ে দিলেন।

সম্পি প্রায় কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছিল না। ফলে ওকে হেনস্থা করার সাফল্যে রনিতা ম্যাডামের চোখ চকচক করছিল।

সমর্পিতাকে বাঁচানোর জন্য অনুষ্কা বারবার উত্তর দিতে চেয়ে হাত তুলছিল, কিন্তু রনিতা ম্যাডাম সেটা যেন দেখেও দেখছিলেন না।

একসময় তিনি ঠান্ডা চোখে অনুষ্কার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধারালো গলায় কেটে-কেটে বললেন, ‘আমি জানি তুমি সব জানো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি কিছু জানতে চাইছি না।’

সম্পিকে যাচ্ছেতাইভাবে নাস্তানাবুদ করার পর ওকে ভালোরকম বকাবকি করলেন রনিতা ম্যাডাম। তারপর বললেন, 'তুমি ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাকে ঠিক পথে আনা দরকার...।'

সম্পি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়ল।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পির মুখচোখ লাল। প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

রনিতা ম্যাডাম চলে যাওয়ার পর সম্পি ইলিনাকে বলল, 'সবাই জানে আমি পড়াশোনায় বাজে...তাও কেন যে আমাকে রনিতা ম্যাডাম হ্যারাস করলেন কে জানে! আমার কপালে নির্ঘাত গার্জেন কল ঝুলছে।'

ইলিনা আর সজনী ওকে ভরসা দিতে লাগল।

আকাশে কালো-কালো মেঘের ছানা ভেসে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি—তবে যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে। জানলা দিয়ে বড়-বড় গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল। এলোমেলো বাতাসে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে।

সম্পিকে দেখে মনে হল, ও যেন একটু দমে গেছে। চুপচাপ কী যেন ভাবছে।

ইলিনা বারবার ওকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী হয়েছে?'

সমর্পিতা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'না, কিছু না...।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ইলিনা। ওর মনে হল, ডাকাবুকো সম্পি ভয় পেয়েছে।

শেষ পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে সম্পি একবার টয়লেটে যাওয়ার নাম করে বেরোল।

ইলিনার কী মনে হল, সম্পির পিছন-পিছন ও-ও বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখল, সম্পি বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে ক্লাস নাইন-বি-র একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটার নাম নিনা। সম্পিদের পাড়ায় থাকে—ওর বন্ধুও। আর সম্পির মতো নিনারও একটু ভয়ডর কম।

ইলিনা চটপট ক্লাসে ফিরে এল আবার। একটু পরে সম্পি ফিরে এসে ওর পাশে বসল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শম্পা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে পড়েছেন।

শম্পা ভূগোল পড়ান এবং খুব ভালো পড়ান। কিন্তু শেষ পিরিয়ডে ইলিনার হাই উঠছিল। ভাবছিল কখন ছুটি হবে, স্কুল বাসে করে বাড়ি যাবে।

ও সম্পিকে বলল, 'নিনার সঙ্গে কী কথা বলছিলি?'

সম্পি কী যেন চিন্তা করছিল, চটকা ভেঙে বলল, 'রনিতা ম্যাডামের কাছে যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নেব ভেবেছিলাম। তাই ওকে বলছিলাম। কিন্তু ওর কাজ আছে—বাড়ি ফেরার তাড়া আছে...।'

'ওকে সঙ্গে নিবি কেন?'

'না, মানে...যদি কোনও প্রবলেম হয়...।'

'কী প্রবলেম?'

'যদি বকাবকি করে, মারধর করে.........তারপর গার্জেন কল......।' একটু থেমে সম্পি আবার বলল, 'যাকগে, যা হয় হবে।'

'আমি তোর সঙ্গে যাব?' ইলিনা জিগ্যেস করল।

সমর্পিতা একলহমা কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'নাঃ, থাক—দরকার নেই। দেখি না কী হয়!'

এরপর ও আর কোনও কথা বলল না। অন্যমনস্কভাবে শম্পা ম্যাডামের ভূগোল পড়ানো শুনতে লাগল।

ইলিনা বুঝতে পারছিল, সম্পি কেমন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কিন্তু কোনও টিচার পড়া না পারার জন্য সম্পিকে টিচার্স রুমে ডেকে পাঠাচ্ছেন, এটা তো সম্পির কাছে নতুন নয়! তা হলে ও এরকম ঘাবড়ে যাচ্ছে কেন?

এসব ভাবতে-ভাবতে ইলিনা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশের কালো-কালো মেঘের ছানাগুলো কখন যেন একজোট হয়ে পড়েছে। এখন ওদের কালো দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। ওদের ঘন কালো শরীর ভেদ করে বিদ্যুতের রুপোলি তরোয়াল মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আর তারপরই গম্ভীর চাপা গর্জন।

কখন যেন ছুটির ঘণ্টা পড়ল। গোটা ক্লাস সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। কথার ফুলঝুরি ছিটকে পড়তে লাগল চারিদিকে।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ি রওনা হতে হবে এই চিন্তায় সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল। কিন্তু সম্পি চুপচাপ বসে রইল। ধীর স্থির গম্ভীর।

ইলিনা আর সজনী ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সম্পির দিকে একবার তাকাল। ইলিনা জিগ্যেস করল, 'কী রে, তোর সঙ্গে থাকব?'

'না, না—তুই বাড়ি যা।' চটপট বলল সম্পি, 'আমি একা ম্যানেজ করে নেব।'

ইলিনার মনে হল, সমর্পিতা চায় না ওকে কেউ ভিতু বলুক।

ও এখন মনের ভেতরে বাড়তি সাহস তৈরি করছে।

ক্লাসরুম যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন সম্পি উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে চলে এল বাইরের অলিন্দে। অলিন্দ ধরে খানিকটা এগোলেই একটা বড় চৌকো চাতাল। তাকে ঘিরে কাস্ট আয়রনের ঢালাই করা নকশা কাটা রেলিং।

দোতলার এই চাতালটাকে অনেকটা ছাদের মতো দেখায়। চাতালের গা ছুঁয়ে একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা কাঁঠাল গাছ উঠেছে।

চাতালের একপাশে বেশ বড়সড় টিচার্স রুম। সম্পি কোনাকুনিভাবে চাতালটা পেরিয়ে টিচার্স রুমের কাছে গেল। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

রুমের চওড়া দরজায় বাদামি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ঘরটা একচিলতে দেখা যাচ্ছে। আর ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল সমর্পিতা। নিজেকে সাহস জোগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল। রনিতা ম্যাডাম আর যা-ই করুন, নিশ্চয়ই মারধোর করবেন না!

বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সম্পি। ওর হাত সামান্য কাঁপছে নাকি?

দূর! যা হয় হবে!

এক হাতে ভারী পরদা সরাল ও। তারপর জুতোয় শব্দ তুলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে মাত্র দুজন টিচার : রনিতা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। ওঁরা পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে হোম লোন আর ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট নিয়ে কীসব আলোচনা করছিলেন। সমর্পিতাকে দেখেই ওঁরা চুপ করে গেলেন। তারপর রনিতা বললেন, 'এসো, সমর্পিতা, এসো...।'

রবিনা ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন। ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে সমর্পিতা ছোট্ট করে হাসল। কিন্তু ম্যাডাম ওর দিকে তাকালেন শুধু—হাসলেন না। টেবিলে রাখা নস্যি রঙের কাঁধ-ব্যাগটা তুলে নিয়ে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর হাবভাব দেখে মনে হল তিনি যেন সমর্পিতার ঘরে ঢোকার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। নিশ্চয়ই রনিতা ম্যাডাম ওঁকে বলে রেখেছিলেন যে, সম্পিকে তিনি কথা বলার জন্য টিচার্স রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন।

টিচার্স রুমে ঢুকে সবচেয়ে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল প্রকাণ্ড একটা টেবিল। টেবিলটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। মেহগনি কাঠের তৈরি, ঝকঝকে পালিশ। টেবিলের আটটা পায়া আটটা সিংহের

থাবা। টেবিলের নানান নকশা আর কারুকাজ দেখে বোঝা যায় এ টেবিল ব্রিটিশ আমলের কনফারেন্স টেবল।

ঘরের একপাশে চারটে কাঠের আলমারি, আর তার পাশে একটা স্টিলের আলমারি।

তার ঠিক বিপরীতে একটা কাঠের ব্যাক—তাতে অনেকগুলো ক্লাস রেজিস্টার, চকের বাক্স আর ডাস্টার। ব্যাকের পাশে বড়-বড় তারিখওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার।

ঘরে তিনটে চার ব্লেডের সিলিং ফ্যান—তবে এখন একটা চলছে। তার হাওয়ায় রনিতা ম্যাডামের কানের পাশে চুল উড়ছে।

আকাশ মেঘলা থাকায় ঘরে দুটো টিউবলাইট জ্বলছে। রনিতা ম্যাডামের পিছনে তিনটে বিশাল-বিশাল জানলা—সম্পিদের ক্লাসরুমের মতো। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বাতাসে মাথা ঝাঁকানো পাগল গাছপালা।

কোকিলের ডাক শুনতে পেল সম্পি। এই ডাকটা ওকে যেন ভরসা জোগাল।

সম্পি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বসেনি। কারণ, ম্যাডাম ওকে বসতে বলেননি।

টেবিলের এপার থেকে ও রনিতা ম্যাডামকে দেখছিল।

রনিতা ম্যাডামের সামনে তিন-চার ভাগে ভাগ করে রাখা ক্লাস টেস্টের খাতা। খাতার ওপরে লোহার পেপার-ওয়েট চাপানো। খাতার পাতার কোনাগুলো পাখার হাওয়ায় উড়ছে।

খাতাগুলোর পাশে রনিতার কাঁধ-ব্যাগ। গাঢ় নীল রঙের ব্যাগ—ব্যাগের খোলা মুখ দিয়ে ছাতার রঙিন বাঁট দেখা যাচ্ছে।

'এদিকে এসো, সমর্পিতা—এপাশটায় এসো...।' হাতের ইশারায় ওকে নিজের কাছে ডাকলেন ম্যাডাম।

'না, ম্যাডাম—এখানেই ঠিক আছি।' কথা বলতে-বলতে হাতে ঝোলানো স্কুল-ব্যাগটা টেবিলের ওপরে রাখল সম্পি।

হাসলেন রনিতা ম্যাডাম। বললেন, 'কোনও ভয় নেই, সমর্পিতা—এপাশটায় এসো, আমার কাছে এসো। তোমাকে আমি কানও মুলব না, মারধোরও করব না। তবে হ্যাঁ—' চওড়া করে হাসলেন রনিতা : 'একটু বকাবকি হয়তো করব। এসো...এপাশটায় এসো—।'

এরপর আর আপত্তি করা যায় না।

টেবিলের পরিসীমা ধরে ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল সমর্পিতা। ম্যাডাম মুখে বলছেন বটে 'কোনও ভয় নেই', কিন্তু যদি রাগের মাথায় কান-টান মুলে দেন! তা হলে কিন্তু বড় প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে।

'আজকাল তোমার পড়াশোনায় একটুও মন নেই কেন বলতে পারো?' বকুনির পালা শুরু করে দিলেন রনিতা : 'ক্লাসে সবসময় দেখি অন্যমনস্ক। এরকম করলে তো তোমার রেজাল্ট অনেক নীচে নেমে যাবে!'

সমর্পিতা ততক্ষণে ম্যাডামের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে—তবে মোটেই হাতের নাগালের মধ্যে নয়। কাঁচমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে ও ম্যাডামের ভর্ৎসনা গায়ে মাখছিল।

'আজও ক্লাসে দেখলাম তুমি কোনও পড়া বলতে পারছ না। ইতিহাস বলে যে একটা সাবজেক্ট আছে সেটাই বোধহয় তুমি ভুলে গেছ।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন রনিতা : 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী প্রবলেম হয়েছে? লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এখন কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?'

সমর্পিতা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনমিনে গলায় বলল, 'কিছু নিয়ে তো মাথা ঘামাচ্ছি না, ম্যাডাম—পড়ছি...।'

'ছাই পড়ছ!' ধমকে উঠলেন রনিতা, 'আসলে তুমি স্কুলের ওই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে বড্ড বেশি ইনভলভড হয়ে পড়েছ, তাই না?'

সমর্পিতা চুপ করে রইল।

জানলার বাইরে মেঘ ডাকল। বৃষ্টিও জোরে শুরু হল। রনিতা বৃষ্টির শব্দে জানলার দিকে একবার তাকালেন। তারপরই ব্যাগ থেকে ছাতাটা টেনে বের করে নিজের হাতের কাছে রাখলেন।

সম্পিকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাডামের ধৈর্য কয়েক ডিগ্রি কমে গেল।

'চুপ করে আছ কেন? বলো। পরানের অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথটা নিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের ইনভলভড হয়ে পড়েছ না?'

সমর্পিতা আর চুপ করে থাকতে পারল না। আলতো গলায় বলল, 'ম্যাডাম, ওটা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ নয়—মার্ডার।'

'তোমাকে কে বলেছে মার্ডার?' ধৈর্য আরও কমে গেল : 'পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে যা রিপোর্ট দেওয়ার দিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সবাই জানে এই স্কুলটা একটু ইয়ে...মানে, ভূতুড়ে...একটু দোষ আছে। আর সেদিন রাতে তুমি বা রবিনা যা দেখেছ সবটাই—।'

'হ্যালুসিনেশান। আমাদের দেখার ভুল—তাই তো?' ম্যাডামের কথার খেই ধরে সমর্পিতা বলল।

সম্পির কথার সুরে ব্যঙ্গ আর বিদ্রোহের ছোঁয়া পেয়ে রনিতা খেপে উঠলেন : 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! শিক্ষা-দীক্ষা পাওনি? বাজে নোংরা মেয়ে!'

সম্পির মাথায় আগুন জ্বলে গেল। ও ভুলে গেল কাকে কী বলছে। ক্ষিপ্ত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বাজে নোংরা মেয়ে! তুই কী? তোর সেই শাড়িটা কোথায়? ওই যে, পাড়ের কাছে শঙ্খের ডিজাইন করা। যেটা পরে সেদিন অন্ধকারে ছাতা মাথায় দিয়ে ওই মরা গাছটায় হনুমানের মতো লাফাচ্ছিলি। শাড়িটা আছে, না পুড়িয়ে ফেলেছিস?'

ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল। সম্পির কথাগুলো বুলেটের মতো বিঁধে গেল রনিতা ম্যাডামের গায়ে।

সাত

ওঁর মুখটা অলৌকিকভাবে পালটে যেতে লাগল। গাল দুটো বসে গেল। রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল! ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়ে দুটো কালো অন্ধকার গর্ত তৈরি হল। সেই গর্তের কেন্দ্রবিন্দুতে দুটো উজ্জ্বল সাদা ফুটকি—হাই পাওয়ারের জোনাকির মতো জ্বলছে।

রনিতা ম্যাডাম অদ্ভুত এক কর্কশ গলায় বললেন, 'তোর লপচপানি বড্ড বেড়েছে। তোকে ঠিক পথে আনা দরকার। আমাদের যে কতটা শক্তি তুই জানিস না...।'

সম্পি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। গল্পে পড়া কিংবা সিনেমায় দেখা আজগুবি ব্যাপারটা যে ওর চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে, সেটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর ভেতর থেকে সমস্ত বেপরোয়া ভাব আর সাহস চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে ওর জিভ শুকিয়ে গেছে, পা দুটো মেঝেতে এঁটে বসেছে।

খপ করে হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা একটা পেপারওয়েট তুলে নিলেন রনিতা। ওঁর হাতের আঙুলগুলো কেমন কালো-কালো হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আর আঙুলের নখগুলো এখন কেমন লম্বা আর বাঁকানো।

রনিতা খলখল করে হাসলেন। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, 'এটা খুব ছোঁয়াচে রোগ। কী করে কখন যে হয়ে গেছে একটুও টের পাইনি। তোর গায়ে একটা কামড় বসালে তুইও একপলকে আমাদের মতন হয়ে যাবি। তখন তেষ্টায় পাগল হয়ে ঘুরবি...আর যদি মরণকামড় দিই তা হলে তুই পরানের মতো শেষ হয়ে

যাবি। সে-রাতে পরানকে শুষে শেষ করে আমরা আনন্দে ওই মরা গাছটায় নাচানাচি করছিলাম। তুই কি চাস আরও একবার তাই করি?'

আকাশে এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাল যেন মেটাল হ্যালোজেন বাতি ঝলসে উঠল। সমর্পিতা আর রনিতা ম্যাডামের মুখে-গায়ে সাদা আলো ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে গেল।

সমর্পিতা অনেক কিছুই করার কথা ভাবছিল, কিন্তু কোন এক অলৌকিক অভিশাপ ওকে যেন পায়ে পেরেক ঠুকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

ও একবার খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, আর-একবার জানলার দিকে। ও কি একছুটে বাইরের চাতালে চলে যেতে পারবে? তারপর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারবে না? কিন্তু এখন কি ম্যাডামরা কেউ আছেন? বড়দিও হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। এখন শুধু সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের লোকজনই যা ভরসা। কিন্তু এখান থেকে চিৎকার করলে সেই আওয়াজ কি সার্ভেন্টস কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছবে? এই বৃষ্টিতে কেউ কি আসবে?

সম্পি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো, রনিতা পিশাচটা খলখল করে হাসছে। ওকে ঠেকাতে কিছু একটা করতে হবে, করতেই হবে।

সম্পি হঠাৎ কোথা থেকে শক্তি খুঁজে পেল কে জানে! ও দু-হাতের দুটো প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলে। ভয়ংকর শব্দ হল। বিশাল টেবিলটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

আর রনিতা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন। তারপর বড় করে হাঁ করলেন।

টিউবলাইটের আলোয় পিশাচের দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। সম্পির দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

রনিতার দু-পাটিতেই হাঙরের মতো কয়েক সারি করে ইস্পাতের দাঁত। ঝকঝকে এবং ছুঁচলো।

পপকর্ন খাওয়ার ভঙ্গিতে লোহার পেপারওয়েটটা হাঁ করা মুখের ভেতরে ছুড়ে দিলেন। তাপর কড়মড়-কড়মড় করে ওটা চিবোতে লাগলেন। ঠিক যেন তালমিছরির ডেলা চিবিয়ে গুঁড়ো করছেন।

একটু পরেই লোহার গুঁড়ো থু-থু করে টেবিলে উগরে দিলেন রনিতা। তারপর পাতলা ঠোঁটের ওপরে কয়েকবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে সম্পিকে লক্ষ করে হাসলেন।

সম্পির শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজলের স্রোত নেমে গেল। এই পিশাচের সঙ্গে শক্তিতে পেরে ওঠা অসম্ভব। সম্পি একমাত্র পালানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পা দুটো যে কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

টেবিলে ঘুসি মারার পর থেকেই সম্পির দু-হাতের মুঠো ব্যথা করছিল। ও হাত কচলে ব্যথা তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ভয়...ভয়টা তাড়ানো যায় কেমন করে?

রনিতা ঘষা-ঘষা গলায় বললেন, 'শোন মেয়ে, এই মুহূর্তে তুই যা-যা দেখছিস সবই তোর দেখার ভুল। এ-কথা মনে থাকে যেন! সব হ্যালুসিনেশান।' তারপর একটু রাগি কর্কশ স্বরে বললেন, 'তোর সাহস তো কম নয়! আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসিস! এই দেখ...।'

সমর্পিতাকে দিশেহারা কাবু অবস্থায় পেয়ে রনিতা যেন বেশ মজা পেয়ে গেছেন। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে টিউবলাইটগুলোর দিকে একবার তাকালেন। তারপর ক্ষণপ্রভার গতিতে চোখের পলকে পৌঁছে গেলেন দেওয়ালে গাঁথা ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর কাছে। তারগুলোর ওপরে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

আলোর ফুলকি ছিটকে বেরোল। 'ফট' করে একটা শব্দ হল। এবং ঘরের আলো নিভে গেল। ঘুরন্ত পাখার গতি কমতে লাগল।

ঘরটা কেমন অদ্ভুত আঁধারে ছেয়ে গেল। জানলার বাইরে মেঘ আর বৃষ্টি যেন অকালসন্ধ্যা তৈরি করে দিয়েছে। সম্পির চোখের সামনে রনিতা ম্যাডামের অপচ্ছায়া। তাঁর চোখের অন্ধকার কোটরে দুটো সাদা

আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। আর একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে চাপা খিলখিল হাসি।

কর্কশ গলায় পিশাচটা বলল, 'এবার বুঝেছিস, আমাদের কী শক্তি! আজকের এসব ব্যাপার কাউকে বলবি না। কাউকে না। যদি বলিস, তা হলে—যা বললাম—তুইও পরানের মতো হয়ে যাবি...।'

এমন সময় তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

সেই কানফাটানো আওয়াজে সম্পির আতঙ্কের ঘোরটা হঠাৎই কেটে গেল। ও 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে শুরু করল এবং কোন এক শক্তিতে খোলা দরজার দিকে মরণপণ ছুট লাগাল।

পিশাচটা ছুটন্ত সম্পিকে লক্ষ করে লাফ দিল। দু-লাফে পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কিন্তু সম্পি ততক্ষণে বাইরের চাতালে এসে পড়েছে। ঝুপুস বৃষ্টি ওকে যেন হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিল। ও ফিরে তাকাল টিচার্স রুমের দরজার দিকে।

রনিতা ম্যাডাম সম্পিকে তাড়া করার ঝোঁকে টিচার্স রুম ছেড়ে চাতালে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই আঁতকে উঠলেন। এমনভাবে কাতরে উঠলেন যেন বৃষ্টির ফোঁটায় গায়ে ফোসকা পড়ছে।

যন্ত্রণার 'উঃ! আঃ!' শব্দ করে রনিতা একলাফে টিচার্স রুমে আবার ঢুকে গেলেন।

সম্পি সেটা দেখে অবাক হয়ে অঝোর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। বৃষ্টির জলে কী এমন শক্তি আছে যে, এই পিশাচগুলো বৃষ্টির জলের 'জ্বালা' সইতে পারে না?

টিচার্স রুম এখন বেশ অন্ধকার। তাই রনিতা ম্যাডামকে সম্পি ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ম্যাডাম ঘরে ঢুকে পড়ার আগে সম্পি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। ওঁর শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ামাত্রই সেখান থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়েছে। গরম লোহার শিক আচমকা জলে ডোবালে যেমনটা হয়।

তা হলে কি সত্যি-সত্যিই বৃষ্টির ফোঁটায় এই পিশাচগুলোর ছ্যাঁকা লাগে? সেইজন্যই কি সেই ভয়ংকর রাতে এদের মাথায় ছাতা ছিল?

সম্পি তখনও চিৎকার করছিল : 'কে কোথায় আছ, শিগগির এসো! দোতলায় আগুন লেগেছে—আগুন!'

কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর ওর হারানো সাহস খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। তা ছাড়া ও লোকজনের ছুটে আসার শব্দ পাচ্ছিল।

সম্পি আঁজলা করে বৃষ্টির জল ধরতে লাগল। এবং এগোতে লাগল টিচার্স রুমের দিকে। ওর ভেতরে এখন একটা রাগ টগবগ করে ফুটছিল।

রনিতা ইলেকট্রিকের তারে কামড় বসানোমাত্রই শর্ট সার্কিট হয়ে স্কুল বিল্ডিং-এর অনেকটা অংশের আলো নিভে গেছে। সেই সময় দুজন দারোয়ান রোজকার মতো একতলার ঘরগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ করে দরজায়-দরজায় তালা দিচ্ছিল। আচমকা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ওরা হকচকিয়ে যায়। আর তারপরই সম্পির চিৎকার ওদের কানে এল।

সম্পির চিৎকার সার্ভেন্টস কোয়ার্টারেও পৌঁছেছিল। সেখান থেকে বলাইদা আর মলিনাদি হন্তদন্ত হয়ে এসে দারোয়ানদের সঙ্গে জড়ো হল। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল। বুঝতে পারল, চিৎকারটা দোতলার চাতাল থেকে আসছে।

তা হলে কি দোতলাতেই আগুন লেগেছে?

কিন্তু ওরা চারজনে চাতালে এসে কাউকে দেখতে পেল না। আর আগুনও দেখতে পেল না।

কারণ, সম্পি তখন বৃষ্টির জল আঁজলা করে নিয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গা সপসপে ভেজা। মাথার চুল থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। চুলের গোছা কপালের ওপরে নেমে এসেছে। আর সেই ভেজা চুলের ফাঁক দিয়ে ওর দুটো রাগি চোখ দেখা যাচ্ছে।

‘কোথায় গেলি? আয়, সামনে আয়—’ পিশাচকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ডাকাবুকো মেয়েটা।

রনিতা তখন একটা আলমারির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লুকোতে চেষ্টা করছেন। ওঁর অন্ধকার গর্তের মতো চোখ দুটো সম্পির দিকে তাকিয়ে স্থির। আসলে ওরা তখন সম্পির আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টির জলের দিকে লক্ষ রাখছিল। অপেক্ষা করছিল, কখন সেই চুঁইয়ে পড়া বন্ধ হবে। অর্থাৎ মেয়েটার এক আঁজলা জল কখন শেষ হবে।

জল শেষ হয়ে যাবে বলে সমর্পিতার মনে কিন্তু ভয় ছিল না। ও জানে ওর পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে। এই অবস্থায় ওর পিশাচটাকে জড়িয়ে ধরার খুব সাধ জাগছিল।

সম্পি হঠাৎই খেয়াল করল, আলমারির পাশে দাঁড়ানো রনিতার চেহারা ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে—স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার। একইসঙ্গে দোতলার চাতালে অনেকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কথা বলতে-বলতে কারা যেন টিচার্স রুমের দিকে এগিয়ে আসছে।

সম্পির হাতের জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। রনিতাকে ও এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

রনিতা হিসহিস করে চাপা গলায় বললেন, ‘আজকে যা কিছু দেখলি কাউকে বলবি না। তা হলে তোর সর্বনাশ হবে। মনে রাখিস, আমি একা নই—আমরা সবাই মিলে তোকে অনায়াসে খতম করে দেব...।’

রনিতা ম্যাডাম স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এলেন। ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় সমর্পিতাকে চুপচাপ থাকতে বললেন।

‘কই, কোথায় আগুন লেগেছে?’ পুরুষের গলা : ‘ঘর অন্ধকার কেন?’

‘কে অমন চিৎকার করছিল গো?’ মহিলার কণ্ঠস্বর : ‘কী-করে আগুন লাগল বলো দেখি...।’

সমর্পিতা পিছন ফিরে চারজনকে দেখতে পেল। ওরা তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হুড়মুড় করে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে।

সমর্পিতা কিছু বলে ওঠার আগেই মানুষের ছদ্মবেশে থাকা পিশাচটা বলে উঠল, ‘এই তো, এই তারটা শর্ট সার্কিট হয়ে আর-একটু হলেই আগুন লেগে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি এই ডাস্টারটা দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরেছি—।’

টেবিল থেকে একটা ডাস্টার তুলে নিয়ে দেখালেন রনিতা।

সম্পি স্থির চোখে ওঁকে দেখছিল। পিশাচরা তা হলে অভিনয়টা ভালোই জানে!

রনিতা বললেন, ‘সমর্পিতা থাকায় একটা বড় হেলপ হয়েছে। ও সঙ্গে-সঙ্গে ওরকম না চেঁচালে তোমরা কি এত চটপট আসতে?’ সমর্পিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন : ‘থ্যাংক য়ু, সমর্পিতা। তোমাকে আমি কাল একটা রিওয়ার্ড দেব...।’

ঠিক তখনই সাদা আলোর ঝলকানি, আর তারপরই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

আট

সমর্পিতা স্কুল বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির তেজ খানিকটা কমে এসেছে। মেঘলা আকাশের সঙ্গে সন্ধের অন্ধকার মিশে গিয়ে ছাই রং অনেক গাঢ় হয়েছে।

সমর্পিতার ব্যাগে ছাতা আছে কিন্তু ও ছাতা বের করল না। একে তো ওর সর্বাঙ্গ চুপচুপে ভেজা—ছাতা ওকে নতুন কোনও নিরাপত্তা দিতে পারবে না। বরং বৃষ্টির জল ওকে রনিতা ম্যাডামের মতো ভয়ংকর প্রাণীগুলোর হাত থেকে বাঁচাবে।

সমর্পিতা বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল, থরথর করে কাঁপছিল। ওর বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করে শব্দ হচ্ছিল। তার সঙ্গে বেশ শীত করছিল।

ও কালো আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি উপহার দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানাল।

স্কুল বিল্ডিং-এর কাছ থেকে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেন গেটের দিকে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল সম্পি। হেঁটে যাওয়ার সময় ও বারবার বাঁ-দিকের ঝোপঝাড় আর গাছপালার দিকে তাকাচ্ছিল। এই গাছপালার আড়ালে রনিতা ম্যাডামের মতো কেউ লুকিয়ে নেই তো?

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মনে হল, যেরকম জোরে বৃষ্টি পড়ছে তাতে খোলা জায়গায় ওরা থাকতে সাহস পাবে না। বৃষ্টিতে গায়ে ফোসকা পড়ে যাবে। আর যদি সেদিনের মতো ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোরাঘুরির কথা ভাবে তাতেও লাভ নেই। কারণ, এ-বৃষ্টি ছাতায় তেমন মানবে না।

সম্পি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। স্কুল থেকে বেরিয়েই বাস কিংবা অটো পেলে হয়।

ভেজা পিচের রাস্তায় বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে। রাস্তার ধারে লাগানো সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলো রাস্তায় পড়ে কমলা রঙের আলোর ফুলকি তৈরি করছে। স্কুলের দু-চারজন মেয়ে তাদের গার্জেনের সঙ্গে ফিরছে। এ ছাড়া রাস্তাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। আর দূরের খেলার মাঠটা বৃষ্টিতে ঝাপসা।

'এই, সম্পি—।'

সমর্পিতা চমকে উঠল। বুক ধড়াস করে উঠল। ডাক লক্ষ্য করে ফিরে তাকাল।

ও খেয়ালই করেনি, একটা বড় নিমগাছের নীচে দুটো মেয়ে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইলিনা আর সজনী।

ওরা দুজনে সম্পির কাছে এগিয়ে এল।

'তোর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। তাই বাড়ি যাইনি—ওয়েট করছি।' ইলিনা বলল, 'রনিতা ম্যাডাম কী শাস্তি দেয় না দেয়। আমি ওয়েট করব শুনে সজনীও থেকে গেল।'

'তুই ভিজছিস কেন? ছাতা নেই?' সজনী জিগ্যেস করল।

'তুই এরকম কাঁপছিস কেন?' ইলিনা।

সমর্পিতা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইলিনাকে জাপটে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

ইলিনা হকচকিয়ে গেল। কোনও-রকমে ছাতা সামলে সম্পির ভেজা পিঠে হাত বোলাতে লাগল আর বারবার বলতে লাগল, 'কী হয়েছে রে, সম্পি—কী হয়েছে?'

সম্পি কাঁদতেই থাকল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আর একইসঙ্গে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।'

ইলিনা আর সজনী কিছুতেই ওকে শান্ত করতে পারছিল না।

একটু পরে দু-পাশ থেকে সম্পিকে জাপটে ধরে ওরা মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল। ইলিনার মনে হল, রনিতা ম্যাডাম নিশ্চয়ই সম্পিকে সাংঘাতিক অপমান করেছেন, কিংবা চড়-থাপ্পড় মেরেছেন বা কান মুলে দিয়েছেন।

ওরা যখন স্কুলের গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো ওদের চোখে-মুখে এসে পড়ল।

আলোর দিকে তাকিয়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল। কিন্তু আলোর পিছনে সব অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটা ওদের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

সেটা দেখে ইলিনারা পিচের রাস্তার পাশে ঘাসজমির দিকে সরে গেল। কিন্তু গাড়িটা গতিপথ বদলে ওদের মুখোমুখি এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

ইলিনা একটু ভয় পেয়ে গেল। সজনীও। গাড়িটা ওদের পথ আগলে দাঁড়াল কেন?

ঠিক তখনই গাড়ি থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'ইলিনা, এসো—সবাই গাড়িতে উঠে এসো...।'

অনুষ্কার গলা।

অনুষ্কা এখনও বাড়ি যায়নি? ছুটির পর এতক্ষণ ধরে ও কী করছে?

ওরা তিনজনে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সামনের জানলার কাচটা সামান্য নামানো। সেখানে আবছাভাবে অনুষ্কার মুখ দেখা যাচ্ছে। ওর পাশেই স্টিয়ারিং-এ ওর বাবা।

'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে এসো—।' অনুষ্কা তাড়া দিল। গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে গেল।

সম্পিকে গাড়িতে উঠতে বলল ইলিনা। তারপর ছাতা বন্ধ করে নিজে উঠল।

সজনী ইতস্তত করছিল। বলল, 'আমি বাড়ি যাব—।'

অনুষ্কা বলল, 'চিন্তা কোরো না—আমি সবাইকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।'

ওরা তিনজনে পিছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনুষ্কা ওর বাবার সঙ্গে সম্পি আর সজনীর পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বাবা গাড়িটা ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, 'কী বাজে বৃষ্টি! তোমরা সব একেবারে ভিজে গেছ দেখছি!'

ইলিনা সৌজন্যের ঢঙে বলল, 'ও কিছু না, কাকু—বাড়িতে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নেব।'

সমর্পিতার গা ঘেঁষে বসেছিল ইলিনা। তাই টের পাচ্ছিল সম্পি তখনও তিরতির করে কাঁপছে।

ও চাপা গলায়, প্রায় ফিসফিস করে, জিগ্যেস করল, 'সম্পি তোর কী হয়েছে রে? এবার শান্ত হ।'

সমর্পিতা অস্পষ্টভাবে বলল, 'কিচ্ছু না—।'

অনুষ্কা ওদের কথা শুনতে পেয়েছিল। ও নরম সুরে বলল, 'এখন ওকে ডিসটার্ব কোরো না। আমি সব জানি। পরে কখনও ওর সঙ্গে কথা বলব...।'

সমর্পিতা অবাক হয়ে অনুষ্কার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

ভিজে রাস্তায় গাড়ি চলতে লাগল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সম্পি। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। সেই বৃষ্টির ফোঁটার ঝিলিমিলির আড়ালে রনিতা ম্যাডামের পালটে যাওয়া মুখটা ও দেখতে পাচ্ছিল।

আজ বৃষ্টি নেই। খোলা জানলার বাইরে অন্ধকার। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্কা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী দেখছিল কে জানে!

হঠাৎ করে ও ঘুরে দাঁড়াল। বিছানায় বসে থাকা ইলিনার দিকে সরাসরি তাকাল।

বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর গায়ের সবুজ রঙের টপটা কোমরের কাছ থেকে ইঞ্চিচারেক ওপরে তুলে ধরল ও।

ওর নাভির ঠিক ওপরে কালো রঙে আঁকা একটা ছবি : একটা ফুলকে ঘিরে আছে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

ঠিক এই ছবিটাই লাগানো রয়েছে ওর ঘরের দেওয়ালে। এই ছবিটাই ওকে খাতার পাতায় আঁকতে দেখেছিল ইলিনা। তখন ওর ছবিটা ভালো লেগেছিল। ও তা থেকে ট্যাটুর ডিজাইন করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনুষ্কা তাতে সায় দেয়নি। বাজে ওয়ার্থলেস ছবি বলে কাটাকুটি দাগ দিয়ে ছবিটা নষ্ট করে দিয়েছিল।

অথচ সেই ছবিটাকেই বডি ট্যাটু করে বসে আছে ও!

‘এই ছবিটাকে তুমি বাজে ওয়ার্থলেস বলেছিলে—’ অভিযোগের সুরে বলে উঠল ইলিনা, ‘আর সেই ছবিটাকেই ট্যাটু করে বসে আছ! আশ্চর্য!’

অনুষ্কা অল্প হাসল। টপটা তুলে ধরা অবস্থায় কয়েকটা পা ফেলে ইলিনার খুব কাছে এগিয়ে এল। বলল, ‘তুমি ভুল করছ, ইলিনা—এটা মোটেই ট্যাটু নয়। হাত দিয়ে দ্যাখো...।’

সত্যিই ইলিনা আঙুল ছোঁয়াল ছবিটায়। ছবিটা যে উল্কি নয় সেটা বুঝতে চাইল : ‘ট্যাটু নয় তো এটা তা হলে কী?’

‘এটা জন্মদাগ। মানে, জন্মচিহ্ন। আমাদের সবার পেটে আছে।’

‘জন্মচিহ্ন মানে?’

‘জন্মচিহ্ন মানে জন্মের সময় থেকেই এই দাগটা আমাদের সবার পেটে থাকে...।’

‘আমাদের সবার মানে কারা?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ইলিনা।

‘আমি, বাপি, মা—আমাদের সবার পেটে এই ছবি আছে—জন্মদাগ।’

‘কেন? এ কী পিকিউলিয়ার ব্যাপার!’

টপটা ছেড়ে দিল অনুষ্কা। ওটা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ইলিনার চিবুকে হাত দিয়ে বলল, ‘পিকিউলিয়ার নয়, ইলিনা। ভ্যাম্পায়ারদের এটাই নিয়ম...।’

‘ভ্যাম্পায়ার?’ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ইলিনা। অনুষ্কার হাতটা সরিয়ে দিল : ‘কী বলছ তুমি!’

‘হ্যাঁ, ইলিনা—’ নীচু গলায় বলল, ‘ভ্যাম্পায়ারদের চেনার এটাই সবচেয়ে বড় চিহ্ন। তা ছাড়া এই সিম্বলটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র...’ দেওয়ালে লাগানো সাপ আর ফুলের ছবিটার দিকে দেখাল : ‘এটা আমাদের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাই আমাদের দেখে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়...। অবশ্য এটা দেখতে পেলেও সবাই ট্যাটু ভাববে।

ইলিনা কাঁপছিল। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল। ও ভয়ের চোখে সহপাঠীকে দেখছিল।

অনুষ্কা ভ্যাম্পায়ার!

‘ইলিনা, প্লিজ...ভয় পেয়ো না। মানুষের মতো...আমাদের মধ্যেও... ভালো-খারাপ আছে। আমরা ভালো, ইলিনা, বিশ্বাস করো—।’

ইলিনার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখে ঝাপসা দেখছিল। ও মাথা পিছনে হেলিয়ে বিছানায় দু-হাতে ভর দিল।

ওর চোখ গেল দেওয়ালে টাঙানো রাতের ছবিটার দিকে। জ্যোৎস্না ধোওয়া রাত। বিশাল প্রাসাদ। পূর্ণিমার চাঁদ।

আগের দিন ছবিটা যেমন দেখেছিল আজ যেন একটু বদলে গেছে। প্রাসাদের ছায়ার পাশ থেকে চাঁদটা যেন অনেকটা দূরে সরে গেছে। আর আগের দিন, যতদূর ইলিনার মনে পড়ছে, বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।

আজ আলো জ্বলছে দুটো জানলায়!

নিজেকে সামলে নিল ইলিনা। মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না। চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না।

ও তাকাল অনুষ্কার মুখের দিকে।

এই অপরূপ রূপসী মেয়েটা ভ্যাম্পায়ার!

আজ টিফিনের সময় অনুষ্কা ইলিনাকে ডেকেছিল।

ইলিনা ওর কাছে যেতেই ও বলেছে, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ভীষণ ইমপরট্যান্ট কথা। তুমি আজ ছুটির পর আমাদের বাড়ি চলো—প্লিজ।'

অনুষ্কার মুখে আকুতির ভাব ফুটে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এমন সব কথা ও ইলিনাকে বলতে চায় যেগুলো না বলতে পারলে ও কষ্ট পাবে।

ইলিনা রাজি হয়েছিল। একইসঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, রনিতা ম্যাডামের সমস্যাটা যদি সমাধান করতে হয় তা হলে অনুষ্কার সাহায্য দরকার। কারণ, সমর্পিতার ব্যাপারটা যে ইলিনা জানতে পেরেছে সেটা শুধু অনুষ্কার জন্য।

ওই ঘটনার পর সমর্পিতা এক সপ্তাহ স্কুলে আসেনি। ওর বাড়িতে ফোন করে ইলিনা জেনেছে, পরদিন ভোরবেলা থেকে সম্পির খুব জ্বর। সেই জ্বর এতটাই খামখেয়ালিভাবে ওঠানামা করছিল যে, সম্পির মা-বাবা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া সম্পি জ্বরের মধ্যে ভুল বকছিল। সবকিছু মিলিয়ে ওর মা-বাবা ভাবছিলেন ব্যাপারটা ভাইরাল ফিভার নয়—অন্য কিছু।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা একদিন স্কুলের পর সম্পিকে দেখতে গিয়েছিল। তখন ও অনেকটা সামলে উঠেছে।

ইলিনা আর সজনী ওকে সেদিন টিচার্স রুমের ব্যাপার নিয়ে অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সম্পি গোঁজ হয়ে বসে রইল। ঠিকঠাক কোনও জবাব দিল না।

ওর মা নানান কথা বলছিলেন।

'দ্যাখো না, যে-মেয়ে সবসময় সাহসের বড়াই করে, সে কেমন ভয়ে চুপসে গেছে। এই তো, গত পরশু —যখন জ্বরটা খুব বেড়েছিল—তখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। বারবার বলছিল, "বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল দিয়েই খতম করতে হবে...বৃষ্টির জল চাই...বৃষ্টি চাই।"

'আমি ওকে মাথায় জলপটি দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সাড় ফেরাতেই কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। অনেকবার জিগ্যেস করলাম, "বৃষ্টির জল দিয়ে কী করবি বলছিলি?" তো ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল— কোনও জবাব দিল না। বলো দেখি, কী মুশকিল!

'তা ছাড়া ক'দিন ধরে খাবারদাবার কিছু মুখে তুলছে না। শুধু বলছে খিদে নেই। তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। ঠিকঠাক না খেলে শরীরে জোর পাবে কেমন করে?'

সম্পির মা একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। আর অনুষ্কা শান্ত চোখে সম্পির দিকে তাকিয়ে ওকে দেখছিল।

'ও, হ্যাঁ। তোমাদের একজন দিদিমণি বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সম্পি কেমন আছে সে-খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, সম্পি ওঁর খুব প্রিয় স্টুডেন্ট...।' মেয়ের দিকে ঘুরে তাকালেন : 'অ্যাই, কী নাম যেন ওই দিদিমণির? তোকে যে সেদিন বললাম...।'

সম্পি নিষ্প্রাণ স্বরে বলল, 'রনিতা ম্যাডাম।'

ইলিনা আর সজনী মুখচাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

একটু পরে সম্পির মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই অনুষ্কা বলল, 'সম্পি, রনিতা ম্যাডাম তোমাকে থ্রেট করেছেন?'

সম্পি চুপ করে রইল। বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে রইল। আঙুল খুঁটতে লাগল।

'আমি সব জানি, সম্পি। রনিতা ম্যাডাম এখন আর মানুষ নেই— অন্য কিছু হয়ে গেছেন। পরানের মার্ডারে রনিতা ম্যাডাম ইনভলভড...।'

সমর্পিতা চমকে মুখ তুলে তাকাল। ইলিনা আর সজনীও তাকাল অনুষ্কার দিকে।

'তুমি কেমন করে জানলে?' সম্পি অস্পষ্ট গলায় জিগ্যেস করল।

'আমি জানি—' আত্মবিশ্বাসের জোর ফুটে বেরোল অনুষ্কার উত্তরে : 'সেদিন ঠিক কী হয়েছিল আমাকে খুলে বলো।' অনুষ্কা সম্পির কাঁধে একটা হাত রাখল : 'কোনও ভয় নেই। আমরা তোমাকে হেলপ করতে চাই...।'

তিনজনে মিলে আরও খানিকক্ষণ বোঝাতেই সম্পি নরম হল। ও দুর্বল গলায় ধীরে-ধীরে সেদিনকার সব ঘটনা খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে ইলিনা আর সজনীর ভেতরে ভয়ের হিমেল স্রোত ছড়িয়ে পড়ল। এসব কী বলছে সম্পি!

ওর কাহিনি শুনতে-শুনতে অনুষ্কা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওর ফরসা গালে গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ল।

একসময় ওরা তিনজন উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে।

ক'দিন ধরেই রোজ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে।

আজ সম্পির বাড়ি আসার ব্যাপারে অনুষ্কা একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। বলেছিল, যদি সম্পির বাড়ির রাস্তায় জল জমে যায়, তা হলে কিছুতেই ও গাড়ি থেকে নামতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সেরকম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্কা রেনকোট এবং ছাতা দুটোই নিয়ে বেরিয়েছে। এ নিয়ে ইলিনা আর সজনী ওর সঙ্গে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। কিন্তু অনুষ্কা সেই পুরোনো কথাই বলেছে : বৃষ্টি ওর ভালো লাগে না।

সম্পির বাড়ি থেকে ফেরার পর তিনটে দিন অনুষ্কা কীরকম যেন আনমনা ছিল। তারপর আজ ইলিনাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ইলিনা অন্ধকার প্রাসাদের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। না, ও মোটেই ভুল দেখছে না। আজ সত্যি-সত্যিই দুটো জানলায় আলো জ্বলছে!

'এই ছবিটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মিস্ট্রি আছে।' প্রাসাদের ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইলিনা বলল, 'আজ দেখছি দুটো জানলায় আলো জ্বলছে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম যেদিন তোমার বাড়িতে এসেছিলাম সেদিন...।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে অনুষ্কা বলল, 'বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।' তারপর ইলিনার পাশে বসে পড়ল : 'সেদিন তোমাকে বলিনি—আজ বলছি। এই বাড়িটা আমাদের পূর্বপুরুষের—তিনহাজার বছরের পুরোনো। আমাদের মতন যারা...মানে, ইয়ে...তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এই ছবিটা লাগানো আছে। এই ছবিটার একটা সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে। ওটা নিজে-নিজে অনেক কিছু করতে পারে—।'

কথা বলতে-বলতে অনুষ্কা লক্ষ করল ইলিনার মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে। ও বিছানা ঘষটে অনুষ্কার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছে।

অনুষ্কা ওর হাত চেপে ধরল। অনুনয়ের গলায় বলল, 'ইলিনা, প্লিজ... বিলিভ মি। আমি তোমার বন্ধু— বেস্ট ফ্রেন্ড। এটা ঠিকই যে, আমাদের লাইফ আর লাইফ স্টাইল তোমাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু বিশ্বাস

করো, আমরা কখনও মানুষের ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারি না। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আমরা প্রায় চারশো বছর ধরে মানুষের রক্তের তেষ্টা ভুলে গেছি! তার বদলে আমরা ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, চড়াই, পায়রা এসব দিয়ে খিদে-তেষ্টা মেটাই! আমার বাপি আর মা কী বলেন জানো? বলেন, আমাদের অবজেকটিভ হল রেগুলার চেষ্টা করে-করে ফাইনালি ভেজিটারিয়ান হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের চরম মুক্তি।'

অনুষ্কার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে ও বলল, 'আমাদের প্রবলেম একটাই, আমরা সেদ্ধ, ভাজা, পোড়ানো—মানে, রান্না করা খাবার একদম খেতে পারি না। আমাদের সিস্টেম নেয় না। তাই আমরা সবকিছু কাঁচা খাই।

'কিন্তু তা বলে আমরা হাল ছাড়িনি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। মানুষের বন্ধু হতে চেষ্টা করছি। মানুষের মতো হতে চাইছি। বিশ্বাস করো, প্লিজ...।'

অনুষ্কার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। যেন হিরের কুচি ওর ফরসা গালের ওপরে চিকচিক করছিল।

ওর দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ইলিনার মনে হল, এ চোখের জল মিথ্যে হতে পারে না। এর মধ্যে কোথায় যেন সত্যের ঝিলিক আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ইলিনার মনে এক আশ্চর্য আবেগ তৈরি হয়ে গেল। ও সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুষ্কাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখেও জল এসে গেল। কান্না জড়ানো গলায় ও বারবার বলতে লাগল, 'তুমি আমার বন্ধু, অনুষ্কা। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড...বেস্ট ফ্রেন্ড...।'

নয়

সমর্পিতা যখন স্কুলে আবার এল তখন ওর জ্বর সেরে গেছে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল। আগের চেয়ে রোগা দেখাচ্ছে ওকে। পিঠের স্কুল-ব্যাগটা প্রকাণ্ড আর বেঢপ মনে হচ্ছে।

সমর্পিতা এখন অনুষ্কার পাশে বসে। ফাঁক পেলেই ওর সঙ্গে গল্প করে। আর রনিতা ম্যাডামের ভয়ের কথা আলোচনা করে।

অনুষ্কার অন্যপাশে বসে ইলিনা। অনুষ্কার পাশে বসতে ওর ভালো লাগে তাই।

অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সমর্পিতা বুঝতে পেরেছে, অনুষ্কার বুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ এবং গভীর।

অনুষ্কার পরামর্শেই এখন ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসে। সেটা হয় সাইলেন্ট মোডে রাখে অথবা অফ করে রাখে। কারণ দিদিমণিরা টের পেলেই শাস্তি পেতে হবে।

সেদিন অনুষ্কার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ইলিনা রাতে ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারে জেগে থেকে শুধু ওই অদ্ভুত মেয়েটার কথা ভেবেছে।

ভ্যাম্পায়ারের গল্প ইলিনা বইয়ে পড়েছে, দু-একটা সিনেমাতেও দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে ভ্যাম্পায়ার হয় বলে কখনও ভাবেনি। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়াররাও যে খারাপ এবং ভালো দু-রকমের হতে পারে সেটাও কখনও ভেবে দেখেনি।

অনুষ্কা ওকে বলেছে, 'আমরা কখনও কারও ক্ষতি করি না। আমাদের ধর্মে অকারণে শক্তি ব্যবহার করা বারণ। আমাদের অনেকরকম সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। কিন্তু সেগুলো খুব জরুরি সিচুয়েশান না হলে

আমরা ইউজ করি না। আমরা সবসময় চুপচাপ থাকি, কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। কারণ, আমরা...আমরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখতে চাই।'

অনুষ্কার গোপন কথা ইলিনা কাউকে বলেনি। এমনকী মা-বাবাকেও নয়।

স্কুলে অনুষ্কার পাশে রোজ বসতে পেরে ইলিনার নিজেকে অনেক বেশি সাহসী, শক্তিশালী আর বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, রনিতা ম্যাডাম—কিংবা ওইরকম কোনও পিশাচ—ওর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

ইলিনা পরানের কথা ভাবছিল।

পরান মারা যাওয়ার পর যে-ঢেউ উঠেছিল সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে সেটা থিতিয়ে গেল। রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুল আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। এবং স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হয়ে গেল। হেডমিসট্রেস প্রীতি দত্ত নোটিশ জারি করে সে-কথা সব ক্লাসে জানিয়ে দিলেন।

সমর্পিতা মাঝে-মাঝে রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে। বন্ধুদের বলে ইতিহাস পড়া বুঝতে যাচ্ছে। আসলে ও এ-কথাই বলতে যায় যে, ও সেদিনকার কথা কাউকে বলেনি।

রনিতা ম্যাডামকে দেখে ও অবাক হয়ে যায়। এত স্বাভাবিক, এত স্নেহ-মাখানো ব্যবহার! সেদিন কর্কশ-স্বরে-কথা-বলা ভয়ংকর চেহারার যে-পিশাচকে সমর্পিতা দেখেছিল সেটা মনে হয় যেন সত্যি-সত্যি দেখার ভুল, হ্যালুসিনেশান।

রনিতা ম্যাডামের ওপর নজরদারির কাজটা ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা—তিনজনে মিলে করতে লাগল। ওরা চোখ-কান খোলা রেখে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগল। আর অনুষ্কাকে সব খবর জানাতে লাগল।

স্কুলের পিছনদিকে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে অনেক বড়-বড় গাছ আছে। সেখানে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক পুরোনো টিন, অ্যাসবেস্টস শিট, ভাঙা কাঠ, আর শ্যাওলা ধরা কয়েকশো ইট ডাঁই করে রাখা আছে।

একদিন টিফিনের সময় বাইরের মাঠে অনুষ্কা আর ইলিনা গল্প করছিল। হঠাৎ কোকিলের মিষ্টি ডাক শোনা গেল।

স্কুলের বাগানে সবসময়েই কোকিলের ডাক শোনা যায়। শুনে মনে হয় কোকিলরা শুধু বসন্তকাল নয়, বর্ষাকালেরও ইজারা নিয়ে নিয়েছে। ইলিনার খুব ইচ্ছে যে, ও 'ডাকন্ত' কোকিল দেখবে। ওর চোখ প্রায়ই সেই দৃশ্যটা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সেই 'দুর্লভ' দৃশ্যটা ও আজও খুঁজে পায়নি।

তাই টিফিনের সময় কোকিলের ডাক শুনেই ইলিনা একেবারে লাফিয়ে উঠল। ও অনুষ্কার হাত ধরে টানতে-টানতে ডাকের উৎস লক্ষ করে ছুট লাগাল।

আন্দাজে ভর করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত ওরা চলে এল স্কুলের পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে। গাছপালার অঞ্চলে ঢুকে ওপরদিকে মুখ তুলে গাছের ডালপালা আর পাতার ফাঁকে কোকিলটাকে খুঁজতে লাগল।

অনুষ্কাই প্রথম দেখতে পেল পাখিটাকে। কুচকুচে কালো রং। একটা লম্বা গাছের ওপরদিকে একটা ডালের একেবারে গোড়ায় বসে আছে পাখিটা। 'কু-উ, কু-উ' করে ডাকছে।

ইলিনা কোকিলটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছে আজ ফুলফিলড হল—।'

একটু পরেই পাখিটা উড়ে চলে গেল অন্যান্য গাছের আড়ালে।

ওরা যখন ফিরে আসছে তখনই ইলিনার চোখে পড়ল, ইট-কাঠের স্তূপের পাশে দুটো লোমশ প্রাণী পড়ে আছে।

দেখে চেনা গেল। একটা কাঠবিড়ালি, আর একটা বেজি। দুটো প্রাণী যেন পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে।

ওরা চট করে সেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে কাঠবিড়ালির দেহটা হাতে তুলে নিল অনুষ্কা। হালকা। ফাঁপা। বোঝাই যাচ্ছে, ভেতরে সারবস্তু কিছু নেই। গলার কাছটায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ইলিনা বেজির দেহটা একবার তুলেই ফেলে দিল। সেটাও চরিত্রে কাঠবিড়ালিটার মতো।

অনুষ্কা বলল, 'বুঝতে পারছ, ডেডবডিগুলো অন্যরকম?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—পরানের মতন।'

'এগুলো বেশি পুরোনো নয়। গন্ধ থেকে বুঝতে পারছি...' কাঠবিড়ালিটা ফেলে দিল : 'কিছু একটা করা দরকার...।'

ইলিনা ঘড়ি দেখল। এখুনি টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়বে। রবিনা ম্যাডামের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তাই ওরা স্কুল বিল্ডিং-এর দিকে প্রায় ছুট লাগাল।

ওদের এই কয়েকদিনের গোয়েন্দাগিরিতে একটা ব্যাপার ওরা লক্ষ করেছে। ক্লাস নাইনের 'এ' সেকশানের একজন ছাত্রী আর ক্লাস টেন 'সি' সেকশানের একজন ছাত্রী প্রায়ই রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ইলিনা, সজনী, সমর্পিতা আর অনুষ্কা ওরা যে যখন যা জানতে পারে সেটা এস-এম-এস করে বা ফোন করে বাকিদের জানিয়ে দেয়।

পরানের মৃত্যুর ঘটনার পর স্কুলের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে অনেকগুলো বাড়তি আলো লাগানো হয়েছে। স্কুল ক্যাম্পাসের রাস্তায় যেসব ল্যাম্পপোস্টের আলো খারাপ ছিল সেগুলো পালটানো হয়েছে। এ ছাড়া বড়দি উদ্যোগ নিয়ে জঙ্গলের কিনারায়, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আর ফেস্টিভ্যাল হলের চারপাশে অনেকগুলো নতুন আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এই চেষ্টা দেখে রনিতা ম্যাডাম একদিন ব্যঙ্গ করে সম্পিকে বলেছেন, 'আলো দিয়ে ভূত তাড়ানোর কনসেপ্ট বহুকাল হল বাতিল হয়ে গেছে। আলোয় আমাদের কোনও প্রবলেম নেই।' হাসলেন ম্যাডাম। তারপর : 'যখন আমাদের তেষ্টা পায় তখন কীসের আলো আর কীসের অন্ধকার! তুই-ই বল...।'

সম্পি কোনও জবাব না দিয়ে চলে এসেছিল। তারপর স্কুল ছুটির সময় বাকি তিনজন বন্ধুকে খবরটা জানিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'ওর কথার টোনে আমার মনে হয়েছে খুব শিগগিরই ওরা আর-একটা বড় কুকীর্তি করতে চলেছে...।'

ইলিনা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'রিহার্সাল আবার শুরু হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওই পিশাচটা যতই বলুক, রাতের আলোতেই ওদের অ্যাক্টিভিটি বেশি...।'

এই দুশ্চিন্তাটা ইলিনার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। চিন্তায়-চিন্তায় বহুক্ষণ একা-একা ছটফট করার পর ও অনুষ্কাকে ফোন করেছে।

অনুষ্কা ফোন ধরতেই ইলিনা বলেছে, 'শোনো, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব—।'

'বলো।'

'কাল থেকে অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তুমি কাল থেকে রিহার্সালে চলো...।'

অনুষ্কা ইতস্তত করল : 'কী করে যাই বলো তো! একে তো কোনও প্রোগ্রামে আমি নাম দিইনি, তার ওপর আমি—মানে, আমরা—মানুষদের এড়িয়ে চলি। নইলে ধরা পড়ে যেতে হয়। যেমন তোমার কাছে ধরা পড়ে গেলাম।'

'কিন্তু তুমি যদি হেলপ না করো তা হলে কেমন করে হয়! তুমিই তো বলেছ, তুমি সব জানো। তুমি ভরসা দিয়ে বলেছ ''আমি তো আছি!'' ফাংশানের রিহার্সাল রোজ সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলবে। যদি

কারও কোনও বিপদ হয়! যদি সম্পির আবার কোনও বিপদ হয়! ও তো রনিতা ম্যাডামের টার্গেট হয়ে আছে...।'

অনুষ্কা চুপ করে ভাবছিল।

ইলিনা আবার বলল, 'ওসব জানি না, তুমি কাল রিহার্সালে যাবে। আর কিছু না পারো অন্তত একটা আবৃত্তি করবে। রবিনা ম্যাডামকে বলবে। তুমি রিহার্সালে থাকলে আমরা সবাই ভরসা পাব...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনুষ্কা বলেছে, 'ঠিক আছে—কাল থেকে আমি রিহার্সালে যাব।'

আনন্দে ফুলঝুরি হয়ে গেল ইলিনা। বলল, 'থ্যাংক য়ু, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।'

পরদিন অনুষ্কাকে রিহার্সালে দেখে অনেকেই অবাক হল। এই মুখচোরা ইনট্রোভার্ট মেয়েটা অ্যানুয়াল ফাংশানে পার্টিসিপেট করবে! কিন্তু ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারল না।

ইলিনা জানে, অনুষ্কার মধ্যে এমন অনেক নাম-না-জানা গুণ আছে যার জন্য ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না।

অনেকদিন পর ফেস্টিভ্যাল হলটা জমজমাট হয়ে ওঠায় ইলিনাদের খুব ভালো লাগছিল। ওরা সবাই মিলে কলকল করে এমন গল্পে মেতে উঠল যে, ওদের চুপ করানোর জন্য শম্পা ম্যাডাম, রবিনা ম্যাডাম, কাকলি ম্যাডামকে বেশ কয়েকবার বকুনি দিতে হল। তাতে গুঞ্জনের আওয়াজ কমল বটে কিন্তু থামল না।

রিহার্সালের তদারকিতে সমর্পিতা, অঙ্গনা, সজনী, রবিনা ম্যাডাম সবাই এদিক-ওদিক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিলেন। কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তোলানো শুরু করে দিয়েছেন। শম্পা ম্যাডাম ক্লাস টেনের মধুরিমা আর শ্রাবন্তীকে নাচের একটা মুদ্রা বোঝাচ্ছেন।

সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হচ্ছে বটে!

একটা অশুভ ঘটনার পর রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তাই বড়দি বলেছেন, তিনি রিহার্সালে আজ আসবেন—তা হলে সবাই উৎসাহ পাবে। তা ছাড়া আগে রিহার্সালে শুধু চা-বিস্কুট খাওয়ানো হত—আজ থেকে বড়দি টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। বলেছেন, রিহার্সাল অনেকদিন বন্ধ থাকায় হাতে সময় অনেক কমে গেছে। তাই রোজ একটু বেশিক্ষণ ধরে রিহার্সাল করতে হবে আর সেইজন্যই 'স্পেশাল' টিফিন।

রিহার্সাল পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। প্রীতি দত্ত এখনও আসেননি। অফিসে কী যেন কাজ করছেন—সেটা সেরেই আসবেন। বড়দি যেহেতু রিহার্সালে কখনও আসেন না তাই ওঁর আসাটা একটা বড় ঘটনা।

ইলিনারা বলাবলি করতে লাগল যে, এবার হয়তো রাশভারী বড়দিকে একটু-আধটু হাসতে দেখা যাবে। এ নিয়ে সজনী আর সমর্পিতা বাজিও ধরে ফেলল।

আজকের সন্ধেটা খুব সুন্দর। কোনও বৃষ্টি নেই। সূর্য ডোবার পর হালকা ছাই রঙের আকাশ। তার ওপরে গাঢ় স্লেট রঙের লম্বা-লম্বা আঁচড়। বাতাসে গাছপালার পাতা নড়ছে।

রিহার্সাল দিতে-দিতে বাইরেটা কখন যেন আঁধার হয়ে গেল।

ইলিনা অনুষ্কার সঙ্গে গল্প করছিল। গত বছরের অ্যানুয়াল ফাংশানের কথা বলছিল। কে আবৃত্তি করতে গিয়ে কবিতার লাইন ভুলে গেছে, কে গানে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, কাকলি ম্যাডামের গলা কী মিষ্টি—এই সব গল্প করছিল।

এর মধ্যে আশাদিকে সঙ্গে করে প্রীতি দত্ত চলে এলেন। তিনি এসে পড়ায় অনেকেই তটস্থ হল, আবার খুশিও হল। তারপর টিফিনের প্যাকেট আর চা সবাইকে বিলি করা হল। সকলেই আনন্দ আর ফুর্তির মেজাজে টগবগ করছিল।

ইলিনার বেশ ভালো লাগছিল। অনুষ্কাও জমজমাট ব্যাপারটা এনজয় করছিল। ও কখনও ভাবেনি এত মানুষের মাঝে ও এরকম অস্বস্তিহীনভাবে বসে থাকতে পারবে।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পি ওর ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে ফেস্টিভ্যাল হলের জানলার কাছে চলে যাচ্ছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হয়তো সেই বিপজ্জনক সন্ধেটার কথা ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

হলের টিনের চালে থেকে-থেকেই খড়মড় আওয়াজ হচ্ছিল। ইলিনা জানে, ওগুলো গাছের শুকনো পাতা আর সরু ডালপালার শব্দ। হল ঘিরে যেসব বড়-বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো থেকে প্রায়ই ডালপাতা খসে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই আওয়াজগুলো ইলিনাকে অল্প-অল্প ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

প্রথমদিন বলে বড়দি সাতটা নাগাদ রিহার্সাল শেষ করে দিতে বললেন। ভয় এড়াতে সবাই দলবেঁধে হল থেকে বেরিয়ে মেন গেটের পথ ধরল।

ইলিনার সঙ্গে পিচের রাস্তা ধরে এগোতে-এগোতে অনুষ্কা বলল, 'মনে হয়, ভয় কেটে গেছে। ওই পিশাচরা ঘুমিয়ে পড়েছে...।'

'কী করে বুঝলে?' ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল বেস্ট ফ্রেন্ড-এর দিকে।

অনুষ্কা বলল, 'ওদের কেউ হয়তো আমাকে ফেস্টিভ্যাল হলে চিনে ফেলেছে। ওরা জানে, আমাদের মতো ভ্যাম্পায়াররা কখনও মানুষের প্রবলেমে ইনভলভড হয় না। কিন্তু আমাকে দেখে নিশ্চয়ই ওদের কেউ একজন বুঝেছে আমি তোমাদের প্রবলেমে জড়িয়ে পড়েছি—তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছি...।'

'তোমাকে ওরা এত ভয় পায়!' অবাক হয়ে বলল ইলিনা।

অনুষ্কা হাসল : 'খারাপ ভ্যাম্পায়াররা ভালোদের সবসময় ভয় পায়। ওরা আমাদের ক্ষমতার কথা জানে। তবে এটাও জানে, আমরা সবসময় নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চাই।'

'ওরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায় না?'

'চায়—কিন্তু পারে না। রক্তের তেষ্টা ওদের পাগল করে দেয়। মানুষের গন্ধ ওদের মাথা খারাপ করে দেয়। তা ছাড়া পূর্ণিমার সময় ওদের এই পাগলামিটা মারাত্মক বেড়ে ওঠে। তখন ওরা পশু কিংবা মানুষ মেরে তেষ্টা মিটিয়ে উল্লাসে নেচে বেড়ায়—কোনও জ্ঞান থাকে না।'

'যেদিন রাতে আমি ওরকম তিনটে পিশাচকে গাছে নাচানাচি করতে দেখেছিলাম সেদিন কি তা হলে পূর্ণিমা ছিল?'

'বোধহয় ছিল। সেদিন মেঘ-বৃষ্টি ছিল—তাই হয়তো বুঝতে পারোনি।'

ইলিনা কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর ভয়ে-ভয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

দূরে খেলার মাঠের কিনারায় শুকনো মরা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালার আড়ালে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। প্রায় গোল হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরেই শুক্লপক্ষের শেষ—তারপর পূর্ণিমা।

চাঁদটা অনুষ্কাকে দেখাল ইলিনা : 'ওই দ্যাখো—ক'দিন পরেই পূর্ণিমা।'

'কী করে বুঝলে?' চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কা জানতে চাইল।

'খুব সোজা।' ইলিনা বলল, 'চাঁদের ওপরদিকটা যদি ডানদিকে হেলে থাকে, তা হলে শুক্লপক্ষ চলছে। আর যদি বাঁ-দিকে হেলে থাকে তা হলে কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদের নীচের দিকের বাঁকটা সেই অনুযায়ী কৃষ্ণপক্ষের "ঋ"-ফলা আর শুক্লপক্ষের হ্রস্ব "উ"-কারের বাঁকের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। এটা আমাকে মা শিখিয়ে দিয়েছে—।' ইলিনা হাসল। কিন্তু তারপরই আসন্ন পূর্ণিমার কথা ভেবে ভয়ের গলায় বলল, 'পূর্ণিমার সময় ওরা কিছু করতে পারে...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুষ্কা বলল, 'শুধু পূর্ণিমা কেন? ভয় তো এমনিতেই আছে, কিন্তু পূর্ণিমার সময় ভয়টা আরও বেশি—'

হঠাৎই একটা ব্যাপার মনে পড়ে যাওয়ায় ইলিনা জিগ্যেস করল, 'তুমি যে বললে তোমাকে ওরা চিনে ফেলেছে—কী করে চিনতে পারল?'

অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, 'আজ রিহার্সালে আমি টিফিন খাইনি—চা-ও খাইনি। সেটা হয়তো ওদের কেউ লক্ষ করেছে। তা ছাড়া আমাদের দেখতে খুউব সুন্দর হয়। আর আমাদের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয় অনেকটা দারচিনির গন্ধের মতো...।'

চেনার চিহ্নগুলো মনে-মনে খতিয়ে দেখল ইলিনা। তারপর গন্ধটার কথা ওর মনে পড়ল। ও অনুষ্কার গাড়িতে আর বাড়িতে এইরকম গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু গা থেকে ওরকম গন্ধ বেরোলে তো এখনও সেই গন্ধ ইলিনার নাকে আসার কথা!

ওর মনের কথা কী করে যেন টের পেয়ে গেল অনুষ্কা। বলল, 'ইলিনা, তোমার সঙ্গে আমার একটা মেন্টাল ম্যাচিং হয়ে গেছে। অনেকটা যেন রেডিয়ো স্টেশান ধরার টিউনিং-এর মতো। তাই তুমি হয়তো দু-একবার আচমকা ওই স্মেলটা পেয়ে গেছ। আসলে ওই গন্ধটা কুকুরের নাকে ধরা পড়ে—আর ওই পিশাচদের নাকেও। কুকুর প্রায় ন'হাজার রকম গন্ধ চিনতে পারে, মনে রাখতে পারে। আমরা প্রায় পাঁচশো রকম গন্ধ চিনতে পারি। রনিতা ম্যাডামের মতো পিশাচরাও তাই। তবে...।'

'আর আমরা? আমরা কতরকম গন্ধ চিনতে পারি?'

হাসল অনুষ্কা : 'কিছু মনে কোরো না। তোমাদের বেলায় সংখ্যাটা মাত্র সত্তর থেকে আশি। আর তার মধ্যে এই দারচিনির মতো গন্ধটা পড়ে না। যেমন, তুমি এখন এই গন্ধটা পাচ্ছ না, তাই না?'

বিহ্বলভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল ইলিনা। সত্যিই ওই গন্ধটা ও এখন পাচ্ছে না। ওই দু-বার ছাড়া কখনও পায়নি।

হঠাৎই অনুষ্কার জন্য ভয় পেল ইলিনা। যদি ওই পিশাচগুলো অনুষ্কার কোনও ক্ষতি করে?

সে-কথাই জিগ্যেস করল ওকে।

অনুষ্কা ছোট্ট করে হেসে বলল, 'ভয় পেয়ো না। সেটা কিছুতেই পারবে না।'

ওরা গাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। অনুষ্কা ইলিনাকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দেবে এরকমই কথা হয়েছিল। তাই দুজনেই উঠে বসল গাড়িতে।

অনুষ্কার বাবা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। হেডলাইট জ্বেলে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, 'কী, ফাংশানের রিহার্সাল কেমন হল?'

দুজনেই বলল, 'ভালো—।'

'গুড—ভেরি গুড।' বলে অনুষ্কার বাবা হাসলেন।

দশ

চাঁদকে দেখে পূর্ণিমা বোঝার উপায় ছিল না, কারণ, আকাশের মেঘ পুরু আড়াল তৈরি করেছিল। গতকাল থেকেই বৃষ্টির আশা তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টি এখনও সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছে।

ফেস্টিভ্যাল হলে রিহার্সাল চলছিল। যাদের হাজির থাকার কথা তারা সবাই হাজির। দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে মেয়েরা কাকলি ম্যাডাম আর শম্পা ম্যাডামের কাছে তালিম নিচ্ছিল। রবিনা ম্যাডাম একপাশে বসে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'র পাতা ওলটাচ্ছিলেন আর মাঝে-মাঝে কয়েকটা সাদা পাতায় কী যেন টুকে নিচ্ছিলেন।

বড়দি আজ আসেননি, তবে ওঁর চালু করে দেওয়া টিফিন আর চায়ের নিয়মটা পালটায়নি।

আজও যথারীতি অনুষ্কা চা-টিফিন খায়নি। 'বাইরের জিনিস খাওয়া ডাক্তারের বারণ' বলে এড়িয়ে গেছে।

ও একটা কাগজ হাতে ধরে বসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটা লেখা। রবিনা ম্যাডাম ওকে এই কবিতাটা তৈরি করতে বলেছেন।

রিহার্সালের জন্য সামান্য হট্টগোল চলছিল। তার মধ্যে হঠাৎই একটা শব্দ সমর্পিতার কানে গেল। হলের টিনের চালে একটা জোরালো শব্দ হয়েছে। বোধহয় বড় মাপের কোনও গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে।

সম্পি বোধহয় ওর ডাকাবুকো স্বভাবের পুরোটা এখনও ছাড়তে পারেনি। আর তার সঙ্গে ওর শখের গোয়েন্দা হয়ে ওঠার শখটাও ছাড়েনি। তাই ও চট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ঢাউস স্কুল-ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল হলের বাইরে।

ইলিনা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। ও অনুষ্কাকে বলল, 'যাই, কী ব্যাপার একবার দেখে আসি—।' তারপর উঠে রওনা হল।

হলের বাইরে বেশ কয়েকটা আলো লাগানো, কিন্তু উঁচু চালের কাছটায় অন্ধকার। চালের ওপরে গাছের ডালপালা আর পাতা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, গাছের ডাল আর পাতা সরিয়ে খুব ক্ষিপ্রভাবে এদিক থেকে ওদিক চলাফেরা করছে।

সম্পিকে দেখতে পেল ইলিনা। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে।

রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে টিচার্স রুমের সেই ঘটনার পর থেকে সম্পির একটা ব্যাপার ইলিনা লক্ষ করেছে : সম্পি কখনও ওর স্কুল-ব্যাগটা কাছ-ছাড়া করে না।

ইলিনা সম্পির কাছে গিয়ে দাঁড়াল : 'কিছু দেখতে পেলি?'

'হ্যাঁ—কিছু একটা হলের চালের ওপরে ঘোরাফেরা করছে।'

'বোধহয় ভাম-টাম কিছু হবে।'

ইলিনা এ-কথা বলল কারণ, স্কুল চত্বরে মাঝে-মাঝে ভাম দেখা যায়।

ওর কথার উত্তরে সম্পি বলল, 'হ্যাঁ, ভাম হতে পারে। তবে প্রবলেমটা হল ভামটা আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস পরে রয়েছে।'

ইলিনা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল সম্পির দিকে। তারপর মোবাইল ফোন উঁচিয়ে ধরে বলল, 'অনুষ্কাকে ফোন করে ডাকব?'

'না, না—এখনও সেরকম কিছু সিচুয়েশান হয়নি।' সম্পি হাত নেড়ে বারণ করল : 'তা ছাড়া অন্য সবাই সন্দেহ করতে পারে। তারপর রনিতা ম্যাডাম জানতে পারবেন...। চল, ফিরে যাই।'

ওরা দুজন হলে ফিরে চলল।

সম্পি বলল, 'রনিতা ম্যাডামের সঙ্গের দুটো মেয়েকে আমরা চিনতে পারিনি। তা ছাড়া এর মধ্যে কারও ঘাড়ে ওরা কামড় বসিয়েছে কি না কে জানে! সংখ্যাটা তা হলে তিন থেকে আরও বেড়ে যাবে...।'

ইলিনার অনুষ্কার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, পূর্ণিমার রাতে ওই পিশাচগুলো পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আজ ওরা একটা কিছু করবেই। অনুষ্কাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা ভয় পায় না। ওরা এখন বোধহয় সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ইলিনা আর সমর্পিতা ফেস্টিভ্যাল হলে ঢুকে পড়ল। তারপর ওরা অনুষ্কা আর সজনীর কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

সম্পি চাপা গলায় চালে শব্দ হওয়ার ব্যাপারটা ওদের বলল।

একটু পরেই সম্পি বলল, 'অ্যাই, আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।' ও ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজনও উঠে পড়ল, বলল, 'চল আমরাও যাই—।'

অনুষ্কা রবিনা ম্যাডামের কাছে গিয়ে চাপা গলায় টয়লেটে যাওয়ার পারমিশান নিল। তারপর ওরা চারজন আবার বেরিয়ে এল হলের বাইরে।

আকাশে এখনও মেঘ। চাঁদ মেঘের আড়ালে থাকলেও চাঁদের ঘোলাটে জ্যোতি দেখা যাচ্ছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। বড়-বড় গাছের পাতা এলোমেলো নড়ছে, পাতায়-পাতায় ঘষা লেগে খসখস শব্দ হচ্ছে।

ফেস্টিভ্যাল হল থেকে বেরিয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে টয়লেট। জায়গাটা স্কুল-বিল্ডিং-এর পিছনদিক। টয়লেটের বাঁ-দিকে রেলিং ঘেরা বাগান। আর ডানদিকে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

এই টয়লেটটা সাধারণত তালা দেওয়া থাকে। এখন রিহার্সাল চলছে বলে বড়দির নির্দেশে তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। মাঠে যখন প্যান্ডেল বেঁধে স্কুলের কোনও ফাংশান-টাংশান হয় তখন এই টয়লেটটা গেস্টদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ওরা চারজন টয়লেটের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝিলমিল লাগানো বিশাল দরজা—প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তিনটে সিঁড়ির ধাপ উঠে তারপর টয়লেটে ঢুকতে হয়।

সম্পি বলল ও আগে যাবে। তখন ইলিনা বলল, 'তোর ব্যাগটা আমার কাছে দিয়ে যা—।'

তাতে ও স্পষ্ট জবাব দিল, 'না রে, ব্যাগটা আমার সঙ্গেই থাক...।' তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে গেল।

ব্রিটিশ আমলের টয়লেট। তার সিলিং যেমন উঁচু, আকারও তেমনি বিশাল। তবে মাত্র একজন ব্যবহার করতে পারে।

টয়লেটে চল্লিশ ওয়াটের দুটো বালব জ্বলছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে বড় ওয়াশ বেসিন। তার ওপরে বিরাট মাপের বেলজিয়ান আয়না। তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বাথটাব। লম্বায় প্রায় আট ফুট হবে। তার সাদা রং অনেক জায়গায় চটে গিয়ে জং ধরা লোহা বেরিয়ে পড়েছে।

ডানদিকে বড় মাপের ইউরিনাল কিউবিকল, আর তার পাশে একটা ছোট ঘর হল ল্যাট্রিন।

টয়লেটের দেওয়ালে-দেওয়ালে ঝুল-কালি আর মাকড়সার জাল দেখে বোঝাই যায় এটা খুব কম ব্যবহার হয়।

টয়লেটের দরজা বন্ধ করল সম্পি। তারপর দু-পাল্লার ঝিলমিলের ওপরে কাঠের লক আটকে দিল।

এবার ও টয়লেটের প্রতিটি আনাচকানাচ খতিয়ে দেখে নিল যে, টয়লেটে সত্যিই ও একা।

সিলিং-এর দিকে তাকাল সম্পি। অনেক উঁচুতে চার দেওয়ালে চারটে বড় মাপের ভেন্টিলেটার। তার চারপাশে মোটা-মোটা ঝুল জমে আছে।

সম্পির একটু ভয়-ভয় করছিল। ও ব্যাগটা শুকনো মেঝেতে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ইউরিনাল কিউবিকল-এ ঢুকল। তখনই যেন একটা ছোট্ট কাশির শব্দ শুনতে পেল।

ও গলা বাড়িয়ে বাইরেটা আবার দেখে নিল। কেউ নেই।

ভাগ্যিস ও ভয়ে চিৎকার করে ওঠেনি! স্কুলে ডাকাবুকো বলে যার পরিচয়, তাকে সবাই ভিতুর ডিম বলে ডাকুক এটা ও কিছুতেই চায় না।

কিন্তু ইউরিনাল কিউবিকল থেকে ও যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন টয়লেটে ও একা নয়। টয়লেটের দরজার কাছে রনিতা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর মুখটা এখনও পালটে যায়নি, কিন্তু দু-চোখে সাদা আলো জ্বলছে।

ম্যাডামের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুল ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়ে। সম্পি ওর নাম জানে না, তবে মুখটা চেনে। যতদূর মনে পড়ছে, মেয়েটা ক্লাস নাইনের 'সি' সেকশানে পড়ে। ওর চোখেও সাদা আলো ধকধক করে জ্বলছে।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা সম্পি ততটা ভয় পেল না। কারণ, দরজার বাইরে ওর তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আবার অনুষ্কা রয়েছে।

কিন্তু এই পিশাচ দুটো কোথায় লুকিয়ে ছিল? সম্পি তো এদের খুঁজে পায়নি! তা হলে কি ল্যাট্রিনের ছাদের ওপরে লেপটে শুয়ে ছিল?

সম্পি চিৎকার করার কথা ভাবল। কিন্তু দরজার ঠিক বাইরেই যখন তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তখন চিৎকার না করে, ওদের স্বাভাবিক গলায় ডাকলেই হয়। তা হলে ওরা বুঝবে, সম্পি ভিতু নয়।

সম্পি 'ইলিনা! ইলিনা!' বলে ডেকে উঠল। ডাকটা সম্পির অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিৎকারের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

পিশাচ দুটো চাপা খিলখিল হাসিতে ঢলে পড়ল। গোপন রসিকতায় এ ওর গায়ে ঠেলা মারতে লাগল। রনিতা ম্যাডাম ওঁর ছাত্রীর যেন ইয়ার-দোস্ত হয়ে গেছেন।

'ওরা কেউ নেই রে। ওরা চলে গেছে।' হেসে বললেন রনিতা। ওঁর গলাটা অস্বাভাবিকরকম মিহি শোনাল : 'আমাদের মতো আর-একজন ওদের মিছে কথা বলে ডেকে নিয়ে গেছে। তোর পাহারা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

পিশাচের কথা বিশ্বাস করল না সমর্পিতা। ও আবার ইলিনা আর অনুষ্কার নাম ধরে জোরে-জোরে ডেকে উঠল—একবার, দু-বার, তিনবার।

না, কেউ সাড়া দিল না। সম্পির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

পিশাচ দুটো আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। কাচের চুড়ির সঙ্গে কাচের চুড়ি ঠোকাঠুকি লাগল যেন। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল।

'কেউ নেই—' আঙুল ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বললেন রনিতা, 'তুই এখন আমাদের। তোর বন্ধু অনুষ্কা—ওই ন্যাকা ভ্যাম্পায়ারটা—ওকেও আজ আমরা খতম করব। ভ্যাম্পায়ার, কিন্তু মানুষ ধরা পছন্দ করে না। ন্যাকাষষ্ঠী! বেড়াল বলে মাছ ছোঁব না! তার উপর আমাদের পিণ্ডি চটকানোর প্ল্যান আঁটছে! আজ দেখব ওর দৌড় কত!'

'তোকে আজ কেউ বাঁচাতে পারবে না।' রনিতার সঙ্গী পিশাচটা বলল, 'আজ আমাদের পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল...।'

সম্পি ঝুঁকে পড়ে ওর ব্যাগ খুলল। একটা জলের বোতল বের করে ছিপি খুলল। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।

পিশাচ দুটো বিদ্যুৎঝলকের মতো লাফ দিল। এক লহমায় চলে এল সম্পির কাছে। ওর দু-পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াল। লম্বা জিভ বের করে ওর ঘাড়-গলা চাটতে লাগল। আর মুখ থেকে জড়ানো গলায় 'আঃ—! আঃ—!' করে লোভের শব্দ বের করতে লাগল।

সমর্পিতার গা ঘিনঘিন করছিল কিন্তু একইসঙ্গে আরাম কিংবা তৃপ্তির ঝিমুনি লাগছিল। সেই অবস্থাতেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল : এই পিশাচগুলো কি সম্মোহন জানে?

রনিতা ম্যাডাম সম্পির হাতের জলের বোতলের দিকে তাকিয়ে নেশা-ধরা গলায় বললেন, 'সম্পি, তোর তেষ্টা পাচ্ছে, তেষ্টা?...আমাদেরও পাচ্ছে...দারুণ তেষ্টা...তেষ্টা—আ—আ—আঃ...!'

রনিতা ম্যাডামের কথা শেষ হওয়ার আগেই জলের বোতলটা ওঁর মাথায় উপুড় করে দিল সম্পি। তাই রনিতার শেষ দিকের 'আঃ!'-টা আরামের চিৎকার থেকে যন্ত্রণার চিৎকারে বদলে গেল।

মানুষের মাথার ওপরে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতল উপুড় করে দিলে যে-দশা হয়, রনিতা ম্যাডামের দশা তার চেয়েও দশগুণ খারাপ হয়ে গেল।

ওর শরীর গাঢ় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। গরম তেলের ওপর জলের ফোঁটা পড়ল যেরকম চড়বড়-চড়বড় শব্দ হয় সেরকম শব্দ হতে লাগল। তার সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণার মরণ আর্তনাদ।

ধোঁয়াটে রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন দলা পাকিয়ে খসে পড়ল মেঝেতে।

বৃষ্টির জলের সত্যি-সত্যি এত শক্তি!

সম্পি তাজ্জব হয়ে গেল। এই পিশাচটাকে নিকেশ করার জন্য ও কতদিন ধরে বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখেছিল। দুটো প্লাস্টিকের বোতলে সেই জল ভরে ও সেই কবে থেকে স্কুল-ব্যাগে বোতলগুলো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে!

আজ সেটা কাজে এল।

ধেড়ে পিশাচ তো পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু কচিটা?

সেটা তখন সম্পিকে জাপটে ধরে ইস্পাতের দাঁতের পাটি ফাঁক করেছে। এবং সেই ধারালো দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে সমর্পিতার গলায়।

সম্পি এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল—অনেকটা যুদ্ধের ডাকের মতো। তারপর বোতলে যে-সামান্য জল ছিল সেটা ছুড়ে দিল দ্বিতীয় পিশাচের গায়ে।

পিশাচটার গা থেকে ধোঁয়া বেরোল। ওটা চকিতে দু-পা পিছিয়ে গেল সম্পির কাছ থেকে।

সমর্পিতা এইটুকু সময়ই চাইছিল। যন্ত্রের মতো নির্ভুল দ্রুতগতিতে ও ব্যাগ থেকে দ্বিতীয় জলের বোতলটা বের করে নিল। একলাফে আহত পিশাচটার কাছে পৌঁছে গেল। ছিপি খুলে বোতলের জল ঢেলে দিল ওটার মাথায়।

ধোঁয়া। চড়বড় শব্দ। যন্ত্রণার চিৎকার।

পিশাচটা পড়ে গেল মেঝেতে। ধোঁয়ায় মাখামাখি হয়ে ছটফট করতে লাগল।

দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে দরজার দিকে পাগলের মতো ছুট লাগল সম্পি। একইসঙ্গে খ্যাপাটে চিৎকার করতে লাগল। হাতের খালি বোতলটা এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে টয়লেটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর ছিটকিনি খুলে সোজা বাইরে।

সম্পি বাইরে এলেও ওর চিৎকার থামেনি। চিৎকার করতে-করতে ও ছুটে গেল ফেস্টিভ্যাল হলের দরজার দিকে।

ওর চিৎকার শুনে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজার কাছে ভিড় করে সবাই দাঁড়িয়ে। পুরোনো ঘটনার কথা মনে রেখে কেউই এগোতে সাহস পায়নি।

সম্পি ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলি ম্যাডামকে দেখতে পেয়ে ওঁর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকৃত গলায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘পিশাচ! পূর্ণিমা! পিশাচ! টয়লেটে। রনিতা...রনিতা ম্যাডাম...পিশাচ!’

এটুকু শুনেই কাকলি ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সম্পি টাল সামলাতে না পেরে আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল— কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল।

মেয়েরা কাকলি ম্যাডামকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

অন্যরা সমর্পিতাকে ঘিরে ধরে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।

ও বড়-বড় শ্বাস টেনে অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে জড়ানো এলোমেলো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধাতস্থ হয়ে সম্পি টয়লেটের ভয়ংকর ঘটনা সবাইকে খুলে বলল। তারপর জিগ্যেস করল, ইলিনা, সজনী, অনুষ্কা ওরা কোথায়।

কেউই কিছু বলতে পারল না। সবাই শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ভয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে রইল।

হঠাৎই একটি মেয়ে বলল, ‘তোমার সঙ্গেই তো ওরা তিনজন হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো আর দেখিনি—।’

তা সত্ত্বেও সম্পির চোখ ভিড়ের মধ্যে তিন বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। কোথায় গেল ওরা? ওদের ফোন করার কোনও উপায় নেই, কারণ মোবাইল ফোন ও টয়লেটে ব্যাগে ফেলে এসেছে।

সম্পি এতক্ষণে ভয় কাটিয়ে দম ফিরে পেয়েছিল। ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে জুতসই একজন সঙ্গী খুঁজতে লাগল। ইলিনাদের খোঁজার জন্য কয়েকজনকে ও সঙ্গে নিতে চায়।

ও সামনে দাঁড়ানো দুজন মেয়েকে বলল, ‘আমি ইলিনাদের খুঁজতে যাব। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?’

ওর কথায় দুজনের জায়গায় ছ’জন ওর কাছে এগিয়ে এল : ‘চলো, আমরা যাব...।’

সম্পির চোখ সাহসী রবিনা ম্যাডামকে খুঁজল কিন্তু দেখতে পেল না।

কয়েকজনকে জিগ্যেস করে জানল, মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে ক্লাস নাইনের একটি মেয়ে এসে রবিনা ম্যাডামকে কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেছে।

সম্পি আর দাঁড়াল না। ওর মন কু-ডাক ডাকতে লাগল। ওর মনে হল, রবিনা ম্যাডাম, ইলিনা, সজনীদের খুব বিপদ। কারণ আজ পূর্ণিমা।

অনুষ্কা কি পারবে সবাইকে বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সম্পি পিচের রাস্তা ধরে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে রওনা হল। প্রায় সাত-আটজন মেয়ে দল বেঁধে ওর সঙ্গী হল। শম্পা ম্যাডাম বারবার সম্পিকে ডাকলেন, অন্ধকারে এসব খোঁজাখুঁজির কাণ্ড থামাতে বললেন। কিন্তু সম্পির আজ কোনও বারণ না শোনার দিন।

নিরুপায় শম্পা ম্যাডাম তখন মোবাইল ফোন নিয়ে বড়দিকে ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সম্পিরা তখন হইহই করে এগিয়ে চলেছে। থেকে-থেকে ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কার নাম ধরে ডাকছে।

আকাশের চাঁদের দিকে সম্পির চোখ গেল।

মেঘের আড়াল সরিয়ে ফ্যাকাসে হলদে চাঁদ কখন যেন বেরিয়ে এসেছে।

এগারো

উদভ্রান্তের মতো যে-মেয়েটি ওদের কাছে ছুটে এল ইলিনারা ওর মুখ চেনে, কিন্তু নাম জানে না। ক্লাস টেন-এর-ই অন্য কোনও একটা সেকশানে যেন পড়ে।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা টয়লেটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সমর্পিতার বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মেয়েটা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘তোমাদের তিনজনকে...রবিনা ম্যাডাম...এক্ষুনি ডাকছেন। তোমাদের নাম ইলিনা, সজনী আর...আর অনুষ্কা তো?’

ওরা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

‘তোমাদের...তোমাদের রবিনা ম্যাডাম...এক্ষুনি ডাকছেন...খুব দরকার।’

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় যতটুকু দেখা গেল তাতে ‘খুব দরকার’ ভাবটা মেয়েটির চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছিল।

‘ম্যাডাম কোথায়? ফেস্টিভ্যাল হলে?’

‘না, ম্যাডাম হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসের পেছনের দিকে গেলেন। তোমাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে বললেন...।’

ইলিনারা ইতস্তত করল। এ ওর দিকে তাকাল। রবিনা ম্যাডাম হঠাৎ ক্যাম্পাসের পিছনদিকে কী করতে গেলেন?

অনুষ্কা বলল, 'ইলিনা, সজনী—তোমরা বরং যাও, আমি এখানে থাকছি।'

মেয়েটি অসহায়ের মতো বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম যে তিনজনকেই ডেকেছেন—বলেছেন ভীষণ আর্জেন্ট...।'

তখন অনুষ্কা ওকে বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের এক বন্ধু টয়লেটে গেছে। আমরা ইন ফ্যাক্ট ওর জন্যেই ওয়েট করছি। ও বেরোলে আমরা...।'

মেয়েটি বেশ বিপন্ন গলায় বলল, 'তা হলে তো খুব প্রবলেমে পড়লাম! ম্যাডাম যেভাবে বললেন...।'

ইলিনা মোবাইল ফোন বের করে সমর্পিতাকে ফোন করতে লাগল।

রিং বেজে গেল, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। তখন ইলিনা ফোন কেটে দিল।

'ফোন বেজে যাচ্ছে। ও ধরছে না—।'

সজনী বলল, 'ওর ফোনটা নিশ্চয়ই সাইলেন্ট মোডে আছে—।'

অনুষ্কা বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা দুজন যাও—নিশ্চয়ই ওখানে কোনও প্রবলেম হয়েছে। আমি এখানে থাকছি। সম্পি টয়লেট থেকে বেরোলে তারপর আমি যাব। কোনও ভয় নেই—।'

'ভয়? ভয় কীসের?' অন্য মেয়েটি কৌতূহলে জানতে চাইল।

ইলিনা আর সজনী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—এমনি। চলো, যাই...।'

ওরা দুজনে যখন মেয়েটির সঙ্গে এগোচ্ছে তখন অনুষ্কা ডেকে বলল, 'কোনও প্রবলেম হলেই আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন কোরো। সম্পি বেরোলেই আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি—।'

'ঠিক আছে।' বলে ওরা জোর পায়ে হাঁটা দিল।

দু-পাশে গাছপালা, মাঝখান দিয়ে পিচের রাস্তা। ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলো এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। অন্ধকার আর আলো দাবার ছক তৈরি করেছে যেন।

রিহার্সালের গানের আওয়াজ কানে আসছে। তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ।

অনুষ্কা আনমনাভাবেই আকাশের চাঁদের দিকে তাকাল। কী সুন্দর গোল আর স্পষ্ট। ওর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। ছবির চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়েছে কি না কে জানে! প্রকৃতির সঙ্গে ওই ছবিটা সবসময় মেলে না।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কার কেমন ঘোর লেগে গেল। ও অপলকে তাকিয়ে নিশিনাথকে দেখতে লাগল।

হঠাৎই অনুষ্কার হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইল ফোন থরথর করে কেঁপে উঠল। ও চমকে উঠে ফোনের পরদার দিকে তাকাল।

ইলিনা।

ফোন ধরতেই ইলিনার বিপন্ন গলা শোনা গেল। শুধু বিপন্ন নয়, ওর গলা কাঁপছে।

'অনুষ্কা, শিগগির এসো—সর্বনাশ হয়েছে!'

'তোমরা কোথায়?'

'পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে—যেখানে তুমি আর আমি কোকিল দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ইটের পাঁজা...।'

আর শোনার দরকার মনে করল না অনুষ্কা। ফোন কেটে দিয়ে পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে শুরু করল।

আলো আর অন্ধকারে ওর শরীরটা একবার দেখা যাচ্ছিল, একবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। যেন ওর ছুটন্ত শরীরটা জ্বলছে-নিভছে।

ছুটতে-ছুটতে অনুষ্কার মনে হল, টয়লেটের দিক থেকে একটা মিয়োনো ডাক যেন ভেসে এল। ইলিনার নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল যেন।

কিন্তু ওর সামনে দু-বন্ধুর ডাক, পিছনে এক বন্ধুর ডাক। তাই অনুষ্কা দৌড় থামাল না—ছুটতেই থাকল। সেই অবস্থাতেই ও লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে শূন্যে ভেসে উঠে অলৌকিক গতিতে দূরত্ব কমাতে লাগল।

মনে হচ্ছিল যেন ও উড়ে চলেছে। অন্ধকার কিংবা গাছপালা ওর গতি রুখতে পারছিল না। ওকে এই অবস্থায় দেখলে যে-কেউ স্তম্ভিত হয়ে যেত, ভয় পেত।

অকুস্থলে পৌঁছতে অনুষ্কার সময় লাগল আট সেকেন্ডেরও কম। রাস্তা ছেড়ে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

ওই তো, পুরোনো টিন, কাঠ আর অ্যাসবেস্টস। তার পাশে ইটের পাঁজা। ইটের পাঁজার ওপরে শুয়ে আছে ওরা দুজন কে? শুয়ে-শুয়ে ছটফট করছে? গায়ে স্কুল-ড্রেস?

জায়গাটা অন্ধকার। গাছপালার পাতার আড়াল থাকায় চাঁদের আলোও সেখানে ঢোকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্যাম্পায়ার মেয়ের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

চিত হয়ে শুয়ে আকুলিবিকুলি করছে ইলিনা আর সজনী। ওরা যে চিৎকার করতে পারছে না তার কারণ স্কুল-ড্রেস পরা একটা পিশাচ ওদের ওপর উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পিশাচটার মুখ ভয়ংকর, চোখ জ্বলছে, ইস্পাতের দাঁত ঝিলিক দিচ্ছে।

কিন্তু রবিনা ম্যাডাম কোথায়?

প্রশ্নটা অনুষ্কার মনে ঝলসে গেলেও একইসঙ্গে ও প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করল।

ও ইলিনাদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দূরত্বটাকে ও মোটেই কমাতে চেষ্টা করল না। ওখানে দাঁড়িয়েই ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

হাতটা পলকে রবারের মতো লম্বা হয়ে গেল। একইসঙ্গে হাতের পেশি, শিরা-উপশিরা সব দেখা গেল। যেন অনুষ্কার হাতটা স্বচ্ছ কাচের তৈরি।

পিশাচটা ততক্ষণে ইলিনার গলার খাঁজে কামড় বসিয়েছে। আর ঠিক তখনই অনুষ্কার হাতের চেটোতে কতকগুলো কাঁটা গজিয়ে গেছে—ছুচলো ইস্পাতের কাঁটা।

সেই হাতে বজ্রমুঠিতে পিশাচটার ঘাড় চেপে ধরল অনুষ্কা। শরীর থেকে যেমন করে জোঁক ছাড়ায় সেভাবে পিশাচটাকে ইলিনার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল, এক হ্যাঁচকায় টেনে নিল নিজের কাছে।

ইলিনা আর সজনী এবার প্রাণপণ চিৎকার জুড়ে দিল। সেই চিৎকারে গাছপালার ঘুমন্ত পাখিরা জেগে উঠে ডাকতে লাগল, ওড়াউড়ি শুরু করল।

ইলিনারা টের পেল দারচিনির গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

ইলিনার গলা থেকে রক্ত পড়ছিল, মাথা টলে যাচ্ছিল। ও কোনওরকমে উঠে বসল। তাকাল অনুষ্কার দিকে।

সজনীও তাকাল।

ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ইলিনার প্রিয়তম ভ্যাম্পায়ার! শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে।

অনুষ্কার হাতের মুঠোয় পিশাচটার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওটা হাঁ করে বাতাস টানার চেষ্টা করছিল। যন্ত্রণার চিৎকার করছিল। ইস্পাতের দাঁতের পাটি ঝকঝক করছে। আর তার ফাঁকে সাপের মতো কুণ্ডলী

পাকানো একটা কালো রঙের জিভ। সেটা কখনও-কখনও লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

অনুষ্কার শক্তি এতটাই যে, পিশাচটা তার কানাকড়িও ডিঙোতে পারছিল না। তাই জেতার চেষ্টা করতে-করতে ওটা কাহিল হয়ে পড়ল।

অনুষ্কা মোবাইল ফোন ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতে পিশাচটার নাক চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ করে পিশাচটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে।

অনুষ্কা ওটাকে ছেড়ে দিল। ওটার নিষ্প্রাণ শরীরটা ভেজা কাপড়ের মতো খসে পড়ল মাটিতে। পড়েই রইল।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

ইলিনা আর সজনী থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

এই তা হলে অনুষ্কার গোপন শক্তি! অনুষ্কা না থাকলে ইলিনারা আজ বাঁচত না।

কৃতজ্ঞতার আবেগে ইলিনার কান্না পেয়ে গেল। একইসঙ্গে গলার অসহ্য যন্ত্রণা ওকে অজ্ঞান করে দিতে চাইছিল। ও সজনীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল।

সজনীর অবস্থা তখন সাংঘাতিক। ওর বুক ধড়াস-ধড়াস করছিল। আধো-অন্ধকারে এইমাত্র ও কী দেখল? ওদের বন্ধু অনুষ্কা! সে কেমন পালটে ভয়ংকর হয়ে গেল! অমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমানুষিক লড়াই করল!

সজনীর বুক ঠেলে কান্না উথলে উঠছিল। একইসঙ্গে একটা অচেনা ভয় ওকে অবশ করে দিচ্ছিল।

ইলিনা আর সজনী নেমে এল ইটের পাঁজা থেকে। দুজনেই ভয়ে কাঁপছে, কাঁদছে।

ইলিনার স্কুল-ড্রেস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ও সজনীকে আঁকড়ে ধরে পা ফেলছিল। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠছিল।

অনুষ্কা ছুটে গিয়ে ওদের জাপটে ধরল। ওরা তিনজনেই হাঁপাচ্ছিল। কাঁদছিল। আর সজনী শিউরে উঠছিল।

একটু পরে অনুষ্কা সজনীকে বলল, 'শিগগির সম্পিকে একটা ফোন করো...।' কথাটা বলেই ও ইলিনার গলায় নিজের রুমালটা চেপে ধরল। যে করে হোক রক্তটা বন্ধ করা দরকার।

সজনী কান্না-ভাঙা কাঁপা গলায় বলল, 'আমাদের দুজনের কারও মোবাইল নেই। গণ্ডগোলের সময় কোথায় ছিটকে পড়েছে জানি না...।'

'আমার ফোন থেকে ফোন করো। ওই তো আমার ফোন ওখানে পড়ে আছে।'

সজনী এগিয়ে গেল সামনে। অন্ধকারে হাতড়ে অনুষ্কার মোবাইলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।

সম্পিকে ও ফোন করতে যাবে, তখনই অনুষ্কা জিগ্যেস করল, 'আমরা যে পিশাচটাকে খতম করলাম সেটাই কি টয়লেটের ওখানে আমাদের ডাকতে গিয়েছিল?'

সজনী নাক টেনে-টেনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'না, ও ভালো মেয়ে। এখানে এসে দূর থেকে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিয়েই ও ছুটে আবার ফেস্টিভ্যাল হলে চলে গেছে। আমরা এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে খুঁজছি, তখনই ওই শয়তান পিশাচটা এগিয়ে এল। তারপর...।'

সজনী কথা বলছিল আর একইসঙ্গে সম্পির নম্বর ডায়াল করে মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরেছিল।

রিং হয়ে যাচ্ছে। ফোন কেউ ধরছে না।

সে-কথাই ও বলল অনুষ্কাকে।

অনুষ্কা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওঃ, আবার সেই সাইলেন্ট মোড! শিগগিরই চলো, ইলিনাকে এখুনি ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। কুইক—।'

ইলিনা অনুষ্কার গায়ে প্রায় এলিয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে 'ও—ওঃ! ও—ওঃ!' শব্দ করে কাতরাচ্ছিল।

ওকে যে করে হোক সুস্থ করে তুলতে হবে। অনুষ্কা ভাবল। আরও গাঢ় করে ইলিনাকে জাপটে ধরল ও।

সজনীকে ডেকে নিয়ে এগোতে যাবে তখনই ওর মনে পড়ল রবিনা ম্যাডামের কথা। যাঁর নাম করে সেই মেয়েটা ওদের ডেকে নিয়ে এল সেই রবিনা ম্যাডাম কোথায়? আর কোন আর্জেন্ট কাজের জন্য তিনি ওদের তিনজনকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

সজনীকে রবিনা ম্যাডামের কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'জানি না। এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে আমরা একবারও দেখিনি। যখন ম্যাডামকে খোঁজাখুঁজি করছি তখন ইটের পাঁজার আড়াল থেকে ওই ভয়ংকর পিশাচটা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তো তুমি এলে...।'

ইলিনা যন্ত্রণায় রুদ্ধ গলায় কোনওরকমে বলল, 'অনুষ্কা, রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো?'

সজনী সে-কথায় সায় দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম। রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো!'

'না রে, আমার কোনও বিপদ হয়নি।' উত্তর দিলেন রবিনা ম্যাডাম নিজেই, 'এখন আমার আর কোনও বিপদের ভয় নেই...।'

ওরা তিনজনে চমকে উঠল। শব্দ লক্ষ করে তাকাল।

কাছেই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে রবিনা ম্যাডামের দেহটা লেপটে আছে। মাটি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাত উঁচুতে ওঁর শরীরটা উলটোভাবে শূন্যে ঝুলছে। পা ওপরে। মাথা নীচের দিকে।

বোধহয় অন্ধকারে ঢাকা কোনও জুতসই ডালে রবিনা পা দুটো আঁকশির মতো আটকে রেখেছেন।

রবিনার শরীর থেকে একটা নীলচে আভা বেরোচ্ছে। সেই আভার জন্যই ওঁকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উলটো হয়ে থাকার জন্য স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে না।

রবিনার গাল বসে গিয়ে চোয়ালটা সামনে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো অন্ধকার কৃষ্ণগহ্বর। আর তার কেন্দ্রে সার্চলাইটের মতো উজ্জ্বল সাদা আলোর বিন্দু।

'তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রে...অসম্ভব পাগল করা তেষ্টা।' গাছের গায়ে উলটো হয়ে ঝুলে থাকা পিশাচটা বলল, 'সেদিন রনিতাদি কী যে কামড় বসাল ঘাড়ে, তারপর থেকেই যত অশান্তি আর ভোগান্তির শুরু। তোরা তো আর বুঝবি না, পূর্ণিমার তেষ্টা কী জিনিস! আয়, তোরা কাছে আয়...আয়...।'

এইসব কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে রবিনার শরীরটা পেন্ডুলামের মতো অল্প-অল্প দুলতে লাগল। ঠিক যেন হাওয়ায় দুলছে। আর ওঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

ইস্পাতের দাঁতের পাটি দেখা গেল। তার ফাঁক দিয়ে একটা লম্বা কালো জিভ সাপের মতো সড়সড় করে বেরিয়ে এল। ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। তারপর সেই দেড়ফুট লম্বা জিভটা নড়তে লাগল, দুলতে লাগল।

পিশাচটার চোখের দৃষ্টিতে বোধহয় সম্মোহন ছিল। কারণ, ইলিনা আর সজনী উলটোভাবে ঝুলে থাকা রবিনার নীল আলো মাখা দেহের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল।

অনুষ্কা ওদের হাত ধরে টেনে আটকে রাখল। চিৎকার করে বলল, 'যেয়ো না—এখানে চুপ করে দাঁড়াও! যেয়ো না! আমার কথা শোনো—!'

হঠাৎই দারচিনির গন্ধে বাতাস মিষ্টি হয়ে গেল। এক ঝটকায় ইলিনা আর সজনীকে ছিটকে ফেলে দিল অনুষ্কা। তারপর ওর ডানহাত চোখের পলকে লম্বা হয়ে ছোবল মারল রবিনা ম্যাডামের গলায়। এবং একটানে পিশাচটাকে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ইলিনা আর সজনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওদের বন্ধুর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মনে হচ্ছিল, ওদের চোখের সামনে যা-যা ঘটে চলেছে সেগুলো বাস্তব নয়, একটা গাঁজাখুরি সিনেমা।

সেই 'সিনেমা'-য় অনুষ্কার হাতের ইস্পাতের কাঁটাগুলো পিশাচটার গলায় আমূল গেঁথে গেল। ওর হাতের টানে পিশাচটা রবারের সুতোয় বাঁধা বলের মতো ছিটকে চলে এল অনুষ্কার কাছে।

পিশাচটা যন্ত্রণার হাহাকার তুলছিল। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল। অনুষ্কা বাঁ-হাতে খপ করে পিশাচটার নাক টিপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল পিশাচটার মরণ গোঙানি। বারবার হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল।

একটু পরেই ওটার সব লড়াই শেষ হয়ে গেল। সব তেষ্টা মিটে গেল।

অনুষ্কা ছেড়ে দিতেই ওটা এক টুকরো কাঠের মতো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ও এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ঘোর কেটে যেতেই ওর বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। ও ফিরে তাকাল ইলিনার দিকে, সজনীর দিকে। ওদের বিপদে কাজে লাগতে পেরে মনটা ভীষণ ভালো লাগছে। এই ভালো লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

অনুষ্কা ইলিনাকে তুলে ধরল। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে নিল : 'শিগগির চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে...।'

সজনী নিজে থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও অনুষ্কার কাছে এসে ওর হাত ধরল। চাপা গলায় বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

ইলিনাও অনুষ্কার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, 'ও যা বলল, তাই...।'

অনুষ্কার কানে এল অনেকের হইচই চিৎকার।

ও চাঁদের দিকে তাকাল। কী স্পষ্ট, কী সুন্দর!

চাঁদকে এই মুহূর্তে ওর ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

ঠিক তখনই সম্পির গলা কানে এল। ওদের তিনজনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে।

বারো

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই।

এখন আমাকে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে।

আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মার অবিনশ্বর হতে অসুবিধে কী! সুতরাং আমি অমর।

তোমার কি মনে নেই, গীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।' অর্থাৎ, কোনও শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না।

তিনি আরও বলেছেন, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

তা হলে আমার 'মৃত্যু' হবে কেমন করে?

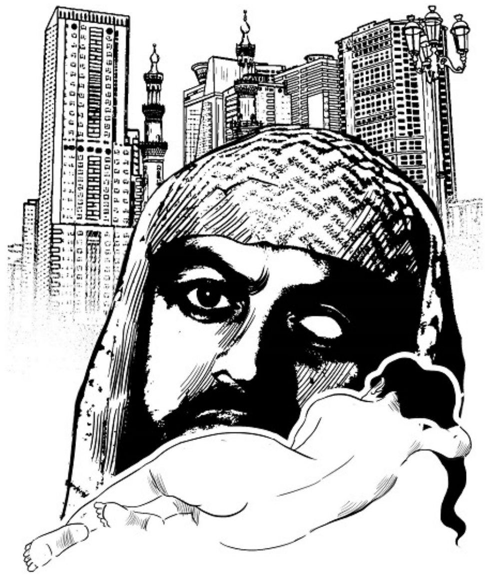
তাই আকাশে, বাতাসে ধুলোয় মিশে আবার শুরু হোক আমার পথ চলা।

চলতে-চলতে আবার আমাকে খুঁজতে হবে নতুন আশ্রয়। নিতে হবে আবার কোনও নতুন পরিচয়। তারপর আবার বিশ্রাম আর আরাম।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন করে শুরু হবে আমার নতুন জীবন।

আঃ, ভাবতেই কী তৃপ্তি!

পিশাচ প্রহর । এক



হিতেশ কাপুর

রোমিলাকে আমি সঙ্গে নিতে চাইনি।

নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা, সেই কারণেই একটু ইতস্তত করেছিলাম। এখন দেখছি মনের বাধায় সাড়া দিলেই ভালো হত। এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমার ভাগ্যে জুটত না। প্রতিটি পল-অণুপল কাটাতে হত না অন্ধ আশঙ্কায়। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কাকে আমি দায়ী করব? কাহরেইন-এর শেখ আবদুল অল হারিদকে? আমার বন্ধু মোহন খান্নাকে? আমার বোন রোমিলাকে? না দায়ী করব নিজেকেই?

প্রথমদিন থেকে ঘটনাগুলো যেন ছবির মতো মনে পড়ছে। ছোট্ট অ্যাভ্রো প্লেনটায় আমরা তিনজন উড়ে চলেছিলাম কাহরেইন-এর দিকে। তিনজন বলতে আমি, মোহন আর রোমিলা। প্লেনে আর কোনও যাত্রী ছিল না। কারণ শেখ হারিদ আমাদের জন্যেই পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজস্ব ছোট প্লেনটি। তিনজনেই বেশ খোশমেজাজে ছিলাম। কাজের সূত্রে এরকম নতুন দেশ দেখার সুযোগ ক'জন পায়। কিন্তু...

শুরু থেকেই তাহলে শুরু করা যাক।

রোমিলা জানলা দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। নীচে, অনেক নীচে পার্শিয়ান গাল্ফ। সেখানে সূর্যের আলোয় নীল জল ঝিলিক মারছে। পথ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু রোমিলাকে দেখে মনে হচ্ছে, নিজের সৌভাগ্যকে ও এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। কোনওদিন যে এরকম একটা দূর দেশে ও বেড়াতে আসবে সে-কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। ওকে খুশি দেখে আমার মনটা ভরে গেল। মা-বাপ মরা ওই একটা আদরের বোন আমার। আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট। সারাটা জীবন ও ঘরকুনো হয়ে পড়ে রইল। জীবনের সাধ-আহ্লাদ-আনন্দ কিছুই তেমন করে পেল না। এমনিতে ও খুব কম কথা বলে। নিঃশব্দে সাংসারিক কাজ সেরে দেয়। কিন্তু এখন ও একেবারে পালটে গেছে। সেই রওনা হওয়ার সময় থেকেই ছোট্ট মেয়েটির মতো খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সংক্ষেপে আমার পরিচয়টা এখানে সেরে নিই।

আমার নাম হিতেশ কাপুর। এখনও মনের মতো মেয়ে পাইনি, তাই কুমার হিতেশ কাপুর হয়েই রয়ে গেছি। ভারতের এক নামি তেল কোম্পানিতে আমি চাকরি করি। চাকরিসূত্রে প্রায়ই আমাকে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে হয়, কিন্তু ভারতের বাইরে এই প্রথম। বিদেশি তেল কেনাবেচার ব্যাপারে হঠাৎই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হল পার্শিয়ান গাল্ফ-এ যাওয়ার।

কোম্পানির ডিরেক্টরের কাছ থেকে কথাটা শুনে যে আনন্দ হয়নি তা নয়, কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে : রোমিলার কী হবে? কারণ পার্শিয়ান গাল্ফ-এ আমার সাতদিনও লাগতে পারে, আবার সাতাশদিনও লাগতে পারে। দু-চারদিনের ব্যাপার হলে রোমিলাকে একাই রেখে যেতাম। বাড়ির কাজের লোক ওর দেখাশোনা করত। কিন্তু এতগুলো দিন? তাছাড়া বেচারি মেয়েটা খুব মনমরা হয়ে পড়বে। সুতরাং সেদিনই বাড়ি ফিরে রোমিলাকে বললাম, অফিসের কাজে আমাকে মিডল ইস্ট যেতে হচ্ছে। সামনের সপ্তাহে।

ও ছোট্ট করে জিগ্যেস করল, ক'দিনের জন্যে, দাদা?

সাতদিনও লাগতে পারে, আবার এক মাসও লাগতে পারে—।

রোমিলা গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখটা বিষণ্ণ দেখাল। আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, ভাবছি, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড ঘটল। রোমিলা মুখ নামিয়ে বসে ছিল, চকিতে মুখ তুলে তাকাল। চোখেমুখে খুশির ফুল ফুটেছে। ও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অবিশ্বাসে ভরা মিষ্টি গলায় বলে উঠল, সত্যি!

আমি প্রাণখোলা হাসি হেসে বললাম, সত্যি। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

আমার বরাবরের দেখা মনমরা চুপচাপ মেয়েটা আনন্দে খুকি হয়ে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বিদেশ ঘোরা আমার কতদিনের স্বপ্ন ছিল জানো? উফ, আমি ভাবতেই পারছি না, দাদা, এই খবরটা সত্যি। যাই, টেলিফোনে বন্ধুদের খবর দিই।

ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার মনে হল, রোমিলার মনমরা চুপচাপ আচরণের জন্যে আমিই দায়ী। বাইরে ঘোরার নামে মেয়েটা এত খুশি হয়! ওকে খুশি রাখার জন্যে এবার থেকে মাঝে মাঝে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাব। নিজের ওপরে রাগ হল। এ-কথাটা আমার আগে কেন খেয়াল হয়নি?

পরদিনই অফিসে সব ব্যবস্থা সেরে নিলাম।

অফিস থেকে পার্শিয়ান গাল্ফ ট্যুরে আমি একা যাচ্ছি না। আমার সঙ্গী হচ্ছে সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার মোহন খান্না। মোহন আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হলেও সম্পর্কটা আমাদের বন্ধুর মতো। ওকে একান্তে নিয়ে রোমিলার কথা খুলে বললাম।

আমার সমস্যাটা শুনে ও রাজি তো হলই, তা ছাড়া নতুন বুদ্ধি দিল। বলল, হিতেশ, বোনকে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত খরচ তুমি করবে ঠিক করেছ জানি। কিন্তু তবুও একটা পরামর্শ দিই। আমরা দুজনেই অফিস থেকে ফার্স্ট ক্লাস এয়ার ফেয়ার পাই। যদি তা নিয়ে আমরা ইকনমি ক্লাসে ট্রাভেল করি তাহলে তোমার বোনের প্লেন ভাড়া তো উঠে যাবেই, তার ওপর হোটেল খরচও কিছুটা পাওয়া যাবে।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, কিন্তু তুমি কেন ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে ইকনমি ক্লাসে ট্রাভেল করতে যাবে? তোমার অসুবিধে হতে পারে।

মোহন আমার পিঠে একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় কষাল। তারপর হেসে বলল, নখরা ছোড়, ইয়ার। তোমার বোনকে সুখবরটা আজই ফাইনাল করে শুনিয়ে দাও, তারপর স্টার্ট প্যাকিং। সামনের মঙ্গলবার আমাদের ফ্লাই করতে হবে।

সেই মুহূর্তে মোহন খান্নাকে খুব ভালো লাগল আমার। বুকের ভেতরে খুশি উপচে পড়তে লাগল।

সেদিনই বাড়ি ফিরে হাঁকডাক করে রোমিলাকে ফাইনাল খবর জানিয়ে দিলাম। তারপর দু-ভাইবোন মিলে গোছগাছ শুরু করলাম। উৎসাহ কারও কম নয়। রোমিলাকে বললাম, ওখানে এক শেখের কাছ থেকে তেল আদায় করার জন্যে কোম্পানি আমাকে আর মোহন খান্নাকে পাঠাচ্ছে, বুঝলি? আমরা তিনজনে গিয়ে শেখকে নিংড়ে তেল বের করে ছাড়ব।

আমি আর রোমিলা গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম। কাজের মেয়েটি, নাম কমলা, সেই হাসি শুনে ছুটে এল আমাদের ঘরে। হয়তো ভাবল, দাদা-দিদি পাগল হয়ে গেছে।

নিজের অবাক করা সৌভাগ্যে রোমিলা তখনও মশগুল। আমি ওর পাশে বসে গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছি। আমাদের সামনের সিট থেকে মোহন খান্না ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এয়ার হোস্টেসদের সুর নকল করে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাব।

রোমিলা খুশিতে ফিরে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর বলল, শেখ লোকটা কিন্তু দারুণ। তেহরান থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে নিজের এরোপ্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমি হাসলাম। কারণ, এই প্লেনে ওঠার পর থেকে রোমিলা কমপক্ষে পাঁচবার শেখসাহেবের অতিথিপরায়ণতার প্রশংসা করেছে। এখন ও অবাক হয়ে প্লেনের বিলাসবহুল অঙ্গসজ্জাগুলো আবার লক্ষ করছে। সত্যি, অ্যাভ্রো প্লেনটার পেছনে বহু টাকা ও পরিশ্রম খরচ করেছেন শেখ আবদুল অল হারিদ।

একেই বলে কেতায় থাকা!—রোমিলা মুগ্ধ হয়ে বলল।

আমাদের তেল বেচুক আর না বেচুক, শেখের কখনও টাকার অভাব হবে না।

—মোহন ঠাট্টার হাসি হাসল। তারপর ছোট্ট করে মন্তব্য করল, তেল বেচাটা এই শেখগুলোর শখ!

রওনা হওয়ার আগে আমি শেখ হারিদ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়েছিলাম। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, তার ওপর মধ্য প্রাচ্যে ইদানীং রোজই গোলমাল লেগে রয়েছে। সেইসব খোঁজখবরের ভিত্তিতেই বললাম, শেখ হারিদের সম্পর্কে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে বোঝা যায় হারিদ অন্যান্য শেখের থেকে আলাদা। নিজের কাহরেইনকে তিনি বেশ কড়া শাসনে রেখেছেন। আর কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। শুনেছি রাজ্যের লোকজনদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও নাকি করে থাকেন।

সত্যি বলছ?—রোমিলা অবাক হয়ে জানতে চাইল। ওর মুখে ভয়ের সংশয় দেখা দিয়েছে।

ওকে সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, অবশ্য খবরগুলো পুরোপুরি সত্যি কিনা জানি না—।

কিন্তু রোমিলা ছাড়ল না। বলল, না দাদা, সত্যি করে বলো, খবরগুলো তুমি কোত্থেকে পেয়েছ?

অতএব বাধ্য হয়ে সব খুলে বললাম।

মিডল ইস্টের কয়েকটা খবরের কাগজ আমার হাতে এসেছিল। তাতেই জেনেছি, কাহরেইনকে ঠিক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য বলা যায় না। গণতন্ত্র সেখানে পুরোপুরি নেই। বরং স্বৈরতন্ত্রই যেন বাসা বেঁধেছে। শেখ হারিদের নিজস্ব সেনাবাহিনী আছে এবং রাজ্যের যে-কোনও মানুষের তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

আমার কথা শুনে মোহন খান্না কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এতে নতুন কোনও ব্যাপার নেই, হিতেশ। মিডল ইস্টে এরকম রাজ্য আরও প্রায় একডজন আছে। সবই সেই মোগলাই ব্যাপার।

কিন্তু আমার মনের ভেতরে অন্য একটা কাঁটা খচখচ করছিল। সে-কথাই মোহনকে বললাম, এরকম রাজ্য আরও আছে জানি, কিন্তু শেখ হারিদ-এর কুখ্যাতি সবার চেয়ে বেশি। রাজ্যের কয়েকটা বিদ্রোহ তিনি এমন নৃশংসভাবে দমন করেছেন যে, আমাদের সভ্য সমাজ ভাবতেও শিউরে উঠবে। খবরের কাগজের বক্তব্য হল, অহেতুক নৃশংসতার কোনও দরকার ছিল না। তাতেই মনে হয়, শেখ কিংবা তাঁর দলবল হয়তো স্বাভাবিক মেজাজের মানুষ নয়।

মোহন খান্না যৎসামান্য রাজনীতি চর্চা করে। শেখের বিরুদ্ধে আমার অসন্তোষ প্রকাশ পেতেই ও চড়া গলায় বলল, এ-যুগে কোন মানুষটা সুস্থ-স্বাভাবিক মেজাজের বলো দেখি? এ সবই হল কাগজের রিপোর্টারদের মনগড়া অভিযোগ। পৃথিবীর কোন দেশকে এ-অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে বলতে পারো? হাঙ্গেরি আর চেকোস্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার দাপট, তিব্বতের ওপর চীনদেশের অপশাসন, ভিয়েতনামে আমেরিকা আর আলজিয়ার্স-এ ফ্রেঞ্চ অত্যাচার। এমনকী সাইপ্রাসের ওপরে ব্রিটিশের অত্যাচার নিয়েও অভিযোগ তুলেছে রিপোর্টাররা। সুতরাং দোস্ত, কয়েকটা খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে আমাদের বন্ধু শেখ হারিদকে সমালোচনা কোরো না। তা ছাড়া, সে আমাদের তেল দেবে, এটা ভুলে যেয়ো না।

কিন্তু তবুও আমি মোহন খান্নাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলাম না। বললাম, হয়তো তোমার কথা ঠিক, মোহন। কিন্তু যখন সমস্ত অত্যাচারের ঘটনাগুলো নিজের দেশেই ঘটে, তখন? আসলে কাহরেইন হল এমন একটা...।

মোহন হাত তুলে আমাকে বাধা দিল : কাহরেইন-এর শাসনব্যবস্থা নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, হিতেশ। তোমার-আমার কাজ হল সস্তায় শেখ হারিদের কাছ থেকে তেল কেনা, ব্যস।

সে যাই হোক, শেখ হারিদের ভদ্রতার তুলনা নেই। আমাদের নেওয়ার জন্যে নিজের প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ নিয়ে রোমিলা ছ'বার বলল কথাটা।

ফলে আমিও কাহরেইন-এর প্রসঙ্গ পালটে বললাম, যে-প্লেনে আমরা এসেছি তার সঙ্গে এ-প্লেনটার কোনও তুলনা চলে না।

ঠিক বলেছ!—মোহন খান্না হেসে সায় দিল : ও-প্লেনটায় এরকম আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল না।

কথাটা বলে মোহন ইশারায় পাইলট কেবিনের দরজার কাছে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটির দিকে দেখাল। মধ্যপ্রাচ্যের এই রূপসী আমাদের বাতাস-বিনোদিনী। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আহার-পানীয় ইত্যাদির ব্যবস্থা সে করে গেছে পরম যত্নে। রোমিলা হাজির থাকা সত্ত্বেও মোহন দু-একবার রসাল রসিকতা করতে ছাড়েনি। আমি বরং নিজেকে সামান্য সংযত রেখেছি।

হঠাৎই দেখি বাতাস-বিনোদিনী দু-পাশের সিটের মাঝখানের অলিপথ ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠোঁটের মধুর হাসিটা যেন কেউ তেহরান থেকেই ওর মুখে তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে।

ওকে আসতে দেখে মোহন শিস দিয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল, হিতেশ, তোমার শেখ ভাই যতই নৃশংস হোক, তার পছন্দ আছে।

আমাদের সামনে এসে মেয়েটি মিষ্টি স্বরে ঘোষণা করল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কাহরেইন-এ নামব। আপনারা দয়া করে সিট বেল্ট বেঁধে নিন, আর সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন।

আমি সিগারেট ধরিয়েছিলাম। মেয়েটির কথায় সেটি অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলাম।

ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে সে নিজের সিটে ফিরে গেল। টের পেলাম, প্লেনটা একপাশে কাত হয়ে চক্কর দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

হিতেশ কাপুর

কাহরেইন দাঁড়িয়ে আছে পার্শিয়ান গাল্ফ আধাআধি পেরিয়ে। উপকূল বরাবর প্রায় দশ মাইল চওড়া এবং বিশাল ইরানের মধ্যে প্রায় বিশ মাইল ঢুকে পড়েছে ছোট এই রাজ্যটি। মাত্র দুশো বর্গমাইল এলাকা হলে কী হবে, এটাই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জমি। কারণ গোটা দেশটাই ভাসছে তেলের ওপর। অথচ রোদে ঝিলিক তোলা সোনালি বালি দেখে তা বোঝার উপায় নেই।

কাহরেইন-এর রাজধানীর নামও ওই একই। ছোট এয়ারপোর্টটা রাজধানীর পশ্চিম ঘেঁষে। ছোট, তবে নিখুঁতভাবে তৈরি।

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি ভাগ বসবাস করে রাজধানীতে। অন্য শহরগুলোয় রাজধানীর রমরমা নেই। সেগুলো সত্যিই যেন মরুভূমি।

প্লেন থেকে নামতেই একটা কালো এয়ার কন্ডিশন্ড মার্সিডিজ গাড়ি আমাদের তুলে নিল। তারপর হাওয়ার গতিতে ছুটে চলল হারিদের প্রাসাদের দিকে। চলার পথে ড্রাইভার একটিও কথা বলল না।

মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই শেখের প্রাসাদে পৌঁছে গেলাম।

প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে সশস্ত্র প্রহরা। গেট পেরিয়েই টানা নুড়ি-পথ। তার দু-পাশে সবুজ গাছপালা। নুড়ি-পথটা অনেকটা পাহাড়ি রাস্তার মতো এঁকেবেঁকে উঠে গেছে একটা বড়সড় টিলার ওপরে। সেখানেই

বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শেখ হারিদের সাদা ধবধবে বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে তিনদিকের ধূলিমলিন শহরগুলো—নীচে, অস্পষ্ট ধোঁয়াশার আস্তরে যেন ঢাকা। আর প্রাসাদের মুখোমুখি গাল্ফ-এর শীতল জল নীল, মাঝে মাঝে সাদা ফেনার টুকরো। ছোট-ছোট ঢেউ তুলে নীল জলরাশি যেন চঞ্চল খেলায় মেতেছে।

গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল একটা বড় মাপের গাড়িবারান্দা। কেতাবি আরবি পোশাকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। রোদ পড়ে তাঁর সাদা আলখাল্লা ঝকঝক করছে। আমাদের কাছাকাছি এসেই ভদ্রলোক নিচু হয়ে অভিবাদন জানালেন।

আমার নাম হাসান, আমি শেখ আবদুল অল হারিদের ব্যক্তিগত সচিব। কাহরেইন-এ আপনাদের স্বাগত জানাই।

হাসানের কণ্ঠস্বর ভরাট, মার্জিত—বেশ সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলার মতো। মুখচোখের রেখা সঞ্জীব ও তীক্ষ্ণ। থুতনিতে মিশকালো দাড়ি।

আমার ও মোহনের সঙ্গে করমর্দন করার সময় হাসানের ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটল। তারপর রোমিলার দিকে মনোযোগ দিয়ে তিনি বললেন, এই সুন্দরীর পরিচয় জানতে পারি?

আমার বোন, রোমিলা।—আমি সহজ গলায় বললাম। অথচ বুকের ভেতরে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি জাগছিল।

স্বাগতম, মিস রোমিলা।—হাসান রোমিলার হাত ধরলেন। তারপর অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে হাতে চুমু খেলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন রোমিলাকে। তাঁর কালো চোখ সম্মোহনের দৃষ্টিতে খেলে বেড়াতে লাগল রোমিলার সুন্দর মুখে।

রোমিলা হঠাৎই লজ্জা পেয়ে হাসল : ধন্যবাদ, মিস্টার হাসান। আমি একরকম জেদ করেই দাদার সঙ্গে এসেছি নতুন দেশ দেখব বলে। দাদা আর মিস্টার খান্না যখন ব্যবসায়িক কাজকর্ম সারবেন, সেই ফাঁকে আমি আপনাদের চমৎকার শহরগুলো দেখে বেড়াব।

আপনার বিদেশ ভ্রমণ নিশ্চয়ই সুখের হবে, মিস রোমিলা।

পরক্ষণেই হাসানের মুখ থেকে বিগলিত ভাবটা মিলিয়ে গেল। ভাবলেশহীন মুখে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে মাপা সুরে তিনি বললেন, আমাদের মাননীয় শেখের ইচ্ছে যে, কাহরেইন-এ থাকাকালীন আপনারা তাঁর প্রাসাদেই আতিথ্য গ্রহণ করেন।

কিন্তু আমি তো শুধু বেড়াতে এসেছি!—রোমিলা আপত্তি জানিয়ে বলল। তারপর আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, কী হল, তোমরাও কিছু বলো!

আমি ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু হাসান যেন রোমিলা বা আমার কথা শুনতেই পাননি। তিনি তখন শান্ত সুরে যান্ত্রিকভাবে বলে চলেছেন, যদি আপনারা মাননীয় শেখের আতিথ্য-আপ্যায়ন প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। অতএব আসুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। সঙ্গে নিয়ে আসা মালপত্রের জন্যে চিন্তা করবেন না। সেগুলো আপনাদের আগেই নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে যাবে।

হাসানের কথার সুরে ও ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল যে, আমি বা মোহন কেউই তার অনুরোধ বা আদেশের প্রতিবাদ করতে পারলাম না। আমরা তিনজনেই হাসানকে অনুসরণ করলাম।

প্রাসাদের ভেতরটা স্নিগ্ধ শান্ত। সাদা রঙ ছাড়া অন্য কোনও রঙ কোথাও নেই। কেন জানি না আমার তাজমহলের কথা মনে পড়ে গেল।

মার্বেল পাথরের মেঝেতে আমাদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিভিন্ন দিকের দেওয়াল থেকে। অস্বাভাবিকরকম চওড়া অলিন্দ ধরে আমরা হেঁটে চলেছি। মাথার অনেক ওপরে নকশাদার কারুকাজ করা সিলিং। কিছুদূর পর পরই সিলিং থেকে ঝুলে রয়েছে কাটগ্লাসের ঝকমকে ঝাড়লণ্ঠন। ডানদিকের দেওয়ালে সাজানো রয়েছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নানানরকম অয়েল পেইন্টিং। আর বাঁদিকে একটানা ঘরের মিছিল। আমরা একের পর এক কালচে কাঠের নকশা কাটা দরজা পার হয়ে চলেছি। পরপর দুটো দরজার মধ্যেকার দূরত্ব দেখে বোঝা যায় ঘরগুলো আকারে বিশাল। দুটো দরজার মাঝের ফাঁকা দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী।

পাশাপাশি তিনটে ঘরে আমাদের স্থান দিলেন হাসান।

প্রতিটি ঘরের আকার-প্রকার ও সাজসজ্জা যে-কোনও পাঁচতারা হোটেলকেও লজ্জা দেবে। অবশ্য ঘর না বলে সেটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট বলাই ভালো।

আমি হতবাক হয়ে ঘরের সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে পড়ল, প্লেনে বসে রোমিলাও ঠিক এইরকম অবাক হয়েছিল।

একটু পরেই মোহন আর রোমিলা আমার ঘরে এল। ওরা জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। ওদের দেখে আমি হেসে মন্তব্য করলাম, এই যদি শেখের অতিথিশালা হয় তাহলে শেখ নিজে যে-ঘরে থাকেন তার জাঁকজমক কীরকম কে জানে!

মোহন বলল, তুমি যতই খুঁতখুঁত করো না কেন, আমার কিন্তু এখানে বেশ লাগছে। হোটেলে এই আরাম পাওয়া যেত না।

সে তুমি ঠিকই বলেছ।—আমিও মোহনের সঙ্গে একমত হলাম।

রোমিলা এখন আবার খুশি হয়ে উঠেছে। ও বলল, দাদা, আমি শুধু ভাবছি কোন ড্রেসটা পরে শেখের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

রোমিলা খুশি হয়েছে কারণ হাসান যাওয়ার সময়ে ওকে বলে গেছেন, মিস্টার কাপুর ও মিস্টার খান্না যখন মাননীয় শেখের সঙ্গে পরিচয় করতে যাবেন, তখন আপনিও অবশ্যই আসবেন, মিস রোমিলা।

রোমিলা খুশিতে ফুটছে। বলল, ওফ্, বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুদের সব গল্প শোনাতে আমার আর তর সইছে না!

মোহন গম্ভীরভাবে বলল, সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কে না আলাপ করতে চায়! শেখ তো তার ব্যতিক্রম নয়।

আমি বললাম, ধ্যুৎ, শেখদের সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে আমাদের হারিদ সাহেবের হয়তো একটা গোটা হারেমই রয়েছে। এতগুলো মেয়ে একটা পুরুষ কখনও সামলাতে পারে!

মোহন খান্না বিজ্ঞের মতো বারদুয়েক ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, যাই বলো ভাই, এই হারিদ লোকটার রুচি আছে।

রোমিলা বলল, আমি যাই। চটপট বেছে ফেলি কোন ড্রেসটা পরে শেখের দরবারে যাব।

ও চলে যেতেই মোহন আমাকে লক্ষ করে চোখ টিপল। বলল, হিতেশবাবু, বলা যায় না, শেখ হয়তো তার হারেম থেকে দুজন রূপসীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে রাতে সেবা করার জন্যে।

আমি ওর কাঁধে এক থাপ্পড় মেরে বললাম, তোমার সবসময় খালি এক চিন্তা।

আমার মনের ভেতরে একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করতে লাগল। কারণ, হাসানের নজর আমার একটুও ভালো লাগেনি। মোহনকে অবশ্য সে-কথা বললাম না। বললেও ও সেটা হেসে উড়িয়ে দিত।

শেখ আবদুল হারিদের চেহারা বেঁটে, মোটা। চোখ দুটো কুতকুতে। থুতনিতে ছুঁচলো দাড়ি। তাঁর ধারালো নজরের সামনে রোমিলা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বিশেষ করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর শেখসাহেব যখন ওর হাত তুলে চুমু খেলেন।

এ সত্যিই আমার মহা সৌভাগ্য, মিস কাপুর।—শেখের কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল হাসানের ভদ্রতা ও মোলায়েম ভাব। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার কাপুর, আপনার বোন অপরূপ সুন্দরী।—সামান্য হাসলেন শেখ হারিদ : এখান থেকে খুব কাছেই আমার চেনা কয়েকজন উপজাতির সর্দার আছে যারা মিস কাপুরের বিনিময়ে অসংখ্য ছাগল দেবে। অবশ্য আমার ধারণা, উনি বিক্রির জন্য নন।

শেখের কথায় ঠাট্টার সুর থাকলেও আমার কেমন খারাপ লাগল। মনে হল, তিনি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন। কিন্তু কোনও এক শঙ্কায় আমি নিজের উত্তেজনা সামলে নিয়ে ঠাট্টার মেজাজেই বললাম, রোমিলার বদলে আমি যদি একপাল ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরি তাহলে আমার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়রা ছেড়ে কথা বলবে না।—তারপর গলা নামিয়ে বললাম, তাছাড়া স্যার, আপনাদের এদিকটায় ছাগলের সংখ্যাই বোধহয় বেশি, তাই না।

আমার কথায় ব্যঙ্গের খোঁচাটা শেখ হারিদ বুঝতে পারলেন কিনা জানি না, তবে তাঁর মেজাজটা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল।

হারিদ বললেন, আমার দেশ আর আপনাদের দেশের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, আইন-কানুন, সবই আলাদা। বিংশ শতাব্দী অনেক এগিয়ে গেছে। সভ্যতাও থেমে নেই। অথচ কাহরেইন-এ আমরা আমাদের পুরোনো রীতি আর ঐতিহ্যের অনেকটাই এখনও ধরে রেখেছি। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতির সুফলগুলো আমরা এখানেও বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করি।

শেখ কথা থামিয়ে আমাদের তিনজনের ওপর নজর বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, একমাত্র আল্লা ছাড়া আমাদের সবচেয়ে পবিত্র ঐতিহ্য হল আমন্ত্রিত অতিথির সেবা। আপনারা তো এখানে কয়েকদিন আছেন, আশা করি আমার অতিথিসেবার আন্তরিকতা ও নিদর্শন প্রমাণ করার সময় আমি পাব।

মোহন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, আপনার আতিথেয়তা আর উদারতার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি, স্যার।

মোহনের কথায় হারিদ যেন সত্যিই খুশি হলেন। বললেন, শুনে আনন্দিত হলাম, মিস্টার খান্না, বড়ই আনন্দিত হলাম। আচ্ছা, এবারে আমাকে বিদায় নেওয়ার অনুমতি দিন। আগামীকাল সকালে, আমাদের ব্যবসায়িক আলোচনা শুরুর আগে, আমার এই নগণ্য প্রাসাদের কয়েকটি বিশেষ অংশ আপনাদের দেখাতে চাই।

কথাটা বলেই শেখ হারিদ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে রোমিলার দিকে তাকালেন।

আমি দুঃখিত, মিস রোমিলা, আপনাকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারব না। কারণ আমাদের রীতি অনুসারে প্রাসাদের বেশিরভাগ অংশই স্ত্রীলোকের কাছে নিষিদ্ধ।—শেখ হারিদ হাসলেন : বুঝতেই পারছেন, নারী প্রগতি আপনাদের দেশে যতটুকু এগিয়েছে আমাদের এখানে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও এগোয়নি। কোনওদিন আদৌ এগোবে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে পরশুদিন আপনার সম্মানার্থে আমি নৈশভোজের আয়োজন করেছি। আপনি সে-অনুষ্ঠানে দয়া করে যোগ দিলে আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করব। আপনি আমার দেশে নিছকই বেড়াতে এসেছেন। সে-কথা চিন্তা করে আমি একটা গাড়ি আপনার ব্যবহারের জন্যে দিচ্ছি। যদি চান ড্রাইভারও থাকবে গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে আমার এই ছোট রাজ্যে যেখানে খুশি আপনি ঘুরে বেড়াতে পারেন। সোজা কথায়, এটাকে আপনি নিজের দেশ মনে করলেই আমি আন্তরিক খুশি হব। এবারে আমাকে অনুগ্রহ করে বিদায় দিন।

রাজসভা ভঙ্গ হল।

রোমিলা কাপুর

ঘড়িতে এখনও ন'টা বাজেনি, অথচ সূর্যের তাপ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। জোরালো আলোয় চিকচিক করছে পার্শিয়ান গাল্ফ-এর তুঁতে রঙ জলের ঢেউ। জলের পাশ ঘেঁষে পিচের রাস্তা চলে গেছে আবাদানের দিকে। রাস্তা সামান্য উঁচু-নিচু। যেন এখানেও পার্শিয়ান গাল্ফ-এর ঢেউয়ের ছোঁয়া লেগেছে।

কাহরেইন ও তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একটা টুকটুকে লাল রঙের আলফা স্পোর্টস কার আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন শেখ হারিদ। আর তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হাসান আমাকে উপহার দিয়েছেন কাহরেইন ও ইরানের রোড ম্যাপ। সেটা দেওয়ার সময় হেসে বলেছেন, যদি পথ ভুলে কোথাও হারিয়ে যান তাই এটা সঙ্গে দিলাম। বিপদে কাজে লাগতে পারে।

শেখ হারিদের অতিথিসেবায় হয়তো কোনও ত্রুটি নেই, কিন্তু তবুও আমি যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। কোথায় যেন একটা সংশয়ের কাঁটা বিঁধে রয়েছে।

শেখ ড্রাইভার সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হইনি। কারণ আমি গাড়ি চালাতে জানি। তবে বিদেশি গাড়ি কখনও চালাইনি। তাই শেখকে অনুরোধ করলাম, ড্রাইভারকে উনি যেন নির্দেশ দেন আল্ফা চালানোর নিয়মকানুনগুলো আমাকে একটু শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

শেখ হাসলেন আমার কথায়। কিছুটা চতুর সে-হাসি। মুখে বললেন, যথা আজ্ঞা। সুন্দরীদের অনুরোধ রাখতে পারলে আমি খুশি হই!

তারপর দূরে দাঁড়ানো একজন রক্ষীকে ইশারা করলেন।

দাদা ও মোহনদা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের মুখে কেমন এক সতর্ক অভিব্যক্তি। কিছুতেই যেন সহজ হতে পারছে না। ওরা শেখের সঙ্গে চলে গেল মিটিং-এ বসবে বলে। যাওয়ার আগে শেখ বলে গেলেন, আপনার ভ্রমণ সুখের হোক, মিস কাপুর।

একটু পরেই সুপুরুষ চেহারার একজন যুবক এসে আমাকে আলফা চালানোর টুকটাক তালিম দিল। তারপর হেসে বিদায় নিল। এবং আমিও রওনা হলাম।

রওনা হওয়ার আগে একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম, গাড়িটার কোনও নাম্বার প্লেট নেই। তার বদলে সামনে ও পেছনে আঁকা রয়েছে দুটি রাজকীয় প্রতীকচিহ্ন।

দিলখুশ মেজাজে উদ্দাম বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি। চুল উড়ে এসে পড়ছে নাকে, মুখে, চোখে। ড্রাইভারজাতীয় একটা অজানা-অচেনা লোক থাকলে হয়তো মন খোলসা করে ঘোরাঘুরি করতে পারতাম না।

এখানে এসে থেকেই মনে হচ্ছে আমার মনের সমস্ত ধোঁয়া আর কুয়াশা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মা-বাবাকে হারিয়ে যে-দুঃসহ দুঃখটা বুকের মধ্যে মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছিল, সেটা যেন কোন জাদুকর হালকা করে দিয়েছে। দেশে ফিরে বন্ধুদের যে কতরকম গল্প কতদিন ধরে শোনাব তা ভাবতেও বেশ রোমাঞ্চ জাগছে।

রাস্তা থেকে উপকূলের কিনারা এখন আর চোখে পড়ছে না। দু-ধারেই ছোট-বড় গা-ঘেঁষাঘেঁষি ঘরবাড়ি। আর থেকে থেকেই চূড়াওয়ালা মসজিদ দেখতে পাচ্ছি। দাদার কাছে শুনেছি, এখানকার শতকরা নিরানব্বুই জন মানুষই মুসলিম।

হঠাৎ সামনে একটা জটলা চোখে পড়ায় আমাকে ব্রেক কষতে হল। শব্দ করে নিশ্চল হল আলফার চাকা। একদল মানুষ নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মত্ত। অন্তত তাদের হাত-পা নাড়া দেখে সেইরকমই মনে হচ্ছে।

আরও একটু লক্ষ করে যা বুঝলাম, একজন লোক কাঁধে করে কার্পেট ফিরি করছিল, তার সঙ্গেই দরাদরি অথবা অন্য কোনও কারণে কোনও খদ্দেরের ঝগড়া বেঁধেছে।

প্রথমে লোকগুলো আমার গাড়িটাকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আপনমনে ঝগড়াতেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু হঠাৎই একটি অল্পবয়েসি মেয়ে আঙুল তুলে আমার গাড়ির দিকে দেখাল। না, ঠিক গাড়ির দিকে নয়। বরং বলা যায় গাড়ির বনেটের ওপরে আঁকা রাজকীয় চিহ্নটার দিকে দেখাল।

চিহ্নটার দিকে অন্য সকলের চোখ পড়ামাত্রই মন্ত্রের মতো কাজ হল। নগ্ন আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি মেয়ে-পুরুষের মুখে। তারা ঝগড়া থামিয়ে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো পথ ছেড়ে ছিটকে গেল দু-পাশে।

আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম, শেখ হারিদকে তাঁর প্রজারা অস্বাভাবিক ভয় করে। তাহলে কি প্লেনে আসতে-আসতে শেখ হারিদ ও কাহরেইন সম্পর্কে দাদা যে-কথাগুলো বলছিল সেগুলো সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি? হঠাৎই একটা নাম না-জানা ভয় আমাকে পেয়ে বসল, আর তখনই টের পেলাম একটা গাড়ি আমাকে অনুসরণ করছে।

গাড়িটার রঙ আকাশি। চেহারা অনেকটা বেঁটেখাটো ভ্যানের মতো। উইন্ডশিল্ডের কাচটা সাধারণ স্বচ্ছ কাচ নয়—সানগ্লাসের মতো কালচে। কাচের পেছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জ্বলন্ত সূর্যের প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়েছে উইন্ডশিল্ড থেকে।

গাড়িটা আমি রিয়ারভিউ মিরারে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাইনি পেছনে। এই রাস্তাটায় গাড়ির সংখ্যা এমনিতে খুব বেশি নয়। সেইজন্যেই আকাশি ভ্যানটাকে আমি এত অল্প সময়ে সন্দেহ করতে পেরেছি। শেখ হারিদ তাহলে আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তি ছাপ ফেলল আমার মনে। অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিয়ে আল্ফার গতি বাড়িয়ে দিলাম আচমকা।

রাস্তার অলিগলি পেরিয়ে একটা জমজমাট জায়গায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থামালাম রাস্তার ধার ঘেঁষে। তারপর গাড়ি থেকে নামলাম।

জায়গাটা মনে হয় মার্কেটজাতীয় কিছু হবে। বিভিন্ন দোকানপাট-ফিরিওয়ালায় গিজগিজ করছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড় দেখলে তাক লেগে যায়। হঠাৎ আকাশি ভ্যানটার কথা খেয়াল হতেই পেছনে তাকালাম। আশ্চর্য! গাড়িটা সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভীষণ রাগ হল এবার। মন খুলে বেড়াতেও পারব না এদেশে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দ্রুত পা ফেলে ভ্যানটার কাছে গেলাম। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই দুজন মানুষের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। ঠান্ডা নিরুত্তাপ ওদের দৃষ্টি। আমাকে দেখে এতটুকু বিচলিত হল না ওরা।

কী মতলবে ফলো করছেন আমাকে?

এক সেকেন্ড দুজনে-দুজনের দিকে তাকাল। তারপর স্টিয়ারিংয়ে বসা লোকটি ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল তার অর্থ হল, ওরা শেখ হারিদের লোক। ওরা আমাকে অনুসরণ করছে না, বরং আমার যাতে কোথাও কোনও অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর রাখছে। সোজা কথায় দেহরক্ষী। এর কারণ আমি শেখ হারিদের অতিথি, অর্থাৎ ভি. আই. পি।

বুঝলাম, ভূমিকা ওদের যাই হোক, উদ্দেশ্য ওদের একটাই—আমাকে নজরে নজরে রাখা। ঠিক করলাম, যে করে হোক লেজ থেকে এদের ছাড়াবই। সুতরাং ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারপাশে দেখছিলাম।

পাথরের টুকরো দিয়ে গড়া বড়-বড় বাড়ি। কোনও-কোনও বাড়ির সামনে গাড়িবারান্দা। তার নীচেও বাজার বসে গেছে। বিক্রি হচ্ছে শুকনো ফল, সিগারেট, কার্পেট, খোদাই করা কাঠের কাজ, পেতলের কারুকাজ, নকশাছাপা কাপড়, আখরোট, আঙুর, বাদাম, আরও কত কী।

মুগ্ধ চোখে কতক্ষণ এসব দেখছিলাম জানি না, হঠাৎই একটা মাঝবয়েসি লোক অসভ্যের মতো আমাকে ধাক্কা দিয়ে গা ছুঁয়ে গেল। আমি রেগে উঠে লোকটাকে ডেকে দুটো কড়া কথা বলতেই বিপদ হল। একগাদা লোক আমাকে ঘিরে ধরল। ওদের ভাষা আমি একটুও বুঝতে পারছি না। আর ওরা যে আমার কথা বুঝতে পারছে তাও মনে হল না।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় সুপুরুষ চেহারার একজন যুবক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। না, সে আমার দেহরক্ষী নয়। আমার দেহরক্ষীরা এখন হয়তো গাড়িতে বসে হাই তুলছে আর মাছি মারছে।

যুবকটি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভিড় সরাতে লাগল। আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, 'ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড, মিস!' তারপর দেশজ ভাষায় ভিড় করা লোকজনকে কীসব বলে নিরুৎসাহ করতে লাগল। মিনিটকয়েক ধরে চলল তার অনর্গল কথা, দ্রুত হাত-পা নাড়া, তারপর একসময় লক্ষ করলাম জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক। আর ঘটনাস্থলে আমি ও অচেনা যুবক—দুজনে একা।

আপনি আমাদের দেশে নতুন মনে হচ্ছে?—যুবক বিশুদ্ধ ইংরেজিতে প্রশ্ন করল। তারপর সামান্য ইতস্তত করে বলল, আমার নাম ইলিয়াস—মহম্মদ ইলিয়াস।

আমি ওর প্রশ্নের জবাবে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলাম যে, আমি এদেশে নতুন। এবং ও নাম বলার পর ভদ্রতাবশত নিজের নামটা বললাম। সেইসঙ্গে ধন্যবাদও জানালাম ওকে।

ইলিয়াস বলল, ধন্যবাদের দরকার নেই। আসলে বিদেশি কেউ এলেই প্রথম-প্রথম এ-জাতীয় অসুবিধেয় পড়তে হয়।

ইলিয়াসের গায়ের রঙ উজ্জ্বল সাদা। মাথায় কুচকুচে কালো ঢেউখেলানো চুল। প্রাণবন্ত কালো চোখের তারা। সুচারুভাবে তৈরি চওড়া পেন্সিল গোঁফ। দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো, তবে ফরসা গাল ও চোয়ালে নীলচে আভা। এ ছাড়া নাক-মুখ চোখের রেখা ধারাল।

সুদর্শন এই মানুষটার গায়ে লাল-নীল আড়াআড়ি ডোরা কাটা ব্যানলনের টি-শার্ট আর তার সঙ্গে মানানসই কর্ডের কালো প্যান্ট।

প্রখর রোদ আমাদের ঝলসে দিচ্ছিল। সামান্য ইতস্তত করে আমি বললাম, একটা ছায়া দেখে আশ্রয় নিলে হয় না?

ইলিয়াস দমফাটা হাসি হেসে উঠল হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে।

ওর সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে চোখের কোণে জল মুছে বলল, দেখেছেন, আমি কী বোকা! আপনি আমার দেশে অতিথি। কোথায় আপনাকে আপ্যায়ন করব তা না, রোদের মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আসুন, ওই রেস্তোরাঁটায় ঢোকা যাক—অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

ইলিয়াস আঙুল তুলে কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁর দিকে দেখাল। আমি ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে ওর অনুরোধে রাজি হলাম। এবং দুজনে এগিয়ে চললাম সেদিকে।

আমার মনের মধ্যে খুশির জলতরঙ্গ বাজছিল। মনে হচ্ছিল, ভারতের রোমিলার সঙ্গে এ-রোমিলার কোনও সম্পর্ক নেই। রেশমি খোলস কেটে গুটিপোকা যেন বেরিয়ে এসেছে। দাদা আর মোহনদা যেন দুই দেবদূত। পলকে মিলিয়ে দিয়েছে আমার মুক্তির ছাড়পত্র। তবু এত আনন্দের মধ্যেও শেখ হারিদের মিছরি মাখা আচরণ কেন জানি না সন্দেহের খোঁচা দিয়ে চলেছে ক্রমাগত।

রেস্তোরাঁর নাম 'কারনামা'। সাজগোজে তার কোনও ত্রুটি নেই। বিশাল কাচের দরজায় আলপনা আঁকা। ভেতরটা আধুনিকভাবে, অনেকটা পাশ্চাত্য রীতিতে সাজানো। রেস্তোরাঁর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাতাস যেন চোখেমুখে ঠান্ডা চুম্বন এঁকে দিল। বাইরের গরম ও চোখধাঁধানো রোদ্দুরের পর ভেতরে ছায়াময় শীতল

পরিবেশ এককথায় মরুভূমির মরূদ্যান। কারুকাজ করা স্বচ্ছ পরদা ঝোলানো একটা বড় কাচের জানলার পাশে একটা টেবিল বেছে নিল ইলিয়াস। আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

ইলিয়াস বলল, শুধু আমার নামটাই আপনাকে বলেছি, মিস কাপুর। একজন অজানা-অচেনা মানুষের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শুধু নামটুকু বোধহয় যথেষ্ট নয়। আসলে আমি একজন রিপোর্টার। এখানে একটা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ আছে, তার জন্যে খবর জোগাড় করি। এই যে আমি হাটের মাঝে ঘুরছিলাম, তাও খবরের খোঁজে। এখন এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, সেটাও হয়তো আগামী সংখ্যায় ছাপা হয়ে যাবে বিশাল হেডিং দিয়ে : ভারতীয় তরুণীর চোখে কাহরেইন। সুতরাং রেস্তোরাঁর আপ্যায়নের বিল যদি আমি মেটাই তাহলে আর ওজর-আপত্তি তুলবেন না। ধরে নিন, আপনার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্যে আমি এত কসরত করছি।

আমি হেসে বললাম, আপনার কথায় আপত্তি করব সে মনের জোর আমার নেই। কারণ, যে-বিপদ থেকে একবার বাঁচিয়েছেন—।

ইলিয়াস হাতের ভঙ্গি করে বলতে চাইল, ও কিছু নয়।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মেনু কার্ড দেখে অর্ডার দিল ইলিয়াস। তারপর বলল, মিস কাপুর, এখান থেকে আর মাইল পাঁচেক পার হলেই আপনি কাহরেইন-এর সীমা ছাড়িয়ে ইরানে পা দেবেন। কাহরেইন আসলে ইরানেরই অংশ, তবে এর শাসনব্যবস্থা স্বতন্ত্র।

দাদার কথাগুলো মনে পড়ল আমার। ইলিয়াস যখন রিপোর্টার তখন ও নিশ্চয়ই শেখ আবদুল অল হারিদ সম্পর্কে অনেক খবরই রাখে। তাই বললাম, আপনাদের কাহরেইন-এর রাজা শুনেছি সাঙ্ঘাতিক লোক!

স্পষ্ট লক্ষ করলাম, ইলিয়াস চমকে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। তারপর থেমে থেমে বলল, আপনি কোত্থেকে এ খবর শুনলেন?

তখনই আমার খেয়াল হল, ইলিয়াসকে শুধু নামটা ছাড়া আর কোনও কথাই বলিনি আমি। অবশ্য ইলিয়াসও জানতে চায়নি। এখন প্রসঙ্গ ওঠায় ওকে বললাম, আমি বর্তমানে আপনাদের শেখসাহেবের গেস্ট, তারপর সংক্ষেপে সব খুলে জানালাম।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর মুখ দেখে কেন যেন আমার মনে হল ওকে অকপটে সব খুলে বলা যায়। অনুসরণকারী আকাশি ভ্যানটার কথাও ওকে বললাম।

আমার কথা শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেল ইলিয়াস। ফিনফিনে পরদাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। খুব গভীরভাবে কী যেন ভাবছে ও। ঠিকরে আসা আলোর ছটায় ওর চোখ চিকচিক করতে লাগল।

এমন সময় বেয়ারা এসে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। ইলিয়াস ঘোর কাটিয়ে সচেতন হল। তারপর অমলিন হাসি হাসল। বলল, ওসব কথা এখন থাক। লেট আস এনজয় দ্য মিল!

আমি সামান্য বিব্রত হয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিলাম।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও কথা বললাম না দুজনে। তারপর ইলিয়াস বলল, আপনাকে শেষে একটা দারুণ জিনিস খাওয়াই।

কী জিনিস?

খেয়েই দেখুন না—!

ও বেয়ারাকে ডেকে স্বদেশি ভাষায় কী যেন বলল। বেয়ারা চলে গেল। তারপর আমাকে লক্ষ করে প্রশ্ন করল, আপনারা শেখের ওখানে কতদিন আছেন?

জানি না, দাদার মিটিং যতদিন চলবে। তবে মনে হয়, সাত-দশ দিনের বেশি লাগবে না।

হতাশভাবে মাথা নাড়ল ইলিয়াস। বলল, সাত-দশ দিনে কি ইরান দেখা শেষ হবে? অন্তত দিনকুড়ি তো লাগবেই।

কেন, আপনি আমাকে ইরান ঘুরিয়ে দেখাবেন নাকি?

দেখালে ক্ষতি কী, মিস কাপুর! ইলিয়াস মুগ্ধ করা হাসি হাসল : ইরান আমার দেশ। আমার জন্ম তাবরিজ-এ। তেহরান-এর তুলনায় তাবরিজ অনেক ছোট শহর, কিন্তু আমার বড় প্রিয়। জানেন, তাবরিজ-এর খুব কাছেই রয়েছে উর্মিয়া লেক! ইরানের সবচেয়ে বড় হ্রদ। আর তার ঠিক উলটোদিকে দুশো মাইলটাক পুবে রয়েছে বিখ্যাত কাস্পিয়ান সাগর। দেখলে আপনার তাক লেগে যেত।

বেয়ারা সুদৃশ্য কারুকাজ করা দুটো লম্বা ধাতব গ্লাস টেবিলে রেখে গেল। গ্লাসে উষ্ণ তরল রয়েছে।

আমি অবাক চোখে ইলিয়াসের দিকে তাকাতেই ও একটা গ্লাসে আমেজ-ভরা চুমুক দিল। তারপর দ্বিতীয় গ্লাসটা ইশারায় দেখিয়ে বলল, নিন, চুমুক দিন। এর নাম সবুজ চা, গ্রিন টি। মধ্যপ্রাচ্যে এই জিনিসটার দারুণ চল রয়েছে। আপনাদের ভারতে এটা তেমন জনপ্রিয় নয় বলেই শুনেছি।

আমি গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে জানালাম যে, ও ঠিকই শুনেছে।

সবুজ চা শেষ করার পর ইলিয়াস বলল, নিন, এবারে বলুন, কারেইন কেমন লাগছে? আমি কিন্তু ইন্টারভিউটা সত্যিই নিচ্ছি...সিরিয়াসলি।

আমি থেমে-থেমে নিজের টুকরো মতামত জানালাম কাহরেইন সম্পর্কে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা ডায়েরি আর পেন বের করে কীসব টুকে নিতে লাগল ইলিয়াস। আর মাঝে মাঝে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, কী ব্যাপার, হাসছেন কেন?

ও হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাবছি আমার খুশ-নসীবের কথা। কত সহজে হাজার-হাজার মাইল দূরের এক বিদেশিনীর ইন্টারভিউ পেয়ে যাচ্ছি। অন্যান্য রিপোর্টার বহু কাঠখড় পুড়িয়েও কোনও ভারতীয়ের ইন্টারভিউ জোগাড় করতে পারে না।

ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর ইলিয়াস বলল, চলুন, এবারে ওঠা যাক।

ও ইশারায় বেয়ারাকে ডাকল। বলল বিল নিয়ে আসতে।

বিল এলে পর টাকা মিটিয়ে দিয়ে ইলিয়াস আমাকে জিগ্যেস করল, বলুন তো, এখানে কারেন্সির নাম কী?

তক্ষুনি আমার মনে পড়ল, ঘুরে বেড়ানো বা কেনাকাটার জন্যে কোনও টাকাপয়সা নিয়ে বেরোতে আমি ভুলে গেছি। তেহরান এয়ারপোর্টেই আমরা ভারত থেকে আনা মার্কিন ডলার ভাঙিয়ে ইরানি টাকা নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন টাকা তো আনিনি, উপরন্তু তার নামটিও মনে করতে পারছি না। সে-কথা ইলিয়াসকে বলতেই ও হেসে বলল, রিয়াল।—একটু থেমে আরও যোগ করল : তবে এখানে বহু দোকানেই মার্কিন ডলার নেয়। ও-বিষয়ে আইনের কড়াকড়ি তেমন নেই।

'কারনামা' থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ইলিয়াস আমার পাশে পাশে হাঁটছে। ধুলো উড়ছে রাস্তায়। কাছে-দূরের মসজিদ থেকে আজান শোনা গেল।

ইলিয়াস বলল, আপনার ফেরার তাড়া আছে? না থাকলে আশপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। আমি হেসে বললাম, সেরকম কোনও তাড়া নেই। তা ছাড়া আমি তো দেশ দেখতেই বেরিয়েছি। আর আপনার মতো গাইড পেলে তো বর্তে যাব।

ইলিয়াস গলা নামিয়ে বলল, সো কাইন্ড অফ য়ু।

তারপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম দুজনে।

স্থানীয় লোকজন, তাদের জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বহু ইতিহাসই শোনাল ইলিয়াস। সেইসঙ্গে শোনাল ওর নিজের কথা। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর ও ফিরে যায় তাবরিজ-এ। সেখানে ওর মা-

বাবা দুজনেই অল্পদিনের ব্যবধানে মারা যায়। মা অসুখে, আর বাবা সন্ত্রাসবাদী ঘটনায়। তখন ইলিয়াস দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ভারি মন নিয়ে। ওর সঙ্গে ছোট দু-বোন। বড় বোন আলেয়া আর ছোট নাজমা। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওরা এসে পড়ে কাহরেইন-এ। ইলিয়াস চাকরি নেয় খবরের কাগজে। তখন থেকে ওরা তিনজনে এখানকারই বাসিন্দা।

বেলা ক্রমশ পড়ে আসতে লাগল। ইলিয়াস একটা দোকান থেকে আঙুরের শরবত খাওয়াল আমাকে। তারপর কথা বলতে-বলতে আমরা ফিরে চললাম আমার আলফা স্পোর্টস-এর দিকে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি আকাশি ভ্যানটা ঠিক একই ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইলিয়াস অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল ভ্যানটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলল, সাবধানে থাকবেন, মিস কাপুর। শেখ হারিদ লোকটা স্যাডিস্ট। এ-দেশ ছেড়ে আমি কবে চলে যেতাম...কিন্তু এখন জড়িয়ে পড়েছি...আর ফেরার উপায় নেই।

একটা বাচ্চা ছেলে ঘুরে-ঘুরে গোলাপের তোড়া ফেরি করছিল। ইলিয়াস তাকে কাছে ডাকল। একটা ছোট গোলাপের তোড়া কিনে আলতো করে তুলে দিল আমার হাতে। বলল, টেক কেয়ার। যদি সম্ভব হয় তাহলে আল্লার কাছে প্রার্থনা করি এই গোলাপের গুচ্ছ সমস্ত বিপদ থেকে আপনাকে রক্ষা করুক।

আমি গাড়িতে উঠে বসতে যাচ্ছি, ইলিয়াস বলল, আবার আমাদের দেখা হবে এই আশা পোষণ করার মতো স্পর্ধা কি আমি দেখাতে পারি, মিস কাপুর?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, পারেন। কাল সকাল ন'টায় আবার আমাদের এখানেই দেখা হবে।

শুক্রিয়া।—ইলিয়াস হেসে হাত নাড়ল : ইন্টারভিটা ভালো করে লিখে কাল আপনাকে শোনাব।

বাই অল মিন্স। বলে আমি গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। গোলাপের তোড়াটা নাকের কাছে নিয়ে বারকয়েক ঘ্রাণ নিলাম। তারপর গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। ইলিয়াসের সুন্দর মুখটা উইন্ডশিল্ড-এর ওপরে ভাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ করলাম, আকাশি ভ্যানটা যথারীতি আবার আমার পিছু নিয়েছে।

ঠিক করলাম, প্রাসাদে ফিরে দাদা বা মোহনদাকে অনুসরণকারী ভ্যানটার কথা বলব না। বললে হয়তো মিছিমিছিই আশঙ্কায় ভুগবে।

আর ইলিয়াসের কথা। ওর কথা খুব বেশি বলে ফেললে দাদা নিশ্চয়ই আমাকে আজেবাজে ঠাট্টা করে খ্যাপাবে। তার চেয়ে কিছু না বলাই ভালো।

বাতাস চিরে লাল আলফা স্পোর্টস ছুটে চলেছে, আর আমার বুকের ভেতরে কাল সকাল ন'টার ঘণ্টা বাজছে ঢং...ঢং...

হিতেশ কাপুর

সকালে রোমিলা গাড়ি নিয়ে কাহরেইন দেখতে বেরোল। আর আমি ও মোহন খান্না গেলাম শেখ হারিদের দরবারে।

আমাদের অবাক করে দিয়ে শেখ হারিদ বললেন, আমি নিজেই আপনাদের প্রাসাদ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনারা আমার গুরুত্বপূর্ণ অতিথি।

আমরা শেখকে অনুসরণ করলাম। আমাদের ঠিক পেছনেই বিশ্বস্ত সচিব হাসান। এবং কিছুটা দূরত্ব রেখে আমাদের সঙ্গী হয়েছে চারজন সশস্ত্র রক্ষী।

শিল্পকলা ও পুরাসামগ্রীর অমূল্য সংগ্রহ ছড়িয়ে রয়েছে সারা প্রাসাদ জুড়ে। শেখ এক নিপুণ গাইডের মতো প্রতিটি জিনিসের খুঁটিনাটি ইতিহাস শোনাতে লাগলেন আমাদের।

এইভাবে প্রায় একঘণ্টা প্রাসাদ পরিক্রমার পর একটা লুকনো লিফটে চড়ে আমরা উঠে গেলাম প্রাসাদের গম্বুজে। গম্বুজের ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা নীচে, বহু নীচে, প্রাণচঞ্চল শহরগুলো দেখতে লাগলাম। এটাই কাহরেইন-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা।

আমাদের মুখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম জমছিল। ভোরের ঠান্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দিল। মনে হল, আরব্য রজনীর রূপকথার কোনও গল্পে ঢুকে পড়েছি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে শেখ হারিদ বললেন, এবারে আপনাদের এমন একটা জিনিস দেখাব যা বাইরের জগৎ কখনও চোখে দেখেনি। আশা করি আপনারা প্রাণভরে সে-দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন।

লিফ্ট আবার ফিরে এল নীচে। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সাদা মার্বেল পাথরে বাঁধানো অলিন্দ ধরে।

চলতে-চলতে একসময় পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের পেছনের এক বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে। প্রাসাদের কাছাকাছি মাঠের একটি অংশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলগুলো পাথরের টুকরো গেঁথে তৈরি। তার গায়ে সবুজ লতানে গাছের ঝাড়। ঘেরা অংশে প্রবেশ করার পথ একটাই : প্রকাণ্ড ভারি এক লোহার দরজা। দরজায় সশস্ত্র প্রহরা। প্রাসাদে ঢোকার মুখেও এত কড়া পাহারা দেখিনি।

আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে অপূর্ব সুন্দর নিসর্গচিত্রের মতো এক অপরূপ বাগান।

আমরা ভেতরে ঢুকতেই লোহার গেট আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। শেখ হারিদ অনুচ্চ অহঙ্কারী কণ্ঠে বললেন, এই বাগানে আমার পোষা পাখিরা থাকে।

তাঁর ঠোঁটে সামান্য ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

আমি আর মোহন পরস্পরের দিকে তাকালাম। পোষা পাখি? কিন্তু কই, কোনও খাঁচা তো নজরে পড়ছে না। মাথার ওপরে খোলা নীল আকাশ। পাখিদের বন্দি করার ব্যবস্থা কই?

অবাক হয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের নজর আটকে গেল। মুগ্ধ অপলক চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম। এবং আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম।

নানান রঙের রূপসী ফুল ফুটে আছে বাগানে। তাদের বর্ণ গন্ধের তুলনা হয় না। সামনেই এক অগভীর দিঘি। আকাশ নীল রঙের মার্বেলে বাঁধানো। নির্মল স্বচ্ছ তার জল। দিঘির মাঝে এক স্বপ্নিল ফোয়ারা। তার জলধারা শূন্যে বাঁক নিয়ে বিরঝির করে ঝরে পড়ছে টলটলে জলে। কুলকুল শব্দ হচ্ছে জলতরঙ্গের মতো। দিঘির পাড়ে সূর্যের খরতাপ আড়াল করে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ দেবদারু ও চিনার গাছের সারি। ছায়া-ছায়া সবুজ পরিবেশ যেন মায়াময় এক মরূদ্যান।

সব মিলিয়ে অপরূপ এই উদ্যান।

না, উদ্যানের অপরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমাদের অবাক করে দেয়নি, পা জোড়া গেঁথে দেয়নি নরম ঘাসের জমিতে। আমাদের হতবাক করেছে বাগানের পাখিরা।

স্বর্গের এই নন্দনকাননে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে সুন্দরী তরুণীর ঝাঁক। সংখ্যায় তারা কুড়ি, কি তারও বেশি হবে। কেউ পায়চারি করছে, কেউ দিঘিতে সাঁতার কাটছে, কেউ শুয়ে আছে ঘন দেবদারুর ছায়ায়, আর কেউ বা ঘাসের ওপর শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

প্রতিটি মেয়েই অপরূপ রূপসী ও তীব্র যুবতী। সবচেয়ে অবাক করে দেওয়া বিষয় হল, তরুণীরা সকলেই সম্পূর্ণ নগ্ন। শেখ হারিদের নগ্ন পোষা পাখির ঝাঁক।

আপনাদের মুখ দেখে বুঝতে পারছি আপনারা খুশিই হয়েছেন। আসুন, একটু ঘুরে দেখা যাক।—শেখ মেজাজি স্বরে বললেন।

আমরা বাগানে পায়চারি করতে থাকলাম।

তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম। চলার পথে যে-মেয়েটি আমাদের সামনাসামনি পড়ছে সে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তারপর আমরা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ামাত্রই সে আবার নিজের সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় ফিরে যাচ্ছে। যে-কাজে মেতে ছিল সেই কাজেই আবার মেতে উঠছে।

এ এক অদ্ভুত সম্মান। আবার একই সঙ্গে আমার শরীরে দপদপ করে উঠছে। কামনার শিরা। প্রতিটি নগ্ন নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব যেন নতুন নতুন বাসনার দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে দেহের অন্ধকার কুঠরিতে।

চলতে চলতে আমরা বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

মুখে সবজান্তা হাসি ফুটিয়ে শেখ হারিদ বললেন, ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি, আমার যে-কোনও অতিথি এই বাগানে আসামাত্রই নির্বাক হয়ে যায়। কথা হারিয়ে ফেলে কোন অজানা জাদুমন্ত্রে।

মোহন খান্নাই প্রথম ভাষা খুঁজে পেল। বলল, স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই স্যার, এই দুর্লভ সুন্দরীদের দেখার অনুমতি ও সুযোগ দিয়ে আপনি একই সঙ্গে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন এবং অবাক করেছেন।

শেখ নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন : দয়া করে ভুল বুঝবেন না, মিস্টার খান্না, এটা আমার হারেম নয়। সেটা আছে প্রাসাদেরই অন্য আর এক অংশে। সেখানে আমি ও আমার বিশেষ কয়েকজন রক্ষী ছাড়া আর কারও ঢোকার অধিকার নেই। তা ছাড়া, আমার বেগমরা নগ্ন দেহে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না, সেরকম অনুমতি তাঁদের দেওয়া হয়নি। —শেখ হারিদ একটু থেমে নগ্ন তরুণীদের দিকে ইশারা করে বললেন, না, মিস্টার খান্না, বেগম নয়, এই মেয়েরা আমার কয়েদি।

আপনার কয়েদি!—আমি ও মোহন বিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করে উঠলাম শেখের কথার।

হ্যাঁ, কয়েদি। কোনও-না-কোনও অন্যায় আচরণের জন্যে ওরা এখানে বন্দি। সে-অন্যায় আমার বিরুদ্ধে, আমার রাজ্যের বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্যিই কি ওরা অপরাধী? দুপাশে হাত ছড়ালেন হারিদ : আমার বিচার কি সঠিক বিচার হবে? কী করে ন্যায়-বিচার করব আমি? আমি ওদের রাজা, কিন্তু রাজা হলেও আমি এক ক্ষুদ্র মানুষ। তাই ওদের বিচারের ভার আমি তুলে দিয়েছি মহান আল্লার হাতে। আল্লাই ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। আল্লা ওদের বিচার করে চলেছেন, আর সেই বিচারের রায় অনুযায়ী দণ্ড পাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চেষ্টা করি। ওরা এই ঘেরা বাগানে বন্দি, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনওরকম অসুবিধে ওদের নেই। ওরা সম্মানিত অতিথির আপ্যায়ন পায়।

আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শেখ হারিদ। তারপর এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হেসে বললেন, যাওয়ার আগে আর-একটা কাজ বাকি আছে। আমার আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ আজ রাতে দুজন তরুণী আপনাদের শয্যা মধুময় করে তুলবে। ওদের মধ্যে থেকে আপনারা একজন করে বেছে নিন।

আমি একটু অস্বস্তি পেলাম। কী বলছেন শেখ হারিদ?

মোহনকে দেখে বেশ উল্লসিত মনে হল, কিন্তু আমি খুশি হতে পারলাম না। রোমিলার কথা মনে পড়ল। জানতে পারলে ও কী ভাববে? সেই অস্বস্তির কথাই শেখকে বলতে গেলাম আমি।

কিন্তু আমার ছোট বোন সঙ্গে রয়েছে। ও যদি জানতে পারে...

শেখ হারিদ ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আশা করি আমার আতিথেয়তাকে অসম্মান করার চেষ্টা আপনি করবেন না, মিস্টার কাপুর!

পরক্ষণেই হারিদের স্বর পালটে গেল। মেজাজি গলায় বললেন, ভয় নেই, আপনার সুন্দরী বোন কিছুই জানতে পারবে না।

আমি বুঝলাম, শেখ হারিদের ইচ্ছে বা অনুরোধ তাঁর আদেশের চেয়েও শতগুণ ধারাল।

মোহন জিগ্যেস করল, যাকে খুশি বাছতে পারি?—সে যেন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

যাকে আপনার খুশি!—শেখ মোহনকে আশ্বাস দিলেন, আপনিই প্রথমে পছন্দ করুন, মিস্টার খান্না।

শরীরে পোশাক থাকুক আর না থাকুক, ওদের মধ্যে যে-কেউই পুরুষের নজর টানে। কিন্তু মোহন একটু দ্বিধায় পড়ল। কিছুক্ষণ ঘুরে-ঘুরে দেখে ও শ্যামলা রঙের একটি মেয়েকে পছন্দ করল। আমরা যখন বাগানে ঢুকি তখন মেয়েটি দিঘির স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটছিল। আমাদের এগিয়ে আসতে দেখেই সে চটপট উঠে এসেছিল জল থেকে। তারপর নিশ্চল ভাস্কর্যের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জলের অলস ধারা তার সুঠাম শরীরের স্তন, নাভি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। মাথার কালো চুল, সুন্দর মুখমণ্ডল ও ডৌল স্তনের ওপর বিন্দু-বিন্দু জলের মুক্তো চিকচিক করছিল। মেয়েটির বয়েস খুব বেশি হলে সতেরো কি আঠেরো, কিন্তু দেহের গঠনে কোথাও কোনও ঘাটতি নেই।

সুতরাং সুন্দরীদের সমাবেশে ওই মেয়েটিকেই সেরা সুন্দরী বলে মনে হল মোহনের।

এখানে সবাই দারুণ সুন্দরী, কিন্তু দিঘির ধারের ওই শ্যামবর্ণ মেয়েটিকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ, স্যার। —একটু ইতস্তত করে মোহন বলল।

সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল আমাদের কাছে। দু-হাত দু-পাশে ঝুলিয়ে রেখে সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে—যেন মেহগনি কাঠে খোদাই করা মূর্তি।

তারপর শেখ হারিদের বিশ্বস্ত অনুচর হাসান ইশারা করতেই মেয়েটি আমাদের সামনে বারকয়েক পায়চারি করল, যাতে সবদিক থেকে আমরা তাকে খুঁটিয়ে দেখতে পারি।

পেছন থেকেও মেয়েটির যৌবনের আকর্ষণ কম নয়। তার ভারি নিতম্ব যেন চলার তালে তালে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমার মনে হল, মেয়েটি ইচ্ছে করেই আমাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

আপনার মেয়ে দেখার জহুরি চোখ আছে, মিস্টার খান্না।—শেখ খুশির সুরে বললেন। তাঁর হাত অন্তরঙ্গভাবে খেলে বেড়াতে লাগল মেয়েটির মসৃণ ত্বকের ওপর। তারপর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, দারুণ পছন্দ! আজ রাতের জন্যে ও পুরোপুরি আপনার। তবে একটা কথা আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে : ওর শরীরের কোন অংশ আপনার চোখে সবচেয়ে লোভনীয়, মিস্টার খান্না?

ওর শরীরে কোনও খুঁত নেই। সবই সুন্দর।—মোহন স্বীকার করল অকপটে।

কিন্তু শেখ হারিদ নাছোড়বান্দা।

কিন্তু এমন একটা অংশ তো আছে যেটা আপনার সবচেয়ে পছন্দ?

মোহন বুঝল উত্তর না দিয়ে রেহাই নেই। ফলে ও বলল, ওর পায়ের গড়ন সত্যি একসেলেন্ট। এরকম নিখুঁত গড়ন কখনও আমার নজরে পড়েনি।

চমৎকার!—হাততালি দিয়ে উঠলেন শেখ হারিদ। তারপর তিনি ধীরে ধীরে ফিরে তাকালেন আমার দিকে : মিস্টার কাপুর, এবারে আপনার পালা। আপনি আপনার শয্যাসঙ্গিনী বেছে নিন। লজ্জা করবেন না মোটেই।

আমি নিরুপায় হয়ে নগ্ন সুন্দরীদের খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম।

হিতেশ কাপুর

সারাদিন ঘুরে এসে রোমিলা খুশিতে টগবগ করে ফুটছিল। প্রচণ্ড উৎসাহে ও সারাদিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাতে লাগল আমাদের।

সন্ধে গড়িয়ে রাত বাড়ছে। আমার মন ক্রমাগত উসখুস করে চলেছে। কারণ রাত আর একটু গাঢ় হলেই আমার ঘরে পৌঁছে যাবে আমার পছন্দ করা সুন্দরী। এই এক চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আমাকে সারাক্ষণ অন্যমনস্ক করে রাখল।

তাকিয়ে দেখি মোহন খান্নার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

আমরা রোমিলার ঘরে বসে ছিলাম। মোহন দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বারান্দার দিকে নজর রাখতে চাইছে।

কথা বলতে বলতে রোমিলা একটু পরেই বুঝতে পারল আমরা কেউই ওর কথায় কান দিচ্ছি না। তখন অভিমানে আহত গলায় ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা, তোমরা আমার একটা কথাও শুনছ না। ভেবেছিলাম, সারাদিনে আমি কোথায় কোথায় ঘুরলাম সে-কথা বলে তোমাদের তাক লাগিয়ে দেব, কিন্তু কোথায় কী? ধ্যুৎ ছাই, মোহনদারও দেখছি এক অবস্থা।

হতাশায় হাত ছুড়ল রোমিলা।

কিছু মনে করিস না, রোমু। —আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর আড়চোখে দেখলাম মোহনের দিকে : আসলে সারাটা দিন আমাদেরও কম খাটুনি যায়নি। ভাবছি ঘরে গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি। ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।

আমারও একই অবস্থা, রোমিলা। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। —মোহন চটপট বলে উঠল।

কিন্তু রোমিলা সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে দেখল : কী হয়েছে বলো তো তোমাদের? এখনও তেমন রাত হয়নি। ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে রাতে বেড়াতে বেরোব, কাহরেইন-এর রাতের জীবন দেখব।

প্লিজ রোমু, আজ নয়, কাল।—আমি রীতিমতো অনুনয়ের সুরে বললাম, শরীরে আর কিছু নেই। নির্ঘাত গরমের জন্যে এমন কাহিল লাগছে। এ-কথা বলে রোমিলার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। স্পষ্ট টের পেলাম, রোমিলার নজর আমার পিঠে বিঁধছে।

শুনলাম, মোহন ওকে বলছে, আমিও চলি। গুড নাইট।

অবাক সুরে রোমিলা বলল, সত্যি, হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনারা শুধু নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে এসেছেন। আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।

আমি নীরবে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলাম।

ঘরে আসার মিনিটদশেক পরেই আমার পছন্দ করা মেয়েটি এল। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের সকালে দেখা উদ্যান ও সেখানকার সমস্ত ঘটনা হয়তো নিছকই এক সুন্দর স্বপ্ন, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মেয়েটিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনা থেমে গেল।

উপস্থিত শয্যাসঙ্গিনী এক সুন্দর স্বপ্ন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সঙ্গে সে মনোরম বাস্তবও বটে। পরনে তার আকাশ-নীল ম্যাক্সি। গলা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত বিছানো। অসংখ্য ভাঁজ তার শরীরের রূপরেখা স্পষ্ট অথচ রহস্যময় করে তুলেছে। সকালের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে।

পিঠ পর্যন্ত কালো চুলের ঝরনা। পাতলা টুকটুকে ঠোঁট। টানা-টানা ভুরু, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে টানা কালো চোখ। গায়ের রঙ মার্বেল পাথরের মতো সাদা।

আমি কোনও কথা বলার আগেই গলায় বাঁধা পোশাকের ফাঁসটা খুলে ফেলল সে। চাপা ফিসফিস শব্দ তুলে পোশাকটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ওর সুন্দর পায়ের পাতা ঘিরে যেন তৈরি হল এক সুনীল জলাশয়। এখন ও সম্পূর্ণ নগ্ন। সকালে যে নগ্ন রূপ দেখে আমি ওকে পছন্দ করেছি, এখন তা যেন বিকশিত হয়েছে শতদল মেলে। সকালে ওর সুতনু বাহুর প্রশংসা করেছি আমি। চাঁপার কলির মতো নিটোল প্রতিটি আঙুল। দীর্ঘ বাহু। নখ থেকে শুরু করে কাঁধ পর্যন্ত যে-মোহময়ী রেখা বরাবর বাহুর গতি, তা যেন কোনও দক্ষ শিল্পীর সাবলীল তুলির টান।

ওর শরীরের কোন অংশ আপনাকে বেশি টানে, মিস্টার কাপুর। শেখ হারিদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছি, ওরকম সুঠাম দীর্ঘ বাহু কেবলমাত্র অপ্সরী কিন্নরীদের ছবিতেই দেখা যায়, স্যার। এই দুটো হাত বুকে জড়িয়ে আমি সারাজীবন বসে থাকতে পারি।

শেখ মুচকি হেসেছিলেন আমার কথা শুনে। অবশ্য কেন, তা বুঝতে পারিনি—অন্তত তখন।

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে স্বপ্নচারিণী কথা বলল, তোমাকে আমি সুখী করতে চাই। সেরকমই আদেশ রয়েছে আমার ওপরে।

আমার অঙ্গের প্রতিটি শিরা দপদপ করে কাঁপতে লাগল। ওর অপরূপ হাত দুটো হাতে তুলে নিলাম। চোখের নজর যথেচ্ছ খেলে বেড়াতে লাগল ওর নিখাদ-নগ্ন শরীরে। ফিসফিস করে বললাম, তোমার মতন সুন্দর কাউকে দেখিনি। শুধু তোমাকে দু-চোখ ভরে দেখতে চাই।

ও আলতো করে নমনীয় হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল আমার হাত থেকে। তারপর আরও কাছে এসে ধরা দিল আমার বাহুবন্ধনে।

দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার মুখ নামিয়ে এনে গভীর চুম্বন এঁকে দিল আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে।

আমার শরীরের অভ্যন্তরে পাগল করা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সেই মুহূর্তে।

আমার মধ্যে কিছুটা অস্বস্তি, কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা সঙ্কোচ ছিল। কারণ অন্যের আদেশে এই মেয়েটি এসেছে আমাকে ভালোবাসতে। নিজের ইচ্ছেয় আসেনি। কিন্তু প্রথম স্পর্শের সঙ্গে-সঙ্গেই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উবে গেল আমার মন থেকে। ওর মোহময়ী যৌবন অনিবার্য নিয়তির মতো গ্রাস করল আমার নীতি-আদর্শ-সহানুভূতি, সবকিছু। তা ছাড়া, দেখে মনে হল, একটি সুন্দর স্বপ্নময় সুখ-শয্যা রচনার ইচ্ছে আমার চেয়ে এর কিছু কম নয়।

আমাদের মিলন হল একটি স্মরণীয় ঘটনা। দুজনেরই কৌমার্যব্রতের ইতি ঘটল সে-রাতে। তীব্র কামনা, আনকোরা অভিজ্ঞতার আনাড়িপনা, সবকিছু মিলে এক আশ্চর্য যুগলবন্দি সৃষ্টি করলাম আমরা দুজনে। ওর কামনার আবেগ যেন ওর সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায়।

উত্তাল ঢেউ তুলে ও আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কোন অজানায়। মনে হল, এর চেয়ে সুখের নীড় তিন ভুবনের কোথাও নেই।

অবশেষে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি রাজকীয় শয্যায়। কথা বলছি নরম গলায়। জানলাম, ওর নাম আয়েষা। ছেলেবেলা থেকেই ও কাহ্রেইন-এ মানুষ। ইংরেজি শিখেছে ওর বাবার কাছে। তারপর...।

আমি ওর কানের কাছে মুখ এনে ছোট্ট করে বললাম, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আয়েষা।

পলকে ওর নমনীয় শরীর শক্ত হয়ে গেল। আমি চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর কাজল কালো চোখে অনন্ত দুঃখের ঢল নেমেছে, সঙ্গে আতঙ্কের জটিল স্রোত।

ও-কথা বোলো না কখনও।—আয়েষা বিষণ্ণ স্বরে বলল।

কেন বলব না? আমাদের পরিচয় মাত্র একদিনের, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

না হিতেশ, তা হয় না। আমি শেখ হারিদের কয়েদি। আজ রাতের পর আর আমাদের দেখা হবে না।

কিন্তু কোন অপরাধে শেখ তোমাকে বন্দি করেছেন?—অধৈর্য হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

আয়েষার মুখ-চোখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, অপরাধ আমি করিনি, করেছেন আমার বাবা। বাবার একটা খবরের কাগজ আছে—কাহ্রেইন থেকে বেরোয়। সেই কাগজে এমন কিছু লেখা বেরিয়েছিল, যা শেখ হারিদ মনে করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে।

তাতে তোমার কী করার আছে?—আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তুমি শেখকে চেনো না। নৃশংসতায় তাঁর জুড়ি নেই। বাবার ওপরে কী-ইবা প্রতিশোধ নিত শেখের লোকেরা। বড়জোর বাবাকে ওরা মেরে ফেলত। কিন্তু বাবা তো এমনিতেই অসুস্থ, যে-কোনওদিন মারা যেতে পারেন। সুতরাং বাবার অপরাধে যদি আমাকে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে বাবার ওপর ধাক্কাটা অনেক বেশি আসবে। তাই এই ব্যবস্থা। আজ সকালে যে-সব মেয়েদের তুমি বাগানে দেখেছ, ওদের বেশিরভাগই নিরপরাধ। ওদের প্রাসাদে এনে বন্দি করে রাখা হয়েছে কারণ অন্যায়টা করেছে ওদের কোনও আত্মীয় অথবা বন্ধু। একের পাপের শাস্তি অন্যকে সইতে হচ্ছে।

কিন্তু এখন তোমাকে নিয়ে শেখ কী করবেন?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

আয়েষা মনমরা সুরে জবাব দিল, কেউ সঠিক জানে না। কিন্তু এমন সব কথা আমরা কানাঘুষোয় শুনেছি যে, সেগুলো উচ্চারণ করতেও ভয় হয়। তবে এটুকু জানি, এখানে কোনও মেয়েকে এক বছরের বেশি আটকে রাখা হয় না। আর কোনও মেয়েকে যদি শেখের অতিথির সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে তারপর তাকে আর ওই বাগানে দেখা যায় না।

তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি থাকতে পারব না।—বুঝতে পারছিলাম, আবেগে আমার স্বর বুজে আসছে। শুধু-শুধু দুঃখ পেয়ো না। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কথা বিশ্বাস করো।

আয়েষা আমার কথা বিশ্বাস করল কিনা জানি না, তবে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল ওর সুন্দর ঠোঁটে। বলল, হিতেশ, ওসব কথা ভুলে যাও। শুধু আজকের রাতটুকুই আমার কাছে সত্যি। এসো, এই সময়টুকু আমরা সবকিছু উজাড় করে ভালোবাসার খেলা খেলি।

সে-রাতে আরও কতবার যে আমরা একই খেলায় মেতে উঠেছিলাম আজ আর মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, শেষবারের পর আয়েষার ধনী বুকের ওপর মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওর শরীরের সোঁদা গন্ধ নাকের ভেতরে ঢুকে আমাকে মাতাল করে দিচ্ছিল।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভেঙেছে তখন আয়েষা চলে গেছে।

প্রাতরাশের টেবিলে রোমিলা হালকা গলায় মন্তব্য করল, দাদা কাল সাত-তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েও তোমাদের শরীরের কোনও উন্নতি হয়নি। ঠিক ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে।

আমি কোনও জবাব দিলাম না। শুধু মোহন খান্নার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। রোমিলা টেবিল ছেড়ে চলে যেতেই মোহন জিগ্যেস করল, কী দোস্ত, এখানকার হাওয়া এখন স্যুট করছে তো? তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কাল রাতটা বেশ ভালোই কেটেছে।

আমি উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, তোমার?

একগাল হেসে মোহন বলল, দারুণ! শুধু খারাপ লাগছে এই কথা ভেবে যে, একটু পরেই শালা শেখের সঙ্গে তেলের দর নিয়ে মেছোবাজারের মতো দরাদরি করতে হবে। কিন্তু উপায় কী ব্রাদার, এর নাম চাকরি। চলো, তৈরি হয়ে নিই।

তেল নিয়ে কথাবার্তা সহজে মিটল না। চটপট কোনও সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো গেল না। শেখ হারিদের সঙ্গে হাজির ছিলেন তাঁর মন্ত্রণা পরিষদ। হাসান হাজির ছিলেন নীরব সাক্ষীর মতো। আর মোতায়েন ছিল শেখের বিশ্বস্ত কয়েকজন রক্ষী। অত্যন্ত ছোটখাট ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একরোখাভাবে জেদ ধরলেন কাহরেইন-এর বাণিজ্য মন্ত্রণা পরিষদের মুখপাত্ররা। সব দেখেশুনে মনে হল চটজলদি কোনও চুক্তি করতে তেলের কুমিররা রাজি নন।

সারাদিন ধকলের পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। মোহন বলল, ওরা মনে হয় অন্য কোনও পার্টির সঙ্গেও কথাবার্তা চালাচ্ছে। হতে পারে। আমি ওর কথায় সায় দিলাম : আমরা দরে যত পর্যন্ত উঠতে পারি সেই পর্যন্ত দেখব। তাতেও যদি ওরা রাজি না হয় তাহলে কোম্পানিতে টেলিগ্রাম করে ডিরেক্টরদের ডিসিশান জানতে হবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অগত্যা।—বলল মোহন।

সারাদিনের মিটিংয়ে আমি কম বকবক করিনি। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মোহনকে সাহায্য করার। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে মিটিংয়ে আমি একাত্মভাবে জড়িয়ে পড়তে পারিনি। আয়েষার কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল গত রাতের কথা। রাতের পুঙ্খানুপঙ্খ প্রতিটি স্মৃতি জ্বলজ্বল করছিল আমার চোখের সামনে, ভিড় করছিল আমার মনের ভেতরে। কেমন একটা অপরাধবোধ আমাকে জড়িয়ে ধরল। কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় আমি কোনও জালিয়াতি করে ফেলিনি তো? না কি আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই ওই শয্যাবিলাসের আয়োজন করেছিলেন শেখ হারিদ? কিন্তু এতটা শয়তানি প্যাঁচ কি খেলবে কাহরেইন-এর এই নির্লিপ্ত মানুষগুলো? তা ছাড়া আয়েষার কথাগুলো কি বানানো গল্প, মিথ্যে?

অনেক ভেবেও আয়েষার কথাগুলো মিথ্যে বলে মনে হল না।

ওর বাবার অপরাধে ও শাস্তি ভোগ করছে!

কী নৃশংস এই শেখের বিচার!

আয়েষার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। ওর সুন্দর মুখ, ওর অপরূপ অতুলনীয় দুটি বাহু, ওর জাদুমন্ত্রে ছোঁয়া-লাগানো নগ্ন যৌবন।

যে করেই হোক আয়েষার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। কোনও বাধা, কোনও বিপদ আমাকে রুখতে পারবে না।

রোমিলা কাপুর

নির্দিষ্ট জায়গায় যখন পৌঁছলাম তখন ন'টা বেজে দশ মিনিট। আজও আকাশি ভ্যান আমার অনুসারী। বহু চেষ্টা করেও লেজ থেকে তাকে ছাড়াতে পারিনি।

আলফা থামিয়ে গাড়ি থেকে নামতেই মহম্মদ ইলিয়াসের হাসিমুখ। আমার হাতে নাম-না-জানা হলুদ ফুলের তোড়া। শেখ হারিদের চোখ ভোলানো বাগান থেকে নিজে হাতে তুলে এনেছি।

তোড়াটা ইলিয়াসের হাতে দিয়ে বললাম, গোলাপের বদলে।

ইলিয়াস দু-হাত পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। ডান হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে ফুলের তোড়াটা গ্রহণ করল। তারপর লুকনো বাঁ হাত সামনে নিয়ে আসতেই লজ্জা পেলাম। ওর হাতে সদ্য ফোটা গোলাপের তৈরি একটা নতুন গুচ্ছ।

তোড়া দুটিকে হাতবদল করে মাথা ঝুঁকিয়ে আদাবের ভঙ্গিতে ওর গোলাপের তোড়াটা আমার দিকে এগিয়ে দিল ইলিয়াস। বলল, ইতনি আসান নহী হ্যায় কর্জ চুকানা ইয়ে বান্দেকি! এ বান্দার ঋণ শোধ করা অত সহজ নয়, মিস কাপুর।

তারপর গতকালের মতোই ও হাটের মাঝখানে হো-হো করে হেসে উঠল। আশেপাশের লোকজন বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল আমাদের দিকে।

ইলিয়াসের পোশাক আজ অন্যরকম। ফিনফিনে গোলাপি কাপড়ে তৈরি ফুলহাতা কাফতান আর আঁটোসাঁটো ব্লু জিন্স। কাঁধে ঝোলানো একটা চামড়ার ব্যাগ।

চলুন, কারনামায় গিয়ে বসি।—ইলিয়াস বলল, ইন্টারভিউটা সঙ্গে এনেছি। আপনাকে পড়ে শোনাব।

আমি ওর পাশে হাঁটছি। কারনামা-র সুদৃশ্য দরজা ক্রমেই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে ভারতের কথা ভাবলে দেশটার স্মৃতি কেমন আবছা মনে হয়। মনে হয়, কাহরেইন সত্যি, বাকি সব মিথ্যে।

গতকাল দাদা ও মোহনদার আচরণ আমার কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছে। বারবার মনে হয়েছে, কী একটা যেন ওরা গোপন করতে চেষ্টা করছে আমার কাছ থেকে। কোথায় চিন্তায় ছিলাম আমার কাহরেইন বেড়ানোর কতটুকু ওদের বলব, আর কতটুকু বলব না, উলটে ওরা আমার বেড়ানোর গল্পকে মোটে পাত্তাই দিল না। সেই মুহূর্তে ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওদের ওপর।

আজ সকালেও দাদা আর মোহনদার মুখে অবসাদ ও ক্লান্তির ছাপ দেখেছি। সেই সঙ্গে যেন একটা আবছা অপরাধবোধও ছায়া ফেলেছিল ওদের মুখমণ্ডলে। দাদা এমনিতে মনের ভাব খুব একটা লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই ওকে দেখেই আমার সন্দেহটা গাঢ় হল। শেখ হারিদ কি ওদের দিয়ে কোনও অন্যায় কাজ করিয়ে নিতে চলেছেন?

ইরান কথাটার অর্থ জানেন?

ইলিয়াসের আচমকা প্রশ্নে আমার চমক ভাঙল। দেখি 'কারনামা'র দরজায় পৌঁছে গেছি।

দরজা ঠেলে ভেতরের ঠান্ডা পরিবেশে ঢুকলাম দুজনে। আমি ছোট্ট করে বললাম, ইরান কথাটার আবার অর্থ আছে নাকি?

কাহরেইন-এর নেই, কিন্তু ইরানের আছে।

গতকালের টেবিলটার দিকে অজান্তেই চোখ চলে গেল আমাদের। টেবিলটা খালি। দুজনে চোখাচোখি হল। ইলিয়াসের কালো চোখের তারায় আশ্চর্য কৃতজ্ঞতার ইশারা। কিন্তু কেন, তা জানি না।

টেবিলে দুজনে মুখোমুখি বসলাম। তারপর আমি বললাম, আজ শুধু সবুজ চা। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব।

ইলিয়াসের চোখ পলকের তরে সপ্রশ্ন হল। কিন্তু পরক্ষণেই বেয়ারাকে ডেকে সবুজ চা অর্ডার দিল। তারপর আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, এত তাড়া নিয়ে এলেন কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যি-সত্যি আমার বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই। কিন্তু ইলিয়াসের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসতে আমার ভয় হচ্ছিল। তা ছাড়া আমি জানি, রেস্তোরাঁর বিল কিছুতেই ও আমাকে মেটাতে দেবে না। সেইজন্যেই আরও বেশি খারাপ লাগছিল। সুতরাং প্রসঙ্গ পালটে ঠোঁটে হাসি টেনে ওকে প্রশ্ন করলাম, কী হল, ইরানের অর্থটা বললেন না তো!

ইলিয়াসের মুখ সামান্য গম্ভীর হল। বলল, ইরানের অর্থ হল, আর্যদের দেশ। কারণ প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া থেকে দলে-দলে যেসব মানুষ ইরানে এসেছিল, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আর্য। সেইজন্যেই ওই নাম। উত্তর ভারত আর ইওরোপের সঙ্গে সেইসব আর্যদের রক্তের সম্পর্ক ছিল। সেইজন্যে তাদের বংশধরদের সঙ্গে দক্ষিণ ইওরোপের মানুষদের মিল আছে। আর প্রায় খাঁটি আর্য বলতে ইরানে রয়ে গেছে কয়েকটি উপজাতি—যেমন, কুর্দ, লুর আর বখতিয়ারি।

আমি হেসে ওকে বললাম, আপনি যে একেবারে ইতিহাস মুখস্থ করে রেখেছেন দেখছি!

ভুলে যাবেন না আমি রিপোর্টার। খবর বেচে খাই।

সবুজ চা টেবিলে এসে গেল। আমি ছোট্ট গোলাপের তোড়াটা নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। দেখাদেখি ইলিয়াসও আমার দেওয়া হলুদ ফুলের গুচ্ছ তুলে ধরল মুখের সামনে। বলল, আপনি গোলাপ ভালোবাসেন?

আমি হেসে বললাম, কে না বাসে!

ইলিয়াস আনমনা হয়ে গেল। থেমে-থেমে বলল, আলেয়া...আলেয়া গোলাপের নামে পাগল ছিল...।

আলেয়া! ইলিয়াসের বোন! কিন্তু ও এভাবে কথা বলছে কেন? আলেয়া গোলাপের নামে পাগল ছিল!

আমি ছোট্ট করে জিগ্যেস করলাম, আলেয়া এখন গোলাপ ভালোবাসে না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ওর শরীরের গভীর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এল বাইরে। পরদা ঢাকা জানলার দিকে তাকাল ইলিয়াস। অস্ফুট স্বরে বলল, এখন ও গোলাপ ভালোবাসে কিনা জানি না...

আমি চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলাম। অখণ্ড নীরবতায় চুমুকের ক্ষীণ শব্দটা কটু হয়ে কানে বাজল।

ইলিয়াস এবার আমার দিকে চোখ ফেরাল। বলল, আলেয়া কাছে নেই। এখন তেরো বছরের নাজমাই আমার সব। ওকে সুখী রাখার জন্যে আমি যা খুশি করতে পারি। ও আমার চোখের মণি, রোমিলা—না ভুল বললাম, তার চেয়েও বেশি।

ইলিয়াসের ফরসা মুখ লালচে হয়ে গেছে। এখুনি যেন রক্ত ফেটে বেরিয়ে ছিটকে পড়বে হলুদ ফুলের তোড়ার ওপর। ওর চোখ চকচক করছে কী এক অদ্ভুত আবেগে। আলেয়া ওর কাছে নেই কেন? আলেয়ার কি বিয়ে হয়ে গেছে? ইলিয়াসের চোখমুখ দেখে সে-কথা জিগ্যেস করতে ভরসা হল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইলিয়াস চায়ে চুমুক দিল। ফুলের তোড়াটা নামিয়ে রাখল পাশের চেয়ারে। একটু পরেই ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, ইন্টারভিউটা তোমাকে পড়ে শোনাই।

আমি আগ্রহে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম।

প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজকরা কয়েকটা কাগজ বের করল ইলিয়াস। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হল। বলল, এটা পার্সি ভাষায় লেখা, কিন্তু আমি ইংরেজি অনুবাদ করে পড়ে শোনাচ্ছি। বোর করলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, লজ্জা করবে না।

ও হাসল। আমিও হাসলাম। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে ইলিয়াস ইন্টারভিউটা আমাকে পড়ে শোনাতে লাগল। পড়া এবং শোনার ফাঁকে-ফাঁকে চলতে লাগল আমাদের চায়ে চুমুক।

চা এবং ইন্টারভিউ-পাঠ প্রায় একই সঙ্গে শেষ হল। তখন ইলিয়াস প্রশ্ন করল, কেমন লাগল?

দারুণ!—একটু থেমে আরও বললাম, এটা কিন্তু মোটেই মন-রাখা কথা নয়। সত্যি, এত চমৎকার ও সাবলীলভাবে ইন্টারভিউটা ইলিয়াস লিখেছে যে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা বেরিয়ে আসে।

ওর নানান গুণ আমাকে বিপজ্জনক ভাবে মুগ্ধ করে চলেছে।

প্রশংসার জন্যে নরম গলায় আমাকে পালটা ধন্যবাদ জানাল ইলিয়াস। তারপর কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, তোমার তো আবার বাড়ি ফেরার তাড়া রয়েছে, নইলে...

হঠাৎই চুপ করে গেল ও।

আমি জানতে চাইলাম, নইলে কী?

ইলিয়াস একরাশ কুণ্ঠা নিয়ে নিচু গলায় বলল, কাল নাজমাকে তোমার কথা গল্প করেছিলাম। ও ভীষণ জেদ ধরেছে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। আসলে আমি চাকরিতে বেরিয়ে পড়ি। বাড়িতে আমাদের পিসির কাছে নাজমা থাকে। ফলে তেমন গল্পগুজব করার সঙ্গী পায় না। তার ওপর তুমি ভারত থেকে এসেছ শুনে তো একেবারে আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছে।

কথা বলতে-বলতে একটা খুশির আভা ছড়িয়ে পড়ছিল ইলিয়াসের চোখে-মুখে। হঠাৎই সেটা দপ করে নিভে গেল। অনেকটা সাফাই দেওয়ার সুরে বিড়বিড় করে ও বলতে লাগল, আসলে আমি নাজমাকে বলেছিলাম, বাড়িতে আনা যাবে না—হয়তো রাজি হবে না। অচেনা লোকের বাড়িতে হুট করে কে-ই বা আসতে রাজি হয়, বলো!

ইলিয়াস আমার কাছে ঝুঁকে এল, বলল, আমি অনেকভাবে ওকে নিরাশ করতে চেয়েছি, কিন্তু তবুও মেয়েটা আশা ছাড়েনি। বারবার একই কথা বলছিল...

আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম। নাজমার প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারার দুঃখ যে ইলিয়াসের কাছে কতখানি সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তবুও আমার মনে হচ্ছিল, ইলিয়াসের বাড়িতে গেলে আমার কষ্ট

বাড়বে। আমি যেদিন ভারতে ফিরব সেদিন আমার পা টেনে ধরবে কাহরেইন-এর মাটি। বহুদিনের পোষা পাখির মতো আমার ডানা ভারী হয়ে যাবে। আর উড়তে পারব না আমি।

হঠাৎই আমার মনে হল, নাজমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল না কেন ইলিয়াস? তাহলে ওরও আশ মিটত, আর আমাকেও অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হত না। এই চিন্তাটাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় বলে ফেললাম ইলিয়াসকে।

নাজমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতে।

ইলিয়াস চোখ তুলে সরাসরি আমার দিকে তাকাল। বলল, সম্ভব হলে তো নিয়েই আসতাম, রোমিলা। ওর —ওর...।

আমি তীক্ষ্ণ নজরে ইলিয়াসকে জরিপ করছিলাম। হঠাৎই যেন অদ্ভুত এক বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে ওর চোখেমুখে।

আমি জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে নাজমার?

ইলিয়াস নিচু গলায় বলল, ও হাঁটতে পারে না। প্যারালিসিসে ওর দুটো পা বহুবছর ধরে অকেজো হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে?

ইলিয়াসের বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবুও ও সংক্ষেপে সব বলল আমাকে। নাজমার যখন তিন বছর বয়েস তখন কী একটা অসুখে হঠাৎ করেই ওর পায়ে প্যারালিসিস দেখা দেয়। তারপর সেটা ক্রমে বাড়তে থাকে। বহুরকম চিকিৎসা করেও কোনও কাজ হয়নি।

কথা বলতে-বলতে ইলিয়াসের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

আমি ভারী গলায় বললাম, সরি, ইলিয়াস। অজান্তে তোমাকে ব্যথা দিয়ে ফেলেছি। চলো, আমি তোমার বাড়িতে যাব—নাজমাকে দেখতে যাব।

ইলিয়াসের জলভরা চোখ পলকে আনন্দে চকচক করে উঠল। ও অবিশ্বাসের সুরে বলল, সত্যি?

আমি হেসে বললাম, ট্রুথ, নাথিং বাট দ্য ট্রুথ।

ইলিয়াস আচমকা আমার হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল, গ্রেট। কাম অন, লেটস গো।

ইলিয়াস চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। সেইসঙ্গে আমিও।

ওর ইচ্ছে পূরণ করতে পেরে আমার আনন্দ হচ্ছে! আমার একটা হাত কখন যেন ইলিয়াস বগলদাবা করে বন্দি করে ফেলেছে। গোলাপের তোড়াটা আমি আমার ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ইলিয়াসও হলুদ ফুলের গুচ্ছটা ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছে। ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে আর পাকা গাইডের ভাবভঙ্গিতে ইরান, কাহ্রেইন ইত্যাদি সম্পর্কে লাগাতার বকবক করে চলেছে। যেন এক অদ্ভুত পাগলামি পেয়ে বসেছে ওকে।

বাজার এলাকাটা পেরিয়ে এসেই ইলিয়াস ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রোমিলা, আলফা আলফার জায়গায় পড়ে থাক। আলফা সঙ্গে নিলে পেছন পেছন ওই আকাশি ভ্যানও আসবে। না কি তোমার দেহরক্ষী চাই?

আমি প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। বললাম, একজনকেই সামলাতে পারছি না তার ওপর আরও দুজন এলে তো তুলকালাম কাণ্ড হবে।—আমি ইশারায় ইলিয়াসের হাতে বন্দি আমার হাতটা দেখালাম।

ওঃ, সরি!—বলে ইলিয়াস চটপট হাতটা ফেরত দিল।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজাও খুলে দিয়েছে ড্রাইভার। দুজনে চটপট উঠে বসলাম ভেতরে। ইলিয়াস দেশীয় ভাষায় কী যেন নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে

বলল, আমার বাড়ি একেবারে কাহরেইন-এর সীমানার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম কানাম। তবে পৌঁছতে মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।

ঠিক-ঠিক বলতে গেলে আট মিনিটের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম দুজনে।

জায়গাটা বেশ কিছুটা ঘিঞ্জি। দেখে মনে হয় এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে নিম্নবিত্তের সংখ্যাই বেশি। ইলিয়াস বোধহয় আমার মনের কথা টের পেয়েই বলে উঠল, গোটা কাহরেইন তেলের ওপরে ভাসছে। অথচ সব পয়সাই ঢুকছে শেখ হারিদের পকেটে। দেশের লোক সব অভাবে ধুঁকছে।

ইলিয়াসের কথায় বেশ খানিকটা ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তুমি শেখের অতিথি। তোমার সামনে এসব কথা বলে ফেললাম বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু সত্যি কথাটা কি জানো? দেশের লোকের সহ্যের সীমা পার হয়ে যেতে চলেছে। ধস একদিন নামবেই।

আগামী সেই দিনটার আশায় ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

বাড়ির সদর দরজা পেরিয়েই হাঁকডাক শুরু করে দিল ইলিয়াস, নাজমা। নাজমা। দ্যাখ কাকে নিয়ে এসেছি।

সদর পেরিয়েই একটা খোলা উঠোন। তারপর বাড়ি।

একটু পরেই বাড়ির দোতলার বারান্দায় সাদা-চুল এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাঁখে অপূর্ব রূপসী একটি মেয়ে। বয়েস বারো কি তেরো। নিশ্চয়ই নাজমা। আর বৃদ্ধা সম্ভবত ওর পিসিমা।

আমাদের দেখে মেয়েটা কোল থেকেই একেবারে হইহই শুরু করে দিল।

ইলিয়াস ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, সবুর কর, এক্ষুনি আমরা ওপরে যাচ্ছি।

সেকেলে জীর্ণ ঢঙের সিঁড়ি ভেঙে ইলিয়াস আমাকে ওপরে নিয়ে গেল। চলতে-চলতে বলল, কোথায় শেখ হারিদের প্রাসাদ, আর কোথায় এই বাহাত্তুরে বাড়ি।

আমি মাথা নিচু করে সিঁড়ি ভাঙছিলাম, চট করে মুখ তুলে ওকে দেখলাম। তারপর বললাম, তুমি তো অবুঝ নও। ওই প্রাসাদ কাদের কান্না-ঘাম-রক্তে তৈরি তা নিশ্চয়ই তুমি জানো, আমার চেয়ে ভালো করেই জানো!

ইলিয়াস হেসে বলল, ইন্টারভিউতে একটা কথা জুড়ে দেব, ভারতীয় তরুণীদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা মুশকিল।

দুজনেই চড়া গলায় হেসে ফেললাম।

অবশেষে নাজমার ঘরে এলাম।

ঘরটা আকারে মাঝারি। মেঝেতে রঙচটা একটা পুরোনো কার্পেট পাতা। বড়-বড় দুটো জানলায় জাফরি ঝোলানো। হয়তো রোদের তাপ ও চোখ ঝলসানো আলো স্তিমিত করার জন্যে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা খাটো বিছানায় নাজমা এখন আধশোয়া অবস্থায়। দুটো তাকিয়া ওর পিঠের কাছে গোঁজা। রঙিন সুতো দিয়ে কী একটা বোধহয় বুনছিল, সেটা বিছানার একপাশে রাখা। এখন মুগ্ধ একাগ্র চোখে ও শুধু আমাকে দেখছে।

নাজমা যেন কোনও স্বর্গীয় পুতুল। দুধে-আলতা ওর গায়ের রঙ। টানা-টানা কালো চোখ। ধারালো নাক ও চিবুক। পাতলা গোলাপি ঠোঁট। নাকে ছোট একটা লাল পাথর ঝিলিক মারছে। এছাড়া তেমন কোনও সাজগোজ বা প্রসাধন নেই। আমি থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটার অপরূপ সৌন্দর্য আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম।

ইলিয়াস আমার কনুই স্পর্শ করল, বলল, বিছানাতেই বোসো। নাজমা তোমাকে কাছছাড়া করবে বলে মনে হয় না।

নাজমা হাততালি দিয়ে উঠল, তোমার কথা কাল দাদার কাছে কত শুনেছি। তুমি আজ আমাকে সারাদিন ধরে ইন্ডিয়ার গল্প শোনাবে। নানান দেশের গল্প শুনতে আমার দারুণ লাগে।

ইলিয়াস বলল, ব্যস, এবারে আমার ছুটি। তবে রোমিলা, আর-একটা রিকোয়েস্ট, আজ আমাদের এখানে খেয়ে যাবে তুমি—অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

আমি মুখ ফিরিয়ে ইলিয়াসকে দেখলাম। অপরূপ সৌন্দর্য ওদের জন্মগত অধিকার। একটু থেমে ওকে বললাম, ভদ্রতার জন্যে যদি নোবেল পুরস্কার দেওয়া হত, তাহলে সেটা তোমার হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, ইলিয়াস।

আমরা তিনজনেই হালকা গলায় হেসে উঠলাম। ইলিয়াস ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর আমি ফুটফুটে পুতুলটার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলাম।

ঘরের দেওয়ালে বাঁধানো বেশ কিছু ছবি রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি রঙিন পার্সিলিপি। কিন্তু যে-ছবিটার প্রতি আমার নজর পড়ল সেটা তিনজনের একটি গ্রুপ ফটো। ইলিয়াস ও নাজমা দুপাশে। ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে বছর কুড়ির এক যুবতী। নিশ্চয়ই আলেয়া। একেবারে নাজমার মুখটি অবিকল কেটে বসানো।

আমি সেদিকে আঙুল দেখিয়ে নাজমাকে জিগ্যেস করলাম, মাঝখানে কে? তোমার দিদি আলেয়া?

হ্যাঁ।—ছবির দিকে না তাকিয়েই নাজমা বলল। একটা দুঃখ ছায়া ফেলল ওর কণ্ঠস্বরে।

তোমার দিদি এখন কোথায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, জানি না...একটু থেমে আরও বলল, দাদা জানে।

ঠিক এই সময়ে ওর পিসিমা এক গ্লাস শরবত হাতে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দিলেন। তারপর নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নাজমা ছোট্ট করে বলল, আমার পিসিমা। খুব ভালো বাদামের শরবত তৈরি করে, খেয়ে দ্যাখো।

আমি সৌজন্যবশত গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে ইশারা করতেই নাজমা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, আমি তো ওটা রোজই খাই, ডাক্তারবাবু খেতে বলেছেন। বাদামের শরবত খেলে আমার পা ধীরে-ধীরে সেরে উঠবে।

কথাটা বিশ্বাস করতেই মন চাইল, কিন্তু ইলিয়াসের মুখে যা শুনেছি তাতে মনে হয়, নাজমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্যেই হয়তো ও কথা বলা হয়েছে। শরবতটা রোজ খেলে ওর শরীরের পুষ্টি বাড়বে। শরবত শেষ করতেই আবার গল্প।

আমি নাজমাকে ভারতের নানান কথা শোনাই। পরক্ষণেই ও হাত-পা নেড়ে আমাকে ইরান বা কাহরেইন সম্পর্কে সাতকাহন করে শুনিয়ে দেয়। রাজ্যের বিষয় নিয়ে গল্পেগুজবে ইরান ও ভারত দেশ দুটো ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। ঘড়ির কাঁটার কথা একেবারে ভুলে গেলাম দুজনে।

দুপুর একটা নাগাদ গল্পের ঢেউ থামল। কারণ ইলিয়াস ঘরে এসে হাজির হল। আমাদের দিকে তাকিয়ে মজাদার মুখভঙ্গি করে বলল, আসুন মেমসাহেবরা, খানা তৈরি। তারপর আবার আড্ডা দেওয়া যাবে।

সুতরাং তখনকার মতো গল্প থামল। ওই ঘরেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম আমরা।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর ইলিয়াসও আমাদের আসরে যোগ দিল। সোজা কথায়, গুলতানি একেবারে জমে উঠল। এহেন বিষয় নেই যা আমাদের আলোচনায় জায়গা পেল না। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সময় একেবারে হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগল।

আকাশের আলো ম্লান হয়ে আসতেই আমি সচেতন হলাম। ইলিয়াসকে বললাম, এবারে আমি ফিরতে চাই। ও হেসে বলল, তোমার তো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল।

বুঝলাম, ঠাট্টা করছে। তাই হেসে বললাম, তুমিও ইন্ডিয়াতে কখনও এসো, তখন মজা টের পাওয়াব।

আমরা দুজনে নাজমাকে ছেড়ে উঠলাম। ও হঠাৎই বলল, দিদি এক মিনিট। তোমাকে একটা জিনিস দিই।

তারপর তাকিয়ার নীচ থেকে রুমালের মতো একটা জিনিস বের করল। রুমালটা রঙচঙে সুতোয় বোনা।

নাজমা বলল, আমি বুনেছি।

আমি আলতো করে ওর কমনীয় গাল টিপে দিলাম। বললাম, ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই এমন সুন্দর জিনিসটা পেলাম।

ইলিয়াস আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমার গোলাপের তোড়ার চেয়েও সুন্দর?

আমি কপট রাগে ওর দিকে কটমট করে একবার দেখলাম।

নাজমা বারবার বলল, আবার এসো! আবার এসো!

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয়ই আসব। তারপর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর ইলিয়াস।

চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই।—ইলিয়াস বলল।

একশোবার। না পৌঁছে দিলে আমি যাব কেমন করে?

ইলিয়াস বলল, সামনের বড় রাস্তায় পৌঁছলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

কিন্তু তার আর দরকার হয়নি।

আমি হঠাৎ জিগ্যেস করলাম, আবার কবে দেখা হচ্ছে?

কেন, কাল ন'টায়!—চটপট বলে উঠল ইলিয়াস। শুনে আমার ভালো লাগল।

অবাক হয়ে ভাবলাম, মানুষের প্রত্যাশা কী দুরন্ত বেগেই না বাড়তে থাকে! বাড়তে-বাড়তে যদি তা কখনও বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন?

আর কয়েক পা এগোতেই আলেয়ার কথা মনে পড়ল আমার। ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে জানতে চাইলাম, আলেয়ার কী হয়েছে ইলিয়াস? ও এখন কোথায়?

একটা বুক-কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলিয়াস বলল, আল্লা জানেন। আমি কী বলব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎই লাল রঙের আলফা স্পোর্টস কারটা আমার চোখ পড়ল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা কে নিয়ে এল এখানে?

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগেই আকাশি রঙের ভ্যানটা নজরে পড়ল।

ইলিয়াসের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আচমকা দুটো ছায়া আমার সামনে এসে হাজির হল।

আমরা চমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ভয়ে বুক কাঁপছে।

ইলিয়াস আমার বাহু আঁকড়ে ধরল শক্ত হাতে।

ছায়ামূর্তি দুজনের একজন ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, মিস কাপুর, আমরা আপনার দেহরক্ষী। আপনার গাড়িটা আমরা নিয়ে এসেছি। বাড়ি ফিরতে আপনার কোনও অসুবিধে হয়েছে শুনলে মাননীয় শেখ ভীষণ দুঃখ পাবেন।

আমি করুণ চোখে ইলিয়াসের দিকে একবার তাকালাম। ওর চোখে-মুখে ঘৃণা যন্ত্রণা ভয় আক্রোশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ইলিয়াসকে ছেড়ে আমি দেহরক্ষী দুজনের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। ইলিয়াস আচ্ছন্নের মতো আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল : বিদায়!

আলফায় উঠে যখন স্টার্ট দিলাম তখন আমার চোখ ঝাপসা হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। ইলিয়াসের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু করে।

আকাশি ভ্যানটা আমার আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি সেটাকে অনুসরণ করে চলেছি।

এটুকু বুঝলাম, শেখ হারিদের অনুচরদের চোখে ধুলো দেওয়া নেহাত সহজ নয়। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের ট্যাক্সি অনুসরণ করে ইলিয়াসের বাড়ি পর্যন্ত এসেছে। সে-কথা ভাবতেই দুশ্চিন্তা জুড়ে বসল মাথায়। আগামীকাল ইলিয়াসের সঙ্গে দেখা হবে তো?

ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখতেই দেখলাম, গাঢ় নীল আকাশে এক ফালি সুদৃশ্য চাঁদ আমার পাশে ছুটছে। পার্শিয়ান গাল্ফ-এর নোনা বাতাস আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। ভাবতে অবাক লাগল, আমি দেশছাড়া হয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের এক বিদেশি রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি।

হিতেশ কাপুর

সে রাতে শেখ আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নৈশভোজে। সুতরাং অস্থির মন নিয়েই মোহন ও রোমিলার সঙ্গী হলাম। রোমিলা একটু আগেই বেড়িয়ে ফিরেছে। ভীষণ ক্লান্ত ছিল ও। নৈশভোজে যেতে রাজি হচ্ছিল না। আমিই বলেকয়ে ওকে রাজি করিয়েছি। বলা যায় না, ওকে অনুপস্থিত দেখলে শেখ হারিদ কী থেকে কী ভেবে বসবেন।

ভোজের আসরে উপস্থিত ছিলেন শেখ হারিদ নিজে, পাশে তাঁর প্রিয় বেগমদের একজন, আর দুই ছেলে। ছেলে দুটি চেহারায় বাপের মতো, তবে অনেক রোগা। এখনও ওদের দাড়ি গজায়নি। অবশ্য একজন যে বাবার মতো চমকদার দাড়ি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেটা তার গাল দেখলেই বোঝা যায়।

আসরে হাজির ছিলেন আরও কয়েকজন মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ অফিসার। তাঁদের মধ্যে দুজন সকালে তেলের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া পার্টির তদারকিতে শশব্যস্ত হয়ে যথারীতি হাজির রয়েছেন সদা উপস্থিত বিশ্বস্ত অনুচর হাসান।

শেখ হারিদ বেশ খোশমেজাজে গল্প করছেন সবার সঙ্গে। তিনি কথা বলার সময় অন্য সবাই চুপ করে শুনছেন। তাঁর কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। অতিথিসেবার দায়িত্ব তিনি যথাযথ পালন করে চললেন। বিশাল কারুকার্যময় ঘরে বেজে চলেছে দেশীয় সঙ্গীতের সুর। স্বল্পবাস সুন্দরী মেয়েরা ঘুরেফিরে খাবার পরিবেশন করছে রুপোর পাত্রে। সব মিলিয়ে খাঁটি মধ্য প্রাচ্যের পরিবেশ।

ডাইনিং টেবিলে কাবাব, বিরিয়ানি, ফলসামগ্রীর আশ্চর্য সমাহার যে-কোনও খাদ্য-বিলাসীকে দিশেহারা করে দেওয়ার মতো। রোমিলা ও মোহন আনন্দের সঙ্গে এটা-ওটা চেখে চলল। প্রতিটি খাবারের পরই পরিবেশন করা হচ্ছে দেশি-বিদেশি পুরোনো-নতুন নানান রঙের নানান স্বাদের সুরা। সন্দেহ নেই ওই রাজকীয় নৈশভোজের স্মৃতি সহজে ভুলে যাওয়ার নয়।

আমার খাওয়ার ভঙ্গিতে হয়তো নির্লিপ্ত ভাব ধরা পড়েছিল। তা ছাড়া খেতেও যে তেমন আগ্রহ ছিল তা নয়। হয়তো সেই কারণেই হাসান বললেন, মিস্টার কাপুর, আপনি তো ঠিকমতো খাচ্ছেন না। আর তেমন কথাবার্তাও বলছেন না।

হাসান আমার পাশেই বসে ছিলেন।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে আমি মনস্থির করে ফেললাম। তারপর মনের বোঝা হালকা করার জন্যে নিচু গলায় বললাম, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন, মিস্টার হাসান। গতকাল বাগানে যে-মেয়েটিকে আমি পছন্দ করেছিলাম মনে আছে?

নিশ্চয়ই মনে আছে। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। অবশ্য সুন্দরী ছাড়া কাউকেই মাননীয় শেখ তাঁর উদ্যানে স্থান দেন না।—একটু থেমে হাসান বললেন, মেয়েটি আপনার মনোরঞ্জন করতে পেরেছে আশা করি?

তার অনেক বেশিই করেছে।—আমি জবাব দিলাম।

তাহলে আপনাকে অসুখী দেখাচ্ছে কেন, মিস্টার কাপুর?

শ্বাস টেনে বললাম, ওকে আমি আবার দেখতে চাই। শেখকে বলে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না আপনি?

এই প্রথম শেখের একান্ত সচিবের ঠোঁটে হাসির আভাস দেখলাম। না, বন্ধুত্বের হাসি সেটা নয়, বরং তাকে ঠোঁটের বিকৃতি বলা যায়। এ হাসি মন ছোঁয় না।

হাসান বললেন, আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, মিস্টার কাপুর। আপনি ওকে এমনভাবে উপভোগ করেছেন যা আর কোনও পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সবই আল্লার ইচ্ছে, তাতেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইচ্ছে করলেও আমি অথবা মাননীয় শেখ, কেউই এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। সবই আল্লার মরজি।

হাসান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ-বিষয়ে আর আলোচনা চালাতে তিনি নারাজ। আমার অস্বস্তি ও অস্থিরতা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর নিজের ঘরে এসেও হাসানের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। যতই দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তি বাড়ছে ততই যেন এক জেদ চেপে বসছে মনের গভীরে, আয়েষার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে।

এক সময় মন স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম। তখন রাত কত জানি না, চুপিসারে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে।

অলিন্দে আবছা আলো জ্বলছে। হয়তো রাত বেড়ে ওঠায় এই ব্যবস্থা। ছায়ায়-ছায়ায় লুকিয়ে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চললাম প্রাসাদের পেছন দিকে। প্রকাণ্ড অলিন্দ, বিশাল হলঘর, বারান্দা ইত্যাদি পেরিয়ে আসার সময় কেমন যেন গা-ছমছম করতে লাগল। লুকিয়ে চলার পথে যখনই শেখের কোনও ভৃত্য অথবা রক্ষী নজরে পড়ছে তখনই ঘন অন্ধকারের আড়ালে চকিতে আত্মগোপন করছি। অপেক্ষা করছি রুদ্ধশ্বাসে। তারপর পথ পরিষ্কার হলে আবার এগিয়ে চলি গোপন অভিসারে।

এক সময় পেছনের মাঠে যাওয়ার দরজাটা আমার চোখে পড়ল। দরজা বন্ধ। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ আয়েষাকে উদ্যানে আর পাওয়া যাবে না। প্রাসাদের কোথাও ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রাসাদের এক অন্দরমহলে পৌঁছে গেলাম। অন্দরমহল অথচ কড়া পাহারার ব্যবস্থা সেখানে নেই। এবং তার গঠনও বড় বিচিত্র। ঠিক যেন কোনও হোটেলের মতো সরু অলিন্দ। অলিন্দের দু-পাশে পর-পর ছোট ছোট ঘর। যেন জায়গা বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসাদের অন্যান্য অংশে যে-বিশাল ঘর-বারান্দা ইত্যাদি দেখেছি, এ জায়গাটা ঠিক তার উলটোটা।

জানি, আমার অনুসন্ধান হয়তো হাস্যকর, নিছক পাগলামি। অনেকটা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। কিন্তু এক অদ্ভুত জেদ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। আয়েষার মিষ্টি মুখটা বারবার ভেসে উঠছে মনের পরদায়। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে! ফলে প্রত্যেকটা দরজা আমি খুলে দেখতে চেষ্টা করলাম। কোনও দরজা বন্ধ, কোনওটা খোলা। খোলা দরজায় উঁকি মেরে নজরে পড়ল ছিমছাম ঘর। পরিপাটি বিছানা বালিশ। সম্পূর্ণ খালি। ঘরে কেউ নেই।

হতাশ না হয়ে সরু অলিন্দ ধরে এগিয়ে চললাম। একটার পর একটা দরজা খুলে দেখতে চেষ্টা করছি, কিন্তু আয়েষা কোথাও নেই।

শেষপ্রান্তে পৌঁছে অলিন্দ যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। হতাশায় মন ভেঙে পড়তে চাইছে। ঠিক তখনই একটা চাপা গোঙানি আমার কানে এল।

খুব কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে গোঙানিটা আসছে। মনে হল সামনের একটা বন্ধ দরজার পেছন থেকেই। ঝটিতে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। হ্যাঁ, এই দরজাটাই। হাতলটা ঘুরিয়ে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল।

দরজা খুলতেই অ্যান্টিসেপটিক আর ইথারের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। চটপট ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম আমি।

ঘরটা আধো অন্ধকার, কিন্তু তবুও ঘরের কোণে রাখা বিছানাটা আমার অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ল। আবার একটা হালকা গোঙানি ভেসে এল বিছানার দিক থেকে। শব্দটা এখন অনেক জোরে শোনাল, কারণ এখন আর দরজার আড়াল নেই, দূরত্বও ততটা নয়।

আমি বিছানার দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। বিছানায় শোয়া মানুষটিকে দেখে চমকে উঠলাম। হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে। এ আমি কী দেখছি!

আয়েষা বিছানায় শুয়ে আছে। ওর দু-চোখ বোজা।

আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। পরক্ষণে আর-একটা আর্ত গোঙানি বেরিয়ে এল ওর ঠোঁট চিরে।

আয়েষা!—ওর কপালে হাত রেখে ফিসফিস করে ডেকে উঠলাম আমি। তাপে আমার হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে। কপাল থেকে গালে হাত সরালাম। সেখানেও একই উত্তাপ। আয়েষার জ্বর হয়েছে নাকি!

আয়েষা, চোখ খোলো। আমি হিতেশ। বলেছিলাম না তোমার সঙ্গে দেখা করব।

দ্যাখো, আমি এসেছি।

ও চোখ খুলল। ওর অপরূপ দৃষ্টি এখন শূন্য। কয়েক মুহূর্ত পরে যেন আমাকে দেখতে গেল। ওর নজর ক্রমে স্পষ্ট হল।

হিতেশ। ওঃ হিতেশ, তুমি কেন এলে?—ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল শুধু। অস্পষ্ট ফিস-ফিস শব্দগুলো বেরিয়ে এল কোনওরকমে।

মনে হল আয়েষাকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। ওর চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে বারবার। যেন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে।

আমার ভীষণ অবাক লাগল। কী হয়েছে আয়েষার? ও কি অসুস্থ? ঘরটার মধ্যে কেমন যেন একটা হাসপাতাল-হাসপাতাল ভাব। আমি ওর বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম।

তোমার কী হয়েছে, আয়েষা?

আয়েষার শরীর হালকা নীল চাদরে ঢাকা। অথবা আবছা আলোয় চাদরের রঙটা ওরকম মনে হচ্ছিল।

আমি একটা হাত রাখলাম ওর চাদরে ঢাকা বাহুর ওপর। কিন্তু হাত ঠেকল কোমরে।

অবাক হয়ে ওর কাঁধের দিকে নিয়ে এলাম আমার অনুসন্ধানী হাত। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল আমার সারা শরীরে। আমার মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আতঙ্কঘন বরফের আঙুল যেন খেলে বেড়াচ্ছে আমার শিরদাঁড়ার ওপর। একটা অস্ফুট আর্তনাদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

আয়েষার কাঁধের কাছে বাহুর কোনও অস্তিত্ব নেই। কাঁধের পর উদ্ধত বুক, পাঁজর, কোমর।

একটানে চাদরটা সরিয়ে দিলাম ওর শরীর থেকে।

স্পর্শের পর চোখে দেখা প্রমাণ পেলাম। আয়েষা এখনও সম্পূর্ণ নগ্ন। কিন্তু ওর যুবতী স্তন বা অন্যান্য দেহসৌষ্ঠব আমার নজর কাড়ল না। প্রচণ্ড অবিশ্বাসে আমি স্থবির হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর কাঁধের দিকে। কাঁধ, গলা ও বুক ঘিরে পুরু ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজে গৌরী স্তনের কিছু অংশও ঢাকা পড়েছে। কিন্তু কাঁধের পাশে বাহুর কোনও অস্তিত্ব নেই।

কাঁধের গা ঘেঁষে ওর অপরূপ হাত দুটো কেটে নেওয়া হয়েছে।

ওঅ...আয়েষা!—আমি গভীর শ্বাস ফেলে ডুকরে উঠলাম।

ও ধীরে ধীরে চোখ খুলল। মাথা তুলতে চেষ্টা করল। ওই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বুঝতে পারল, আমি সব দেখেছি, জেনেছি। দুর্বল গলায় বিড়বিড় করে আয়েষা বলল, হিতেশ, তুমি এ-অবস্থায় কেন দেখতে এলে আমাকে? বাবাকে শাস্তি দিতে ওরা আমার হাত কেটে নিয়েছে।

ও ক্লান্ত হয়ে আবার এলিয়ে পড়ল বালিশে। কাঁপা হাতে চাদরটা টেনে দিলাম ওর নগ্ন দেহের ওপর। কিছুক্ষণ বসে রইলাম ওর বিছানার পাশে। অপলকে চেয়ে দেখতে লাগলাম আয়েষার সুন্দর ঘুমন্ত মুখ। আমার মনে পড়ল, মোহনের সঙ্গিনী মেয়েটির কথা। সেও বোধহয় আশেপাশে কোনও ঘরে একই রকম বিছানায় শুয়ে আছে।

এক সময় ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম অলিন্দে। তারপর দরজা টেনে বন্ধ করে দিলাম।

ঘেন্না ও হতাশায় আমার শরীরের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু তার চেয়েও তীব্র হয়ে উঠছে অন্ধ রাগ। কী জঘন্য এই মানুষগুলো একটা নিরপরাধ মেয়েকে এরকম পৈশাচিক শাস্তি দিল!

তখন আমার কাণ্ডজ্ঞান বোধহয় লোপ পেয়েছিল, কারণ বিন্দুমাত্রও লুকনোর চেষ্টা না করে আমি সটান সেই অলিন্দ ধরে ফিরে চলেছি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, দ্বিতীয় কোনও প্রাণীর সঙ্গে আমার মোলাকাত হল না। মৃত নিস্তব্ধ প্রাসাদ পুরীতে আমি সম্পূর্ণ একা পথিক।

সামান্য অসুবিধে হলেও ফেরার পথ চিনে নিতে পারলাম। মোহনের ঘরের কাছে এসে দরজায় টোকা মারলাম। একটু পরেই ও দরজা খুলে দিল। গত রাতের সুখশয্যার পর আজ বোধহয় গভীর ঘুমে ডুবে যেতে পারেনি।

ঘরে ঢুকেই তাড়াহুড়ো করে ওকে সব খুলে বললাম। রাগে উত্তেজনায় আমার কথা জড়িয়ে গেল, তেমন করে গুছিয়ে বলতে পারলাম না। কিন্তু মোহন খান্না মোটামুটি সব বুঝতে পারল।

কথা বলতে-বলতে আমার কান্না পেয়ে গেল আয়েষার জন্যে।

শেখের লোকগুলো কি মানুষ, না জানোয়ার! তোমাকে তো প্রথমেই বলেছিলাম, কাহরেইন সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর পেয়েছি তাতে দেশটা সুবিধের নয়।

মোহন আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু ভাবতে দাও।

কিন্তু বুঝতে পারলাম, বাইরে যতই শান্ত ভাব দেখাক না কেন ভেতরে-ভেতরে মোহনও অস্থির হয়ে উঠেছে, আর সেইসঙ্গে ভয়ও পেয়েছে।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে পড়ল রোমিলার কথা।

মোহন! রোমিলাকে যে করে হোক এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আমি যে সব দেখে ফেলেছি এটা যদি শয়তানগুলো টের পায় তাহলে ওরা কী করবে বিশ্বাস নেই।

মোহন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে অত ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু আমার মন মানতে চাইল না। মোহন বারবার বলল, দ্যাখো, আমরা এখানে বিদেশি। আমাদের নিয়ে চট করে কিছু করে উঠতে পারবে না শেখের লোকেরা।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। কারণ রোমিলা আমার ভীষণ প্রিয়।

অবশেষে মোহন খান্না রাজি হল।

দুজনে মিলে ডাকাডাকি করে রোমিলাকে জাগালাম। বললাম, জলদি জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে।

রোমিলার মুখে আতঙ্ক ছায়া ফেলল। ঘুম-ঘুম চোখে তৈরি হয়ে নিতে লাগল ও। তারই মধ্যে জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার, দাদা?

এখন সময় নেই। পরে সব বুঝিয়ে বলব। আমি ও মোহন প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম।

রোমিলার মুখ-চোখ হতবিহ্বল। আমার এবং মোহনের দিকে তাকিয়ে ও বোধহয় বুঝতে পারল সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আরও দ্রুত ব্যস্ততায় সব গুছিয়ে নিতে লাগল।

মিনিট কয়েক পরেই রোমিলাকে সঙ্গে করে আমরা প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

রোমিলার ব্যবহারের জন্যে যে-গাড়িটা শেখ হারিদ দিয়েছিলেন সেটা কতকগুলো ফুলগাছের পাশে দাঁড় করানো ছিল। রোমিলা গাড়ি চালাতে জানে। সুতরাং মালপত্র পেছনের সিটে চাপিয়ে ওকে চটপট ড্রাইভারের সিটে ঠেলে বসিয়ে দিলাম। তারপর জানলায় মুখ নিয়ে বললাম, শোন রোমু, সমুদ্রের গা ঘেঁষে যে-রাস্তাটা উত্তরে গেছে সেটা ধরে ছ-সাত মাইল গেলেই কাহরেইন-এর বর্ডার পড়বে। তারপর বাসিরায় দশ মাইল ভেতরে ঢুকলেই রাজধানী আনাম। সুতরাং সেখানে পৌঁছতে তোর বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। তারপর সোজা চলে যাবি ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে। আমাদের কাছ থেকে কোনও খবর না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবি। আমরা দু-একদিনের মধ্যেই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব।

রোমিলা অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু এখন তোমরা কী করবে? তা ছাড়া আমি সরে পড়েছি সেটা টের পেলে শেখ কী ঝামেলা বাঁধাবেন কে জানে!

আমি জ্বালাধরা গলায় বললাম, আমি কী ঝামেলা বাঁধাই সেটা আগে দ্যাখ! তাছাড়া গোলমালের সময় তুই এখানে থাকিস তা আমি চাই না। অতএব ঝটপট রওনা হয়ে যা। পথে কোথাও গাড়ি থামাবি না।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রোমিলা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেল প্রাসাদের সিংহ-দুয়ার দিয়ে।

আমি আর মোহন চিন্তায় মশগুল হয়ে প্রাসাদে ফিরে এলাম।

ঘরে বসে দুজনে যখন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছি, তখন মোহন বলল, রোমিলা যে চলে গেল সে-ব্যাপারে হারিদকে কী বলবে?

মনে রেখো, এখনও আমাদের তেলের বৈঠকে কোনও ফয়সালা হয়নি।

আমি রাগে বিরক্তিতে বলে উঠলাম, তেলের বৈঠক গোল্লায় যাক, আমি শুধু ওই বেচারি মেয়েটার কথা ভাবছি। এখন কী হবে ওর?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রোমিলা রওনা হওয়ার পর প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেছে। এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই বর্ডার পেরিয়ে গেছে। এখন ওর আর বিপদের ভয় নেই। এ-কথা ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

উঠে দাঁড়িয়ে মোহনকে বললাম, আমি আয়েষার কাছে যাচ্ছি। তুমি কি সঙ্গে আসবে, মোহন?

মোহন আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। বুঝল, কোনও কিছুতেই আমি নিরস্ত হব না। তখন সে রাজি হল।

বাইরে বেরিয়ে টিমটিমে অলিন্দ ধরে আমরা রওনা হলাম।

রোমিলা কাপুর

দাদার কথায় গাড়ি নিয়ে তো বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু বুকের ভেতরটা টিপ-টিপ করতে লাগল।

গাড়ি ছুটিয়ে চলেছি জনহীন রাস্তা ধরে। স্টিয়ারিংয়ের ওপরে আমার হাত কাঁপছে। সারা শরীর কাঁপছে। রাতের বাতাসে ঠান্ডা আমেজ গায়ে কাঁটা তুলছে।

বারবার করে ভেবে কোনও অনুমান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না, কী এমন বিপদে পড়েছে দাদারা। তবে এটুকু বুঝলাম, বিপদটা সাঙ্ঘাতিক, নইলে আমাকে এভাবে সাত তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দিত না। আর বিপদের মূলে যে শেখ আবদুল অল হারিদ, সে-ইঙ্গিত তো দাদার কথাতেই পাওয়া গেল।

আমার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল।

হঠাৎই দুটো রাস্তার ক্রসিংয়ে এসে পৌঁছলাম। মনে সামান্য খটকা লাগতেই গাড়ি থামিয়ে দিলাম। দাদা বলেছে, উত্তর দিকের পথ ধরে ছ-সাত মাইল গেলেই কাহরেইন-এর সীমান্তে পৌঁছে যাব। তারপর সীমান্ত পেরিয়ে বাসিরা। বাসিরা থেকে ইন্ডিয়ান এমব্যাসি। তাহলে সামনে ডানদিক-মুখী পথটাই কি বাসিরা যাওয়ার পথ?

মনের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা উঁকি মারতেই শেখ হারিদের দেওয়া রোড-ম্যাপটার কথা মনে পড়ল। ওটা সবসময় আমি কাছে কাছে রাখি, ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে। ঝোলা-ব্যাগটা পাশেই সিটের ওপর রাখা ছিল। ওটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে রোড ম্যাপটা বার করে নিলাম। একই সঙ্গে আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ইলিয়াসের আজকের—উঁহু, বরং বলা ভালো, কাল সকালে দেওয়া গোলাপগুচ্ছ। সময়ে কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে ওদের তাজা জলুস।

ফুলের তোড়াটা নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিলাম। গন্ধের মাদকতা যেন বেড়ে গেছে সময়ের তালে তালে। আমার মনে পড়ল ইলিয়াসের কথা।

ইলিয়াসের কাছে গেলে কেমন হয়?

রোড-ম্যাপ দেখে বাসিরার পথ চিনে যেতে আমার অনেক সময় লাগবে। জানি না, শেখের রক্ষীবাহিনী ইতিমধ্যেই আমার পিছু নিয়েছে কিনা। সুতরাং এই মুহূর্তে আমার হাতে যে-জিনিসটা কম তা হল সময়। বাসিরার পথ চিনে যাওয়ার চেয়ে ইলিয়াসের বাড়িতে পৌঁছনো বোধহয় সহজ। কারণ একবার হলেও সেই পথে আমি গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করেছি।

মন স্থির করতে আর বেশিক্ষণ সময় লাগল না। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমার লক্ষ্য এখন কানাম, ইলিয়াসের বাড়ি।

স্মৃতিকে ঝালিয়ে পথ চিনে এগোতে শুরু করলাম। যদি-বা পথ ভুলে যাই তাহলে সঙ্গে রয়েছে রোড-ম্যাপ। কেন জানি না, ইলিয়াসের কথা মনে পড়তেই দুশ্চিন্তার ভার অনেকটা কমে গেল। শুধু একটা জিনিসই খারাপ লাগছিল, এত রাতে গিয়ে ওদের বিব্রত করা। কিন্তু এই সঙ্গিন বিপদে আমি যে নিরুপায়!

আবছা চেনা রাস্তাগুলো দিয়ে ছুটে চলার সময় দাদা আর মোহনদার কথা মনে পড়ল। ওদের কোনও বিপদ হয়নি তো? আমাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়ে ওরা পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারল কিনা কে জানে।

ভালো-মন্দ নানান ভাবনা ভাবতে-ভাবতে পথের নিশানা কখন হারিয়ে ফেলেছি জানি না। যখন খেয়াল হল তখন আমি অজানা এক বড় রাস্তায়। শিরা-উপশিরা দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইতে লাগল। মাথার ভেতরে ঝড় উঠল যেন। চিন্তা-স্মৃতি সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। পথের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বিশ্রাম নিলাম। তারপর ড্যাশবোর্ডের আলোয় রোড ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম পুরোনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার। ইলিয়াসের বাড়ির রাস্তা যেমন করে হোক চিনে নিতেই হবে আমাকে।

আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সফলতা এল। সঠিক রাস্তা খুঁজে পেলাম। তারপর অত্যন্ত সতর্কভাবে ধীরে-ধীরে গাড়ি চালিয়ে রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে যেতে লাগলাম। অবশেষে একসময় পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে।

এখন আমার চোখের সামনে ইলিয়াসের বাড়ি। রাতের আলো-আঁধারিতে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে।

আমি গাড়ি থেকে নামতেই নিজেকে কেমন অসহায় মনে হল। এতক্ষণ গাড়ির ভেতরে থাকায় এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করছিলাম। এখন সেই আড়াল ছেড়ে নির্জন রাতের দুনিয়ায় পা রাখতেই মনে হল, এক বিরূপ পরিবেশে আমি হাজির হয়েছি। আমার চারপাশে বিপদ। যে-কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারি আমি। আতঙ্ক দ্বিধা ইত্যাদি কাটিয়ে উঠলাম কয়েক পলকেই। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ছুটে গেলাম ইলিয়াসের বাড়ির দরজা লক্ষ্য করে।

দরজায় পৌঁছতেই বুঝলাম যা আশা করেছিলাম তাই, দরজা বন্ধ।

নিশুতি রাতে দরজা ধাক্কা দিয়ে শোরগোল তুলতে একটু সঙ্কোচ হল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রয়োজন ছাপিয়ে গেল সঙ্কোচকে।

ইলিয়াস! ইলিয়াস!—বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠলাম আমি। কোনও সাড়া নেই। অন্ধকার বাড়িটা গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। ইলিয়াস। ইলিয়াস! আরও জোরে ডেকে উঠলাম আমি। একই সঙ্গে ধাক্কার তীব্রতাও বেড়ে গেল।

সচকিতে চারপাশে তাকালাম। আমাকে অনুসরণ করে কেউ এসে পৌঁছয়নি তো ইলিয়াসের বাড়ির কাছাকাছি? মনে পড়ল, গতকাল আমার আলফা স্পোর্টস অনুসরণ করে এখানে এসে হাজির হয়েছিল আকাশি রঙের ভ্যানটা। ওরা ইলিয়াসের বাড়ি চিনে গেছে। তাহলে...।

কে?

চিন্তায় ছেদ পড়ল। চোখ তুলে দেখি দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা জানলার পরদা সরে গেছে। সেখানে এক পুরুষের সিল্যুট। এবং কণ্ঠস্বর ইলিয়াসের।

ইলিয়াস! দরজা খোলো! আমি রোমিলা!—আমার আশঙ্কা কেটে গিয়ে আশ্বাস-ভরসা ফিরে এল। চোখে জল এসে গেল আমার। ভাবতে পারিনি পথ চিনে এখানে আমি আসতে পারব, দেখা পাব মহম্মদ ইলিয়াসের।

ছায়ামূর্তিটা দ্রুত জানলা থেকে সরে গেল। তারপর পায়ের শব্দ। অবশেষে সদর দরজা খুলল। আমি ইলিয়াসের দরাজ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বললাম, ইলিয়াস, ভীষণ বিপদ! আমাকে বাঁচাও!

সবল দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল ইলিয়াস। বুঝল আমার শরীর ক্লান্তিতে শিথিল হয়ে এলেও উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে।

কী হয়েছে, রোমিলা?—জানতে চাইল ইলিয়াস। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে বলল, না, থাক। আগে ওপরে চলো, তারপর কথা হবে।

সদর দরজা বন্ধ করে আমাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ইলিয়াস। তারপর উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম দুজনে।

যে-ঘরে এসে বসলাম, সে-ঘরটা গতকাল দেখিনি। ছিমছামভাবে সাজানো ইলিয়াসের ঘর। মাঝারি আলোয় ঘরটা কেমন এক রহস্যময় চেহারা নিয়েছে। বিছানার চাদর এলোমেলো। ইলিয়াস নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছিল। এখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে। তাতেই মনে হচ্ছে ও আবার কিশোর বয়েসে ফিরে গেছে। এই বিপদের মুহূর্তেও ওকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে, আদর করতে ইচ্ছে করছে। ও ছাড়া আমার যেন আর কেউ নেই।

আমাকে ধরে বিছানায় বসাল ইলিয়াস। নিজেও বসল। দেখলাম, সামনের একটা কারুকাজ করা টেবিলের ওপর রয়েছে আমার দেওয়া হলুদ ফুলের গুচ্ছ। সযত্নে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে ইলিয়াস। মনে পড়ল, ওর লাল গোলাপের ঋণ আমি শোধ করতে পারিনি।

কী হয়েছে রোমিলা?—ইলিয়াস নরম স্বরে জানতে চাইল।

আমি যেটুকু জানি ওকে খুলে বললাম, আমার দাদা হিতেশ কাপুর ও তাঁর অফিস কলিগ মোহন খান্না বোধহয় শেখ হারিদের সঙ্গে কোনও বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। কারণ আমাকে ঘোর রাতে ডেকে ওরা গাড়ি নিয়ে রওনা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তলে-তলে কী কাণ্ড ওরা করছে তা জানি না। তবে এটুকু জানি, ওরা অন্যায় কোনও কাজে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়বে না। শেখ হারিদের সঙ্গে বোধহয় ওদের কোনও গোলমাল শুরু হবে। দাদার কথায় সেরকমই মনে হয়েছে।

ইলিয়াস একাগ্রমনে সব শুনতে লাগল।

ওকে আরও বললাম, দাদা আমাকে বাসিরায় যেতে বলেছিল। সেখানে গিয়ে ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে আশ্রয় নিতে বলেছিল। কিন্তু রাতবিরেতে আমি সেখানে পথ চিনে যেতে ভরসা পাইনি। সেইজন্যে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, ইলিয়াস। আমাকে তুমি বাঁচাও, বাসিরায় পৌঁছে দাও!

ইলিয়াসের চোয়ালের রেখা ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। বুঝতে পারছি, সংশয় ও দ্বিধার কোনও আলোড়ন চলছে ওর বুকের ভেতরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইলিয়াস বলল, শেখ হারিদকে তুমি কতটুকু চেনো?

আমি কোনও জবাব দিলাম না। কারণ শেখ হারিদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ইলিয়াস যে যথেষ্ট খবর রাখে সেটা আমি দু-দিনের আলাপেই টের পেয়েছি।

ইলিয়াস অনেক—অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কেটে-কেটে বলল, রোমিলা, তুমি কাল জানতে চেয়েছিলে আমার বোন আলেয়ার কী হয়েছে, ও এখন কোথায়। তখন তোমাকে কোনও উত্তর দিতে পারিনি আমি। কিন্তু এখন, নিজের প্রয়োজনেই সে-উত্তর আমাকে দিতে হবে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল ইলিয়াস। হাতে হাত ঘষল। মাথার চুলে আলতো করে হাত বোলাল। অবশেষে ভারি গলায় বলল, আলেয়ার কী হয়েছে তা জানি না তবে ও কোথায় আছে তা জানি। ও শেখ হারিদের কাছে গত পাঁচ মাস ধরে বন্দি।

আমার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ঘরটা যেন দুলছে। বুকের ভেতরে ভূমিকম্পের তোলপাড় শুরু হয়েছে যেন। আলেয়া শেখ হারিদের কাছে বন্দি। কী অপরাধে?

সেই কথাটাই ইলিয়াসকে জিগ্যেস করলাম। ও ক্লান্ত স্বরে বলল, অন্যায় আলেয়া করেনি, করেছিলাম আমি। কাগজে একটা লেখা লিখেছিলাম শেখ হারিদের শোষণের বিরুদ্ধে। কাহরেইন-এর জনসাধারণকে সচেতন করতে চেয়েছিলাম শেখের অন্যায়-অবিচার আর শোষণ সম্পর্কে। চেয়েছিলাম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

কথা বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল ইলিয়াস। ওর ফরসা গাল লাল হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। সামান্য দম নিয়ে ও বলল, সেটাই শেখ জানতে পারেন। কিন্তু আমার গায়ে উনি আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেননি। শুধু থাবা বসিয়েছেন আমার মনে। আলেয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল তাঁর লোকেরা। হারিদের প্রাসাদে কোন অন্তরালে বন্দি করে রাখল।

কিন্তু এ তো অন্যায়! আমি চিৎকার করে উঠলাম। ইলিয়াসদের নিস্তব্ধ বাড়ি কেঁপে উঠল ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে।

আমার কথায় তেতো হাসি হাসল ইলিয়াস : অন্যায়। এখানে ন্যায়-অন্যায়ের মালিক তো শেখ হারিদ নিজে। তিনি যা করেন সেটাই আইন, সেটাই ন্যায়! একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেওয়াটা তাঁর শখ, যদিও সেটা আসলে একরকম মানসিক বিকৃতি।

আলেয়ার আর কোনও খোঁজ পাওনি?

না, খোঁজ পাইনি। আর কোনওদিন খোঁজ পাবও কিনা জানি না। ইলিয়াস বলল, তা ছাড়া শেখ যে-ধরনের শাস্তি দেন বলে শুনেছি...।

আর কিছু বলল না ইলিয়াস। চুপ করে রইল।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কী বলব, কী বলা উচিত, তা যেন বুঝে উঠতে পারছি না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। খোলা জানলা দিয়ে দেখছি রাতের আকাশ ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

একসময় আমি বললাম, আমি এখন কী করব, ইলিয়াস?

ইলিয়াস মুখ নিচু করে বসে ছিল, সেই অবস্থাতেই বলল, তোমাকে কোনওরকম সাহায্য আমি করতে পারব না, রোমিলা। কারণ শেখের বিচারে সেটা আর একটা অন্যায় হবে। আর তখন...তখন...—ইলিয়াসের শরীর কেঁপে উঠল। মুখে হাত চাপা দিল ও। বিকৃত স্বরে বলল, তখন ওরা আমার ছোট বোনকে ধরে নিয়ে যাবে, নাজমাকে ধরে নিয়ে যাবে!

হঠাৎই মুখ তুলল ইলিয়াস। দু-হাতে আমার কাঁধ চেপে ধরল। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, রোমিলা—আমার রোমিলা, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু নাজমা যে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি। ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই! আমি ছাড়া ওরও তো আর কেউ নেই। পিসির তো দিন ফুরিয়ে এল, কিন্তু নাজমার জীবন যে সবে শুরু।

আমি ইলিয়াসের সজল চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। নিজের বিপদের অনুভব ইলিয়াসের যন্ত্রণার তরঙ্গে কোথায় ভেসে যেতে লাগল। নাজমা—অপরূপ স্বর্গীয় পুতুল-পুতুল মেয়েটা, ওকে নৃশংস শেখ শাস্তি দেবেন এ-কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

এমন সময় নিস্তব্ধতা ভেদ করে শুনতে পেলাম গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন। ইলিয়াস বিছানা ছেড়ে উঠল। জানলার কাছে গেল দেখতে।

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। রুমালে চোখ মুছে যখন তাকালাম তখন ইলিয়াস ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর গভীর দুটো চোখে অতল যন্ত্রণার ছায়া।

ওরা এসে গেছে।—অস্ফুট স্বরে ইলিয়াস বলল।

আকাশি ভ্যানটা এসে গেছে! আমি জানতাম, ওরা আসবেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নাজমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। ইলিয়াস আমার কাছে এগিয়ে এল। ছোট্ট করে বলল, চলো।

ওর সঙ্গে নাজমার ঘরে এলাম। আকাশ আরও ফরসা হয়েছে। জানলা খুলে পরদা সরিয়ে দিল ইলিয়াস। ভোরের পবিত্র আলো এসে পড়েছে বিছানায় ঘুমন্ত নাজমার মুখে। ওর পাশেই শুয়ে বৃদ্ধা পিসিমা। আমি প্রাণভরে নাজমাকে দেখলাম। ও ভালো হয়ে উঠুক।

একসময় ইলিয়াসকে বললাম, চলো, নীচে যাওয়া যাক।

ইলিয়াস আমাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নামতে লাগলাম। উঠোনে এসে ইলিয়াস হঠাৎ ডুকরে উঠল। আমাকে জাপটে ধরল দু-হাতে। বলল, না রোমিলা, এ হয় না। চলো, পেছনের দরজা দিয়ে আমরা পালিয়ে যাই।

আমি হাসলাম। ওর মাথার চুল আদর করে ঘেঁটে দিলাম। বললাম, তা হয় না। নাজমাকে আমার ভালোবাসা দিয়ো।

ইলিয়াস আমাকে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল আর বলতে লাগল, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, রোমিলা! চিরকাল অপেক্ষা করব! একদিন তুমি ফিরে আসবেই। বলো, আসবে না?

আমি হেসে বললাম, রিপোর্টার, তুমি এত সুন্দর, তোমার চোখ এত সুন্দর, তোমার মন এত সুন্দর...যেখানেই থাকি, ফিরে আমাকে আসতেই হবে।

তারপর ইলিয়াসের বাঁধন ছাড়িয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমি। ভোরের আলোয় দেখলাম, আকাশি ভ্যানটা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে, তার দু-পাশে দুজন প্রহরী।

ওদের সঙ্গে ভ্যানে ওঠার আগে গাড়িতে রাখা ঝোলা-ব্যাগ থেকে আমি ইলিয়াসের দেওয়া গোলাপের তোড়াটা নিয়ে নিতে চাই। সেটাই আমার সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতম প্রেমের একমাত্র স্মৃতি।

হিতেশ কাপুর

দ্বিতীয়বার পথ চিনে যেতে কোনও কষ্ট হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আয়েষার ঘরের দরজার সামনে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, দরজা হাট করে খোলা। ভেতরে উঁকি মারতেই কারণটা পরিষ্কার হল। হাসান বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, জরিপ নজরে দেখছেন আয়েষার শিথিল দেহ। তাঁর সঙ্গে দুজন সশস্ত্র প্রহরী। সকলেই দরজার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে।

নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। ঘৃণাভরা স্বর ছিটকে বেরোল আমার মুখ থেকে : আপনারা মানুষ না পশু? এ জঘন্য কাজ আপনারা কেন করলেন?

বিদ্যুৎগতিতে হাসান ও তাঁর দুজন অনুচর ঘুরে তাকাল। কিন্তু আমাদের দুজনকে দেখামাত্রই ওদের ভাবভঙ্গি সহজ-স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসান গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাদের এখানে আসা উচিত হয়নি, মিস্টার কাপুর।

কী করে এ-ঘর আপনারা খুঁজে পেলেন?

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, আমার কথার জবাব দিন! দেখুন তো কী অবস্থা করেছেন মেয়েটার!—আঙুল তুলে বিছানায় শোয়া অসহায় মেয়েটিকে দেখালাম।

আপনারা শেখ হারিদের অতিথি, কিন্তু অতিথির সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। —হাসান ঠান্ডা স্বরে বললেন, ছিঃ, এ বড়ই লজ্জার কথা! যান, এখনই চলে যান।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোহন খান্নারও জেদ চেপে গেছে। ও বলল, যাব, কিন্তু তার আগে এই জঘন্য অত্যাচারের কারণ জানতে চাই। আপনাকে বলতেই হবে।

হাসান একই রকম গলায় বললেন, আপনাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই, কিন্তু আপনারা যখন এত পীড়াপীড়ি করছেন তখন শুনুন। তবে তারপর কিন্তু চলে যেতে হবে।—আয়েষার দিকে মুখ ফিরিয়ে আঙুল তুললেন হাসান : এই মেয়েটির বাবা মাননীয় শেখ হারিদ সম্পর্কে অসম্মানজনক কিছু মন্তব্য করেন তাঁর পত্রিকায়। সুতরাং তাঁকে উচিত শাস্তি দিতে তাঁর মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে দেশের আরও দশজন নাগরিক সাবধান হবে। শেখের বিরুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা দশবার ভাববে।

কিন্তু এর এ-অবস্থা করলেন কেন?—উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলাম। হাসান সহজ সুরে বললেন, সবই আল্লার ইচ্ছে। আমাদের শেখ একজন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর বিশ্বাস এসব ব্যাপারে কোনও উপযুক্ত শাস্তি বেছে দেওয়া তাঁর একার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি মহান আল্লার শরণাপন্ন হয়েছেন। এই মেয়েটিকে রাখা হল পোষা পাখির বাগানে। সঙ্গে রাখা হল আরও অনেক মেয়েকে। তাদের প্রত্যেকের বন্ধু অথবা আত্মীয়, কেউ না কেউ শেখের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করেছে। পোষা পাখিদের অনেকেই অক্ষত অবস্থায় এক বছর পরে ছাড়া পায়। কিন্তু শেখ হারিদের অতিথিরা যাদের বেছে নেয় তাদের শাস্তি পেতে হয়। প্রত্যেক অতিথিকে বলা হয় শয্যাসঙ্গিনী বেছে নিতে। বেছে নেওয়ার পর প্রত্যেককে জিগ্যেস করা হয়, সঙ্গিনীর দেহের কোন অংশ তাঁর চোখে সবচেয়ে সুন্দর। তারপর সেই অঙ্গগুলো অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয় পাখিদের শরীর থেকে—অবশ্য অতিথির সঙ্গে সে রাত কাটানোর পর, আগে নয়। পরে যখন মেয়েটি মোটামুটি সেরে ওঠে তখন তাকে পৌঁছে দেওয়া হয় তার বাড়িতে। সেখানে সে হয়ে থাকে আল্লার ন্যায়বিচারের জীবন্ত প্রমাণ।

একটু থেমে হাসান আবার বললেন, মিস্টার কাপুর, আয়েষাকে আপনিই পছন্দ করে বেছে নিয়েছিলেন, শেখ হারিদ নয়। আর ওর সুন্দর হাতের তারিফ আপনি নিজের মুখেই করেছেন, যেমন মিস্টার খান্না করেছেন তাঁর সঙ্গিনীর পায়ের তারিফ। অতএব আল্লার বিচারের বাণী আপনাদের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে। মহামান্য শেখ হারিদকে দয়া করে এর জন্যে দায়ী করবেন না।

আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। চিৎকার করে ফেটে পড়লাম হাসানের ওপর : নির্লজ্জ শয়তান কোথাকার! তোমরা ওই মেয়েগুলোকে নিয়ে নৃশংস খেলায় মেতেছ আর দায়ী করছ ভগবানকে? এর মাশুল তোমাদের কড়ায় গণ্ডায় গুনতে হবে।

হাসান এবারে সত্যি-সত্যি হাসলেন, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি। আমার শরীরে যেন আগুন ধরে গেল।

মাননীয় শেখকে আপনাদের অভিযোগের কথা জানানো হবে এবং তাতে যে তেলের চুক্তির বিশেষ সুবিধে হবে তা মনে হয় না।—হাসান তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে লাগলেন, ভারতের আর্থিক অবস্থার কথা সারা দুনিয়ার সবাই জানে। তেলের চুক্তি সফল হওয়াটা আপনাদের পক্ষে খুব জরুরি। সুতরাং এখনও যদি সব হম্বিতম্বি ছেড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন তাহলে এ-ব্যাপারটা যাতে বেশিদূর না গড়ায় সেদিকে আমি নজর দিলেও দিতে পারি।

লোকটার স্পর্ধা আর নিশ্চিন্ত ভাব আমাকে জ্ঞানহীন ক্ষিপ্ত করে তুলল। সমস্ত ধৈর্য ও সহ্যশক্তির বাঁধন পলকে ছিঁড়ে গেল। চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম একজন সশস্ত্র রক্ষীর ওপর। চোখের নিমেষে তার রিভলভারটা তুলে নিলাম হোলস্টার থেকে। কিন্তু সেটা উঁচিয়ে ধরার আগেই হাসান লাফিয়ে পড়লেন আমার ওপর। রিভলভারটাকে কবজা করার জন্যে শুরু হল দুজনের ধস্তাধস্তি। জড়াজড়ি হুটোপাটির মধ্যে হঠাৎই গুলি ছুটে গেল—গুড়ুম!

এবং একই সঙ্গে হাসানের মুখে বিস্ময়ের স্থির অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তারপর বিস্ময় ধীরে-ধীরে পরিণত হল অসহ্য যন্ত্রণায়। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

সর্বনাশ করেছে!—মোহন খান্না আশঙ্কাভরা গলায় বলে উঠল।

আমি ওকে গুলি করতে চাইনি, কিন্তু যাই বলো ছুঁচোটা উচিত শিক্ষা পেয়েছে।—কথা বলতে-বলতেও আমি রিভলভার তাক করে রেখেছি দুই রক্ষীর দিকে। না, আমার মনে কোনও দুঃখ বা অনুশোচনা জাগেনি! বরং বারবার মনে পড়ছিল আয়েষার কথা।

ওর মালিকটাকে শেষ করতে পারলে আরও খুশি হতাম। আমাদের এক্ষুনি পালাতে হবে।—মোহন বলল!

কিন্তু আয়েষার কী হবে?

আমরা যদি ধরা পড়ি তাহলে ওর কোনও উপকারেই আসব না। শিগগির চলো, তর্ক করার সময় নেই।

ভেবে দেখলাম, মোহনের কথায় যুক্তি আছে। সুতরাং রাজি হলাম। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সেটা বাইরে থেকে লক করে দিলাম। দুই প্রহরী ঘরে বন্দি রইল। তারপর অলিন্দ ধরে ছুটতে শুরু করেছি দুজনে।

আমাদের কানে আসছিল চিৎকার, কোলাহল, ছুটন্ত পায়ের শব্দ। কারা যেন ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে আসছে আমাদের লক্ষ্য করে। বাইরে যাওয়ার একটা দরজা খুঁজে পেতেই সেদিকে ছুটে গেলাম। দরজা পার হতেই আমরা চলে এলাম প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাগান পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম প্রাসাদের ঘেরা পাঁচিলের কাছে। তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো নিমেষে পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়লাম বাইরে।

ছায়া আর অন্ধকারের আড়ালে-আড়ালে সরু রাস্তা ধরে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চললাম। ঢালু রাস্তা এঁকেবেঁকে নেমে গেছে বন্দরের দিকে। প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসার পর পেছনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ আর শুনতে পেলাম না। ছুটতে ছুটতে একসময় আমরা পৌঁছে গেলাম সাগরের কিনারায়।

জলে ছোট-বড় নানান মাপের নৌকো ভাসছে। সেদিকে তাকিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে মোহন খান্না বলল, নৌকো নিয়ে পালানোই সহজ হবে। আমারও সেইরকমই মনে হল। সুতরাং একটা ছোট্ট পালতোলা নৌকো বেছে নিয়ে আমরা ভেসে পড়লাম।

জলে খানিকটা এগোতেই সমুদ্রের হাওয়া এসে সাদা পালটা ফুলিয়ে দিল। বাতাস আমাদের ঠেলে নিয়ে চলল উপকূল থেকে সাগরে।

এত সহজে পালাতে পারব ভাবিনি। হয়তো সৌভাগ্য আমাদের সহায় ছিল। ধীরে-ধীরে তীরের আলোকবিন্দুগুলো আরও ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল। ক্রমে মিলিয়ে গেল শেখ হারিদের ছায়াময় বিশাল প্রাসাদ। কিন্তু মনে হল, প্রাসাদের কাছাকাছি অনেকগুলো উজ্জ্বল আলোর ফুটকি ব্যস্তভাবে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। অনুসন্ধান কি এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ওরা?

চারদিক এখন শূন্য, শান্ত। শুধু ছলছল সাগরের জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে।

উত্তর দিকে যাব ঠিক করেছিলাম, তারপর পাড়ে নৌকো ভেড়াব। কিন্তু ওলটপালট বাতাস সব পরিকল্পনা তছনছ করে দিল। বাতাস আমাদের রাতের আঁধারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে—অসহায় ভাবে ছেড়ে দিল থইথই সাগরের অকুল পাথারে।

একদিন একরাত পরে একটা ট্যাঙ্কার আমাদের উদ্ধার করল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, চেহারা সূর্যের খরতাপে ঝলসে গেছে। দরকারি পরিচর্যার পর ট্যাঙ্কারটা আমাদের পৌঁছে দিল আবাদানে।

রোমিলা! রোমিলা! ওর কথা ভেবে ভেবে আমি শুধু ছটফট করছি। ও ঠিকমতো পৌঁছতে পেরেছে তো ভারতীয় দূতাবাসে?

আবাদান থেকে অবশেষে আমরা যখন বাসিরায় পৌঁছলাম তখন তিন-তিনটে দিন কেটে গেছে। আমরা সোজা চলে গেলাম ভারতীয় দূতাবাসে। কিন্তু...।

ঘটনার পর তিন মাস কেটে গেছে। রোমিলার কোনও খবর পাইনি। বহু চেষ্টা করেছি, বহু লেখালিখি করেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কাহরেইন-এ লোক মারফত খবর নিয়েছি। না, ওই বর্ণনা অনুযায়ী কোনও মেয়েকে কেউ দেখেনি। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব কিছুই করতে বাকি রাখিনি। মোহন খান্নাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, কিন্তু ফলাফল তাতেও শূন্য। আমার আদরের ছোট বোনের কোনও হদিস আজও পাইনি।

তাই শুধু ভাবি, এর জন্যে কে দায়ী? নিয়তি, না আমি নিজে?

উপসংহার

আকাশি ভ্যান যেখানে এসে থামল সেটা শেখ হারিদের প্রাসাদ।

রোমিলাকে রক্ষীরা ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখল একটা ছোট ঘরে। প্রথমবার প্রাসাদে এসে যে বিলাসবহুল আপ্যায়ন ও পেয়েছিল এ যেন তার ঠিক বিপরীত।

পরের দিনটা রোমিলার জীবনে এক অতুলনীয় আতঙ্কের দিন।

সকালবেলা শেখ হারিদ এলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আগেকার ভদ্র নম্র ব্যবহারের ছিটেফোঁটাও এখন নেই তাঁর মধ্যে। খুব কর্কশ রুক্ষ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, মিস কাপুর, আপনার দাদা অত্যন্ত অন্যায় একটা কাজ করেছেন। যদি তাঁর ভালো চান তাহলে বিনা মতলবে যা বলা হবে অক্ষরে-অক্ষরে শুনবেন। নইলে বিপদে পড়বেন।

শেখ চলে গেলেন। তখন প্রাসাদের ভৃত্যরা এসে রোমিলাকে নিয়ে গেল একটা স্নান-ঘরে। ওর পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হল, তারপর সুবাসিত সাবানে ওকে স্নান করিয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দেওয়া হল ওর নগ্ন দেহে। এবং ওই নগ্ন অবস্থাতেই ওকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদের পেছন দিকের এক মনোরম উদ্যানে। সেখানে ওরই মতো জনা কুড়ি নগ্ন রূপসী ঘোরাফেরা করছে। ঠিক যেন উর্বশীদের নন্দনকানন।

দুটো দিন রোমিলার স্বচ্ছন্দে কেটে গেল।

তৃতীয় দিন শেখ হারিদ বাগানে এলেন। সঙ্গে দুজন প্রৌঢ় বিদেশি অতিথি এবং একজন অনুচর। ওঁরা চারজন পায়চারি করতে লাগলেন বাগানের মধ্যে। অতিথি দুজন রোমিলার সামনে এসে বহুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওর নগ্ন যৌবনসম্পদ।

রোমিলার মুখ লজ্জায় লাল হল।

কিন্তু আরও দুর্ভাগ্য বোধহয় ছিল ওর কপালে।

একটু পরেই ওকে ডাকা হল শেখদের কাছে। ওকে পায়চারি করতে বলা হল তাঁদের সামনে। সবদিক থেকে পরখ করে দেখা হল ওর দেহসৌষ্ঠব।

অবশেষে মেজাজি গলায় শেখ হারিদ বললেন, আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়, সিনর রোমানি।—শেখ রোমিলার কোমল মসৃণ স্তন স্পর্শ করলেন চঞ্চল আঙুলে : কিন্তু এবারে দয়া করে বলুন, ওর দেহের কোন অংশটা আপনার চোখে সবচেয়ে আকর্ষণীয়?

হারিদের অতিথি হোঁচট খাওয়া ইংরেজিতে বললেন, ওর সব সুন্দর...তবে আমার মনে হয় এরকম লোভনীয় বুক আমি আগে দেখিনি...

একটু থামলেন সিনর রোমানি। আর?—শেখ উৎসাহ দিয়ে জানতে চাইলেন।

আর ওর টানা-টানা চোখ দুটোর কোনও জবাব নেই।

পিশাচ প্রহর । দুই



প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ল বিনতার কপালে। আকস্মিক ঠান্ডা স্পর্শে চমকে উঠল বিনতা। তারপর চিরদীপের দিকে ফিরে বলল, নাও, শুরু হল।

চিরদীপের বলিষ্ঠ হাতের পাঞ্জা স্টিয়ারিংয়ে নিথর। মুঠোর ভঙ্গিতেই আস্থা ও অহঙ্কার স্পষ্ট। সামনের উইন্ডশিল্ড-এ ধারাবাহিক শব্দে এসে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। আঘাত করেই ওয়াইপারের ঠেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে মসৃণ কাচের ওপর। চিরদীপ টান-টান হয়ে ঋজু স্থাপত্যের মতো বিনতার পাশে বসে। ফরসা মুখ, লম্বা টিকলো নাক, ছোট-ছোট চোখ, চোয়াল সামান্য ভাঙা। পাতলা নীল টেরিকটন জামার নীচে কাঁধের জান্তব পেশি সহজেই চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে যেন কোনও পাকা অ্যাথলিট। এবং সত্যিই চিরদীপ সরকার সারা দেশে সুপরিচিত। এবারের দিল্লির এশিয়ান গেম্স-এ ডেকাথলন ও পেন্টাথলন-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে সে।

বিনতার কথায় ফিরে তাকাল চিরদীপ, বলল, এই হুড খোলা স্পোর্টস কারটা না আনলেই হত। এখন ভিজতে হবে। ওর কথা শেষ না হতেই বৃষ্টির তেজ তিনগুণ বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে পাগলা হাওয়ার মাতন।

আকাশে মেঘ সকাল থেকেই ছিল। তবে বৃষ্টি যে নামবে এটা ভাবা যায়নি। কারণ আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা ছিল, বর্ষার আবির্ভাব হতে এখনও দিনদশেক দেরি। তা ছাড়া সকালের আকাশ রোদঝলমল ছিল। দুপুরের দিকে হঠাৎই পশ্চিম কোণে জমে উঠল ঘন মেঘ। ক্রমশ তা শক্তি ও আয়তনে বাড়তে লাগল। বিনতা দু-একবার শঙ্কিত চোখে আকাশের দিকে তাকালেও চিরদীপ ভ্রুক্ষেপহীন। অভ্যাসলব্ধ সহজ ভঙ্গিতে ছুটিয়ে চলেছে গাড়ি। কিন্তু এখন, দীঘা থেকে ওরা যখন মাত্র আধ ঘণ্টার পথ দূরে, তখনই বৃষ্টি নামল বিপুল সমারোহে।

কোনওরকম আত্মরক্ষায় উপায়হীন হয়ে ভিজতে লাগল বিনতা ও চিরদীপ। সময় বিকেল পাঁচটা হলেও অন্ধকার প্রায় রাতের মতোই। রাস্তা একেবারে ধু-ধু, ফলে উজ্জ্বল হেডলাইট ও হলদে সার্চলাইটের আলো সামনের ভিজে রাস্তায় ঢেলে দিয়ে এখনও গাড়ি চালাতে পারছে চিরদীপ। পথের দু-পাশে শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় আক্রান্ত গাছপালার আর্তনাদ ও বৃষ্টির খই ফোটানোর শব্দ।

একটু পরেই গাড়ি থামাতে বাধ্য হল ওরা। প্রথমত, বৃষ্টির বেগ যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে বেপরোয়া চিরদীপকেও পরোয়া করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পথের ধারে কয়েকটা টিমটিমে আলো ওদের নজরে পড়েছে —সম্ভবত কোনও ছোট দোকান।

গাড়ি থামিয়ে সম্পূর্ণ ভিজে পোশাকে নেমে এল বিনতা ও চিরদীপ। ছুটে এসে ঢুকে পড়ল টিমটিমে আলোয় আলোকিত সেই পলকা আশ্রয়ে। এবং তখনই আবিষ্কার করল, অনুমান ওদের মিথ্যে হয়নি, কারণ জায়গাটা একটা ছোট চায়ের দোকান। যথারীতি দোকানিকে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ভাঙা বেঞ্চিতে বসল ওরা। মাটিতে নিকানো মেঝে ওদের পোশাক থেকে ঝরে পড়া জলে কাদা হয়ে উঠেছে।

প্রচণ্ড হাওয়া দোকানের বেড়া ভেদ করে ছুটে এসে ওদের ভিজে শরীর দুটো কাপিয়ে দিচ্ছে। বাঁশের খুঁটির গায়ে ঝোলানো হ্যারিকেন ঠক-ঠক শব্দে দুলছে। ওরা দু'জন ছাড়া দোকানে আরও দু-তিনজন স্থানীয় লোক আটকে পড়েছে। নিজেদের মধ্যে দু-চারটে কথাও বলছে উৎকলী ভাষায়।

ধূমায়িত চায়ের গ্লাসে প্রথম চুমুক দিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল চিরদীপ, অঘোরচন্দ্র রায় কীরকম লোক?

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় চিরদীপ যে অনেকক্ষণ ধরেই ওকে লক্ষ করছে সেটা বিনতা টের পেয়েছিল তার দিকে না তাকিয়েই। এখন সরাসরি উত্তর দিল, কীরকম লোক জানি না। কোনওদিন তাঁকে আমি চোখেই দেখিনি।

তোমার ঠাকুর্দা তোমাকে এত ভালোবাসেন—অথচ তুমি তাঁকে চোখেই দ্যাখোনি!—সুন্দর করে হাসল চিরদীপ : রিয়্যালি বিনতা, এই দুর্যোগের পরিবেশে তুমি আর ঠাট্টা কোরো না!

বিনতার মুখ যথেষ্ট গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, দূরনিবদ্ধ। ও ধীরে-ধীরে বলল, ঠিকই বলেছ তুমি। ঠাকুর্দার চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে তোমার প্রশ্নগুলোই আমার মাথায় ঘুরছে। বাবা বেঁচে থাকতে শুনেছি, খুব ছোটবেলায় নাকি ঠাকুর্দা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শুনলে অবাক হবে চিরদীপ, বাবা ছিলেন অঘোরচন্দ্র রায়ের একমাত্র সন্তান।—কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বিনতা। যেন কোনও স্মৃতিমন্থনে ব্যস্ত। মন্থনের ফলে কী উঠে আসবে—অমৃত, না হলাহল—তা ও জানে না।

একটু পরে অনিশ্চয়তার ছোঁয়া নিয়ে ও আরও বলল, আমার বাবা, বিলাসচন্দ্র, কী অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলেন জানি না। তবে সেই সময়ে তাঁর মাথার ওপরে ছিল নতুন সংসারের চাপ। আমি তখন খুব ছোট—তখনই হয়তো ঠাকুর্দা আমাকে দেখে থাকবেন।

চিরদীপের চায়ের গ্লাস অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। কমে এসেছে হাওয়ার দাপট। বৃষ্টির তেজও স্তিমিত। ও বিনতাকে সহজ করার চেষ্টায় বলল, চলো, ওঠা যাক। এই বৃষ্টিতে দিব্যি যাওয়া যাবে—ক'দিন যা গরমে কেটেছে।

চায়ের দাম মিটিয়েই ওরা গাড়িতে এসে উঠল। সীসে-রঙ আকাশে এখন, সামান্য লালচে আভা চোখে পড়ে। ছ'টা বাজতে এখনও কিছু বাকি।

মধ্যগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল চিরদীপ। ভিজে নীল জামা এখন ওর শরীরে এঁটে বসেছে, ফলে অ্যাথলিটসুলভ স্বাস্থ্য প্রকট হয়েছে। একইসঙ্গে বিনতা নিজের শারীরিক রেখায় প্রকাশিত। গাড়ির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃষ্টির ছাট ও এলোমেলো বাতাস ওদের শিউরে দিতে লাগল।

চিরদীপ, আমি কিন্তু প্রথমেই তোমাকে বলেছিলাম, নেমন্তন্নটা আমার একার, আমি একাই যাব। অথচ তুমি বললে—।

বিনতার মুখের কথা কেড়ে নিল চিরদীপ, নতুন বউকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া তোমার ঠাকুর্দা তো আর জানেন না যে সম্প্রতি আমি এক নরাধম, তোমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছি। অতএব শ্রীঅঘোরচন্দ্র রায়ের ঘোরতর আমন্ত্রণে দীঘার সমুদ্রতীরে দু-এক সপ্তাহ কাটিয়ে যাওয়ার লোভ আমি সামলাতে পারিনি। একই সঙ্গে নেমন্তন্ন ও মধুচন্দ্রিমা, দুইয়ের আকর্ষণে আমি সম্মোহিত হয়েছি।

চিরদীপের নাটকীয় সংলাপে কপট রাগ দেখিয়ে বিনতা বলে উঠল, এবারে দিল্লির গেম্স-এ তুমি ঘেঁচু পাবে।

ওর গম্ভীর ভাব কেটে গেছে ক্ষণিকে। নিজের প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় মনে-মনে খুশি হল চিরদীপ। বিনতাকে চিন্তামগ্ন অস্থির দেখলে ওর কষ্ট হয়। ও বিনতার কথায় হাসল : আমি যা পাই, সবই তোমার বিনতা। সুতরাং, অভয় দিচ্ছি, ঘেঁচু-পদকও বাদ যাবে না।

এবারে সত্যিই সন্ধ্যা নামল, এবং ওদের চোখে পড়ল দীঘার জনপদ। চালাঘরের দোকানপাট, লণ্ঠন ও মোমবাতির আলো, সাইকেল রিকশার ভেঁপু, সমুদ্রের চাপা গর্জন, মাঝে-মাঝে ছুটে যাওয়া বাস ও গাড়ির শব্দ, আর সবশেষে ঝোড়ো বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ।

চিরদীপ জিগ্যেস করল, বাড়ির ঠিকানাটা মনে আছে?

হ্যাঁ। রায়ভিলা, নিউ দীঘা।

কাউকে জিগ্যেস করে দেখা যাক।

একটা সাইকেলের দোকান ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল চিরদীপ। তারপর নেমে এগিয়ে গেল খোঁজ নিতে।

আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টিতে বৈদ্যুতিক গোলযোগের সময়, কলকাতার খুব চেনা লোডশেডিং এখানেও আবিষ্কার করল বিনতা। রাস্তাঘাট অনেক নির্জন হয়ে এসেছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া এই থমথমে আবহাওয়ায় হয়তো কেউ পথে বেরোতে চাইবে না।

চিরদীপ ফিরে এসে বিনতার পাশে স্টিয়ারিংয়ে বসল। বলল, এখনও মিনিট পনেরোর পথ, ম্যাডাম। এই রাস্তা ধরে নাক বরাবর এগিয়ে যেতে হবে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছুটিয়ে দিল চিরদীপ। তারপর গাইডদের কথার সুর অনুকরণ করে বলতে শুরু করল, এই রাস্তা চলে গেছে উড়িষ্যার দিকে। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট পথ চললেই আপনাকে মেদিনীপুর উড়িষ্যার সীমানায় পৌঁছে দিতে পারি, ম্যাডাম। তারপর বর্ডার পেরোলেই চন্দনেশ্বর, আর সেখানে দেখতে পাবেন কাজুবাদামের গাছ, আমবাগান, নারকেল গাছের সারি, ও একটি কালীমন্দির। এখন আমরা যে-পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, সেই পথের বাঁদিকে টানা এগিয়ে চলেছে সমুদ্র ও ঝাউবন। আর ডানদিকে চোখে পড়বে বিভিন্ন সরকারি আবাস, বাড়ি, দীঘা সরকারি হাসপাতাল, নিউ দীঘা পার্ক ও সরোবর—যদিও এখন আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না, কারণ সবই ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

বিনতা অধৈর্য হয়ে বলল, মানছি, আমি দীঘায় নতুন, তাই বলে এত জ্ঞান পাওয়ার যোগ্য নই। আসল কথা বলো, রায়ভিলার খবর পাওয়া গেল?

গাড়ির সুরেলা হর্ন সুর করে বাজাল চিরদীপ, বলল, পাওয়া গেছে, দেবী। নিউ দীঘা পার্ক ও লেক-এর ঠিক পাশেই। বিরাট এলাকা জুড়ে রায়ভিলা একেবারে রায়প্রাসাদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব জোরালো বড়লোক তোমার ঠাকুর্দা শ্রীঅঘোরচন্দ্র—।

রাস্তা এখন একেবারে নির্জন ও অন্ধকার। বাঁদিকে ঝাউ ও অন্যান্য গাছের গভীর জঙ্গল। ডানদিকে চিরদীপের ধারাবিবরণের সঙ্গে মিল রেখে কয়েকটা অস্পষ্ট বাড়ি দেখতে পাচ্ছে বিনতা। আকাশে কোনও গ্রহ-তারা চোখে পড়ছে না। বরং আবার জমায়েত হতে শুরু করেছে কালচে লাল মেঘের পাহাড়।

ভিজে শাড়ি গায়ে শুকিয়ে এখন রীতিমতো কাঁপছে বিনতা। কিন্তু চিরদীপের যেন সেসব ভ্রুক্ষেপ নেই। অঘোরচন্দ্র রায়ের রহস্যময় আমন্ত্রণ ওর শরীরে ও মনে হয়তো কোনও নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

গাড়ির গতি কমিয়ে দিল চিরদীপ। ডানদিকে ঝুঁকে পড়ে অস্পষ্ট বাড়িগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎই বলে উঠল, বিনতা, পাওয়া গেছে। ওই যে—

তারপর রাস্তা ছেড়ে বাঁক নিল ডানদিকে।

ওদের সামনেই একটা খাটো লোহার দরজা। বন্ধ। রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে আসা মেঠো পথ দরজা পেরিয়ে চলে গেছে ভেতরে। যতদূর হেডলাইটের আলো পৌঁছল, ততদুর পর্যন্ত সে-রাস্তা কোনও বাঁক নেয়নি।

লোহার দরজার দু-দিকে বিস্তৃত খাটো পাঁচিল, তার ওপরে ফুটদুয়েক উঁচু কাটাতারের বেড়া।

গাড়ি থেকে নেমে দরজার কাছে এগিয়ে গেল চিরদীপ। লোহার দরজার গা ঘেঁষে সিমেন্টের পাঁচিলে গাঁথা রয়েছে বড় মাপের পাথরের ফলক। তাতে স্পষ্ট কালো হরফে লেখা, 'রায়ভিলা, নিউ দীঘা।'

এবার লোহার দরজার দিকে নজর দিল চিরদীপ। না, দরজায় কোনও তালা নেই, এমনই ভেজানো রয়েছে।

সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে বৃষ্টিভেজা ঠান্ডা গরাদগুলো মুঠোয় চেপে ধরে ঠেলতে শুরু করল ও। বিশ্রী ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা।

অন্ধকারে নজর চালিয়ে বহু চেষ্টা করেও কোনও 'ভিলা' চোখে পড়ল না চিরদীপের। ও ফিরে এল গাড়িতে।

বিনতা জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? এই বাড়িটাই?

গাড়ি চালু করে চিরদীপ বলল, আদৌ কোনও বাড়ি ভেতরে আছে কিনা জানি না, তবে দরজার গায়ে 'রায়ভিলা' নামেই পাথরের ফলক দেওয়া আছে।

ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর গাড়ি থামিয়ে লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদীপ।

রায়ভিলার এলাকাটা যে ঠিক কত বড় সেটা কোনওরকম ঠাহর করা যাচ্ছে না। মেঠো রাস্তার দু-পাশে সবুজ ঘাসের জমি। তারপর অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে পরিপূর্ণ আঁধারের রূপ নিয়েছে। তবে উদ্দাম হাওয়ায় ঝাঁকড়া গাছের মাতাল দুলুনির খড়খড় শব্দ ওদের কানে আসছে।

আবার গাড়ি নিয়ে অনিশ্চিত পথচলা শুরু হতেই সাময়িক বিরতির পর বৃষ্টিও শুরু হল আবার। পিছনের জঙ্গল থেকে একাধিক শৃগালের সুদীর্ঘ মিলিত আর্তনাদ শোনা গেল।

বিনতা চাপা গলায় বলে উঠল, আমার ভয় করছে! তারপর একটা হাত রাখল চিরদীপের কাঁধে।

চিরদীপ শুধু বলল, ভয় পেলে আমাদের চলে না। আমরা অপেশাদারি হলেও অ্যাথলিট—প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে শরীরচর্চা করি।

হারকিউলিস!—ঠাট্টা করে বলল বিনতা। ওর কাছে আরও সরে এল। এমন সময় বহু দূরে আলোর রেখা ওদের চোখে পড়ল। অঘোরচন্দ্রের হয়তো নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে, ভাবল চিরদীপ। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। মেঠো রাস্তা এখন উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা চরিত্র প্রকাশ করেছে।

অনেক চেষ্টা করেও বাড়িটার অবয়ব বিনতার চোখে পড়ল না, তবু ও আশ্বস্ত হল এই কথা ভেবে যে, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই ওরা খুঁজে পেয়েছে।

ওদের চোখের সামনে আলোর রেখা ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

একসময় গাড়ি এসে থামল প্রাচীন ঢঙে গড়া বিশাল এক গাড়িবারান্দার নীচে। এবং তখনই বৃষ্টি আবার শুরু হল মুষলধারে।

টিমটিম করে একটা বাল্‌ব জ্বলছে বিশাল ভারী সদর দরজার সামনে। আবলুষ কাঠে বহুদিন ধরে তেল সিঞ্চিত করলে যে চকচকে মজবুত রূপ ফুটে ওঠে, দরজার চেহারা অনেকটা সেইরকম। ভারী ভারী দুটো পিতলের কড়া যেন মহিষাসুরের হাতের বালা। গাড়িবারান্দার সিমেন্টের আস্তর বেশ কয়েক জায়গায় খসে গেছে। রঙ বিবর্ণ মলিন। যেন অঘোরচন্দ্র রায়ের শারীরিক জরাজীর্ণ অবস্থার প্রতীক।

নতুন করে ভেজা পোশাক নিয়ে গাড়ি থেকে নামল চিরদীপ ও বিনতা। কান পেতে বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা কর্মচঞ্চলতার শব্দ শুনতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিরাশ হল। চিরদীপের ভুরু কুঁচকে উঠল, বলল, কেউ নেই নাকি বাড়িতে?

বিনতা এত অস্ফুটভাবে 'জানি না' বলল যে, শুধু ওর ঠোঁট নড়াটুকুই বোঝা গেল।

চিরদীপ দ্রুত পায়ে গাড়ির কাছে গিয়ে হর্ন বাজাল একবার, দু-বার—।

নিস্তব্ধতাকে ছত্রভঙ্গ করে সেই শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনির জন্ম দিল। এবং দূরের জঙ্গল থেকে শোনা গেল কোনও জন্তুর একটানা চিৎকার। বৃষ্টির অবিরত শব্দে সমুদ্রের গর্জন এখন আর কানে আসছে না।

হঠাৎই একটা নতুন শব্দে ওরা সচকিত হল। কেউ দরজা খুলছে। ধীরে, অতি ধীরে। দরজার ওপারের আলোছায়া থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল গাড়িবারান্দার টিমটিমে আলোর বৃত্তে।

আগন্তুকের কালিপড়া চোখ, খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি, ঘন ঝোপের মতো ভুরু, গাল দুটো বসে গেছে বয়েসের ভারে, গায়ের রঙ তামাটে, পরনে সাদা হাফশার্ট ও ধুতি—দুটোই যথেষ্ট ময়লা।

ভুরুর নীচ থেকে দুটো উজ্জ্বল চোখ তাকাল চিরদীপ আর বিনতার দিকে। খুব মৃদু স্বরে সে বলল, বাড়িতে শয্যাশায়ী মানুষ, ওভাবে হর্ন বাজাতে নেই।—একটু থেমে তারপর বলল : আপনারা কোত্থেকে আসছেন—?

বিনতা এবার সামনে এগিয়ে গেল, বলল, আমি বিনতা। ঠাকুর্দার চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি...।

আগন্তুকের মুখে সংশয়ের মেঘ তখনও কাটেনি দেখে বিনতা আরও বিশদে বলল, অঘোরচন্দ্র রায় আমার ঠাকুর্দা। আর ইনি—এবারে ও দু-পা পিছনে দাঁড়ানো চিরদীপের দিকে ইশারা করে বলল, আমার স্বামী—।

আমার নাম চুনীরাম,—আগন্তুক মৃদু অস্পষ্ট গলায় বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

ওরা চুনীরামকে অনুসরণ করল।

দরজা পেরোলেই হলঘর। প্রাচীনতার সাক্ষ্য এখানেও প্রচুর। ঝাড়লণ্ঠন, বাতিদান, পুরু সোফা, ফ্রেমে বাঁধানো বড় বড় ছবি, রঙচটা দেওয়াল, আর সামনে কাঠের সিঁড়ি—সোজা উঠে গেছে দোতলায়।

হলঘরে ঢোকামাত্রই একটা দমবন্ধ করা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ওদের নাকে এসে ধাক্কা মেরেছে। সেইসঙ্গে একটা চাপা ফোঁস-ফোঁস শব্দ। যেন কোনও কামার তার হাপর চালাচ্ছে প্রাণপণে।

বিনতা চিরদীপের হাত চেপে ধরল। চিরদীপ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় বে-তোয়াক্কা প্রশ্ন ছুড়ে দিল : এই বিশ্রী গন্ধটা কোথা থেকে আসছে, চুনীরামবাবু? আর এই ফোঁস-ফোঁস শব্দটাই বা কীসের—জেনারেটরের নাকি?

হলঘরের মলিন আলোয় ওদের সামনে সিঁড়ি ভেঙে ওঠা চুনীরাম যেন এক শীর্ণ অপচ্ছায়া। সে মুখ না ফিরিয়েই বলল, আপানাদের গাড়ি আমি জায়গামতো সরিয়ে রাখব, চিন্তা করবেন না। ঝড়-জলের রাত, আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন। দিদিমণি যে আসবেন সে-কথা বাবু আমাকে বলেছিলেন, তাই ঘরও আমি তৈরি রেখেছি। তবে দাদাবাবুকে কষ্ট করে ভাঁড়ার ঘরে শুতে হবে।

প্রথমত ওর প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় চিরদীপ ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তার ওপর ভাঁড়ার ঘরে শোওয়ার ব্যাপার ওকে যেন ক্ষিপ্ত করে তুলল।

ভাঁড়ার ঘরের দরকার নেই, বিনতার ঘরেই আমি থাকতে পারব।

দিদিমণির জন্যে বাবু আলাদা ঘর রাখতে বলেছেন।—চিরদীপের রুক্ষতায় চুনীরাম পাথরের মতো নির্বিকার। ভয় নেই, ভাঁড়ার ঘরে আপনার তেমন কোনও অসুবিধে হবে না।

চিরদীপ তাকাল বিনতার দিকে। ও অন্তত এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করুক। ওর অধিকার আছে। এটা ওর আপন ঠাকুর্দার বাড়ি। কিন্তু বিনতা চুপচাপ। ওর মুখের ওপর ভিজে চুল এসে পড়েছে। কপালের টিপ ধুয়ে গেছে অনেক আগেই। আয়ত চোখ দুটো যেন কোনও স্বপ্নের জগতে চলে গেছে। বিনতা ধীরে ধীরে তাকাল চিরদীপের চোখে, বলল, কয়েকটা রাতের তো ব্যাপার। কষ্ট করে কাটিয়ে দাও।

চিরদীপ ঠোঁট উলটে কাঁধ ঝাঁকাল। অর্থাৎ, পড়েছি মোগলের হাতে...।

দোতলায় উঠতেই হাপরের শব্দ যেন তিনগুণ হয়ে কানে এসে ধাক্কা মারল।

চওড়া অলিন্দ ধরে ওরা হেঁটে চলেছে। পার হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা বন্ধ দরজা। অবশেষে একটা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল চুনীরাম, বলল, এই ঘরটি আপনার, দিদিমণি।

চুনীরামের কথায় বিনতা যেন ঘোর কাটিয়ে উঠল, বলল, ঠাকুর্দার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

সামান্য হাসল চুনীরাম : দেখা হবে, সময় হলেই দেখা হবে। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ওনারও তর সইছে না।—এ-কথা বলে ঘরের দরজাটা সে খুলে দিল, বলল, দরকারি জিনিসপত্র সব ঘরেই পাবেন—।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা রক্ত-হিম-করা চিৎকার প্রাসাদোপম জীর্ণ বাড়িটার ভ্যাপসা বাতাস প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কাঁপিয়ে দিল। মিহি স্বর ক্রমে কর্কশ হয়ে লম্বা টানা এক চিৎকার—যেন নরক থেকে ফিরে আসা কোনও অতৃপ্ত পিশাচের হতাশা ও ক্ষোভের চিৎকার। বাড়ির জরাগ্রস্ত দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল সেই আর্তনাদ।

বিনতার ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল অস্ফুট শব্দ।

চিরদীপ শরীরের প্রতিটি পেশি টানটান করে ঠাহর করতে চাইল চিৎকারটা কোন দিক থেকে এসেছে।

চুনীরাম আগের কথার জের টেনে বলল, ঘরে যান, দিদিমণি। রাতে একা-একা ঘর ছেড়ে বেরোবেন না।

আপনি আপনি চিৎকার শুনতে পাননি? কে অমন করে চিৎকার করল, চুনীরামবাবু?

চিৎকার নয়, দিদিমণি। সমুদ্রের বাতাস কাঁপছে...।

চিরদীপের দিকে ফিরল চুনীরাম, বলল, আসুন দাদাবাবু, আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।

মনে সংশয়, কৌতূহল ও কিছুটা আশঙ্কা নিয়ে চুনীরামকে অনুসরণ করল চিরদীপ। যাওয়ার আগে বিনতার দিকে একবার চকিতে দেখে নিল। স্মিত হেসে বিনতা যেন বলতে চাইল, কোনও ভয় নেই।

ওরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল বিনতা। ঘরের আলোটা কমজোরি হলেও বাকি সব ছিমছাম ও পরিপাটি। অবাক হয়ে দেখল বিছানার ওপর একপ্রস্থ শুকনো পোশাক ওরই জন্য অপেক্ষা করছে। পোশাকগুলো দেখে ওর মনে পড়ল, গাড়িতে একটা সুটকেস ছিল, তার ভেতরে ওর এবং চিরদীপের পোশাক, দরকারি টুকিটাকি সবকিছু রাখা ছিল। সেটা ভুল করে আনা হয়নি। কিন্তু বিছানার পাশে চোখ পড়তেই ওর ভুল ভাঙল। কোন এক মন্ত্রবলে সুটকেসটা ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে। এবং সামান্য অনুসন্ধান করেই ও টের পেল, সুটকেস খুলে কেউ দরকারি সব জিনিসগুলো বের করে ঠিক জায়গামতো সাজিয়ে রেখেছে। ফলে বিছানার ওপর রাখা শাড়ি-ব্লাউজ সব বিনতারই—কলকাতা থেকে সঙ্গে এনেছে।

শরীর শুকিয়ে পোশাক পালটে বিছানার ওপর এসে বসল বিনতা। খুব ক্লান্ত লাগছে। সেই সঙ্গে খিদেও পেয়েছে। তখনই চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে সাজানো টেবিল, টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে। নতুন করে আবার অবাক হল বিনতা। বিনা দ্বিধায় আহারপর্ব সেরে নিল। তারপর আলো নিভিয়ে সরাসরি গা এলিয়ে দিল বিছানায়। বাইরে সাইক্লোনের তাণ্ডব শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ফোঁস-ফোঁস শব্দ। ভ্যাপসা গন্ধটা ইতিমধ্যে নাকে অনেকটা সয়ে গেছে।

শুয়ে শুয়ে ওর মনে পড়ল অঘোরচন্দ্রের চিঠিটার কথা।

সাংবাদিকতায় স্নাতক হওয়ার পর একটা নামি অ্যাড এজেন্সিতে চাকরি পায় বিনতা। তারপরই বাবাকে হারায়। মাকে নিয়ে গড়ে ওঠে ওর সংসার, কারণ কোনও ভাইবোন ওর ছিল না। চাকরির সূত্রে দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নানান জায়গায় ঘুরতে হয় বিনতাকে। ফলে মায়ের ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থাটা ওর নজরে পড়েনি। একদিন মা-ও চলে গেলেন। তারপর থেকে ও একা। অবশেষে হঠাৎই চিরদীপের সঙ্গে আলাপ, প্রেম, বিয়ে। তারপর একটা মাস ওরা নানান দেশ ঘুরে বেড়িয়েছে। শেষে নৈনিতাল থেকে ফিরেই একটা চিঠি হাতে পায়।

অঘোরচন্দ্রের চিঠি। প্রায় দেড়মাসের পুরোনো। কাঁপা হাতে ওর কাছে আবেদন করেছেন অঘোরচন্দ্র :

তোমার বাবাকে অন্যায়ভাবে আমি বঞ্চিত করেছি। এই অভিমানে সময়ের আগেই সে চলে গেছে। এখন আমি শয্যাশায়ী। শেষ নিশ্বাস বুকে ধরে শুধু তোমার জন্যেই প্রতীক্ষা করছি। কারণ তুমিই আমার একমাত্র বংশপ্রদীপ। আমার বিপুল সম্পত্তি-বৈভব অপাত্রে বর্তাক তা আমি চাই না। ইতিমধ্যে দুই-একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়-পরিজন রায়ভিলায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তোমার আসার খবর নিশ্চিত না জেনে তাদের আমি ফেরাতেও পারছি না। মনে রেখো, শুধু তোমার শরীরেই বয়ে চলেছে রায় বংশের দুর্লভ রক্ত। তাই একান্ত অনুরোধ, আয় মা, এই বুড়োকে আর কষ্ট দিস না। তোর আশায় পথ চেয়ে রইলাম। ইতি—তোর ঠাকুর্দা, অঘোরচন্দ্র রায়, রায়ভিলা, নিউ দীঘা।

কী এক অজানা আকর্ষণে সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে বিনতা। চিরদীপ ওকে ছেড়ে থাকতে রাজি হয়নি। সুতরাং দুজনেই রওনা হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঠাকুর্দা কী করে জানলেন আজই ও এসে পৌঁছবে? ঘর তৈরি, খাবার তৈরি...আশ্চর্য!

এমন সময় তিনতলার কোনও ঘর থেকে হুল্লোড়ের শব্দ কানে এল বিনতার। নারী ও পুরুষ কণ্ঠের খুশি রমরমে চিৎকার। বাড়ির মালিক যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী সেখানে এই উৎসব কি মানায়? এরা কি অঘোরচন্দ্রের সেই অবাঞ্ছিত আত্মীয়-পরিজনের দল? মৃতপ্রায় গরুর শোকে উপস্থিত শকুনের পাল? ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা নেমে এল বিনতার চোখে। চিরদীপ এখন কী করছে কে জানে। হয়তো ও...

বিনতা ঘুমিয়ে পড়ল। ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন ক্রমে বেড়ে উঠছে। সেইসঙ্গে হাপরের ফোঁস-ফোঁস শব্দটাও।

ঠক-ঠক-ঠক-ঠক।

ঘুম ভেঙে গেল বিনতার। ঘরের একটা জানলা খুলে গেছে। শোঁ-শোঁ তুফানী হাওয়া ঘরের ভেতরে নিয়ে আসছে বৃষ্টির ছাট।

বাইরে ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল বিদ্যুৎ কালো আকাশের বুকে আলোর আঁচড় টানছে। জানলার একটা পাল্লা হাওয়ার দাপটে জোরালো শব্দে আছড়ে পড়ছে দেওয়ালে।

রাত এখন কত? বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়ি বের করে ঘুম চোখে দেখল বিনতা। রাত তিনটে। তখনই ও বুঝতে পারল, ঠক-ঠক শব্দটা নেহাতই জানলা থেকে নয়—ওর ঘরের দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। চিরদীপ নাকি?

সংশয় ও দ্বিধা নিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে এল বিনতা। পায়ে পায়ে এগোল বন্ধ দরজার দিকে।

হঠাৎই শোনা গেল এক ভয়ঙ্কর তীব্র বিলাপ—বহুক্ষণ স্থায়ী হয়ে অবশেষে কেঁপে-কেঁপে মিলিয়ে গেল।

বিনতার পা-দুটো যেন পাথরে গেঁথে গেল পলকে। শ্রুতিশক্তি একাগ্র করে ও আরও কিছু শুনতে চাইল। কিন্তু একমাত্র হাপরের ছন্দোময় ফোঁসফোঁসানি ছাড়া আর কোনও নতুন শব্দ ওর কানে এল না। এদিকে দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বিনতার মনে সাহস ফিরে এল। দৃঢ় পায়ে শেষ পথটুকু অতিক্রম করে ও দরজা খুলে দিল। এবং চমকে উঠল।

দরজায় যে দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে বিনতা কখনও দেখেনি। একটা অস্পষ্ট কালো ছায়া। পরনে গেঞ্জি ও ধুতি।

বিনতা চকিতে হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না।

লোডশেডিং, দিদিমণি।—অন্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়ামূর্তি ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর দিল : আমার নাম গুণধর। চলুন, বাবু আপনাকে দেখবার জন্যে বড় উতলা হয়েছেন। আর ওনাকে শান্ত রাখা যাচ্ছে না।

অঘোরচন্দ্র ওকে দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন? এত রাতে? কিন্তু তিনিই এ-বাড়ির মালিক, বিনতার পরমাত্মীয় এবং মৃত্যুশয্যায়।

অতএব অন্ধকার অলিন্দ ধরে গুণধরের অপচ্ছায়াকে অনুসরণ করল বিনতা।

হঠাৎ কোত্থেকে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি আবির্ভূত হল গুণধরের হাতে। তার চলমান স্তিমিত আলো গড়ে তুলল অসংখ্য ছায়ার মিছিল।

হঠাৎই বিনতা বুঝতে পারল ফোঁস-ফোঁস শব্দটা ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে। যেন কোনও বিশাল সরীসৃপের নিশ্বাস ওকে সম্মোহিত করে আকর্ষণ করছে।

অলিন্দের আঁকাবাঁকা গোলকধাঁধা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল গুণধর।

দরজাটা আধখোলা। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, ঘরের ভেতরে লণ্ঠন জ্বলছে। ফোঁস-ফোঁস শব্দটা এখন যেন পরিবেশ ছেয়ে ফেলেছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মিলিয়ে এক অপার্থিব শব্দ ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে

একটা দমকা কটু বাতাস বিনতার নাক ছুঁয়ে গেল। বহুদিন পড়ে থাকা শ্যাওলা-ধরা নোনা জলের মাছ যে-গন্ধ ছড়ায়, অনেকটা সেইরকম দুর্গন্ধময় বাতাস—সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঝাঁঝ মিশে রয়েছে।

ঘরে যান, দিদিমণি—বাবু অপেক্ষা করছেন। এই কথা বলেই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে মোমবাতি সমেত মিলিয়ে গেল গুণধর। বিনতা ধীরে-ধীরে দরজা খুলল, পা রাখল রহস্যময় ঘরের ভেতরে।

ঘরটা আকারে বিশাল, ফলে লণ্ঠনের আলো প্রতিটি আনাচে-কানাচে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা পরদা দিয়ে ঘেরা একটা ছোট ঘরের মতো। পরদার আলোকিত অভ্যন্তর দেখে বোঝা যায় লণ্ঠনটা রয়েছে পরদাঘেরা ঘরের ভেতরে। এরই কারণে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা বিছানা, বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটি বাইরে থেকেই নজরে পড়েছে বিনতার। এছাড়া পরদার গায়ে কয়েকটি জিনিসের বিকৃত ছায়া দেখে অনুমান করা যায়, পরদার আড়ালে শুয়ে থাকা রোগীকে নানান ডাক্তারি যন্ত্রে ঘিরে রাখা হয়েছে।

আয়...আয়...কাছে আয়—তীব্র ফিসফিসে স্বর যেন তীরের মতো এসে বিনতার কানে বিঁধল। পচা আঁশটে দুর্গন্ধটা ওর দম বন্ধ করে দিতে চাইছে। বিনতার শরীরে এক চাপা আলোড়ন দেখা দিল। আলো-আঁধারি তন্নতন্ন করে খুঁজেও তৃতীয় কোনও ব্যাক্তিকে ও দেখতে পেল না।

সম্মোহিতের মতো ও পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পরদাঘেরা ঘরের কাছে। পরদা সরিয়ে ঢুকল ভেতরে। জরাক্রান্ত সাবেকী খাট। খাটের ওপর নীলচে মশারি খাটানো। তবে ভেতরে স্তূপাকার চাদর বালিশ-জামাকাপড়ের ভিড়ে অসংখ্য ভাঁজপড়া অস্পষ্ট একটা মুখ চোখে পড়ছে। অঘোরঠাকুর্দা?

হ্যাঁ রে, আমিই তোর ঠাকুর্দা, অঘোর রায়—ফিসফিস করে শ্বাস টেনে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বলে উঠলেন। বিনতার নীরব সংশয় তিনি টের পেয়েছেন। তিনি শ্বাস টেনে-টেনে আরও বললেন, আয়...কাছে এসে বোস...।

বিছানার পাশেই একটা খাটো টুল। বিনতা তার ওপর বসল। দেখল, অসংখ্য, পাইপ ঢুকে গেছে মশারির ভেতরে। খাটের নীচে দুটো বড় বড় সিলিন্ডার! মাথার কাছে স্ট্যান্ডের সঙ্গে লাগানো রয়েছে রক্তের বোতল। তার সঠিক উৎস বোঝা যাচ্ছে না। একটিমাত্র লণ্ঠন সমস্ত আসবাব, যন্ত্র ও পাইপের ছায়া নানান ভাবে জট পাকিয়ে এক অভেদ্য রহস্য তৈরি করেছে।

বিনতা ভয় ভয় চোখে চারপাশে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

ভয় নেই রে, ভয় নেই...অঘোর রায় অস্ফুট স্বরে বললেন, তুই এসে আমাকে যে কী শান্তি দিলি তা আর বলার নয়। এবারে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব।...তুই আমার বংশের একমাত্র মেয়ে...কুলপ্রদীপ। তোর দেহে বইছে আমারই রক্ত। তুই-ই আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ...।—একটু থামলেন অঘোর রায়, তারপর বললেন, কই, দেখি, তোর হাতটা দেখি...।

কাপড়ের স্তূপ ভেদ করে মশারির তলা দিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক হাত বেরিয়ে এল। খসখসে চামড়ায় জড়নো জীর্ণ শুকনো একটি হাত। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেও বিনতা দেখল সেই হাতের প্রতিটি খাঁজে সবুজ ছাতা ধরেছে, খুঁটিয়ে দেখলে আরও চোখে পড়ে পিঁপড়ের আনাগোনা।

একটা অস্বাভাবিক আতঙ্কময় চিৎকারকে অতি কষ্টে রোধ করল বিনতা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর ডানহাত এগিয়ে গেল সেই শ্যাওলা পড়া শীর্ণ কঙ্কালসার হাতের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায়।

বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। সোঁ-সোঁ হাওয়ার দাপট আরও অস্থির আর উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। বিদ্যুৎঝলকের তীব্র আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে লাগল বিশাল ছায়াময় কক্ষের প্রতিটি কাচের জানলা। এবং প্রচণ্ড ফোঁস-ফোঁস শব্দ তুলে প্রাগৈতিহাসিক হাতটা ভয়ানক শক্তিকে আঁকড়ে ধরল বিনতার নরম হাত।

বিনতার শরীর যেন অসাড় হয়ে গেল। বরফের মতো ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে একটা হিম অনুভূতি হাতের আঙুল বেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে ওর দেহের প্রতিটি প্রান্তে। ভ্যাপসা পচা গন্ধটা যেন কোনও বিশাল

চাদর হয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে বিনতাকে, ওকে অবশ করে ফেলছে।

মশারির ভেতরে অঘোরচন্দ্র রায়ের অগোছালো শরীরটা অস্থির ছন্দে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ম্লান আলোয় শুধু চোখে পড়ছে আঁধারের বুক থেকে উজ্জ্বল ছুরির মতো সন্ত্রাসী দুটো চোখের তারা।

বিনতা আপ্রাণ চেষ্টাতেও আঙুলের এতটুকু অংশ নড়াতে পারল না। অবশেষে অসহায়ভাবে নিজেকে ছেড়ে দিল পরিস্থিতির হাতে। তখনই অঘোরচন্দ্র কথা বলতে শুরু করলেন।

দীর্ঘ দেড়মাস আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করেছি। মরেও আমি মরতে পারিনি। আমার বিষয়-সম্পত্তির লোভে ওরা চারজন সেই কবে থেকে এসে হাজির হয়েছে, কিন্তু আমি শুধু তোর জন্যে অপেক্ষা করেছি...।

অঘোরচন্দ্রের ফিসফিসে মোহময় কণ্ঠস্বর ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। দূরে কোথাও মিলিত স্বরে শেয়াল ডেকে উঠল। তারপর : আর কোনও চিন্তা নেই। তোর সব পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে...।

শেষ কথাগুলো যেন অভিশপ্ত কিন্নরীর মতো ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

মশারির পিছনে অঘোরচন্দ্রের অচল-অনড় চৌম্বকশক্তিময় চোখ দুটোর ওপর চোখ পড়ল বিনতার। সবকিছু যেন ওর গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। মনের অস্থিরতা ধীরে-ধীরে প্রশান্ত হয়ে এল। দুর্গন্ধের দম আটকানো চাদর যেন খুলে গেল পাকে পাকে। ফোঁস-ফোঁস হাঁপানির শব্দটাও যেন অনেক কমে গেছে।

বিনতার ফরসা মুখ ঘেমে উঠেছে, আয়ত আঁখি সম্পূর্ণ খোলা, কয়েকগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে ডান ভুরুর ওপরে।

তোর সঙ্গের লোকটি কে?—শীতল সুরে প্রশ্নটা ভেসে এল মশারির ভেতর থেকে।

এই প্রথম চিরদীপের কথা মনে পড়ল বিনতার। ও কোথায়, কী করছে? ও কি জানে বিনতার এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা!

চিরদীপ সরকার—আমার স্বামী।

ফোঁস-ফোঁস শব্দটা পলকে পরিণত হল চাপা গজরানিতে : তুই—তুই বিয়ে করেছিস? কই, আমি তো শুনিনি।

বিনতা বলতে পারত, তোমার ঠিকানা আমি জানতাম না যে খবরটা জানাব। কিন্তু ও কোনও উত্তর দিল না। প্রতিবাদ করল না এই ভিত্তিহীন অনুযোগের।

অঘোরঠাকুর্দার নামটুকুই শুধু শুনেছে মা-বাবার কাছে। তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেও কিছুই জানতে পারেনি। কী তাঁর চরিত্র, কী তাঁর বিশ্বাস, কোথায় তাঁর ঠিকানা, কিছুই না। তবুও এই অজ্ঞাতকুলশীল আত্মীয়ের ডাকে কেন জানি না ছুটে এসেছে কিনতা। কিন্তু ওর বিয়ের কথায় তাঁর এই প্রতিক্রিয়া বিনতার মোটেও ভালো লাগল না। ও একটু রুক্ষ স্বরেই জবাব দিতে চাইল, কেন, শুনলে কি বিয়েতে আপত্তি করতেন? কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে ওর ঠোঁট চিরে যে-উত্তর বেরিয়ে এল, সেটা হল, আমাকে ক্ষমা করুন।

ফিসফিসে স্বর উত্তাল উন্মাদ হয়ে উঠল : প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বিনতা স্থিরভাবে বসে রইল। বন্দি হাতটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনও চেষ্টা পর্যন্তও করছে না। জটিল আলোছায়া খেলা করছে ওর মুখে, সবুজ হাতে।

...তুই শুধু তুই...আর কাউকে আমি চাই না। আমার এত ঐশ্বর্য, ধন-রত্ন, আমি শুধু তোর হাতে তুলে দেব। তোর জিম্মায় রেখে যাব। তুই-ই পারবি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে এই সম্পত্তি রক্ষা করতে। কারণ তোর শিরায়-শিরায় আমার রক্ত।—একটু স্তিমিত হল কণ্ঠস্বর। তারপর শ্বাস টানার ঘড়ঘড় শব্দ করে আবার বলতে শুরু করল, বিলাস...বিলাসচন্দ্র আমার একমাত্র সন্তান। সে আমার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ঐশ্বর্য-বৈভব তার ধাতে সইত না। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকে সে লালসা নাম

দিয়েছিল। ও তিল-তিল করে বৈভব সঞ্চয়ের মর্ম বোঝেনি। কিন্তু তুই বুঝবি, মা, তুই হবি আমার উত্তরসূরি...শুধু আজকের দিনটা, তারপর...।

জরাজীর্ণ হাতের মরণ বাঁধুনি শিথিল হল। কিন্তু বিনতার হাত যেন আসড় হয়ে গেছে। ওর মনের ভেতরে উথলে উঠছে ঘৃণার ঢেউ...সকলের প্রতি। এই মুহূর্তে প্রিয় শুধু ওর ঠাকুর্দা অঘোরচন্দ্র রায়...আর, ও নিজে...।

ধীরে-ধীরে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিনতা। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি এবার যাই।

তারপর পরদার বেষ্টনী পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রকৃতির বুকে ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ তখনও প্রচণ্ড আক্রোশে মাথা খুঁড়ছে। বজ্রপাত ও বিদ্যুৎঝলকের কোনও বিরাম নেই।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বিনতা। পিছন ফিরে একবার তাকাল পরদার আড়ালে শুয়ে থাকা অদ্ভুত শরীরটার দিকে।

লণ্ঠনের হলদে আলো বিশ্রীভাবে কাঁপছে। ফোঁস-ফোঁস শব্দটা শোনা যাচ্ছে তীব্রভাবে, দুর্গন্ধটাও যেন ফিরে পাচ্ছে নিজের স্বরূপ।

বিনতার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। এক ঝটকায় দরজা খুলে দিল ও। খুলেই বিশ্রীভাবে চমকে উঠল।

গুণধর পাথরে খোদাই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি।

চলুন, দিদিমণি, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিই—।

আবার সেই পুরোনো পথ ধরে ফিরে যাওয়া। বিনতার হঠাৎই মনে হল ওর ডান হাতটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে পিছল হয়ে গেছে। নাকের কাছে হাতটা নিয়ে আসতেই অস্বাভাবিক গন্ধের আঘ্রাণ পেল ও। কুহেলি জড়ানো অলিন্দ ধরে পথচলার সময় ওর চেতনা এক নতুন শব্দের দিকে আকৃষ্ট হল। খুব কাছেই কোথাও প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হচ্ছে। কয়েকটা কাটা-কাটা চিৎকারও বিনতার কানে এল। তারপরই একটা ভোঁতা বীভৎস শব্দ। কেউ যেন আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু সে চিৎকার ডুবে গেল ঝড়ের তীব্রতায়।

মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে ও গুণধরকে অনুসরণ করে চলল। ওর মনের মধ্যে বেজে চলেছে এক দ্রিমি স্বর : প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...তুই, শুধু তুই...আর কাউকে আমি চাই না...কাউকে আমি চাই না।

একসময় সকাল হল, তবে সে-সকাল শুধু ঘড়ির কাঁটাতেই। কারণ জমাট বাঁধা ঘন কালো মেঘ সবরকম আলোর রেশ মুছে দিয়েছে সযত্নে। মুষলধারে বৃষ্টিরও বিরাম নেই, উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডবও ক্লান্তিহীন।

তিনতলার একটা বিশাল ঘরে প্রাতরাশের আয়োজন হয়েছিল, সেখানেই অন্যান্য অতিথির সঙ্গে পরিচয় হল বিনতার।

গতরাতে অঘোরঠাকুর্দার ঘর থেকে ফিরে আসার পর একটুও ঘুম আসেনি বিনতার। ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোর মন্থনে সময় কেটে গেছে। এক বিস্ময়কর দায়িত্ববোধ যেন চেপে বসেছে ওর দেহে ও মনে। কখনও কখনও কানে এসেছে সেই রক্ত হিম করে দেওয়া বুকফাটা আর্ত চিৎকার। তবে আগে যে-চিৎকারে ছিল হতাশা ও আক্ষেপের সুর, এখন সেখানে মনে হয় উল্লাসের ছোঁয়া লেগেছে।

একসময় গিয়ে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে বিনতা। বৃষ্টির ছাটে ভিজেছে নির্লিপ্তভাবে, অনুভব করেছে বিধ্বংসী প্রকৃতিকে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে।

সকালে নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়েই চিরদীপের কথা মনে পড়ল বিনতার। আশ্চর্য! এতটা সময় ওর কথা একেবারেই মনে পড়েনি।

চিরদীপের সন্ধানে রওনা হল বিনতা। অন্ধকার অলিন্দে চুনীরামের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাতিদানের গলে-যাওয়া মোমবাতিগুলো সরিয়ে নতুন বাতি বসাচ্ছে।

দাদাবাবু কোথায়, চুনীরামবাবু? এখনও কি ঘুম থেকে ওঠেনি?

কোটরগত চোখ সরাসরি বিনতার দিকে মেলে ধরে চুনীরাম বলল, ওঁর শরীরটা বোধ হয় ভালো নেই। কাল রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, ভিজে মেঝেতে আছাড় খেয়ে মাথায় সামান্য চোট পেয়েছেন। আমি ঘর ছেড়ে বেরোতে বারণ করেছিলাম, শোনেননি।

চুনীরামের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হলেও বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না বিনতার। কিন্তু এই ঘটনায় যতখানি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা, ততটা ও হতে পারছে কই! চিরদীপ ওর প্রেমিক। ওর স্বামী। ভালোবাসার মানুষ। ওর দুঃখ-কষ্টে বিনতার সুখ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে দুঃখও যে নেই!

বিনতার দ্বিধাগ্রস্ত মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে চুনীরাম বলল, আপনি ওপরে যান, দিদিমণি। এই বারান্দার শেষে সিঁড়ি আছে। ওপরে খাবার ঘরে আর সব অতিথিরা আপনার জন্যে হয়তো অপেক্ষা করছে।—একটু থেমে সে যোগ করল, দাদাবাবুর শরীরটা ভালো হলে আমি নিয়ে যাব'খন।

নিজেকে অবাক করে দিয়ে তিনতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল বিনতা।

খাবার ঘরটা আকারে যেন ফুটবল খেলার মাঠ। লম্বা একটা ডাইনিং টেবিল ঘরের দৈর্ঘ্য বরাবর পাতা। প্রতিটি কাচের জানলা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর—তাই সমবেতভাবে বন্ধ। সিলিংয়ে ঝুলন্ত ঝাড়বাতির আলোয় ঘরের অন্ধকার যেন কিছুটা দূরে সরে গিয়ে ওত পেতে রয়েছে। আবার সুযোগ পাওয়ামাত্রই হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ডাইনিং টেবিলের কারুকার্য করা সাবেকী চেয়ারে বসে আছেন চারজন অতিথি। দুজন প্রাতরাশে মনোযোগ দিয়েছেন, এবং ঘরের দূরপ্রান্তে আধো-আঁধারিতে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে গুণধর।

গুণধরকে বিনতার চিনতে পারার কারণ ঘরের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেও ওর চাপা কর্কশ স্বর বিনতার কানে এসে পৌঁছল, বসুন, দিদিমণি।

অতিথি চারজনের একজন উঠে দাঁড়ালেন। রোগা চেহারার ছিপছিপে যুবক। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। লম্বাটে ফরসা মুখে ছেলেমানুষির ছাপ। এবং ঘন-ঘন চোখের পাতা বন্ধ করার মুদ্রদোষ রয়েছে। পরনে তার ফুলহাতা সাদা-কালো চেক শার্ট ও গাঢ় রঙের প্যান্ট। গলায় আশ্চর্যভাবে শোভা পাচ্ছে লাল, নীল, হলদে, সবুজ নানান রঙে রাঙানো একটি মাফলার।

একরাশ কৌতুক গলায় ঢেলে তিনি বলে উঠলেন, আসুন, আসুন, এই শকুন-সম্মেলনে আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক! আপনি এলেন, ব্যস, ষোলোকলা পূর্ণ হল। অধমের নাম সচদেব পাল, যাত্রাদলে অভিনয় করে থাকি, তাতেই বেশ চলে যায়। কিন্তু হঠাৎই কী যে হল,—নাকমুখ কুঁচকে তেতো অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন সচদেব : বড়লোক আত্মীয় মারা যাচ্ছে শুনে আর স্থির থাকতে পারলেম না, উদাসী বাতাসের মতো ছুটে এলেম আমার মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো দাদার ঠাকুর্দা শ্রীঅঘোরচন্দ্র রায়ের কাছে—নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে শরীর দুলিয়ে বলে চললেন সচদেব, তবে এটুকু জানতেম, কিছু না কিছু সম্পত্তি আমি পাবই। যাত্রায় অভিনয় করি, অযাত্রা আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই।

সচদেব পাল এবার খাওয়ার কথা ভুলে বিনতার কাছে এগিয়ে এলেন। আবেগজর্জর গলায় শুরু করলেন, কিন্তু দেবী, এখানে এলেম, দেড়মাসব্যাপী থাকলেম, ঘুমোলেম, খেলেম, অঘোরচন্দ্রের মরবার নামটি পর্যন্ত নেই। এই শুনি মরে-মরে-মরে—আবার শুনি বেঁচে উঠেছে। শোনা কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া তো উপায় নেই, কারণ এ পর্যন্ত ওঁকে দেখতেই পাইনি। অনুমতি নেই, ডাক্তারের বারণ, আরও কত কী!

সচদেবের ধৈর্য শেষ হল, রুক্ষভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, শালা, ডাকলে খোদাতালা পর্যন্ত দর্শন দেন, এ আবার কোথাকার কোন ভি. আই. পি. পাঁচু!

সচদেব, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।—যিনি ধমকে উঠলেন তাঁর পরনে কালো পাড় সাদা শাড়ি, সিঁথি সিঁদুরবিহীন, গায়ের রঙ মাঝারি, কোথায় যেন একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা লুকিয়ে রয়েছে, বয়েস আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ।

সচদেব ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো ঘুরে তাকালেন শাসনকারিণীর দিকে। ব্যঙ্গের মিষ্টি গলায় বললেন, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।—তারপর বিনতাকে লক্ষ করে : বিনতাদেবী, এইমাত্র যিনি আমাকে শাসন করলেন, তিনি সত্যিই আমার মাসি, তবে লতায় পাতায়, শিকড়ে নয়। আহা, কী প্রশান্ত মূর্তি, যেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতমাতা!

ভদ্রমহিলার মুখ আরক্ত হল, উনি মাথা নিচু করে প্লেটের খাবার নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ওঁর পাশে বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। চোখে চশমা, সম্ভ্রান্ত মুখ, মাথার চুলে কিছুটা পাক ধরেছে, ঠোঁটের ওপর গাম্ভীর্যের গোঁফ, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি ও হালকা সাদা চাদর। তিনি বিধবা মহিলাকে চাপা গলায় বললেন, রুচিরা দেবী, আপনি নিজের মনে থাকুন। সচদেবের কথায় কান দেবেন না।—তারপর বিনতাকে উদ্দেশ করে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্বরে বললেন, আসুন, আসুন, বিনতা দেবী, বসুন, খাওয়া শুরু করুন।

বিনতা ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। সচদেব পাল হয়তো মিথ্যে বলেননি। এ-সম্মেলন শকুন-সম্মেলন ছাড়া আর কী? একটা মানুষ কখন মরবে সেই অপেক্ষায় সবাই প্রহর গুনছে। ও পায়ে-পায়ে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসল। খাবার সামনে সাজানোই ছিল, ও খেতে শুরু করল।

বিনতাকে যিনি আহ্বান জানিয়েছেন সেই ভদ্রলোক এবারে নিজের পরিচয় দিলেন,

আমার নাম অচিন্ত্য পুরকায়স্থ। আর ইনি আমার স্ত্রী ললিতা—

ললিতা পুরকায়স্থের পাশে একটা চেয়ার ছেড়ে বসে ছিল বিনতা। দেখল, শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী, লাল ডুরে শাড়ি পরিহিতা শ্রীমতী পুরকায়স্থ খেতে-খেতেই মাথা নাড়লেন। ব্যস্ত মুখ থেকে একটা চাপা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল শুধু।

বিনতা অপ্রতিভ ভঙ্গিমায় হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই সচদেব পালের কথায় চমকে উঠল। যেন ধারালো চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল কথাগুলো।

অচিন্ত্যদা, বহু ঘাটের জল পান করেছি, কিন্তু আপনার মতো ন্যাকা পাবলিক দুটো দেখিনি। সচদেব এতক্ষণ ওদের চারজনকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন, একটু সময় নিয়ে বললেন, ভদ্রতার মোড়কে নিজের হ্যাংলা চরিত্রটা শেষ পর্যন্ত ঢাকতে পারবেন? আপনি, আপনার হোঁদল কুতকুতে বউ, ওই ভারতমাতা, আর আমি—আঙুল উঁচিয়ে প্রত্যেককে দেখালেন সচদেব, এমনকী নিজেকেও, তারপর : এই চারজন গত দেড়মাস ধরে বিনতা দেবীর জন্যে অপেক্ষা করিনি? যতবারই আমরা ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন তুলেছি ততবারই গুণধর নয়তো হারামজাদা চুনীরাম এসে খবর দিয়েছে, স্থির ভবো, আরও একজন আসিতে বাকি অছি!—ব্যঙ্গের সুরে ভেংচে উঠলেন সচদেব : আজ সেই বিনতা দেবী উপস্থিত। গত রাতেই খবরটা জানতে পেরে আমরা আশনাই করিনি?

রুচিরা দেবী অস্থিরভাবে অচিন্ত্যকে দেখছেন, বিনতাকে দেখছেন, ললিতাকে দেখছেন। যেন মনে-প্রাণে চাইছেন, কেউ একটা মুখের মতো জবাব দিয়ে সচদেবকে ঠান্ডা করে দিক।

অচিন্ত্য নির্বিকার।

ললিতা খাওয়ায় ব্যস্ত।

বিনতা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এবং ছায়াময় গুণধর প্রাচীন আসবাব মাত্র।

সচদেব হাত-পা ছুড়ছেন, মুখ বিকৃত করছেন, আর সমানে বলে চলেছেন, এভাবে টাকার লোভ দেখিয়ে টেনে এনে দেড়মাস ধরে আঙুল চুষিয়ে বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। বিনতা এসে গেছে, আর দেরি নয়, হেস্তনেস্ত যা করার এখনই করতে হবে। অঘোরচন্দ্রকে মরতেই হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রক্ত জমানো এক ভয়ানক চিৎকার আলোছায়াময় ডাইনিং হলের বাতাস কাঁপিয়ে দিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ভাঙতে-ভাঙতে সেই হিমেল চিৎকারের টুকরো ঘিরে ধরল সবাইকে। পচা ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ প্রলয়ঙ্কর তরঙ্গের শক্তিতে ওদের দম বন্ধ করে দিতে চাইল। এবং হাপরের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আবদ্ধ ঘরে যেন দামামা বাজিয়ে চলেছে।

প্রত্যেকেই চমকে উঠেছেন, শুধু বিনতা ছাড়া। ও বিস্ময়-থমথমে মুখে যেন কোনও কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে। ওর কানে বেজে চলেছে এক অপার্থিব ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, কাউকে আমি চাই না, আর কাউকে আমি চাই না...।

এই অদ্ভুত পরিস্থিতিকে আরও অদ্ভুত করে তুলল সচদেবের আচরণ। হঠাৎ এক প্রচণ্ড অদৃশ্য ধাক্কায় তাঁর গোটা শরীরটা কেঁপে উঠল। দু-হাতে গলার মাফলারটা আঁকড়ে ধরলেন তিনি। নিজের সঙ্গেই যেন ধস্তাধস্তি শুরু করলেন। কিন্তু সকলের বিস্ফারিত চোখের সামনে ওঁর রঙিন মাফলারটা এক ভয়ঙ্কর সরীসৃপ হয়ে ওঁর গলায় এঁটে বসতে লাগল। দু-প্রান্তের ঝুলন্ত অংশটুকু হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল সচদেবের কণ্ঠনালী।

সচদেবের শরীর বেঁকে গেল ভয়ঙ্কর আক্ষেপে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছাকাছি। সাইক্লোনের তুমুল শব্দ ছাপিয়ে আবার শোনা গেল সেই নৃশংস চিৎকার, উল্লাসের চিৎকার।

সচদেবের চোখের কোণ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। নাকের পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল সেই রক্তের ধারা। এখনও তিনি গলা থেকে মাফলারটা খোলার চেষ্টায় যুঝে চলেছেন। মুখের প্রতিটি ভাঁজ ও রেখা বিকৃত হয়ে গিয়ে তাঁকে আর চেনা যাচ্ছে না।

চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠলেন অচিন্ত্য, ললিতা, ও রুচিরা দেবী। মহিলা দুজন বিশ্রী চিৎকার শুরু করলেন। বিনতা নিজের চেয়ারে স্থির। কোণের আঁধারে গুণধরও।

সচদেব পালের নাক দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে, শরীরের নড়াচড়া অনেক কমে এসেছে।

হঠাৎই তাঁর শরীরটা রণক্লান্ত হয়ে হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। মাফলারটা বেল্টের মতো গলায় কেটে বসেছে, এত চেষ্টাতেও তার বাঁধন শিথিল হয়নি।

একঝলক ঠান্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে আলোড়ন তুলে বেরিয়ে গেল। বলে দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই যে, সচদেব পাল মারা গেছেন। বিনতার কানে সম্মোহনী সুরে এখনও কেউ বলে চলেছে, কাউকে আমি চাই না...আর কাউকে আমি চাই না...।

এইবার গুণধরের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল। ও ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল সচদেবের মৃতদেহের কাছে। এক হাতে অবলীলায় সেটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল, বাড়ির পেছন দিকে কিছু ঝোপ-জঙ্গলও আছে। সেখানেই পুঁতে দিয়ে আসি। নইলে এই দুর্যোগে সৎকার আর কীভাবে হবে?

সচদেব—সচদেব মরল কেমন করে? আমি কি ভুল দেখলাম?—বিস্ময় ও আতঙ্কে অস্থির অচিন্ত্যর কণ্ঠ চিরে এই জিজ্ঞাসা বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গেই আর্ত চিৎকার করে জ্ঞান হারালেন রুচিরা দেবী। অচিন্ত্য ও ললিতা তাঁর আলুথালু দেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

ঘরের অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধেছে। কোনও কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। না। একটা ভিজে দুর্গন্ধময় কুয়াশা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আবির্ভূত হল চিরদীপ। উদ্ভ্রান্ত চেহারা, চোখের কোলে কালি, মাথায় ভারি ব্যান্ডেজ—রক্তে কিছুটা ভিজে উঠেছে।

বিনতা। বিনতা!—হাঁফাতে হাঁফাতে চেঁচিয়ে উঠল ও, শিগগির। যে করে হোক এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে। চলে এসো, এক্ষুনি।

বিনতা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। স্পষ্ট চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল চিরদীপকে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার আর কোথাও যাওয়ার পথ নেই, চিরদীপ।—পায়ে-পায়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে গেল বিনতা : আমার ঘরে চলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

হতভম্ব বিমূঢ় চিরদীপকে নিয়ে বিনতা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই রুচিরা দেবীর জ্ঞান ফিরল। উৎকট গন্ধময় বাতাস তিনি আর সইতে পারলেন না। সমস্ত শরীরে পাক দিয়ে হেঁচকি তুলে বমি করতে শুরু করলেন। ললিতা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন।

সশব্দে আবার বাজ পড়ল কোথাও, এবং সাইক্লোনের গজরানি ছাপিয়ে শোনা গেল একপাল শেয়ালের সুদীর্ঘ বিলাপ, যেন কারও শবযাত্রায় শোক-গাথা গাইছে।

বিনতা ঘরের দরজা বন্ধ করতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল চিরদীপ, বিনতা এই একটা রাতে তুমি কি একেবারে বদলে গেলে? তুমি জানো, কাল রাতে কী হয়েছে? এই সৃষ্টিছাড়া বাড়িতে আর একটা মুহূর্তও আমি থাকব না।

শান্ত স্বরে বিনতা জানতে চাইল, কী হয়েছে কাল রাতে? কোনও দুর্ঘটনা? চুনীরামবাবু বলছিলেন ভিজে মেঝেতে পিছলে পড়ে গিয়ে...।

হ্যাঁ, দুর্ঘটনাই বটে, মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলিয়ে নিল চিরদীপ। তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। তারপর ধীরে-ধীরে বলল গতকাল রাতের ঘটনা।

রাত তখন কত খেয়াল নেই, হঠাৎই এক ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পায় চিরদীপ। কে যেন প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে হিংস্র স্বরে বলছে, তুমি কে? বিনতার সঙ্গে কেন এসেছ? কে তুমি? তোমাকে আমি চাই না...কাউকে চাই না। শুধু বিনতা...।

চিরদীপ চমকে জেগে ওঠে। ছোট্ট ভাঁড়ার ঘরের জমাট বাতাসে ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ফলে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ও। ঘন অন্ধকার চোখে সয়ে আসতেই ও দেখতে পেল অলিন্দের শেষ প্রান্তে দুটো অপচ্ছায়া মিটমিটে মোমের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলেছে। কৌতূহল বেড়ে ওঠায় চিরদীপ এদের অনুসরণ করতে শুরু করে, কিন্তু হঠাৎই ওরা হারিয়ে যায়। চিরদীপ তখন বড় একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার ওদের দেখা যায়। কিন্তু ওরা কাছাকাছি এগিয়ে আসার আগেই চিরদীপকে পিছন থেকে কে যেন জাপটে ধরে। ধস্তাধস্তি শুরু হয় অদৃশ্য আততায়ীর সঙ্গে। আশ্চর্যজনকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চিরদীপ, এবং শেষ মুহূর্তে ভারী একটা কিছু দিয়ে আততায়ী ওকে মাথায় আঘাত করে। ও জ্ঞান হারায়।

এরপরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ও নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করে। সারা শরীরে অবসাদ, ক্লান্তি। মাথাটা প্রচণ্ড ভারী। আধো ঘুমে আধো জাগরণের মধ্যে এরপর শুরু হল ধারাবাহিক দুঃস্বপ্ন। ও দেখল, একজন অল্পবয়েসী যুবক আপ্রাণ শক্তিতে ছটফট করছে, গলায় একটা রঙিন মাফলার, সেটা এঁটে বসেছে মরণ কামড়ে। তারপর ছেলেটির চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চারদিকে শুধু লাল আর লাল। শোনা গেল একটা অলৌকিক উল্লাসের চিৎকার।

বিনতা, ওইসব ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে আমি ভীষণ টায়ার্ড, তা ছাড়া আমার ভয়ও করছে।—চিরদীপ অনুনয় করে বলল, চলো, আমরা ফিরে যাই। অঘোরচন্দ্র রায়ের রাজপ্রাসাদে ঢের বেড়ানো হয়েছে।

বিনতা শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল খোলা জানলার কাছে।

প্রকৃতির কোনও পরিবর্তন নেই। ঘণ্টায় কম করেও দেড়শো কিলোমিটার বেগে ঝড় বইছে। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কাঁঠাল, জামরুল ও অশ্বত্থ গাছগুলো উন্মত্তের মতো এপাশ-ওপাশ দুলছে। ওর ফরসা মুখে এসে ঝাপটা মারছে বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা। বিনতা স্থির অচঞ্চল গলায় বলল, চিরদীপ, তুমি ইচ্ছে হলে ফিরে যাও। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি...।

বিনতার কথা শেষ হল না, একটা প্রাণফাটা বিকৃত চিৎকার শোনা গেল, বাঁচাও! বাঁচাও!

তারপর সেই চিৎকার মুমূর্ষু জান্তব আর্তনাদের রূপ নিল। এবং বেজেই চলল।

চিরদীপ বিনতার কথার প্রতিবাদ জানিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, চট করে ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে।

কে চেঁচাচ্ছে? জিগ্যেস করল চিরদীপ।

জানি না।—বিনতা জবাব দিল।

চিরদীপ একটা মুহূর্ত কী ভাবল, তারপর অসমর্থ শরীর নিয়েই তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওর ভারী পায়ের শব্দ অলিন্দে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল।

চিৎকারের উৎস অনুমান করে তিনতলার একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল চিরদীপ। অন্য সবাই, অর্থাৎ, অচিন্ত্য ও ললিতা, সেখানে ইতিমধ্যেই হাজির। আসার পথে চুনীরামকে কাজে ব্যস্ত দেখেছে চিরদীপ। তেল রঙে আঁকা সাবেকী ছবিগুলো বারান্দার এক আঁধারি কোণে বসে পরিষ্কার করছে। ছুটন্ত চিরদীপকে দেখে সে এতটুকু বিচলিত হয়নি। বরং আরও গভীর মনোযোগে হাতের কাজে ডুবে গেছে।

ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্য ও ললিতা অসংলগ্ন কথাবার্তায় কী করবেন ঠিক করার চেষ্টা করছিলেন, চিরদীপ এসে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলল।

ঘর খালি, তবে বন্ধ কলঘর থেকে রুচিরা দেবীর প্রাণান্তকর চিৎকার বিকটভাবে কানে এসে বাজছে। বাথরুমের ভেতরে যেন মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করে চলেছেন তিনি। ধস্তাধস্তি করছেন কোনও অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে।

চিরদীপের ইশারায় অচিন্ত্য ওর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। দুজনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাথরুমের বন্ধ দরজার ওপর। ললিতা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত শব্দকল্পের জটিলতা সৃষ্টি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে গেল কাঠের দরজা। ততক্ষণে রুচিরা দেবীর চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। বাথরুম থেকে একটা উৎকট বাতাস বেরিয়ে এসে উপস্থিত তিনজনকে শিউরে দিল। এবং ভেতরের দৃশ্যও।

সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে মেঝেতে পড়ে আছেন রুচিরা দেবী। বাথরুমের বড় কাচের জানলা দিয়ে হুহু করে বাতাস ঢুকছে। কারণ, জানলার বড়-বড় শার্সিগুলো ভেঙে চৌচির। এবং ভাঙা কাচের টুকরো একটিও মেঝেতে পড়ে নেই। সুনিপুণভাবে বিঁধে রয়েছে রুচিরার সর্বাঙ্গে। দুটো কাচের ফলা গেঁথে আছে তাঁর বিস্ফারিত দু-চোখের মণিতে, একটা কপালের ঠিক কেন্দ্রস্থলে, আর বাকিগুলো পেটে, মুখে বুকে—দেহের সর্বত্র। রক্তের সরু রেখা অসংখ্য হিলহিলে সাপের মতো জটিল ছবি এঁকেছে রুচিরার মসৃণ ত্বকে। কটু বাতাসটা ঘূর্ণিঝড় তুলল বাথরুমের ভেতরে। তারপর হিস হিস শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

ঘটনাস্থলে এবার উপস্থিত হল চুনীরাম ও গুণধর। হাতে একটা চাদর। সবাইকে সরে যেতে অনুরোধ করে ওরা চাদর মুড়ে কাঁধে তুলে নিল রুচিরার মৃতদেহ। চুনীরাম অস্পষ্ট গলায় বলল, ঝোড়ো হাওয়ায় জানলার কাচ ভেঙে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বড়ই দুঃখের ঘটনা।

সকলেই অবাক, বিমূঢ়। চাপা কান্নায় ও আতঙ্কে ললিতা পুরকায়স্থ ফুলে-ফুলে কেঁপে উঠছেন। চিরদীপের ভুরু কুঁচকে উঠল দুশ্চিন্তায়। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর স্বাভাবিক কোনও ব্যাখ্যা নেই।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে শুনতে পেল হাপরের শব্দের তীব্রতা যেন হঠাৎই শতগুণ বেড়ে গেছে। আর নতুন একটা উল্লাসধ্বনি চিরদীপের মজ্জায়-মজ্জায় যেন ছড়িয়ে দিল বরফের কুচি।

অচিন্ত্য ও ললিতা স্থলিত পায়ে ফিরে চললেন নিজেদের ঘরে। অচিন্ত্য হাতঘড়ি দেখলেন, বেলা বারোটা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল দু-দুটো ভয়ঙ্কর অপমৃত্যু। এবারে কার পালা? অচিন্ত্যর, ললিতার, চিরদীপের, না বিনতার?

অচিন্ত্য ও ললিতার ঘর আকারে সামান্য ছোট, কিন্তু চরিত্রে সাবেকী ঢঙের কোনও হেরফের নেই। প্রাচীন খাটের ওপরে আয়েসী শয্যা, তার ওপরে শুয়ে আছেন ওঁরা দুজনে—মুখোমুখি। একটু আগেই মধ্যাহ্নভোজ পর্ব শেষ হয়েছে, কিন্তু দিবানিদ্রার মানসিকতা কারও নেই। কৌতুক ও রঙ্গপ্রিয় সচদেব পালের নিষ্ঠুর মৃত্যু, এবং রুচিরা দেবীর অসহায় জীবনাবসান অচিন্ত্য ও ললিতাকে যেন বার্ধক্যের দিকে দশ বছর করে এগিয়ে দিয়েছে।

কাল সকালেই আমরা ফিরে যাব, ললিতা।—অচিন্ত্য ভারী গলায় থেমে-থেমে বললেন।

ললিতার উত্তর স্পষ্টভাবে শোনা গেল না।

ঘর যথারীতি আবছায়া অন্ধকার। দু-দুটো বিশাল কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দামাল প্রকৃতি চোখে পড়ে। তার বুকে মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে সৌদামিনী-রেখার আঁকাবাঁকা জ্বলন্ত চাবুক। জানলার বন্ধ শার্সি ভেদ করে যে-আলো ঘরে এসে পড়েছে, তাকে আলো বলা যায় না। হয়তো সেই কারণে ঘরের দেওয়ালে মোমবাতিদানে বসানো রয়েছে লাল রঙের একটা মোমবাতি। তার হলদে বিবর্ণ শিখা বেহিসেবি ভাবে কাঁপছে।

মোমবাতির আলো এসে পড়েছে পাশ ফিরে শুয়ে থাকা অচিন্ত্যর পিঠে। অচিন্ত্যর ছায়ার আড়ালে ললিতা প্রায় অন্ধকারে। এঁদের মুখাবয়ব অস্পষ্ট। শুধু শোনা যাচ্ছে অচিন্ত্যর ক্লান্ত-শ্রান্ত কথার টুকরো।

যখন এসেছিলাম, মনে আশা ছিল, অঘোরকাকার কাছ থেকে কিছু পেলে ডুবে যাওয়া ব্যবসাটাকে আবার বাঁচাতে পারব, কিন্তু...যাকগে, আপাতত শান্তিতে ফিরে যেতে পারলেই ভালো।—অচিন্ত্যর বুক ঠেলে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল : এতগুলো দিন এখানে বেশ আনন্দেই ছিলাম। আকাশ ছিল পরিষ্কার, বাতাস ছিল শান্ত। দীঘার সমুদ্র, নোনা হাওয়া, ঝাউবন—কী ভালোই না লেগেছিল। তারপর বাড়ির কাছেই ওই সুন্দর পার্ক, তার হ্রদ, সেখানে নৌকা বাওয়া, নুড়ি ঢালা উঁচু-নিচু পথ—মনে হচ্ছিল, ইস, এখানেই যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম।—স্বপ্নময় আবেশটা এবার অদৃশ্য হল অচিন্ত্যর স্বর থেকে। তিনি সামান্য আশঙ্কাগ্রস্ত সুরে বলতে লাগলেন, কিন্তু ললিতা, গতকাল দুপুর থেকে সব কেমন পালটে যেতে লাগল। আকাশে মেঘ করে শুরু হল সাইক্লোনের তাণ্ডব, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অচল হল, বাড়ির জেনারেটার গেল বিগড়ে। চারদিকে শুধু অন্ধকার আর আতঙ্ক। অঘোরচন্দ্রকে কোনওদিন দেখিনি, কিন্তু তাঁর আদেশ এমনই যে, লঙ্ঘন করা যায় না। সুতরাং নির্লজ্জের মতো আমরা বিনতার জন্যে অপেক্ষা করেছি। ও এল। আর একই সঙ্গে শুরু হল অলৌকিক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা...।

অচিন্ত্য হঠাৎই থামলেন। কারণ তার মনে হল, ললিতা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। এবং একটা কটু বাতাস যেন ঘূর্ণিঝড় তুলেছে ঘরের ভেতরে।

তিনি ললিতার বাহুতে হাত রাখলেন। সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে ওঁকে ডাকলেন, ললিতা...ললিতা...।

জড়ানো অস্ফুট শব্দ করে ললিতা নড়ে উঠলেন।

বন্ধ জানলার একটা শার্সি হঠাৎই ভেঙে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু আশ্চর্যভাবেই কোনও শব্দ হল না। ঝোড়ো বাতাস অনুপ্রবেশ করল তাড়া খাওয়া স্বদেশির মতো। বাতিদানে মোমবাতির শিখা কেঁপে উঠল লকলক করে। তারপর যেন মন স্থির করে নিয়ে ক্রমশ দীর্ঘ হতে শুরু করল। একটা লিকলিকে হলদে জিভ যেন এগিয়ে চলেছে বিছানায় শুয়ে থাকা অচিন্ত্য ও ললিতার দিকে। একটা শিখা ধীরে-ধীরে দশটা শিখায় পরিণত হয়েছে। ঝোড়ো বাতাসে ভর করে প্রায় বারো ফুট দূরত্ব শূন্যপথে অতিক্রম করে সেই আগুনের অজগর সাপটা অচিন্ত্যর পিঠে ছোবল বসাল। মুহূর্তে যেন ফুটে উঠল অসংখ্য হলদে ফুল। প্রথমে অচিন্ত্য, তারপর ললিতা। লকলকে শিখার হাজারো জিহ্বা ওঁদের গ্রাস করল পলকে।

দুর্গন্ধময় বাতাসটা উন্মত্ত উল্লাসে ঘরের ভেতরে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে উচ্চগ্রামের এক সুদীর্ঘ চিৎকার। যেন নরকের দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ চিৎকার করে আহ্বান জানাচ্ছে। হাপরের ফোঁস-ফোঁস শব্দ দ্রুতলয়ে বেড়ে উঠে বিশ্বচরাচরকে যেন শব্দব্রহ্মে লুপ্ত করে দিতে চাইল।

একটু পরেই লেলিহান আগুন প্রশমিত হয়ে সরে এল। আবার রূপান্তরিত হল মোমবাতির নিরীহ শিখায়। অক্ষত বিলাসী শয্যায় এখন পড়ে আছে শুধু একরাশ কালো ছাই। ঘরের আর কোনও জিনিসে আগুনের আঁচ পর্যন্ত লাগেনি। অক্ষত বিছানা, অক্ষত বালিশ, অক্ষত ঘরের প্রতিটি ধূলিকণা। শুধু মুছে গেছেন অচিন্ত্য পুরকায়স্থ ও ললিতা পুরকায়স্থ। ধ্বংসের পূর্বমুহূর্তেও ওঁরা জানতে পারেননি, নিয়তি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে শেষ মুহূর্তে ললিতার মনে পড়েছিল কলকাতায় রেখে আসা সাত বছরের একমাত্র ছেলের কথা।

আবার ডাক এসেছে। অপ্রতিরোধ্য ডাক। এই ডাক উপেক্ষা করা যায় না। চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায় ডাকের উৎসস্থলে।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়েছে, কারণ জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে কিছুই আর চোখে পড়ে না। বিনতার মুখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে উত্তাল হাওয়া। বৃষ্টির ছাঁটে চুল ভিজে গেছে। চোখের পাতায়, কপালে বিন্দু-বিন্দু জলের ফোঁটা।

চিরদীপ বসে আছে বিছানায়। মুখ গম্ভীর। অনুমান হয়, বিনতার সঙ্গে কোনও বিষয়ে ও একমত হতে পারছে না। ওদের দ্বন্দ্ব-বিহ্বল মুহূর্তে দরজায় এসে দাঁড়াল চুনীরামের ছায়া।

বাবু ডাকছেন, দিদিমণি—।

বিনতা জেগে উঠল আচ্ছন্নতা থেকে। একটিও কথা খরচ না করে রওনা হল চুনীরামকে অনুসরণ করার জন্যে। কিন্তু উঠে এসে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল চিরদীপ : তুমি যাবে না, বিনতা।

সরে যাও, চিরদীপ, এ হয় না।—নির্লিপ্ত শান্ত সুরে বলল বিনতা।

না!—গলার স্বর উঁচু হল চিরদীপের : যদি যেতে তোমাকে হয়ই, তাহলে আমিও যাব। স্বচক্ষে মোলাকাত করে আসব তোমার ঠাকুর্দার সঙ্গে।

এইবার এগিয়ে এল চুনীরাম। অস্পষ্ট স্বরে বলল, ছেলেমানুষি করবেন না, দাদাবাবু। কাল রাতের কথা মনে নেই?

চিরদীপের মাথায় যেন আগুন চড়ে গেল। ঋজু দেহটাকে বাঁকিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল চুনীরামের ওপর। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে চুনীরাম ডান হাতে সামান্য ঝটকা দিল। এবং আসুরিক শক্তিতে বিছানার ওপর নিক্ষিপ্ত হল চিরদীপ। হাত-পা ছড়িয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে রইল।

চুনীরামের কৃশ শরীরে কোথা থেকে এল মত্ত হাতির শক্তি? চিরদীপের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বিনতা ও চুনীরাম নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে বিনতা ছোট্ট করে বলে গেল, তুমি তোমার ঘরে যাও,

চিরদীপ। ফিরে এসে আমি একটু একা থাকতে চাই।

আবার সেই চেনা পথ পার হয়ে সেই রহস্যময় দরজা, সেই রহস্যময় ঘর, সেই রহস্যময় প্রাচীন পুরুষ। আজ, এই মুহূর্তে, বিনতার মনে ভয় নেই, নেই কোনও আশঙ্কা। ছায়াময় ঘরের চারদিকে একপলক নজর বুলিয়ে নিয়ে পরদাঘেরা অঞ্চলের দিকে এগোল বিনতা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

লণ্ঠনের আলো আজ অস্বাভাবিক রকম স্তিমিত। তীব্র কটু গন্ধ বিনতাকে আর বিব্রত করতে পারল না। ও আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে গেল টুলের কাছে। বসল। ছোট্ট করে বলল, আমায় ডেকেছেন?

উত্তরে মশারির নীচ দিয়ে খসখসে চামড়ায় ঢাকা ছাতা পড়া সবুজাভ একটা হাত বেরিয়ে এল। ভয়ঙ্কর শক্তিতে চেপে ধরল বিনতার হাত। তারপর শ্বাস টেনে বলল, বিনতা, সময় হয়ে এসেছে...ওরা আর কেউ নেই...সচদেব-অচিন্ত্য...অচিন্ত্যর বউ...রুচিরা...সব গেছে। কাউকে আমার চাই না...কারও প্রয়োজন নেই...

হাতের চাপ ক্রমশ অমানুষিকভাবে বাড়ছে। বিনতা অনুভব করল ওর ধমনীতে এক বিচিত্র জ্বালা। সেই জ্বালা ক্রমে বয়ে চলেছে শরীরের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে। নাকে, মুখে, চোখে, ত্বকে। শ্যাওলার আঁশটে পচা গন্ধ ওকে ঘিরে ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে আকুলভাবে। হাপরের শব্দের ছন্দ ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে।

গত একমাস ধরে আমি এই দেহে বন্দি রয়েছি মরেও আমি মরতে পারিনি কারণ আমার আসল যে-উত্তরাধিকারী, সে আসেনি...তুই, বিনতা...তোর জন্যে এই অবস্থায় আমি মরে গিয়েও অপেক্ষা করেছি...।—দ্বিতীয় একটা হাত বেরিয়ে এল মশারির বাইরে, দিশেহারা হয়ে যেন কিছু খুঁজছে। তারপর :...আজ আমার সমস্ত কিছু আমি তোকে সমপর্ণ করলাম। সব কিছু...সব কিছু...আমি যাচ্ছি, বিনতা, আমি যাচ্ছি আমার সব কিছু এখন থেকে তোর...সব তোর...।

ফিসফিসে সম্মোহনী শব্দগুলো বিকৃত হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে : সব কিছু তোর...সব কিছু...।

বিনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মাথার ভেতরে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যেন কোনও সুড়ঙ্গের দূর প্রান্ত থেকে কেউ চিৎকার করে ওকে ডাকছে। ঘরের বাতাস হঠাৎ ভীষণ ঠান্ডা হয়ে গেল, বরফের হিম অবশ করে দিতে চাইল প্রতিটি অঙ্গ। একটা অদ্ভুত শন্ শন্ শব্দ শিস কেটে ঝঙ্কার তুলল বাতাসে।

বিনতার চোখের সামনে মশারিটা ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। সবুজাভ হাত দুটো যেন তরল হয়ে ঘন-ঘন ফোঁটায় টপ-টপ করে গলে পড়ছে মেঝেতে।

বিনতা একটুও বিচলিত হল না, জমাট পাথর হয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগল। অতি ক্ষীণ একটা কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে।

এই বাড়ি...এই প্রাসাদ...বিষয়-আশয় সব তোর...তোকেই সব দেখতে হবে, মা। গুণধর, চুনীরাম রইল...ওরা তোকে সাহায্য করবে...আর...আর আমি তো আছিই...বিনতা, বিনতা, কর্তব্য পালনে যেন কোনও খুঁত না থাকে...দেখিস আমি চললাম চললাম।

উৎকট গন্ধটা ভয়ঙ্কর তীব্র হল। এক সুদীর্ঘ অপার্থিব চিৎকার শুরু হল ঘরের ভিতরে। বিনতার চোখ ঝাপসা, মন ঝাপসা, এমনকী শরীরও ঝাপসা।

অপার্থিব করুণ চিৎকারটা কাঁপতে কাঁপতে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে...ঘরটা ভরে উঠেছে ঘন ভিজে কুয়াশায়...ঝড়ের তাণ্ডব হয়ে উঠল বহুমুখী...দূর থেকে তীব্র স্বরে ডেকে উঠল শৃগালের দল...বিনতা যেন ক্রমে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলছে...।

হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে চমকে উঠল বিনতা। যেন হাওয়ায় ভর করে ও এগিয়ে গেল কাচের জানলার কাছে। জানলা খুলে দিল। উদ্দাম বাতাস ঘরের সাদা পরদাগুলোকে শিরশির করে কাঁপিয়ে দিল। শীত করে উঠল বিনতার। যেন মেরু অঞ্চলের বাতাস নিয়ে এসেছে কোনও গভীর ইঙ্গিত।

ঘন অন্ধকারে স্পোর্টস কারের উজ্জ্বল হেডলাইট দেখতে পেল বিনতা। চিরদীপ গাড়ি নিয়ে ছুটে চলেছে। কোথায় যেতে চায় ও? বিনতার ঠোঁটের কোণে খেলে গেল রহস্যময় হাসি। রায়ভিলাকে চিরদীপ ভয় পেয়েছে, দিশেহারা হয়ে পড়েছে সাহসী অ্যাথলিট! জানলা ছেড়ে ও রওনা হল ঘরের দিকে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল গুণধর ও চুনীরাম। বিনতাকে বেরোতে দেখেই অনুগত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল। বিনতা স্মিত হাসল। অস্পষ্ট হালকা স্বরে বলল, তোমরা নিজেদের কাজে যাও—।

দাদাবাবু একটু আগে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন।—গুণধর কর্কশ স্বরে বলল।

কে? ওই চিরদীপ সরকার? কাল রাতে যে এসেছিল?

বিনতার বদলে যাওয়া কণ্ঠস্বর ওদের অবাক করে দিল। নিঃশব্দে ছায়ার মতো সরে গেল দুজনে।

অন্ধকার অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল বিনতা। এই প্রাসাদ যে ওর কতকালের চেনা! এর আনাচেকানাচে সদ্য ফোটা গোলাপের গন্ধ, এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে চলেছে সেতারের সুর। এই সুন্দর বাতাস, এই সুন্দর প্রকৃতি, এ যেন অতুলনীয়।

সদর দরজা খুলে গাড়িবারান্দায় এসে উপস্থিত হল বিনতা। স্থির হয়ে দাঁড়াল। চিরদীপের গাড়ি যে-পথে রওনা হয়েছে সেই পথের দিকে ওর শীতল দৃষ্টি অচঞ্চলভাবে নিবদ্ধ। দুরন্ত বাতাসে বিনতার ভিজে চুল উড়ছে, উড়ছে সাদা শিফনের শাড়ি। জলের ফোঁটা মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুটিয়ে তুলছে অনিয়তাকার আলপনা।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর আবার শোনা গেল গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। এদিকেই আসছে। ক্রমে দেখা গেল হলদে সার্চলাইটের আলো। পরক্ষণেই গাড়িবারান্দার কাছে এসে সজোরে ব্রেক কষল চিরদীপ।

ওকে দেখল বিনতা। উদ্ভ্রান্ত চেহারা, মাথার ব্যান্ডেজ জলে ও রক্তে ভিজে বীভৎস রূপ নিয়েছে। চিরদীপের চোখে হতবাক দৃষ্টি। গাড়িটা কী করে এখানে আবার ফিরে এল তা ও বুঝতে পারছে না। বিনতাকে চিরদীপ দেখতে পায়নি। সুতরাং আবার ও গাড়ি স্টার্ট দিল, উন্মাদ গতিতে ছুটিয়ে দিল গাড়ি। যে করে হোক এই রায়ভিলার এলাকা ছেড়ে ওকে বেরোতেই হবে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে গাড়িটা মেঠো পথে গতিশীল হল।

দরজায় দাঁড়ানো বিনতার ঠোঁটে আবার ফুটে উঠল একচিলতে হাসি। নির্লিপ্তভাবে ও দাঁড়িয়ে রইল। কোনও উৎকণ্ঠা অথবা ব্যস্ততা নেই আচরণে। শুরু হল প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার অবসান হল পাঁচ মিনিট পরেই। আবার শোনা গেল ইঞ্জিনের ক্ষুব্ধ গর্জন, চোখে পড়ল হেডলাইটের আলো।

গাড়িবারান্দার অবয়ব চোখে পড়তেই চিরদীপ থামল। আবার গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হল। ভয়ঙ্কর সাইক্লোনকে ও এতটুকুও গ্রাহ্য করছে না। বিনতা নিজের জায়গায় প্রস্তর-প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে আবার শোনা গেল গাড়ি ফিরে আসার শব্দ...। এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল চিরদীপের আসা-যাওয়ার পালা। কী এক অদৃশ্য আকর্ষণ ওকে বিভ্রান্ত করে এই প্রাসাদের দিকে বারবার টেনে নিয়ে আসছে, তা চিরদীপের কল্পনার বাইরে। কিন্তু এই মুহূর্তে, যখন গাড়িবারান্দার চেহারাটা ওর নজরে পড়ল, ও নিরুপায় হয়ে বসে রইল গাড়িতে। বুঝল, বারবার পালিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা বৃথা। ও ব্যর্থ হয়েছে। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে গাড়ি থেকে নেমে এল চিরদীপ।

বৃষ্টির তেজ কমে এলেও বাতাস আরও রুক্ষ হয়েছে। হেডলাইটের আলো ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। সেই আলোয় পথ ঠাহর করে সদর দরজার কাছে এগিয়ে চলল চিরদীপ। ওর কান্না পাচ্ছে। ক্ষোভে ও হতাশায় ইচ্ছে করছে চিৎকার করে উঠতে। বিনতা। বিনতার এই হঠাৎ পালটে যাওয়া ওর এতটুকু ভালো লাগেনি। কোথায় গেল চিরদীপের প্রতি ওর অনুগত ভালোবাসা? এই রায়ভিলাতে এসে বিনতাকে ও হারিয়েছে। হারিয়েছে সুখ শান্তি মানসিক স্থৈর্য। এখন সেই অভিশপ্ত বাড়িতে ফিরে গিয়ে ও কী করবে? অপেক্ষা করবে

সকালের জন্যে? তারপর যদি সাইক্লোন থেমে যায়, দিনের আলোয় পথ চিনে রওনা হবে কলকাতায়। এখন, এই অন্ধকারে, গোলকধাঁধায় ঘুরে মরার চেয়ে সে তবু অনেক ভালো।

এইসব ভাবতে-ভাবতে গাড়িবারান্দার নীচে এল চিরদীপ। জামা-প্যান্ট ভিজে লেপটে আছে শরীরের সঙ্গে। ঠান্ডায় যেন কাঁপুনি দিচ্ছে। তখনই ওর নজরে পড়ল, সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছায়াময় শরীর। বিনতা।

বিনতা! বিনতা!—উত্তেজনায় ডেকে উঠল চিরদীপ। ছুটে এগিয়ে গেল ওর কাছে : আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, বিনতা। আমি পথ চিনতে পারছি না। বারবার এই হতচ্ছাড়া গাড়িটা ফিরে আসছে এই অভিশপ্ত বাড়ির কাছে। আমার সঙ্গে তুমি যাবে, বিনতা?

বিনতার কয়েক হাতের মধ্যে আসতেই বিশ্রী পচা ভ্যাপসা গন্ধটা চিরদীপের নাকে এসে যেন ধাক্কা মারল। একটা হিমেল বাতাস ওকে জড়িয়ে ধরল পাকে-পাকে। দূরের জঙ্গল থেকে ভেসে এল শেয়ালের চিৎকার। শুরু হল গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ক্রমে সেটা তীব্রতায় বাড়তে লাগল। যেন কোনও অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ হাপরের মতো হাঁফাচ্ছে।

চিরদীপ আরও কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল বিনতার ফিসফিস স্বর, তোমার আর ফেরার পথ নেই...এসো এসো চলে এসো...।

সাদা শাড়ির আড়াল থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল বিনতা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার চিরদীপের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। যেন নরকবাসী কোনও প্রেতাত্মার উন্নাসী আর্তনাদ।

মোহাবিষ্টের মতো আরও কাছে এগিয়ে গেল চিরদীপ। বিনতার হাত ওর হাত চেপে ধরল। প্রচণ্ডতায় অমানুষিক সে-বন্ধন। কোথা থেকে এই আসুরিক শক্তি পেল বিনতা? পরক্ষণেই বিনতার হাতের ওপর চোখ পড়ল চিরদীপের। অসংখ্য ভাঁজ পড়া সবুজ ছত্রাকে আক্রান্ত একটা শীর্ণ জীর্ণ হাত। শ্যাওলা পচা আঁশটে গন্ধটা চিরদীপের সমস্ত চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল। ওর ঠোঁট চিরে শেষ শব্দটুকু বেরিয়ে এল, বিনতা!

উত্তরে একটা কর্কশ পুরুষালী স্বর হেসে উঠল, বলল, আর কাউকে আমার প্রয়োজন নেই...কাউকে আমি চাই না...।

শীতল বাতাস ক্রমে শীতলতর হয়ে যেন পৌঁছে যেতে চাইল হিমাঙ্কের শত ডিগ্রি নীচে। সাইক্লোনের দাপটে হঠাৎ দুলে ওঠা ঝাঁকড়া গাছগুলো যেন সমস্বরে হাহাকার করে উঠল...।

কিছুদিন পর কলকাতার খবরের কাগজে প্রখ্যাত অ্যাথলিট চিরদীপ সরকারের সস্ত্রীক নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা প্রকাশ পায়।

সে সস্ত্রীক দীঘার দিকে রওনা হয়েছিল জানা গেলেও তন্নতন্ন অনুসন্ধানে সেখানে তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সরকারি ক্রীড়ামহল আশঙ্কা করছেন যে, আগামী এশিয়ান গেমস্‌-এ ভারতের সোনা পাওয়ার আশা সম্ভবত চিরদীপ সরকারের সঙ্গেই বিলীন হয়ে গেল।

পিশাচ প্রহর । তিন



১ মে

তন্দ্রাকাকিমা মারা গেলে তাঁর মফস্‌সলের বাড়িটা উত্তরাধিকারসূত্রে আমিই পেলাম। আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র আত্মীয়। তাঁর মৃত্যুতে তেমন দুঃখ পাইনি, কারণ তাঁকে আমি প্রায় চিনতামই না। আর বাড়িটা পেয়ে যে আমার খুব একটা আনন্দ হয়েছে, তাও নয়। কারণ বাড়িটা প্রাচীন, কুৎসিত, জীর্ণ এবং অস্বস্তিকর। হয়তো সময়কালে বাড়িটার চেহারা ভালোই ছিল। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তন্দ্রাকাকিমা বহু বছর ধরে বাড়িটায় একাই ছিলেন।

কোনওরকম সংস্কারের চেষ্টা করেননি বাড়িটাকে। তাঁর সামান্য পাগলামির লক্ষণ ছিল, হয়তো সেই কারণেই বাড়িটা ছেড়ে কখনও কোথাও যাননি। বাড়ি ও তন্দ্রাকাকিমা একই সঙ্গে কালের প্রকোপে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে শুরু করলেন। কখনও কখনও তাঁকে দেখা যেত বাইরের উঠোনে ইজিচেয়ারে বসে আছেন, হাসছেন আপনমনে, অথবা শোনা যেত তাঁর একটানা করুণ বিলাপ। সে-বিলাপের সুর অদ্ভুত—তার কোনও তুলনা নেই। তিনি সত্যিই পাগল ছিলেন কিনা কেউ জানত না, জানার চেষ্টাও করত না। তাঁকে দেখেশুনে শান্ত বলেই মনে হত। আর কেউ তাঁকে বিরক্তও করত না। সুতরাং, অবশেষে, তাঁর বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া শরীর একদিন নিষ্প্রাণ হল। তিনি মারা গেলেন। আর বাড়িটার মালিক হলাম আমি।

এক মেঘলা বিকেলে বাড়িটায় গেলাম।

বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার আগে ওটা আমি ঘুরেফিরে দেখব। বলা যায় না, হয়তো এমন কিছু পেয়ে যাব যা আমি ভালোবেসে রাখতে চাই। কিন্তু না, পছন্দ হওয়ার মতো বা কাছে রাখার মতো কিছুই সেখানে পেলাম না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমার অনুসন্ধানের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু বৃষ্টি নামল অঝোরে। গায়ের হালকা সোয়েটারে শীত বাঁধ মানতে চায় না। তাই বৃষ্টি শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু অঝোর বর্ষণের পাগল করা ছন্দের কোনও পরিবর্তন নেই। সুতরাং সময় কাটাতে বাড়ির নোংরা স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলো ঘুরে দেখতে লাগলাম।

একতলায় কৌতূহল জাগিয়ে তোলার মতো কিছুই পেলাম না। দোতলার দিকে উঠতে যাব, নজরে পড়ল সিঁড়ির পাশেই একটা দরজা। অন্যান্য দরজার তুলনায় বেশ মজবুত—তবে প্রাচীনতার সাক্ষর তার প্রতি অঙ্গে। দরজাটা খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ ছিটকে এল নাকে।

ভেতরটা অন্ধকার। তবে স্পষ্ট নজরে পড়ল, কয়েক ধাপ সিঁড়ি দরজার কাছ থেকে নেমে গেছে নীচে। তাহলে কি নীচে কোনও পাতালঘর রয়েছে? যেমনটা থাকত আগেকার দিনের জমিদারবাড়িতে। কিছুটা ভয় ও কিছুটা সেই দুর্গন্ধের কারণে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। নীচের পাতালঘরে আর যাই থাকুক, কোনও দামি জিনিস নেই।

তারপর দোতলায় উঠে এলাম।

দোতলায় একটিমাত্র ঘরেই কিছু ভাঙাচোরা আসবাবপত্র রয়েছে। অন্যগুলো নিছকই ঘরের কঙ্কাল। বুঝলাম, এই ঘরটাতেই তন্দ্রাকাকিমা থাকতেন। চলে আসছিলাম, কিন্তু কী খেয়াল হল ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলে দেখলাম। তারই একটা ড্রয়ারে বইটা পেলাম।

সময়ের ভারে বইটা স্যাঁতসেঁতে, জীর্ণ। ওটা খুলতেই আশ্চর্য ব্যাপারটা নজরে পড়ল। বাঁধানো হলেও গোটা বইটা হাতে লেখা। অর্থাৎ একটা পাণ্ডুলিপিকে কেউ বইয়ের মতো করে বাঁধিয়ে নিয়েছে। হয়তো তন্দ্রাকাকিমাই। বইয়ের
কোনও-কোনও পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় সেলোটেপ দিয়ে জোড়া। পাতা ওলটাতেই অদ্ভুত খসখস শব্দে বইটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। কিছু কাগজের গুঁড়ো উড়ে পড়ল মেঝেতে। পাতাগুলোয় অসংখ্য ভাঁজ ও নোংরা থাকা সত্ত্বেও লেখা এখনও পড়া যায়। ছোট-ছোট পরিষ্কার অক্ষরে কোনও পুরুষালি হাতে সযত্নে লেখা। জিনিসটা মনে হল, ডায়েরি অথবা দিনলিপি গোছের। প্রথম দু-একটা লাইন পড়লাম।

বইটা আবার ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে আরও একটা লাইন চোখে পড়ল। তখন মাঝে-মাঝে পাতা উলটে কিছু কিছু জায়গা পড়ে দেখলাম। তারপর বইটা বন্ধ করে নিয়ে এলাম নীচের ঘরে। বাইরের ঘরে জানলার পাশে একটা সাবেকী আমলের চেয়ার নিয়ে বসলাম। আলো অত্যন্ত ঝাপসা, পৃষ্ঠাগুলোও ভঙ্গুর, কিন্তু তবুও সেই বিস্ময়কর দিনলিপি পড়তে শুরু করলাম। একটুও না থেমে, এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে পড়ে চললাম...চেয়ারে আমি যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে বসে আছি। আমার শিরদাঁড়া অচল, অনড়। আর আমার মাংস যেন কোনও ঠান্ডা তরল, শিরদাঁড়াকে ঘিরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বয়ে চলেছে। আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু আমার দু-চোখ বইয়ের পাতায় স্থির। আলো জ্বালতে গিয়ে দেখি লোডশেডিং। অগত্যা খুঁজেপেতে একটা আধজ্বলা মোমবাতি নিয়ে এলাম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে সেটা জ্বাললাম। বসিয়ে দিলাম জানলার তাকে। আলোর সমস্যা আংশিক দূর হল। জানলার কাচে বৃষ্টির ছাঁটের অবিরাম বিলাপ, আকাশ মেঘে-মেঘে অন্ধকার। বাইরের খোলা উঠোনে এলোমেলো ঝোড়ো বাতাসে ঝরাপাতা উড়ে যায়। এরকম বই পড়ার উপযুক্ত পরিবেশই বটে! বইয়ের শুরু মে মাসের চার তারিখের রোজনামচা দিয়ে...

৪ মে

ওঃ ভগবান! কাল কী ভয়ঙ্করই না একটা রাত গেছে।

এতদিনের মধ্যে গতরাতেই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা গেছে। অন্যান্য দিনের কথা স্পষ্ট মনে থাকলে ভালো হত। এখন মনে হচ্ছে, এই ডায়েরি আমার আরও আগে থেকে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু নিজের স্বরূপ যে-বইয়ের প্রধান বিষয়, সে-বই লিখতে শুরু করাটা এক প্রচণ্ড দুঃসাহসের কাজ। তাই আরও আগে এ সাহস হয়নি। সে যাই হোক, গত রাতের মতো খারাপ অবস্থা যে অন্য কোনও রাতে হয়নি, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। হয়তো সেই কারণেই মনে হচ্ছে, আজই এ-ডায়েরি শুরু করা দরকার। আমার মনের বিভিন্ন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের জন্যেও এর প্রয়োজন আছে। এখন শুধু ভাবছি, সামনের মাসে পাতালঘরে নেমে যেতে নিজেকে জোর করে রাজি করাতে পারব তো?

কিন্তু রাজি আমাকে হতেই হবে। তাতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং অ-রাজি হওয়ার সপক্ষে কোনওরকম যুক্তি-তর্ক খাড়া করতে আমি কখনও চেষ্টাও করব না। কোনওরকম অজুহাত চলবে না। বরং সামনের মাসে আরও আগে আমি পাতালঘরে নেমে যাব। বেশি দেরি করাটা কখনওই ঠিক হবে না। কে জানে কোত্থেকে কী বিপদ ঘটে বসে। হয়তো আমি নিজেকে সামলাতে পারব, কিন্তু তবুও...গত রাতে পাতালঘরে যেতে বোধহয় একটু দেরি করেছি। দেরি করতে চাইনি, কিন্তু কী করে বুঝব? যখন টের পাই যে ওটা হতে চলেছে, তখন আমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ি আর প্রাথমিক লক্ষণগুলো ধরবার চেষ্টা করি। কিন্তু সবসময়ে ঠিক স্পষ্ট করে ধরতে পারি না। অদ্ভুত এক অস্বস্তি-আশঙ্কার মধ্যে পরিবর্তনটা শুরু হয়, এবং যখন আমি বেশি ভয় পেয়ে যাই তখন ভালোমতো বুঝে ওঠার আগেই ওটার সূত্রপাত হয়। আমার ভীষণ ভয় করে। ভবিষ্যতে আমাকে আরও সাবধান হতে হবে।

এখন আমি আমার ঘরে বসে আছি। সমস্ত খুঁটিনাটি মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। যদি সঠিক তথ্যই না লিখতে পারি তাহলে এই ডায়েরির প্রয়োজন কী? তখন আমার বা অন্য কারও কাছে এর কোনও দামই থাকবে না। জানি না, অন্য কাউকে কখনও এটা দেখাব কিনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সে-সিদ্ধান্ত নেওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। কারণ, যদি কাউকে এটা দেখাই, তাহলে সেইসঙ্গে আমাকে যথাযথ প্রমাণও হাজির করতে হবে। সেটাই তো আমার সমস্ত আশঙ্কার কারণ। আমি চাই না, কেউ আমাকে পাগল ভাবুক।

গত রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আমার স্ত্রী একটু অস্থির হয়ে পড়ে। আমরা বাইরের ঘরে বসে ছিলাম। ও মাঝে-মাঝে টেবিল-ঘড়ির দিকে দেখছিল, আর আড়চোখে আমাকে লক্ষ করছিল। মাথা না ঘুরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে ওর এই লক্ষ করাটা আমার মোটেও ভালো লাগেনি। অবশ্য ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আর আমিও সেটা না দেখার ভান করে বসে রইলাম। পাতালঘরে যাওয়ার কথা শুনলেই আমার ভীষণ ভয় করে। সেইজন্যেই যতক্ষণ পারি ওটাকে ভুলে থাকতে চাই। রাত তখনও খুব বেশি হয়নি। কিন্তু বাইরের আকাশ স্পষ্ট নক্ষত্রময়। জানলার পাশেই আমি বসে ছিলাম, যাতে সময় হলেই বুঝতে পারি। খবরের কাগজে মগ্ন থাকার ভান করে বসে থাকলেও আমার মন অত্যন্ত অস্থির। অস্থির মন নিয়ে পড়া যায় না। খবরের কাগজের সমস্ত খবর আমার কাছে এক ঝাপসা আস্তরণ। না, এটা সেই প্রতীক্ষিত লক্ষণ নয়—অন্তত আমার তাই ধারণা। ঘরের সবক'টা আলোই জ্বলছে। সুতরাং সতর্কভাবে তন্দ্রার চোখ এড়িয়ে মাঝে-মাঝে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম। ওর দুশ্চিন্তার বোঝা আমি আর বাড়াতে চাই না। বেচারা তন্দ্রা। কিন্তু ওর চোখে ত্রাসের ইশারা আমার শরীরে এক অদ্ভুত আনন্দ জাগিয়ে তুলল। যেন সুখ-ভালোবাসার চরম তৃপ্তির আনন্দ। ঠিক জানি না। হয়তো আমার অসুখের এটাই প্রাথমিক লক্ষণ, অথবা কোনও পুরুষের সুস্থ- স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। বলতে পারছি না, কারণ আমি অন্যান্য মানুষের মতো নই। কিন্তু তবুও সেই অনুভূতি চিনতে পারামাত্রই নিজের ওপরে আমার ঘৃণা হল। সুতরাং বুঝলাম, পরিবর্তনটা তখনও সত্যি-সত্যি শুরু হয়নি।

তখন সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগে, তা হল পরিবেশের তফাত। আরামের প্রলেপ মাখানো বাইরের ঘর, উজ্জ্বল আলো, শৌখিন নরম চেয়ার-এর মাঝে আমি বসে আছি, অথচ একই সঙ্গে জানি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই পরিবেশের কী অমানুষিক পরিবর্তনই না ঘটে যাবে...মনে পড়লে আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে। বেশিরভাগ সময় সাধারণ জীবনযাপন করে এবং কোনও-কোনও সময় সাধারণ জীবনযাপনের ভান করার চেষ্টায় পরিবর্তনটাকে আমার আরও বেশি ঘেন্না করে। নিজের ওপর বিতৃষ্ণা আসে, রাগ হয়—যদিও জানি, এটা একটা রোগ। এতে আমার কোনও দোষ নেই। এর জন্যে কাকে দোষ দেব? হয়তো আমার কোনও পূর্বপুরুষই এই অদ্ভুত রোগের জন্যে দায়ী, জানি না। তবে হলফ করে বলতে পারি, এতে আমার কোনও হাত নেই। তা যদি থাকত, তাহলে আমি কবে আত্মহত্যা করতাম। তাতে কোনও সন্দেহ নেই...।

দেওয়ালে টাঙানো সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার দিকে অবিরাম চোরা-চাউনিতে দেখতে লাগলাম—যদি কোনও পরিবর্তনের লক্ষণ নজরে পড়ে। অবশ্য জানি, এত তাড়াতাড়ি কোনও চিহ্ন নজরে পড়বে না। কিন্তু তাড়াতাড়ি নজরে পড়াই ভালো, নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। প্রথমদিকটায় আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারলেও তন্দ্রা সে ভয়াবহ দৃশ্য সইতে পারবে না। আমি নিজে হলেও হয়তো সইতে পারতাম না। যদি সত্যিই চেয়ে থাকি ওই সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়নার দিকে, এবং নিজেকে দেখি, তাহলে...।

এই কারণেই পাতালঘরে কোনও আয়না নেই।

ন'টার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরের আকাশ এখন আরও পরিষ্কার, আরও নক্ষত্রময়। জানলায় লেসের কাজ করা পরদা—তন্দ্রার হাতের কাজ। ও চকিতে আমার দিকে তাকাল, পরক্ষণেই চোখ সরিয়ে নিল। অতি সন্তর্পণে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ারে রাখলাম। এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শান্ত।

'সময় হয়ে গেছে—' আস্তে-আস্তে বললাম।

'হুঁ—' ছোট্ট করে উত্তর দিল তন্দ্রা, স্বস্তির ভাবটাকে বেশ কষ্ট করেই ও গোপন রাখল।

আমরা বাইরের ঘর ছেড়ে পাতালঘরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। তন্দৰাই প্রথম নেমে গেল নীচে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে সিঁড়ির ধাপ সোজা নেমে গেছে। তার ডানদিকে নোনাধরা দেওয়াল, আর বাঁদিকে একটা রেলিং।

আমাদের বাড়িটা পুরোনো। ওপরতলাগুলো জোড়াতালি দিয়ে পরিষ্কার রাখলেও পাতালঘর ও তার সিঁড়ি সেই একই রকম আছে—প্রাচীন ও ছমছমে। যখন সুস্থ থাকি তখন চেষ্টা করেও নীচে যেতে পারি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কারণ সহজেই বোঝা যায়। আর, ইচ্ছে করেই পাতালঘর ও তার চারপাশকে এরকম কুৎসিত রাখা হয়েছে—তাই রাখা উচিত। এতে এই পরিবেশের সঙ্গে আমার অদ্ভুত রোগটা তবু খাপ খেয়ে যায়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ তার প্রতিধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক বিচিত্র ফাঁপা শব্দের জন্ম দিল। নীচের বদ্ধ মৃত হাওয়া সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল আমাদের কাছে। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। নোনাধরা দেওয়ালে এক হাত দিয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করলাম। সিঁড়ির ধাপে পা পিছলে গেল। অন্য হাত দিয়ে আচমকা আঁকড়ে ধরলাম সিঁড়ির রেলিং। মোটামুটি সামলে নিলেও আমার পা এক ধাপ ছাড়িয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল পরের ধাপে। শব্দ শুনে আমার স্ত্রী ঘুরে তাকাল। ওর মুখের অভিব্যক্তি এককথায় অপার্থিব। দু-চোখ সাদা এবং বিস্ফারিত। মুখ হাঁ করা। এক সুদীর্ঘ মুহূর্ত ওর অভিব্যক্তির কোনও পরিবর্তন হল না। কারও মুখে এর চেয়ে বেশি আতঙ্ক ও ত্রাসের উলঙ্গ ছাপ আমি কখনও দেখিনি। অন্তত অকারণে তো নয়ই। আর ওর ভয় পাওয়ারও কোনও কারণ নেই। ওর অন্তত জানা উচিত যে, আমি কখনও ওর কোনও ক্ষতি করব না। তবুও, ভয় পাওয়ার জন্যে ওকে আমি দোষ দিই না। কিন্তু ওই আতঙ্কের ছাপ আমাকে কষ্ট দিল। যাকে আমি ভালোবাসি, সেও যে আমাকে দেখে এতখানি ভয় পেতে পারে সে-কথা ভেবে নিজের ওপরেই ঘৃণা হল। আর ততক্ষণে সেই অভিব্যক্তি মিলিয়ে গিয়ে তন্দ্রা হাসল, ঠোঁট কামড়ানো ছোট্ট হাসি। হয়তো মনের ভয়কে মুখে প্রকাশ করায় ও লজ্জা পেল। আমিও হাসলাম। এবং তখনই বুঝলাম, আজ অনেক দেরি করে ফেলেছি। আমার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে, আর দাঁতগুলো যে অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। জানি, নিজেকে সামলে রাখার ক্ষমতা ক্রমশ আমি হারিয়ে ফেলছি।

সিঁড়ির শেষেই কোণ ঘেঁষে সেই পাতালঘর। ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। নিজেই খুললাম পাতালঘরের দরজা। ও একটু পিছিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকে ওর দিকে তাকালাম। আবার হাসলাম। ওর মুখ পাণ্ডুর, যেন অন্ধকার পাতালঘরের পরিবেশে সাদা আলোর ছোঁয়া পেয়ে উদ্ভাসিত ও সামনে এগিয়ে এল। ওর মুখটা যেন হাওয়ায় ভেসে চলে এল। ওর গলার শুভ্রতা তুলনাহীন। সেই গলায় নীল শিরার আঁকাবাঁকা রেখা স্পষ্ট নজরে পড়ল আমার। শিরার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। দরজা বন্ধ করার সময়ে একটা কষ্টকৃত অনিচ্ছায় ভরা দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুলল ও। হয়তো সত্যিই কোনও দুঃখ ওর হচ্ছে। তারপর দরজা বন্ধ হল। শুনতে পেলাম তালা দেওয়ার শব্দ। দরজায় কান পেতে আরও শুনতে চেষ্টা করলাম। কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। জানি, ও বাইরে অপেক্ষা করছে। কল্পনায় দেখলাম, ও দাঁড়িয়ে আছে, অপলকে চেয়ে আছে, খিল দেওয়া দরজার দিকে, ওর উজ্জ্বল মুখে স্বস্তি ও দুঃখের অদ্ভুত মিশ্র অভিব্যক্তি। আর তারপরই শুনতে পেলাম ওর হালকা পায়ের শব্দ। ও সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। অবশেষে কানে এল ওপরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। আমাদের দুজনের কথা ভেবেই দুঃখ পেলাম।

ঘরের এক কোণে বসে দু-হাতে মুখ ঢাকলাম। মুখটা এখনও আমার নিজেরই। তবে ভীষণ খসখসে ও শক্ত লাগছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আর বেশি দেরি নেই। প্রত্যেক মাসে পরিবর্তনটা ক্রমশ তাড়াতাড়ি এবং সহজে হচ্ছে। আগের মতো আর যন্ত্রণা হয় না। জানি না, এ-লক্ষণ ভালো না খারাপ। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে রাখা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হবে। যেমন কষ্ট হয় আমার পাতালঘরে যেতে। কী যন্ত্রণা সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই কথা ভেবে।

ভোরবেলা আমার স্ত্রী যখন দরজায় টোকা মারল তখনও নিজেকে ভীষণ দুর্বল লাগছিল। কিন্তু এমনিতে আমি ঠিক আছি। এর মধ্যেই সকাল হয়ে গেছে দেখে অবাক লাগছে। পাতালঘরে সময় ঠাহর করা যায় না। আমিও ঘড়ি নিয়ে যাই না।

প্রথমবারে আমার সাড়া পায়নি তন্দ্রা। তাই দরজা খোলার আগে দ্বিতীয়বার শব্দ করল। দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি মারল ও। দেখলাম, দরজার ফাঁকে ওর কৌতূহলী আয়ত চোখ। যখন দেখল সব ঠিক আছে, তখন দরজাটা হাট করে খুলে দিল। ওর সাবধানতা দেখে আশ্বস্ত হলেও কোথায় যেন একটা দুঃখের কাঁটা খচখচ করছে। এই হতচ্ছাড়া অসুখ নিয়ে আর পারি না।

ও একবারও জিগ্যেস করল না আমি কেমন ছিলাম। ও জানে, সে নিয়ে কোনও কথা আমি বলতে পারি না। সত্যি, ওর কি জানতে কৌতূহল হয় না? নিশ্চয়ই হয়। ও জানে না যে আমি এই ডায়েরি রাখছি। এটা আমার পড়ার ঘরের ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রাখব। এখন টেবিলে বসে আছি, জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরের গাছপালার দিকে।

সবকিছু আজ শান্ত, অথচ গতকাল রাতটা এক দুঃস্বপ্নের রাত গেছে। আজকের স্মৃতির চেয়েও ভয়ঙ্কর। যদি সত্যিই ওটা দুঃস্বপ্ন হত! আশ্চর্য, আমি যখন আবার 'আমি'তে ফিরে আসি তখন সমস্ত স্মৃতি কেমন অদ্ভুতভাবে একই সঙ্গে ফিরে আসে। এ নিয়ে ভেবেচিন্তে পরে কিছু লেখার চেষ্টা করব। কেন করব জানি না। কেনই বা এই ডায়েরি লিখতে ইচ্ছা করে, তাও জানি না। হয়তো এটাই মনের সমস্ত ভাব প্রকাশের একটা পথ। যাই হোক, এখন বেশ আরাম লাগছে। ভাবছি, একটু বিশ্রাম করব। ওই জিনিসটা নিজেকে যেসব আঘাত করেছে, আমার শরীরে সেইসব আঘাতের দাগ ও যন্ত্রণা। শরীর আমাদের একটাই। ফলে ভীষণ শ্রান্ত লাগছে। পরে আবার লিখব।

৬ মে

অসুখটার কথা ভাবছিলাম। কাল সারাটা দিন ওটার কথাই ভেবেছি। এভাবে ভাবতে বেশ অসুবিধে ও কষ্ট হয়। আমি যখন...'আমি' থাকি না...তখন কোনও চিন্তাও আমার মনে থাকে না। যদিও বা থাকে, পরে সুস্থ হওয়ার পর সেগুলো আর মনে পড়ে না। বোধহয় সেই সময়টা আমার মন অনেকটা পশুর মতো কাজ করে। তখন আমার কীরকম লাগছিল সেই সম্পর্কে শুধু একটা অস্পষ্ট মোটামুটি স্মৃতি থেকে যায়। মানে, তখন ওটার কীরকম লাগছিল। জানি না, আমি আর ওই প্রাণীটা একই কিনা, তবে আমরা একই শরীরে ভাগাভাগি করে থাকি।

যাই হোক, পরিবর্তনের পর আমার মনে যুক্তি বা কারণের কোনও জায়গা থাকে না। ওই প্রাণীটা নেহাতই খেয়ালখুশি মতো কাজ করে। যে-খেয়ালখুশি মানুষের মস্তিষ্কের ছকে ঠিক খাপ খায় না। না কি আমার মস্তিষ্কই তখন পালটে যায়? তবে স্মৃতির কিছু-কিছু অংশ খুব জোরালো ছাপ রেখে যায়। কতকগুলো প্রায় স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু সেগুলো নিছকই ওটার ভাবনা সম্পর্কে। ওটা কী করছিল বা কেমন দেখতে, তার স্মৃতি ফিরে আসে না। অনেকটা যেন পরিবেশ ও ঘটনাকে ভুলে গিয়ে শুধু মনের অনুভূতিকে মনে করতে চেষ্টা করা। কিন্তু কী সাজ্ঘাতিক জোরালো সেই অনুভূতি! সে-অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এতই জটিল।

মনে হয়, ওই প্রাণীটার বেশিরভাগ অনুভূতিই প্রয়োজন থেকে জন্ম নেয়। প্রয়োজন ও ক্ষুব্ধ হতাশা। কিন্তু সঙ্গে মেশানো থাকে ভয়ানক হিংস্রতা, ঘৃণা ও লিপ্সা। কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের মনে কখনও এই মিশ্র অনুভূতি ঠিক এভাবে জন্ম নেয় না। হয়তো বিচারবুদ্ধির বাঁধন না থাকলে খেয়ালখুশিতে যে-আবেগ তৈরি হয়, তার চরিত্র এরকমই তীব্র। অন্তর মথিত করে সেটা উঠে আসে, সত্যিকারের দৈহিক কার্যকলাপের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকে না। অদ্ভুত জিনিসটার ভেতরে সেটা নরকের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। সেইজন্যেই ওটা বন্য হিংসায় পাগল হয়ে ওঠে। তখন ওটার মনে ওই মিশ্র অনুভূতিই কাজ করে।

পাতালঘরে সত্যি-সত্যি যা ঘটে, তা হল...সমস্ত আবেগ, স্মৃতিকে পাশে সরিয়ে, আমি শুধু ঘটনার বিচারে দেখতে চেষ্টা করছি। যেন আমি এক তৃতীয় ব্যক্তি, পাতালঘরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। (ঈশ্বর না করুন, কারও যেন সে-দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য না হয়। তাহলে নিশ্চয়ই সে পাগল হয়ে যাবে...অবশ্য জানি না, পাতালঘরে ওই অদ্ভুত জিনিসটার সঙ্গে একসঙ্গে বন্দি থাকলে পাগল হওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যাবে কিনা। সেটুকু সময় আমার দ্বিতীয় স্বরূপ কি দেবে?)

পাতালঘরের দৃশ্যটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ওটা ঝাঁপিয়ে পড়ে গদি আঁটা দেওয়ালে, বাঁকানো নখে ও ভয়ঙ্কর শ্বদন্তে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয় দেওয়ালের গদি। ওটা ছিটকে পড়ে মেঝেতে, ঘাপটি মেরে বসে থাকে এক মুহূর্ত, দাঁত খিঁচিয়ে অদ্ভুত গর্জন করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে দেওয়ালে। এক সর্বনাশা রাগ ওটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বারবার ছুটে যায় পাগল করা আবেগে। ওটা মাঝে মাঝে থামে শুধু ভেতরের রাগকে নতুন করে আরও তীব্র করার জন্যে, তারপর আগের চেয়েও হিংস্রভাবে উন্মত্ত আক্রোশে লাফিয়ে পড়ে। অবশেষে একসময় ওটা হাঁফিয়ে পড়ে, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে শ্রান্ত হয়ে বসে থাকে প্রতীক্ষায়। গত রাতে ওটা দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাতালঘরের দরজা অনেক ভারী, অনেক শক্ত।

জানি না, ওটা দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় যে শব্দ হয়, সেগুলো তন্দ্রা শুনতে পায় কিনা। তার চেয়ে খারাপ, অনেক খারাপ ওটার হিংস্র ঠোঁট চিরে বেরিয়ে আসা বিকৃত গর্জন। সেগুলোও কি তন্দ্রা শুনতে পায়? সে বড় বীভৎস হবে। ওই শব্দের নৃশংসতায় মানুষের বুক কেঁপে উঠবে।

গত রাতে, খাওয়ার সময়, তন্দ্রাকে অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। ও নিজে হাতে মাংস রেঁধে দিয়েছিল। ও জানে, মাংস আমি ভালোবাসি। কিন্তু ও এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল যেন এক্ষুনি কোনও বন্য পশুর মতো আমি মাংসের টুকরোগুলো ছিঁড়ে খেতে শুরু করব। হয়তো পাতালঘরের শব্দগুলো ও শুনতে পায়...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে-দৃশ্য ও দেখতে পায় না। এমনিতেই সহজ হয়ে উঠতে ওর তিন-চারদিন লেগে যায়...তারপর ধীরে-ধীরে ও সুস্থ হয়ে ওঠে।

অবশ্য আমিও এখন পুরোপুরি সুস্থ।

৭ মে

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

হঠাৎই মনে পড়ল, এই কথাটা আমার বলা হয়নি। এটা জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, তাই জানিয়ে রাখলাম। যদি কখনও কেউ এ-লেখা পড়ে, তাহলে তাদের জানা উচিত, আমি পাগল নই। আমার অসুখটা মনের অসুখ নয়, দেহের অসুখ। এ রোগ পুরোপুরি শারীরিক। নিশ্চয়ই তাই, নইলে সে-সময় শুধুমাত্র শারীরিক পরিবর্তন হবে কেন?

পরিবর্তনের কথা আমি এখনও লিখিনি। সেটা লেখা খুব কঠিন। কিন্তু শরীরের কিছু-কিছু অংশ আমি দেখতে পাই। হাত, পা, বুক—কিন্তু মুখটা দেখতে পাই না। কারণ সেখানে কোনও আয়না নেই। মুখটা কেবল স্পর্শে অনুভব করতে পারি। জানি না, পরিবর্তনের পর আমার মুখের যা চেহারা হয়, সে-স্মৃতি মনে থাকলে আমি তা সহ্য করতে পারতাম কিনা। এও জানি না, সে-মুখের নিখুঁত বর্ণনা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত কিনা। দেখি, একদিন রাতে এই ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে পাতালঘরে যাব, তারপর যতক্ষণ পারি লিখব—যেমন-যেমন পরিবর্তন হবে সেগুলোর বর্ণনা তেমন-তেমন দেওয়ার চেষ্টা করব। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সুস্থ মন সেই পরিবর্তনের সঙ্গে যুঝে স্থির থাকতে পারবে...যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 'আমি' থাকব।

যে-প্রশ্নটা সর্বক্ষণ আমার মাথায় ঘোরে সেটা হল অন্য কোনও মানুষ কখনও এ রোগে ভুগেছে কি না। যদি জানতে পারতাম আমি একাই এই অসুখের শিকার নই, তাহলে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পেতাম। এটা ঠিক সমব্যথী খুঁজে পাওয়ার স্বস্তি নয়; এতে আমি অন্তত এটুকু আশ্বাস পেতাম, এ-রোগ থাকাটা কোনও অস্বাভাবিক-অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমি যে এ-অসুখে ভুগছি, তার দোষ আমার নয়। এ-অবস্থাতেও আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, যদি জানতাম, এ রোগের কোনও ওষুধ নেই, এ-রোগ যার হওয়ার তার হবেই, কারও কারও ক্ষেত্রে এ-রোগ অনিবার্য।

আমার মতো অসুস্থ কোনও মানুষের ঘটনা খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা আমি করেছি। লাইব্রেরিতে গিয়ে এ নিয়ে গবেষণা করেছি...শেষদিকে লাইব্রেরিয়ান মহিলাটিও হয়তো আমাকে সন্দেহ করত। ভদ্রমহিলা মধ্যবয়েসী, অদ্ভুত রকমের মোটা, আর সাজগোজও উগ্র। হয়তো এ ধরনের চাকরিতে এ ধরনের সাজগোজই কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন। এ ছাড়া, তার মুখে আছে এক অদ্ভুত উপোসী ভাব। তার ধারণা, যে-জিনিস নিয়ে আমি গবেষণা করি, অর্থাৎ লাইক্যানথ্রপি, সেটা মথ ও প্রজাপতির পর্যবেক্ষণবিজ্ঞান। শত গবেষণাতেও কোনও ফল আমি পাইনি। প্রাচীন সব মোটা মোটা বই, চামড়ায় বাঁধানো বিভিন্ন মনস্তত্ত্বের বই ইত্যাদিতে একদিকে যেমন সব উপকথা কিংবদন্তির উল্লেখ আছে, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে বিকৃত মানসিকতার কথা। এ-ধরনের অসুখের অনেকগুলো ঘটনারই উল্লেখ সেসব বইয়ে রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রোগী মানসিক দিক থেকেও অসুস্থ ছিল। সত্যিকারের কোনও দৈহিক পরিবর্তন তার হত না। শুধু মাঝে মাঝে সেই উন্মাদ রোগীর মনে হত, তার শরীরে একটা পরিবর্তন আসছে...কিন্তু কিংবদন্তিরও তো একটা ভিত্তি থাকতে হবে। প্রত্যেক কিংবদন্তিরই কিছু না কিছু সত্যের ভিত্তি আছে। এই ধারণা আর বিশ্বাসকেই আমি ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরি। কিছু একটা আমাকে যে আঁকড়ে ধরতেই হবে।

শুনেছি, আমার ঠাকুর্দার প্রপিতামহ নাকি অভিযাত্রী ছিলেন এবং কোন একটা অভিযানে গিয়ে এক বল্‌কান মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। ট্রানসিলভ্যানিয়ার আল্পস-এর পার্বত্য অঞ্চলে বহুদিন ছিলেন তিনি। জানি না, এর মধ্যে আমার অসুখের কার্যকারণের গোপন বীজ লুকিয়ে আছে কিনা। কিন্তু এ-জাতীয় বেশিরভাগ কিংবদন্তিরই জন্ম ওই ট্রানসিলভ্যানিয়া অঞ্চলে। জায়গাটা নিশ্চয়ই এ-রোগের এক বিশাল ঘাঁটি। আর, এও আমার মনে হয়, রোগটা বংশগত। অন্য কারও থেকে এ-রোগ আমার শরীরে সংক্রামিত হয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। বরাবরই আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি। সব জিনিসেই আমার সংযম রয়েছে। আমি মদ-সিগারেট খাই না, নারী সংসর্গ করাটাও আমার নেশা নয়, স্বাস্থ্যও আমার বরাবরই ভালো। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ-রোগ আমার শরীরে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমার পূর্বপুরুষের পাপ আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। একজনের অপরাধে শাস্তি পেতে হচ্ছে একজন নিরপরাধকে, আমাকে।

আমার অসুখটা নিশ্চয়ই রক্তে অথবা শরীরের কোষে মিশে আছে। আমার ধারণা, বংশপরম্পরায় ওটা রক্তে বয়ে চলে। কিন্তু থাকে সুপ্ত অবস্থায়, অপেক্ষা করে, প্রচ্ছন্নভাবে ঘাপটি মেরে বসে থাকে পুরুষ থেকে পুরুষে। অবশেষে একদিন...হয়তো একশো বছর পর-পর...কিংবা হাজার বছর পর-পর...অসুখটা জেগে ওঠে। ঘুম ভেঙে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তারপর, যত দিন যায়, ওটা হয়ে ওঠে আরও ভয়ঙ্কর, আরও তীব্র। যার এই অসুখ, সে যত বড় হতে থাকে ততই শক্তিশালী হয়ে ওঠে অসুখটা। শরীর থেকে ক্রমশ শক্তি শুষে নিয়ে পৈশাচিক রূপ নেয়, এবং মেতে ওঠে ধ্বংসের তাণ্ডবে...।

এই আমার বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস না করে আমার উপায় নেই।

এই অসুখের জন্যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনওরকমেই আমি দায়ী নই। এ আমার জীবনে এক অভিশাপ —জন্মগত অভিশাপ। এই অভিশাপের বীজ কবে রোপিত হয়েছে? যেদিন আমার সেই পূর্বপুরুষ এক ভয়ঙ্কর নোংরা খেলায় মেতে উঠে এই রোগের বীজাণুকে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেদিন? এই কারণেই

পূর্বপুরুষদের আমি ঘৃণা করি। এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে, এ-পাপ তাদের, আমার নয়। যদি আমার কোনও কাজ এ-রোগের জন্যে দায়ী হত তাহলে আমি হয়তো দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যেতাম। আমার মন পঙ্গু হয়ে যেত। এজন্যে আমার ভয় হয়। এ-ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। যে-রোগে আমি ভুগছি, সে রোগ যে-কোনও লোককে পাগল করে দিতে পারে...।

২ জুন

গত সপ্তাহে সত্যি-সত্যি একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু সে-প্রশ্ন কখনওই ওঠে না। প্রথম থেকেই অবশ্য সেটা জানি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-চিন্তা যে-আমার মনে এসেছে, তাতেই বোঝা যায় আমি কতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছি। এখন আমি খড়কুটো আঁকড়ে ধরতেও প্রস্তুত—প্রস্তুত নিজেকে বাঁচানোর সামান্য সুযোগের জন্যে যে-কোনও ঝুঁকি নিতে। এটুকু জানি, সুস্থ আমাকে হতেই হবে—আর সে-সুস্থতা আসবে ভেতর থেকে—আমার শরীরের গভীর থেকে।

ডাক্তারের কাছে যাওয়ার বুদ্ধিটা তন্দ্রাই আমার মাথায় ঢুকিয়েছে। অবশ্য খুব কায়দা করে, পরোক্ষভাবে। মনস্তত্ত্ববিদ সম্পর্কে কী একটা কথা যেন ও তুলেছিল যে-কাগজে তাঁদের সম্পর্কে কীসব লেখালিখি হচ্ছে—অর্থাৎ, কোনওরকমে 'মনস্তত্ত্ববিদ' শব্দটা বারবার আমার কানে ঢোকানো এবং খোলাখুলি উপদেশ না দিয়ে আমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। ওর মতলব সফলও হয়েছিল, কারণ সত্যিই আমি ডাক্তার দেখানোর কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ ডাক্তারের কথা না বলে ও যে মনস্তত্ত্ববিদের কথা বলেছে, তাতে আমি বেশ আঘাত পেয়েছি। ও আমার মতোই ভালোভাবে জানে, এ রোগটা দেহের—মনের নয়। বহুবারই ওকে সে-কথা বলেছি। কিন্তু ওর কথাতেও যুক্তি আছে। কোনও সাধারণ ডাক্তার আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমাকে পাগল ভাববে এবং শেষ পর্যন্ত সে-ই পাঠাবে কোনও মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। আর, মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারও ব্যর্থ হবেন, কারণ তিনি এমন একটা মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে চাইবেন যার কোনও অস্তিত্বই নেই। আমার কথা তাঁদের বিশ্বাস করানোর একমাত্র পথ আমার পরিবর্তনটা সত্যি-সত্যি দেখতে দেওয়া, আর সে আমি মরে গেলেও পারব না।

সে-কথা চিন্তা করে বহুদিন পর আবার প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলাম। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বারে আমি বসে আছি। সময়টা রাত। সেই বিশেষ রাত। তাঁর নির্দেশমতো আমি গদি আঁটা বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি আমার পাশেই চেয়ারে বসে। একটু আগেই আমার অসুখের খুঁটিনাটি সব তাঁকে বলেছি। তিনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন আর মাঝে-মাঝে মাথা নেড়েছেন। আমার কথা শেষ হলে তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরা মার্জিত মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর মাথায় টাক, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, মুখে পেশাদারি অভিজ্ঞতার ছাপ, পায়ের ওপর পা তুলে তিনি বসে আছেন, হাঁটুর ওপর নোটবই। কথা বলার সময় আমার দিকে তিনি তাকিয়ে নেই, তাঁর চোখ নোটবইয়ের দিকে। আমিও তাঁর দিকে দেখছি না। আমার চোখ জানলায় নিবদ্ধ।

সমস্ত দৃশ্যটা আমার মনে নিখুঁত ছবিতে স্পষ্ট। এমনকী দেওয়ালে আঁটা তাঁর বিদেশি ডিগ্রিসমেত নেমপ্লেটও আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলো সেই নেমপ্লেটে ঠিকরে পড়ছে। বিশাল টেবিল, ভারি ভারি একগাদা বইয়ের সারি। সব দেখে আমার চোখ আবার ফিরে যায় জানলার দিকে। পাতালঘরে থাকার চেয়ে যখন আমি চাঁদ দেখতে পাই তখন পরিবর্তনটা অনেক তাড়াতাড়ি এবং সহজে আসে। বুঝতে পারি, পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ডাক্তারবাবু কথা বলে যান হালকা স্বরে। হয়তো বলছেন, এ-

সবই আমার মনের ভুল, উদ্ভট কল্পনা, এ অসম্ভব, রোগগ্রস্ত দুর্বল মনের চিত্র-প্রলাপ। সে-কথা ভালো করে বোঝাবার জন্যে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। তাকালেন আমার চোখে। আর তাঁর মুখ...তাঁর মুখ দেখেই আমার প্রচণ্ড হাসি পেল...সে-মুখ যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে। সেই শীতল, বিজ্ঞানীর, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে অতীতের অতলে, হয়ে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক, কুসংস্কারে বিশ্বাসী এক ভয়ার্ত মুখ। তাঁর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে আসে দুনিয়া কাঁপানো এক ভয়ঙ্কর চিৎকার। আর তারপর...।

জানি না, ব্যাপারটা হয়তো হাসির নয়, কিন্তু তবুও, আবার হাসতে পেরে ভালো লাগছে।

৩ জুন

আজ রাতে আমাকে পাতালঘরে যেতেই হবে।

কারণ অসুখটা হবে বলে ভয় করছে। আমার স্ত্রীও ভয় পাচ্ছে। গত রাতেই ওকে একটু অস্থির ও চিন্তিত দেখেছি। ক্রমশ ওর অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আবারও ও আকারে-ইঙ্গিতে বলেছে, আমার ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া দরকার। সাহায্য! কে আমাকে সাহায্য করবে? কী সাহায্য করবে? ও কিছুতেই বুঝতে চায় না। হয়তো ভয়ঙ্কর চরম সত্যটাকে ও বিশ্বাস করতে চায় না, মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। তার চেয়ে আমি পাগল হলেই ও যেন স্বস্তি পেত। কিন্তু মাঝে-মাঝে নিজের চেয়ে ওর সুস্থতা নিয়ে আমার চিন্তা হয়। আর নিজের কথা ভেবে শুধু ভগবানকে ডাকি যে, অসুখটা যেন আরও খারাপের দিকে না যায়, যেন প্রতি মাসে ওই একটা ভয়ানক রাত নিয়ে আমি স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে পারি...কিন্তু ওই একটা রাতকেই আমি ভয় পাই। ভয় পাই পাতালঘরটাকেও। পরিবর্তনের পরেও আমার মধ্যে কিছু স্মৃতি, কিছু আবেগ থেকে যায়। আমি কষ্ট পাই। আজ, একমাস পরেও, সে-অনুভূতি আমার স্পষ্ট মনে আছে। পশুটার প্রচণ্ড দাপাদাপির সঙ্গে মনে পড়ে যায় বুকের ভেতরে এক তীব্র যন্ত্রণা, অতীতের যন্ত্রণা। মনে পড়ে সেই ছোটবেলায়, এক পূর্ণিমার রাতে একটা শিকারি হাউন্ডকে আমি মেরে ফেলেছিলাম। কুকুরটা আমাকে আক্রমণ করতে আসছিল...সে-কথায় পরে আসব। কিন্তু তখন আজকের এই ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবিনি। বর্তমানকে আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা আমাকে পাগল করে তোলে। যত দিন যাবে, ততই যদি সে ভবিষ্যৎ ক্রমে খারাপের দিকে যেতে থাকে...।

বলা যায় না, হয়তো অসুখটা ভালোও হয়ে যেতে পারে। সেটা একেবারে অসম্ভব নয়। অনেক রোগ নিজে থেকেই সেরে যায়, শরীরে নিজে থেকেই তৈরি হয় প্রতিরোধের ক্ষমতা। শুধু সেই আশাতেই বুক বেঁধে থাকি। ভাবি, কোনও এক মাসে সেই বিশেষ দিনটা পার হয়ে যাবে, অথচ এই অসুখটা আর হবে না। তখন স্পষ্টই বুঝব, আমি সেরে উঠছি।

আমি ছেলেমেয়ে চাই না। সেরে উঠলেও চাই না। এই রোগের পরিসমাপ্তি আমাকে দিয়েই হোক। আমার বংশধরদের মধ্যে এই রোগ আমি ছড়িয়ে দিতে চাই না। তন্দ্রা এতে দুঃখ পেয়েছে! ও যে মা হতে চায়। এটা বুঝতে চায় না, কেন তা অসম্ভব, কী আতঙ্কময় পরিণতি লুকিয়ে রয়েছে সে-ইচ্ছের পেছনে। হয়তো আমি পাগল হলেই ওর পক্ষে ছিল ভালো। কখনও-কখনও মনে হয়, ও হয়তো ভাবে আমার কিছু একটা হয়েছে...হ্যাঁ, সে-কথা আমি অস্বীকার করি না...কিন্তু পাগল তো আমি হইনি। সুতরাং, এই ডায়েরিতে লিখে রাখার জন্যেই এ-কথা উল্লেখ করলাম। জানি না, সবটা আমার মনের ভুলও হতে পারে।

গত এক মাস কিছু লিখিনি। লেখার মতো কিছু ছিল না। রোগটা যত কাছে আসে ততই লিখতে ইচ্ছে করে। সেই কারণে প্রথমে প্রতিদিন লিখব ঠিক করলেও কাজে তা হয়ে উঠছে না। যতক্ষণ পারি সমস্ত আমি ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কই? নইলে, এখনও আমার মনে পড়ে কেন সেই মাতালটার কথা? যার

সঙ্গে এক পূর্ণিমার রাতে একটা নির্জন হোটেলে আমার দেখা হয়েছিল। কেনই বা মনে পড়ে বৃষ্টি ঝরা রাতের সেই আগন্তুকের কথা? আমার অসুখের এক ভয়ঙ্কর রাতে যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। তারপর...। সে-কথায় মনে পড়ে যায়, ওই ভয়ঙ্কর রাত আবার ফিরে আসবে—প্রতি মাসেই ফিরে আসবে। ইচ্ছে আছে, আজ রাতে ডায়েরিটা পাতালঘরে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। যতক্ষণ পারি, যতটুকু পারি, কাগজে-কলমে ধরে রাখার চেষ্টা করব...হয়তো একদিন এই ডায়েরি সত্যিকারের কাজে আসবে। হয়তো লিখতে গিয়ে নিজের ওপর আমার ঘেন্না করবে। কিন্তু চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

যতখানি সম্ভব আমাকে জানতে হবে। হয়তো সেই তথ্য থেকেই পেয়ে যাব এ রোগকে নির্বাসন দেওয়ার কোনও অদ্ভুত পথ।

এখন বিশ্রাম করা দরকার। আজ রাতে অনেক পরিশ্রম হবে, কষ্ট হবে। আজকের দিনটা ভারি চমৎকার। আকাশ পরিষ্কার। জানি, রাতও পরিষ্কার থাকবে। দেখা যাবে গোল রুপোর থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদকে বাইরে রেখে বদ্ধ পাতালঘরে যেতে ভীষণ কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কী...।

৩ জুন, রাত

যাক, দরজা বন্ধ করে খিল দেওয়া হয়ে গেছে। শুনতে পেলাম, তন্দ্রার পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, অবশেষে ওপরের দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল। এখন পাতালঘরে আমি একা। এখনও ঠিকই আছি। আজ রাতে একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে আমার ভয় করছিল। ডায়েরিটা সঙ্গে নিয়ে এসে ভালোই হয়েছে। কিছু একটা কাজ নিয়ে অন্তত মেতে থাকতে পারব। অপেক্ষার সময়টুকু আর ক্লান্তিকর মনে হবে না। চুপচাপ সেই ভয়ঙ্কর পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করা তবু ভালো।

লিখতে-লিখতে হাতের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ রাখছি। লক্ষ রাখছি আঙুলের নখের দিকে। এখনও নখগুলো ঠিকই আছে। এখনও কিছু শুরু হয়নি। আমার আঙুলগুলো লম্বা, সরু। নখ ছোট করে কাটা। খুব সাবধানে আমাকে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে পরিবর্তনের প্রাথমিক লক্ষণগুলো চোখ এড়িয়ে না যায়। সমস্ত কিছুর নিখুঁত বিবরণ ডায়েরিতে আমি লিখে রাখতে চাই।

পাতালঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই। থাকলে তা নেহাতই চুরমার হত। ঘরের এক কোণে উবু হয়ে বসে হাঁটুর ওপর ডায়েরি রেখে লিখছি। পাতাগুলো যেন সামান্য রঙিন মনে হচ্ছে। একটা বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব লাগালে ভালো হত। আলোটা পাতালঘরের ছাদের গায়ে গর্ত করে বসানো, ওপরে জালের ঢাকা দেওয়া। জালটা একটু তোবড়ানো মনে হচ্ছে, কিন্তু সেটা আমারই কীর্তি বলে মনে পড়ছে না। অবশ্য মনে না পড়ারই কথা। পাতালঘরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার পক্ষে আলোটা যথেষ্ট নয়। আগে কখনও এটা খেয়াল করে দেখিনি। অন্যান্য সময় নিজের ভাবনাতেই এত ব্যস্ত থাকি যে, চারপাশের কথা ভুলে যাই। কিন্তু আজ যে অনেক তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি...।

পাতালঘরটা কংক্রিটের তৈরি। দেওয়ালগুলো বেশ পুরু এবং দরজাটায় বড়-বড় লোহার বল্টু লাগানো। ঘরের চার দেওয়ালেই পুরু গদি আঁটা। তন্দ্রা আর আমি মিলেই গদিগুলো লাগিয়েছি। মাটির তলায় ঘর তৈরি করছি কেন, রাজমিস্ত্রিকে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমরা হিমশিম খেয়েছি, তার ওপর দেওয়ালে গদি লাগানো! সুতরাং, সে-কাজটুকু কষ্ট করে নিজেরাই সেরে নিয়েছি। পাতালঘর তৈরির সময় মিস্ত্রিকে বলেছিলাম, ঘরটা আমাদের পোষা কুকুরের জন্যে। সে সন্দেহ করে বহুরকম প্রশ্ন করেছে, আমাদের অদ্ভুত খেয়ালের কথা চিন্তা করে উপদেশও দিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৈরি করে দিয়েছে ঘরটা। আমাদের কোনও কুকুর নেই। কুকুররা আমাকে ঠিক পছন্দ করে না। আমাকে দেখলে ভয় পায়। মনে হয়, আমি সুস্থ থাকার

সময়েও ওরা আমার ওই অদ্ভুত রোগের গন্ধ পায়। আমার রোগটা যে শুধুই দেহগত, এটা তার একটা বড় প্রমাণ। আবার মনে পড়ছে সেই শিকারি হাউন্ডটার কথা।

এই ঘরে একটা অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ রয়েছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয়, গদির নীচে দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। গদির তুলোগুলো ক্রমশ জমাট বেঁধে গেছে। ওগুলো শিগগিরই পালটাতে হবে। ঘরটাকে যতটা সম্ভব আরামের করে তুলতে হবে। জায়গায় জায়গায় গদি ছিঁড়ে গেছে, তুলো ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। গদিটা শক্ত মোলায়েম রেক্সিনে মোড়া। সুতরাং বুঝতে পারছি, আমার...মানে ওটার...নখগুলো খুব শক্তিশালী এবং ধারালো। ওগুলো গদিতে বসে যায় খুব সহজে, যেন মাখনে ছুরি কেটে বসছে। অন্ধ আক্রোশে দেওয়ালে থাবা বসানোর সময় কখনও কি আমার নখ ভেঙে যায়নি? ছেঁড়া জায়গাগুলো ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে। সেটাই হবে পরিবর্তনের জলজ্যান্ত অকাট্য প্রমাণ। পরে তন্নতন্ন করে খুঁজব। হয়তো কিছু না কিছু পেয়ে যাব। ওটা যে ভয়ঙ্কর শক্তিতে প্রচণ্ড ক্রোধে দেওয়ালে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাতে ওই শক্ত বাঁকানো নখও ভেঙে যাবে। আমি জানি। আমার চেয়ে কে আর ভালো জানবে!

ওই নৃশংস বাঁকানো নখগুলো! ওগুলোর কথা মনে পড়লেই আমি শিউরে উঠি। চামড়া টান-টান হয়ে কুঁচকে যাওয়া বাঁকানো আঙুলের ডগায় ওগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। যেভাবে এই শক্ত গদিতে ওগুলো কেটে বসে, ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেয়, তাতে ভাবি, মাংসের মতো কোমল জিনিস পেলে তার কী অবস্থা হবে! কোনও মানুষের নরম গলার কী অবস্থা হবে! এ-কথা ভাবলেও আমার শরীর কেঁপে ওঠে। নরম মাংসের স্পর্শ আমি স্পষ্ট অনুভব করি, আর সে-অনুভূতি আমার মনে ঘৃণার জন্ম দেয়। কিন্তু তবু সে-অনুভূতি থেকে মুক্তি নেই। ওটা আমাকে বারবার নিজের পরিচয় দিতে চায়। স্পষ্ট দেখতে পাই, কীভাবে সেই থাবা আঁকড়ে বসে যায় গলায়, নখের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ফরসা চামড়ায় আঁচড় কেটে এগোয়, অবশেষে চামড়া কেটে গলায় ঢুকে যায় দশ আঙুল, গলার শিরা কাঁপতে থাকে দপদপ করে। বাঁকানো নখগুলো এখন অদৃশ্য, আঙুলের ডগায় রক্তের উষ্ণ স্পর্শ, রক্ত ফিনকি দিয়ে ছিটকে আসে আমার মুখে। টের পাই উষ্ণ নোনতা স্বাদ। রক্তের গন্ধে আমার মাথা ঘুরতে থাকে, সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসে, শুধু পড়ে থাকে একটা আতঙ্কবিকৃত থরথর মুখ। সে মুখের ক্রমশ পরিবর্তন হয়, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, গলার ভেতরে মৃত্যুর ঘড়ঘড় শব্দ হয়, আমার তীক্ষ্ণ শ্ব-দন্ত নেমে আসে...আমি ঝুঁকে পড়ি সেই মুখটার ওপর...নরম ফরসা গলায় আমার শ্ব-দন্ত...বসে যায়...নরম উষ্ণ মাংসে ওরা ডুবে যায়, অদৃশ্য হয়...এক টানে ছিঁড়ে নেয়...গলার নলি...।

৪ জুন

এইমাত্র ডায়েরি মেরামতের কাজ শেষ করলাম। ছেঁড়া জায়গাগুলো সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই গত রাতে পৃষ্ঠাগুলো আমি ছিঁড়েছি—ওই অসুখের সময়। কিছুই আমার মনে নেই। হয়তো ইচ্ছে করে ছিঁড়িনি, ওই অন্ধ রাগের সময় হাতের কাছে যা কিছু থাকে তাই তছনছ হয়ে যায়। ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলো দু-ভাগে বা চারভাগে সমান করে ছেঁড়া নয়, এলোপাতাড়িভাবে ছিঁড়ে তছনছ করা। ওপরের মলাটটা ছিঁড়ে একেবারে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু পৃষ্ঠাগুলো এখনও পড়া যাচ্ছে। পেনটাও শুকনো ডালের মতো ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে। এত শক্তি, এত ক্ষমতা, কল্পনা করা যায় না। আমি বরাবরই শক্তিশালী, নিয়মিত ব্যায়ামও করি। কিন্তু পরিবর্তনের মাধ্যমে যে বন্য শক্তি আমার মধ্যে আসে তা দুঃস্বপ্নের বাইরে। যেন আমার পেশি, তন্ত্রী সবই বদলে যায়। বাইরের মতো ভেতরে-ভেতরেও একটা পরিবর্তন ঘটে। হয়তো শুধুমাত্র একটা শরীরের আমরা শরিক নই, ছোট্ট মস্তিষ্কেও আমরা দুজনেই জায়গা করে নিই। এটা আশার কথা যে, ওটাকে আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা বলে ভাবতে পারছি। অথচ আমার নিজের শরীরেই ওটার আঘাত

ও ক্ষতের চিহ্ন থেকে যায়। একইসঙ্গে দুটো শরীরের অস্তিত্ব কখনওই থাকতে পারে না। ব্যাপারটা বড় গোলমেলে, আমার যুক্তির নাগালের বাইরে—কিন্তু আমি অনেকের চেয়েই বেশি বুদ্ধিমান এবং যুক্তিবাদী। এ-অদ্ভুত রোগের মোকাবিলা করে, তার সঙ্গে নিয়ত লড়াই করে ক'জন মানুষ আমার মতো নিজের সুস্থতা বজায় রাখতে পারত? এজন্যে আমার গর্ব হয়। আমি ব্যর্থ হইনি। নিজের মনের জোর সত্যিই আমার গর্বের কারণ।

পরিবর্তনের কথা আমার লেখা হয়নি। মনে আছে, ওটার শুরু হওয়াটা স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম। তখন আমি নিশ্চয়ই লিখছিলাম, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক ডায়েরিতে সে-কথা লেখা নেই। লেখার শেষ কয়েকটা লাইন জড়ানো, অস্পষ্ট আঁচড় মাত্র। আমার হাতের লেখা বলে চেনা যায় না। মনে হয়, সেটাই পরিবর্তনের একটা লক্ষণ। জিনিসটার হাত দুটোর অমানুষিক শক্তির কথা লিখছিলাম, তখনই হঠাৎ লেখা শেষ হয়েছে। একেবারে মাঝপথে। আমার ধারণা, হাতের আঙুল, চামড়া, টান-টান হয়ে বেঁকে যাওয়ার ফলেই ওই অদ্ভুত জড়ানো লেখার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তারপর আর কিছু লেখা নেই।

গত রাতে পরিবর্তনটা একটু অন্যরকম মনে হয়েছে। আগের চেয়ে জোরালো না হলেও একটু অন্যরকম। মনে হয়, আমি এখন অসুখটার এক নতুন ধাপে এসে পৌঁছেছি...অসুখটা এখন পালটাচ্ছে...হয়তো ভালোর দিকে যাচ্ছে।

ওটার চিন্তাশক্তি আগের চেয়ে বেড়েছে। অথবা আমার স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর হয়েছে। দুটোর যেটাই হোক, এখন টুকরো ঘটনা ছাড়াও বেশ কিছু চিন্তাভাবনা আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি। সমস্ত হতাশা, খিদে, ঘৃণা, এসবের কথা আমার মনে আছে। কিন্তু সে ছাড়াও মনে পড়ছে ঝাপসা ছেঁড়া-ছেঁড়া চিন্তার অংশ। আমার চিন্তা নয়, ওটার চিন্তা। সে-চিন্তা অনেকটা মানুষের চিন্তার মতো। তাই তো হওয়া উচিত। ওই ভয়ঙ্কর জিনিসটার শরীরে মানুষের মতো চিন্তার ক্ষমতা আছে, এ-কথা কল্পনা করাটাও এক দুঃস্বপ্ন। এক দুশ্চিন্তা। ওটাকে আমার মনের ভাগ আমি দিতে চাই না। কিন্তু বেশ মনে আছে, ওটা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে দেখছিল, কী করে পাতালঘর থেকে বেরনো যায়। মনে আছে, ওটার দাপাদাপির মাঝে এক নীরব মুহূর্ত। তখন ওটা ঘাপটি মেরে মেঝেতে বসে সাদা চোখ দুটো ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিল, খুঁজে বেড়াচ্ছিল দেওয়ালে বা দরজায় কোনও পলকা জায়গা। হয়তো তন্দ্রাকে ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে দরজা খোলাবার কথাও ওটা ভাবছিল। অবশ্য ও-ঘর থেকে বেরনোর কোনও রাস্তা নেই। সবরকমেই আমরা সাবধান হয়েছি। যদি ওটা আমার মতো বুদ্ধিমানও হয়ে ওঠে, তবুও পাতালঘর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ খুঁজে পাবে না।

এটাই হল অসুখের পরিবর্তন : জিনিসটার ক্রমশ বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠা। হয়তো ওটা এভাবে ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে...মানুষের মতো। হয়তো আমি ও সে ক্রমশ কাছাকাছি চলে আসছি। কাছে কে এগিয়ে যাচ্ছে, আমি না সে, তা বলা অসম্ভব। হয় অসুখটা ক্রমেই আমাকে দখল করে নিচ্ছে, অথবা আমি বোধহয় সেরে উঠছি। জানি না, এই নতুন পরিবর্তনটা ভালো না খারাপ...আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, শরীর ঘেমে যায়, পাকস্থলীতে টের পাই কোনও বরফের শক্ত মুঠির অস্তিত্ব। সব মিলিয়ে অন্ধ ত্রাস।

এখন আমি অনেক শান্ত। কিছুক্ষণের জন্যে শুয়ে পড়লাম। ঠোঁটে এখনও রক্ত ও ফেনার স্বাদ, যদিও অনেকবার দাঁত মেজেছি। গত রাতে ঠোঁটে কামড় বসিয়ে দিয়েছিলাম। ঠোঁট ফুলে গেছে, সেইসঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। জিভে কোনও স্বাদ পাচ্ছি না—হয়তো সবটাই আমার মনের অনুভূতি। আজ সকালে স্বাভাবিক হয়ে ঢোক গিলতেই কেমন বমি-বমি ভাব এল। তন্দ্রা যতক্ষণ না দরজা খুলে দিচ্ছে ততক্ষণ দাঁত মেজে মুখ ধুতে পারব না ভেবে গা গুলিয়ে উঠল। তন্দ্রার অপেক্ষায় সময় আর কাটতে চায় না। অবশ্য পাতালঘরে সময় বোঝার উপায় নেই। সময় সেখানে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার অসুখের সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? সময়টা মাপতে পারলে বেশ হত।

গত রাতে যে অসুখটা বেশিক্ষণ ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। অবশ্য এবারে বেশি ঘটনা, বেশি স্মৃতি মনে থাকার ফলে অসুখটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমার স্ত্রী বলেছে, রোজকার সময়ে ও যখন দরজায় এসে ধাক্কা দেয় তখন কোনও সাড়া পায়নি। প্রতিদিন ও দরজা খোলার আগে আমি চেঁচিয়ে সাড়া দিই, বলি, সব ঠিক আছে, তন্দ্রা, দরজা খোলো। অথচ আজ সকালে আমি সে-সময়ে সাড়া দিইনি। তন্দ্রা বলছে, ও নাকি কীসব...অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছে...কিন্তু কোনও উত্তর পায়নি। শব্দগুলো ঠিক কীরকম, তা ও ভেঙে বলেনি।

সুতরাং ও ওপরে ফিরে গিয়ে আরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। বেশ বুঝতে পারছি, ওই একটা ঘণ্টা ওর কী আতঙ্কে, কী উৎকণ্ঠায় কেটেছে। খালি ভেবেছে, আমার কী হল। বেচারি তন্দ্রা! ও আমাকে এত ভালোবাসে, অথচ বুঝতে চায় না। বিয়ের সময় আমার অসুখের কথা ও জানত না। পরে সেটা জানতে পেরে ও এক বিরাট আঘাত পেয়েছে। সে তীব্র আঘাত যে ও সইতে পেরেছে, তাতে আমি ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার মতোই দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় এখন ওর দিন কাটছে।

এক ঘণ্টা পর ও আবার নেমে এসেছে, ধাক্কা দিয়েছে পাতালঘরের দরজায়। এবারে আমি সাড়া দিয়েছি, তারপর ও দরজা খুলেছে। খুব ধীরে-ধীরে ও দরজার পাল্লা ফাঁক করে ঘরে উঁকি মেরেছে। স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি ওর আচমকা শ্বাস টানার শব্দ। আমার জন্যে ভয়ে ও যেন পাগল হয়ে গেছে। অথচ মনে হয় না, আমাকে ও ভয় পায়।

প্রথমবার ওর দরজায় ধাক্কা দেওয়া আমি শুনতে পাইনি—অথবা মনে নেই। যখন ও সে-কথা বলল, তখন বেশ অবাক হয়ে গেছি। অস্পষ্ট আভাসে মনে পড়ছে, আমি ঘাপটি মেরে দরজার ঠিক পাশে বসে ছিলাম, আমার দু-ঊরুর পেশি টান-টান, দু-হাত সামনে বাড়ানো খোলা অবস্থায়, যেন কারও দরজা খোলার জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু সে-স্মৃতি ভীষণ ঝাপসা। কখন যে ওভাবে বসে ছিলাম, মনে নেই। তবে এটুকু জানি, তন্দ্রার জন্যে ওভাবে কখনও আমি অপেক্ষা করব না। করতে পারি না।

৬ জুন

ভীষণ চিন্তা হচ্ছে। অসুখটা এ মাসে এত বেশিক্ষণ ছিল কেন সেই কথা ভাবছি। যতদূর মনে পড়ে, আগে অসুখটা এতক্ষণ থাকত না। আমার এ-অসুখের শুরু থেকে গুছিয়ে লিখতে চাই। তাতে অসুখটার উন্নতি, অবনতি অথবা পরিবর্তনগুলো অনেক স্পষ্ট হবে। মনে-মনে বেশ বুঝতে পারছি, নতুন একটা পরিবর্তন আসছে। সেইজন্যেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এটা যেন অসুখ সেরে ওঠার প্রথম লক্ষণ হয়। এ-পর্যন্ত দিনের পর দিন ওটা ক্রমশ খারাপের দিকে গেছে। এ মাসে অসুখটা আরও বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় মনে হতে পারে আমার অদ্ভুত রোগটা অবনতির দিকে আরও এক ধাপ নেমে গেছে, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও তো ভাবতে হবে, এবারে সুস্থ হওয়ার পর ওটার চিন্তাগুলো পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এরকমটা আগে কখনও হয়নি। অন্তত পুরোপুরি পরিবর্তনটা যে-দিন থেকে শুরু হল তারপর তো নয়ই। একেবারে প্রথমে অসুখটা যখন শুরু হয়, তখনও এরকম অসুখের সময়ের চিন্তা আমি মনে রাখতে পারতাম। আমি যে আবার সুস্থতার দিকে ফিরে চলেছি, এটা হয়তো তারই ইঙ্গিত। আমি হয়তো ক্রমে সেরে উঠছি। এবারে অসুখের প্রকোপটা হয়তো কম ছিল, যার জন্যে সারতে সময় বেশি লেগেছে। বুঝতে পারছি না, এখন যে-অবস্থায় আছি তার চেয়ে আর কত খারাপের দিকে আমি যেতে পারি...।

পুরোনো কথা ভাবতে গিয়ে টের পেলাম, অসুখটা ঠিক কবে শুরু হয় আমার মনে নেই। নিশ্চয়ই খুব ধীরে-ধীরে ওটা প্রভাব বিস্তার করেছে আমার শরীরের ওপর। হঠাৎ একদিনে যদি এ-রোগ আমাকে গ্রাস

করত তাহলে দিনটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট মনে থাকত। দুর্বল মনের কোনও মানুষ হয়তো সে স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাইত, কিন্তু আমি পুরুষের মতোই তার মুখোমুখি হতাম।

যদি তখন আসল ব্যাপারটা ধরতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই যে করে হোক এ-রোগকে প্রতিরোধ করতাম। জানি না কীভাবে, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। কিন্তু কী করে বুঝব? কুসংস্কারে কোনওকালেই আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না ওই—ওই জিনিসটাকেও...যাতে আমি পরিণত হই মাসে একদিন। স্বর্গ, দেবতা, পরি, ডাইনি, শয়তান, এসবেও আমার বিশ্বাস নেই। আমার বাবা-মাও বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা সবসময় সত্যি কথাটাই আমাকে বলতেন : মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজের হাতে, ঈশ্বরের হাতে নয়। সুতরাং, কী করে আমি বিশ্বাস করি...নামটা আর উচ্চারণ করব না...ওই অদ্ভুত জিনিসটার অস্তিত্বে? জানি, এভাবে আমি সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছি, যেন সেটা স্বীকার করলেই আমি হেরে যাব, আরও দুরারোগ্য হয়ে উঠবে আমার ব্যাধি। কিন্তু শত চেষ্টাতেও কাগজে-কলমে সে-কথা আমি লিখতে পারছি না। এমন নয় যে, এ কোনও দুর্বল মানুষের জখম মস্তিষ্কের সত্য অস্বীকারের প্রয়াস, বরং বলা যায়, এ আমার নীরব জেহাদ—ওই অসুখের প্রতি। অসুখের নামটা আমি জানি। ভালোমতোই জানি। নামটা আমার চিন্তায় ঘূর্ণির মতো পাক খায়, কখনও তলিয়ে যায়, কখনও ভেসে ওঠে। তার চরিত্র আমি জানি। কিন্তু তাকে কখনও অস্বীকার করি না। সেটুকু মনের জোর আমার আছে। সবকিছু জেনেশুনেও আমি সহজ-স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি। এ-রোগ জন্ম মুহূর্ত থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার রক্তে মিশে রয়েছে। রক্তের স্রোতের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে শরীরের প্রতিটি শিরায়, প্রতিটি ধমনীতে। আমি বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অসুখটাও তেজিয়ান হয়ে উঠেছে...ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করেছে আত্মপ্রকাশের মাহেন্দ্র মুহূর্তের...আজ এসব বুঝতে পারছি। আগে বুঝতে পারিনি। বোঝা সম্ভবও ছিল না। না, এ দোষ আমার নয়।

ছোটবেলায় আমি একটু রাগী ছিলাম। কথায় কথায় চিৎকার করে হাত-পা ছুড়ে রেগে উঠতাম। কিন্তু বহু ছেলেই ছোটবেলায় ওরকম করে থাকে। ব্যাপারটা নেহাতই সাধারণ। কিন্তু কখনও আমার শারীরিক পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। তার কোনওরকম আভাসও পাইনি। কিন্তু তবুও...হঠাৎ-হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠা...যখন ঝগড়া করতাম অন্য ছেলেদের সঙ্গে, কিংবা প্রিয় খেলনা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতাম টুকরো-টুকরো করে...সেই সময় অমানুষিক ওই রাগের যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ খুঁজে পেতাম না। এমন নয় যে ওইসব ছেলেদের দেখে আমার রাগ অথবা বিরক্তি হত। অথবা মন খারাপ থাকত, তাও নয়।

মনে আছে, একবার আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে, আমারই বয়েসি তবে চেহারায় ছোটখাটো, আমার কপালে ঢিল ছুড়ে মেরেছিল। ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম। কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল আমার মুখ বেয়ে। ছেলেটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় পাওয়ার প্রথম কারণ, ঢিলটা ও অকারণেই ছুড়ে মেরেছে। আর দ্বিতীয় কারণ, ওর চেয়ে আমার গায়ে জোর অনেক বেশি। ইচ্ছে করলেই আমি প্রতিশোধ নিতে পারি। কিন্তু তা করিনি। এমনকী আমার রাগও হয়নি। এতে ছেলেটা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ ও জানত, বদরাগী বলে আমার কুখ্যাতি আছে। রক্তাক্ত মুখে আমি শুধু ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মন ছিল শান্ত। মনে আছে, জিভ দিয়ে ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত চেটে নিয়েছিলাম। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। হয়তো কপালে আঘাত পাওয়ার জন্যেই। সুতরাং চুপচাপ দাঁড়িয়ে রক্ত চাটতে লাগলাম জিভ দিয়ে।

ওর আঘাতের প্রতিবাদ না করায় ছেলেটা নিশ্চয় ভেবে থাকবে আমি ওকে ভয় করি, কারণ ওই ঘটনার পর থেকেই ও সর্বদা আমার পেছনে লাগত। স্কুল ছুটির পর আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। ঢিল ছুড়ত, কখনও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, কখনও বা ঘুষি মারত। কিন্তু ওর ওপর কখনও আমার এতটুকু রাগ হত না। কখনও ইচ্ছে হত না ওকে পালটা ধাক্কা দিই বা ঘুষি মারি। ওর সমস্ত অত্যাচার আমি বিনা দুঃখকষ্টে মেনে নিতাম। ও বুক ফুলিয়ে অন্য ছেলেদের বলে বেড়াত আমি ওকে কী ভীষণ ভয় পাই। সবাই এ নিয়ে আমাকে ঠাট্টা করত, রাগাত। কিন্তু সেসবে আমি কান দিতাম না। অন্য লোকে কী ভাবে না ভাবে সে নিয়ে

আমি কোনওদিনই মাথা ঘামাই না। যখন রাগ হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজন, তখন আমার যে একটুও রাগ হত না, এ তারই একটা উদাহরণ।

আর অন্য সময়ে...কোনও কারণ ছাড়াই...একটা দিনের কথা মনে পড়ে। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। আমি খেলা করছিলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলনা নিয়ে। খেলনাটা একটা দম দেওয়া রেলগাড়ি। অনেকক্ষণ ধরে ওটা নিয়ে খেলছিলাম, মনমেজাজ বেশ খুশিই ছিল। কিন্তু তারপর, হঠাৎই, ওটা হাতে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড আছাড় মারলাম মেঝেতে। বিরাট ধাতব শব্দ তুলে ওটাকে ধ্বংস করতে লাগলাম। যতক্ষণ না ওটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল অফুরন্ত ক্রোধে ওটাকে চুরমার করে চললাম। এমন সময় মা ঘরে এলেন। খেলনাটা ভেঙেছি বলে ভীষণ রাগ করলেন, বললেন, আর কোনওদিনও আমাকে খেলনা কিনে দেবেন না, কিন্তু সে-কথা আমি কানেই তুললাম না। এমনকী পরে, তার পরদিন, রেলগাড়িটা ভেঙে ফেলেছি বলে কোনও দুঃখও আমার হল না। যখনই ওটার কথা মনে পড়ল, তখনই মনে হল জিনিসটা ভাঙার পক্ষে বেশ জুতসই ছিল। ওটা ভেঙেছি বলে বেশ আনন্দ হল। এক অদ্ভুত তৃপ্তি।

এ-ধরনের খাপছাড়া আচরণ আমাকে অন্যান্য রাগী ছেলেমেয়ের থেকে আলাদা করে তুলল। এখন বুঝতে পারছি, ওইরকম রাগ নির্দিষ্ট দিন পর-পর হত, ঠিক এই অসুখটার মতো। কিন্তু তখন সেটা টের পাইনি, টের পাওয়ার কোনও কারণও ছিল না। আমার মা-বাবাও সেটা বুঝতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, এ শিশুসুলভ আবেগ ছাড়া কিছু নয়। এ নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তাও তাঁদের হয়নি। আর হবেই বা কেন?

মায়ের কথা আমার বিশেষ মনে নেই। হয়তো বাবার ব্যক্তিত্বের ছায়ায় মা হারিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন বিশাল চেহারার পুরুষ, লম্বা-চওড়া, কঠোর প্রকৃতির। সেই সঙ্গে নীতিবাগীশ ও ধার্মিক। আমাকে সবরকম অন্যায়ের ছায়া থেকে বাঁচিয়ে তিনি মানুষ করেছিলেন। কখনও কখনও আমার বুকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে গম্ভীর গলায় তিনি বক্তৃতা দিতেন। বেশিরভাগই উপদেশ। কীভাবে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সবরকম কুসঙ্গ এড়িয়ে চলেছেন ইত্যাদি। বাবাকে আমি ভীষণ ভয় পেতাম। চেষ্টা করতাম ঠিক পথে চলতে। যাতে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়। আজও, এই মুহূর্তে, আমি সেই পথ থেকে সরে আসিনি—শুধু আমার এই অসুখটা ছাড়া। ভাবতে অবাক লাগে, বাবাও এই ভয়ঙ্কর অসুখটা নিজের রক্তে বয়ে বেড়িয়েছেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সেই নীতিবাগীশ, জ্ঞানী, ধার্মিক ব্যক্তিটি অভিশাপের বোঝা তুলে দিয়েছেন তাঁর পুত্রের মাথায়, মিশিয়ে দিয়েছেন আমার রক্তে। এ-অসুখ যে আমার নিজের দোষে নয়, এটা তার আরও একটা অকাট্য প্রমাণ। কারণ বাবার মতো ভালোমানুষও এই অসুখে প্রতি মাসে আক্রান্ত হতেন, আমারই মতো। আর অবাক হতেন সেই ভয়ঙ্কর রূঢ় সত্যকে আবিষ্কার করে—যেমনটা আমি হয়েছি।

মাত্র একবার বাবা আমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। নিছক অকারণেই। আমার ওপর ওই একবারই তিনি রাগ করেছিলেন। কারণ পাশের বাড়ির কুকুরটাকে আমি মেরে ফেলেছিলাম। আর বাবা বুঝেও বুঝতে চাননি যে, সেই কাজটা আমাকে নিরুপায় হয়েই করতে হয়েছিল।

যে ছেলেটি সবসময় আমার পেছনে লাগত, ঢিল ছুড়ত, আমার সেই প্রধান শত্রুরই কুকুর ছিল সেটা। ছেলেটার নাম আমার মনে নেই। ও নেহাতই সাধারণ ছিল, মনে রাখার মতো নয়। কিন্তু কুকুরটাকে আমার স্পষ্ট মনে আছে। একটা হাউন্ড। বিশাল ভয়ঙ্কর এক শিকারি জন্তু। ছেলেটা যখনই আমার পেছনে লাগত, কুকুরটা ওর সঙ্গে থাকত। মালিকের নিষ্ঠুর খেলার সঙ্গে যুক্ত হত ওটার হিংস্র গর্জন ও দাঁতখিঁচুনি। ছেলেটা আমাকে যখন বিরক্ত করত, তখন কুকুরটা হলদে চোখ মেলে আমাকে লক্ষ করত। ওটার লম্বা জিভ ঝুলে থাকত বাইরে, ধারালো দাঁত বসানো চোয়াল নড়ে উঠত এদিক-ওদিক—যেন আমার হেনস্থা দেখে মনে মনে ভীষণ খুশি হচ্ছে। সে সময় কুকুরটার দিকে তেমন মনোযোগ কখনও আমি দিইনি। কুকুরটাকে বা ছেলেটাকে, কাউকেই আমি বিশেষ আমল দিতাম না। তবে ঘৃণা করতাম বেশি জন্তুটাকেই। জানি, কুকুর যে মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু সেটা একটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা নিতান্তই আবেগপ্রবণ মূর্খ

ব্যক্তিদের নির্বোধ ধারণা। ভয়ঙ্কর পশুগুলোর ছলনাময় আচরণই এ-ধারণার কারণ। আর বিশেষ করে এই কুকুরটা এক নৃশংস ভয়ানক প্রাণী। তার বহুরঙা গায়ের চামড়া ও হলদে দাঁত তাকে আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। ওটা কখনও আমাকে আক্রমণ করেনি, কিন্তু বলতে পারি, আমার শরীরে দাঁত বসাতে পারলে কুকুরটা খুশিই হত।

একদিন রাতে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরছিলাম। শহর থেকে আমাদের বাড়ি বেশ কয়েক মাইল দূরে, গ্রামে। অত রাতে বাইরে কী করতে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, তবে বাড়ি ফেরার সময় রাত যে অনেক হয়েছিল তা স্পষ্ট মনে পড়ে। সে-রাতে আকাশে নিশ্চয়ই চাঁদ ছিল, কারণ সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ওই ছেলেটার বাড়ির পাশ দিয়েই আমাদের বাড়ির পথ, কারণ একই রাস্তায় আমরা থাকতাম। ওদের বাড়িকে এড়িয়ে যেতে গেলে আমাকে জঙ্গল দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয়। বিনা কারণে জঙ্গলের ঘুরপথ দিয়ে যেতে চাইনি বলেই সেই ঘটনার সূত্রপাত।

যাই হোক, আপনমনে ওদের বাড়িটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি, কোথা থেকে উদয় হল আমার শত্রু। বরাবরের মতোই আমাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে লাগল, আর আমিও ওকে তেমন গুরুত্ব দিলাম না। হেঁটে চললাম। ও একটা বড় পাথর সজোরে ছুড়ে মারল আমার পিঠে। প্রচণ্ড ব্যথা লাগল। বুঝলাম, পিঠে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। কিছুটা পথ গিয়ে আমি সম্ভবত রাস্তার ধারে বসে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, ছেলেটা আমাকে এত ঘৃণা করে কেন, এবং একটু পরে আমিও ওকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শুরু করলাম। এর আগে ওর সম্পর্কে এ ধরনের মনোভাব আমার কখনও আসেনি, হয়তো এতদিনের অত্যাচার অবিচারের যোগফল আজকের এই পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ক্রোধ। বসে বসেই ওর প্রতি আমার ঘৃণা ক্রমশ বাড়তে লাগল। মনে পড়ল প্রথমবারের কথা, যেবার ও আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, আর আমি পেয়েছিলাম নিজের রক্তের স্বাদ। যে-কোনও কারণেই হোক, সেই রক্তের স্বাদ এখন আরও তীব্রভাবে টের পেলাম। জানি, যদি এসবের ইতি না টানি তবে ওই ছেলেটা চিরকাল আমাকে বিরক্ত করবে। সুতরাং উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে চললাম ওদের বাড়ির দিকে।

ছেলেটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল—একটা ভাঙা টালির ঘরের ঠিক পাশে। আমাকে দেখতে পেয়ে ও একটা পাথর তুলে নিয়ে গালাগাল দিতে শুরু করল। নোংরা কথাগুলো শুনে আমার অসহ্য রাগ হল। এই প্রথম বুঝলাম, ছেলেটা কতখানি ছোটলোক। এতদিন কী করে যে ওর বদমাইশি সহ্য করেছি কে জানে। আমাকে বিরক্ত করার জন্যে ইচ্ছে হল ওকে শাস্তি দিই, কিন্তু শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছেটা আরও বেশি হল ওর নোংরা স্বভাবের জন্যে, কুটিল মনের জন্যে। এরকম একটা মানুষের শিক্ষা হওয়া খুব দরকার।

সোজা এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। খুব কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ওর গালাগাল দেওয়া বন্ধ হল না। তারপর ওর ধীর আচ্ছন্ন বুদ্ধি দিয়ে ছেলেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারল ব্যাপারটা ঠিক অন্যান্যবারের মতো হচ্ছে না, কারণ ও পেছোতে শুরু করল। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম, অত্যন্ত ধীর পায়ে। পাথরটা যখন ও ছুড়ে মারল সেটা সোজা আমার মুখে এসে লাগল, কিন্তু সে আঘাত আমি টেরই পেলাম না। ও দৌড়ে পালাল টালির ঘরের দিকে, আর আমি চকিতে টালির ঘর ও বাড়ির মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে আছে, কীভাবে ওর চঞ্চল চোখ এদিক-ওদিক ছিটকে তাকাচ্ছিল সাহায্যের জন্যে, পালানোর পথ খোঁজার জন্যে।

চেহারায় আমি ওর তুলনায় অনেক বড়সড়, শক্তিও আমার বেশি—স্কুলে সমবয়েসিদের সকলের চেয়েই আমি চেহারায় বড়—সুতরাং ও ভীষণ ভয় পেল। ওর এই ভয় পাওয়া আমাকে খুশি করল না। বরং প্রতিশোধের ইচ্ছেটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল...বুঝলাম, ও স্পষ্ট জানতে পেরেছে ওকে শাস্তি পেতে হবে, বুঝতে পেরেছে ও খারাপ। আজ যদি ওকে শাস্তি না দিই, ও ভাববে কোনও অন্যায় ও করেনি। সে আমি সহ্য করতে পারব না। ওর দিকে আরও এক পা এগিয়ে যেতেই ও পালাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। এখনও আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্র এবং তৎপর, আর তখন তো আমার গতি ছিল শিকারি বেড়ালের মতো। দু-

হাতে ওকে আঁকড়ে ধরলাম। গলা টিপে ধরে ওকে ছুড়ে ফেললাম মাটিতে। ও আমাকে লাথি মারার চেষ্টা করল, কিন্তু ওর পা দুটো একপাশে সরিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর দেহের ওপর। ছোট্ট হাতে আমার মুখে ঘুষি চালাতে লাগল ছেলেটা, কিন্তু সে-আক্রমণ পোকার কামড়ের চেয়েও তুচ্ছ। শক্ত দু-হাতে ওর গলা টিপে ধরলাম। শুরু হল ওর শাস্তি। ইচ্ছে ছিল, ওর পাপ অনুযায়ী ভয়ঙ্কর শাস্তিই ওকে দেব। ওর গলায় আমার হাতের চাপ ক্রমশ বাড়তে লাগল, ওর চোখজোড়া বিস্ফারিত হতে হতে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। মনে-মনে খুশি হলাম। উহুঁ, খুশির তুঙ্গে এগিয়ে চললাম—যেন চরম এক আনন্দ ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। আমার আঙুলের চাপ যত বাড়ছে, তত তাড়াতাড়ি সেই আনন্দ এগিয়ে আসছে কাছে। যেন আমার আঙুল বেয়ে উঠে আসছে কাঁধে, তারপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। ওর ঘুষি চালানো একসময় থেমে গেল। ওর ছোট-ছোট হাত আমার কবজি চেপে ধরল, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টায়। শরীরের সমস্ত শক্তি দু-হাতে ঢেলে আমি ক্রমশ চাপ বাড়িয়ে চললাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে নৃশংস জন্তুটা আমাকে আক্রমণ করল।

ওটা কখন যে গুড়ি মেরে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করিনি। কুকুরটা ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ওকে আমার নজরে পড়েনি। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে আমি গড়িয়ে পড়লাম মাটিতে। কুকুরটা শক্তিশালী, কিন্তু সমান-সমান যুদ্ধে আমার কাছে নিতান্তই শিশু। ওটাকে নীচে ফেলে চেপে বসলাম ওর শরীরে, দু-হাতে গলার বেল্টটা আঁকড়ে ধরে মোচড় দিতে লাগলাম। ক্রমে পশুটার দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কুকুরটার ধারালো দাঁতে আমার হাতের মাংস ছিঁড়ে গেছে, হাত বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে কুকুরটার লোমশ শরীরে।

রক্ত দেখে আমার সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। মাথায় বেজে উঠল অমানুষিক তীব্র এক টঙ্কার। তখনই বুঝলাম, পশুটা কত ভয়ঙ্কর এবং ওটাকে ধ্বংস করা কতখানি প্রয়োজন। গলার বেল্টে মোচড় বাড়াতেই বেল্টের চামড়া কেটে বসল ওটার লোমশ নরম গলায়। কুকুরটার লম্বা জিভ চোয়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ওটার মাথা প্রচণ্ড জোরে ঠুকে দিলাম মাটিতে—যাতে পশুটার দাঁতগুলো ঢুকে যায় ওর নিজের হাসি মাখানো জিভে।

কুকুরটার মুখে বিশ্রী ধূর্ত হাসিটা এখন আর নেই। আর ওর চোখের দৃষ্টিরও কোনও তুলনা নেই। বুঝলাম, কুকুরটা মরতে চলেছে। আর, নিজেও বুঝেছে, ওর নৃশংসতার শাস্তি ওকে এইভাবে পেতে হচ্ছে। ওটার চোখ দুটো হলদে সেদ্ধ ডিমের মতো পাক খেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল কোটরের বাইরে। আমার হাসি পেল, কিন্তু সেরকম হাসলাম না। কারণ, তাতে আমার হাতের বাঁধন আলগা হয়ে যেতে পারে। তাই পুরোপুরি মরে না যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে ছাড়লাম না।

অবশেষে যখন উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম, ছেলেটা সামলে উঠে পালিয়েছে। সম্ভবত বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। হয়তো ওকে অনুসরণ করতাম, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক ওর প্রতি আর আমার কোনও ঘৃণা নেই। হয়তো ভেবেছি, অপরাধের যথেষ্ট শাস্তি ও পেয়ে গেছে। হলফ করে বলতে পারি, আর কখনও ও আমাকে বিরক্ত করবে না। চাঁদের আলোয় কুকুরটাকে দেখাচ্ছে তেলকালি মাখানো নরম ন্যাকড়ার মতো। আমার ভালো লাগল। ভীষণ ভালো লাগল। কাজটা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে শেষ হয়েছে। খুশিমনে ফিরে চললাম বাড়িতে। হাতের ব্যথা সেদিন অনেক দেরিতে টের পেয়েছিলাম।

পরদিন সকালে ছেলেটার বাবা এলেন আমাদের বাড়িতে। কীসব কথাবার্তা বললেন আমার বাবার সঙ্গে। তিনি চলে গেলে বাবা আমাকে ডাকলেন। দেখলাম, বাবা ভীষণ রেগে গেছেন। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, আত্মরক্ষার জন্যে ওই কাজ আমাকে করতে হয়েছে, নয়তো কুকুরটাই আমাকে মেরে ফেলত। কিন্তু বাবার ধারণা আমি ছেলেটাকে প্রথমে মারধোর করেছি এবং কুকুরটা ওকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছে। এমনকী বাবাও ওইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করতেন যে, কুকুর অত্যন্ত প্রভুভক্ত প্রাণী। আর আমি তাঁকে বোঝাব

সাধ্য কী। হাতের কাটা জায়গাগুলো বাবাকে দেখালাম, কিন্তু কোনও ফল হল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আমি ছেলেটাকে মারতে গেছি। কী অদ্ভুত। ওই একবারই বাবা আমার ওপর অবিচার করেছিলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই সে ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

এর পর আর কখনও কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেনি বা পাথর ছোড়েনি।

৭ জুন

আজ খুব সকাল-সকাল উঠেছি। ইচ্ছে আছে দুপুরে খাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ডায়েরি লিখব। কুকুরটার বিষয়ে গতকালের লেখাটা আর একবার পড়লাম। মনে হয় না অসুখটার সঙ্গে এ-ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে। বলতে গেলে নিজেকে বাঁচানোর জন্যেই কুকুরটাকে সেদিন আমি মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলাম। অন্য কেউ হলেও তাই করত। কিন্তু এ থেকে আমার শারীরিক ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় আমার সহ্যশক্তি যে কতখানি তারও আন্দাজ পাওয়া যাবে। সুতরাং কাগজে-কলমে এর উল্লেখের প্রয়োজন আছে। এখন অসুখের শুরুর সময়কার ঘটনাগুলো মনে-মনে আবার ঠিক করে নিয়ে স্পষ্টভাবে লেখার চেষ্টা করব। সময়ের সঙ্গে অসুখটার তীব্রতা কীভাবে বেড়ে চলেছে তাও আমি ভালোভাবে গুছিয়ে লিখে রাখতে চাই—যাতে বুঝতে পারি, এর পরের পরিবর্তনটা কীভাবে আমার জীবনে আসতে চলেছে।

ওই সময়কার যে-ছবিটা আজও আমার মনে জোরালো ও স্পষ্ট তা হল বন-জঙ্গল। গ্রামে এক বিশাল জীর্ণ বাড়িতে আমরা থাকতাম। তার পেছনেই ছিল গভীর জঙ্গল। বাড়িটায় হাওয়া বাতাস ছিল প্রচুর, আর ছিল এক অদ্ভুত ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব। সেটা আমার একটুও ভালো লাগত না। কিন্তু জঙ্গলে আমার সবসময় ভালো লাগতো—শুধু ওই অদ্ভুত সময়গুলো ছাড়া। আর ভালো লাগত একা-একা জঙ্গলে যেতে। নির্জন জায়গায় নিজেকে কেমন যেন নিরাপদ মনে হয়।

জঙ্গলের ছবিটা এখনও আমার মনে আছে। অবশ্য চাঁদের আলো ছাড়া সে-ছবি আমি কল্পনায় আনতে পারি না। দিনের আলোয় দেখা জঙ্গলের দৃশ্য আমর মনে ধূসর, অস্পষ্ট। হতে পারে দিনের আলোয় অন্যান্য আকর্ষণই এই অস্পষ্টতার কারণ, এ ছাড়া নির্দিষ্ট কোনও স্মৃতি সবসময়েই তাৎক্ষণিক অনুভবের শিকার হয়ে পড়ে। কিন্তু রাতে! একটা রাতের কথা আমার মনে আছে...না কি অনেক রাতের স্মৃতি একই রকম হওয়ায় সেগুলো একটা রাতের স্মৃতিতে মিশে গেছে?

চারপাশের লম্বা-লম্বা শালগাছের মাঝে একটু খোলা জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। জঙ্গলটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর, আর পাহাড়ের নীচে ঘন অন্ধকার ছায়ায় লুকিয়ে রয়েছে আমাদের বাড়িটা। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বাড়ির ছাদটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জায়গাটা অন্ধকার হলেও গাছের মাথাগুলো চাঁদের আলোয় রুপোর মতো চকচক করছে। হাওয়ায় দুলছে অসংখ্য রুপোর পাত। চারদিক ভীষণ শান্ত, কয়েক টুকরো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ চাঁদকে পাশ কাটিয়ে ভেসে যাচ্ছে দূরে। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে এক আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাকে গ্রাস করল, কিসের যেন এক অস্পষ্ট অদ্ভুত ইচ্ছে। বসন্তকালে যেমনটা হত, অনেকটা সেইরকম। স্কুলে বসে জানলা দিয়ে আকুল চোখে চেয়ে থাকতাম বাইরের কচি ঘাস আর রঙিন ফুলের দিকে। কী যেন একটা করতে ইচ্ছে করত।

কিন্তু এ-ইচ্ছে তার চেয়েও অনেক বেশি তীব্র। কী যেন আমাকে করতে হবে, অথচ করতে পারছি না। তখন ভেবেছিলাম এ হয়তো কোনও যৌন কামনা। হয়তো সেই জন্যেই জামা-প্যান্ট সব খুলে ফেলেছিলাম—এমনকি জুতো-মোজা পর্যন্ত। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বনের মধ্যে। ঠান্ডা ছিল না, কিন্তু আমার

কাঁপুনি আসছিল। চাঁদের আলোর এক তীক্ষ্ণ রুপোলি বর্ণা গাছের ঘন পাতা ভেদ করে এসে ঠিকরে পড়েছে শুকনো পাতা ছাওয়া মাটিতে। তার শীতল দ্যুতি আমাকে যেন বরফ করে দিল। আর আমি শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথা পেছনে হেলিয়ে, মুখ হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। কাঁপতে লাগলাম। যেন আমার শরীরের প্রতিটি শিরায়, প্রতিটি স্নায়ুতে ভয়ঙ্কর এক তড়িৎপ্রবাহ ছুটে চলেছে। কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ, কারণ তখন রাত ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ সব কিছু শেষ হয়ে গেল। সেই ইচ্ছেটাও আচমকা গেল মিলিয়ে। খেয়াল করলাম, আমি চিৎকার করছি। ঠিক চিৎকার নয়—অনেকটা কোনও পশুর গর্জনের মতো, যেন কোণঠাসা কোনও জন্তুর আর্তনাদ। একসময় থামলাম। চারদিক নিস্তব্ধ ছায়া-ছায়া অন্ধকার। কেমন অদ্ভুত লাগছে। নিজেকে ভীষণ নগ্ন লাগছে, একা লাগছে। এইসব করেছি বলে লজ্জা করছে।

তখনও আমার ধারণা ছিল এর সবটাই যৌন কামনা। কিন্তু একটা বিচিত্র স্বস্তিও পেলাম। জামাকাপড় পরে ফিরে এলাম বাড়িতে। সে-মাসে আর তেমন কিছু হয়নি। সবকিছুই ঠিকঠাক চলেছিল। মনে ফিরে এসেছিল প্রশান্তি। যা বলছিলাম, এটা কোনও বিশেষ রাতের স্মৃতি, না কি বহু মাস বহু রাতের একই স্মৃতির যোগফল, তা জানি না। তখন আমি নিশ্চয়ই খুব ছোট ছিলাম...।

এইমাত্র যা লিখেছি তাই নিয়েই ভাবছিলাম। মনে হয় এ-ঘটনা একবার নয়, বহুবারই ঘটেছে। টুকরো-টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে আমি নগ্ন হয়ে জঙ্গলে দৌড়চ্ছি, গুড়ি মেরে বসে আছি গাছপালার আড়ালে, ওত পেতে রয়েছি কোনও পাথরের পেছনে। ঘটনাগুলোই শুধু আমার মনে আছে, সে সময়কার ভাব-অনুভূতি কিছু মনে নেই। যেমন মনে আছে বন্ধ পাতালঘরে ওটার দুরন্ত দাপাদাপির স্মৃতি। মনে হয় না, জঙ্গলে আমি কারও ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলাম বা লুকিয়ে ছিলাম গাছপালার আড়ালে। শুধু এটুকু বলতে পারি, জঙ্গলে আমি একা ছিলাম—একেবারে একা।

তখন কোনওরকম শারীরিক পরিবর্তন যে আসেনি সেটা স্পষ্ট মনে পড়ে। কোনওরকম সন্দেহ তাতে নেই। আর আশ্চর্য, কবে যে প্রথম পরিবর্তনটা এল তা আমার মনে নেই। পরিবর্তনটা সম্পর্কে কীভাবে সচেতন হলাম তাও জানি না। এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ধীরে ক্রমে ক্রমে এসেছে। যার ফলে কোনওরকম স্পষ্ট দাগ আমার স্মৃতিতে নেই।

পরিবর্তনের প্রথম যে-স্মৃতি মনে পড়ে সেটা হয়েছিল আমার শোয়ার ঘরে, জঙ্গলে নয়। সম্ভবত এটা অসুখ শুরু হওয়ার অনেক পরের ঘটনা। আমি সেদিন বিছানায় বসে ছিলাম, ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করছিলাম আমার হাত দুটো। বিছানাটা জানলার ঠিক পাশে। জানলায় তাকালে সরাসরি চোখে পড়ে রুপোলি চাঁদ, শোয়ার ঘরে চাঁদের আলোয় ছায়ার লুকোচুরি।

হাত দুটো রাখা ছিল আমার কোলে, আলোর এক তীক্ষ্ণ ফলা ঠিকরে পড়েছে তাদের গায়ে। আমি সম্পূর্ণ নগ্ন। শরীরের তুলনায় আমার শিরদাঁড়াকে আরও বেশি নগ্ন লাগছে। যেন সেখান থেকে চামড়া পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। বসে বসে লক্ষ করছি নিজের হাত দুটো। এ প্রথমবারের ঘটনা হতেই পারে না, কারণ আমি যেন জানতাম কীসের প্রত্যাশায় আমি অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। মনে আছে, আমার হাতের নখগুলো কীভাবে বাড়তে শুরু করল, হাত কাঁপতে লাগল, চামড়া খসখসে হয়ে কুঁচকে এল, আঙুলগুলো ক্রমশ বেঁকে যেতে লাগল কোনও পশুর...।

তারপর কী করেছি মনে নেই।

৮ জুন

তন্দ্রা বউ হিসেবে খুব ভালো।

ও যা সহ্য করে আর কোনও মেয়ে করত কিনা জানি না। মিথ্যে কথা বলব না, ওকে দেখতে তেমন একটা সুন্দরী নয়। হয়তো প্রেম-ভালোবাসার নদীতে শেষ কুটো হিসেবেই ও আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি ও আমাকে ভালোবাসে। আমার অসুখের কথাটা ও মাঝে মাঝে বুঝতে চায় না দেখে আমি বিরক্ত হই, কিন্তু এ ছাড়া ও খুব ভালো মেয়ে। ওর বোঝা উচিত আমি কখনও ওর ক্ষতি করব না। ওর কেন, কারও ক্ষতি করব না। কারও যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। আসলে আমি ভীষণ লাজুক এবং শান্ত। এই কারণেই আমার অসুখটাকে নিছক শারীরিক বলে বুঝতে না পারলে লোকের চোখে ওই বৈসাদৃশ্যটা প্রকট হয়ে ওঠে। লোকে বোঝে না, তখন আমি অন্য কিছু হয়ে যাই, হয়ে উঠি বিপজ্জনক। কিন্তু তবুও নিজেকে কোনওরকমে আমি সামলে নিয়েছি, আর সেইজন্যেই কাউকে কখনও আমি আঘাত করিনি, কারও কোনও ক্ষতি করিনি।

তন্দ্রাকে কথা দিয়েছি আজ ওকে বাইরে খাওয়াতে নিয়ে যাব। শুনে ও ভীষণ খুশি হয়েছে। আমরা খুব একটা বেরোই না। জমকালো জীবন আমার ভালো লাগে না। আমি ঘরে থাকতেই ভালোবাসি। কিন্তু মাঝে-মধ্যে বেরোলে মন্দ কী! তন্দ্রাও বেড়াতে ভালোবাসে, তবে আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে ও একমত যে, এ ধরনের বেড়ানো-টেড়ানো বছরে দু-তিনদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো। ও জামাকাপড় পরে তৈরি হচ্ছে। যদি রাত না হয়ে যায় ফিরে এসে আবার লিখতে বসব।

উঃ, আজকের সন্ধেটা কী বিচ্ছিরিই না কাটল!

এইমাত্র আমরা ফিরেছি, আর তন্দ্রা সোজা ওর ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। হয়তো আমার ওপর রাগ করেছে। আজ বেরনোর আগে আমার দশবার ভাবা উচিত ছিল। মেয়েদের মরজি স্বয়ং ভগবানও বুঝতে পারেন না। ওরা জীবন সম্পর্কে ভীষণ অবুঝ।

সন্ধের শুরুতেই গোলমাল। তন্দ্রা এমন একটা ব্লাউজ গায়ে দিল যেটা ও জানে আমি ভীষণ অপছন্দ করি। ব্লাউজটা কাঁধ খোলা, হাতকাটা, কদর্য রুচির। এটা পরলে ওকে বেশ্যার মতো দেখায়। প্রথমে ভালো কথায় বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সহজ সত্যিটা শুনে ও বিরক্ত হল। মেয়েরা কেন যে সত্যি কথা শুনলে রাগ করে, আর মনভোলানো প্রশংসায় খুশি হয়, কে জানে। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলেই আমার কথাটা যে কতখানি সত্যি তা ও বুঝতে পারত। এত বছর বিয়ে হওয়ার পর ওর অন্তত জানা উচিত বিনা কারণে তোষামোদ করা আমার স্বভাব নয়, আর নিজের বউয়ের কদর্য বেশবাস আমি কখনও বরদাস্ত করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ব্লাউজটা ও পরল, এবং বাড়ি থেকে বেরনোর আগেই সে নিয়ে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল। অবশেষে ওর কাছে হার মানলাম। কিন্তু সেটাই হল আমার ভুল। এ-নিয়ে সারাটা রাত যে আমার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকবে সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা খালি টেবিল দেখে বসতেই লক্ষ করলাম বেশ কয়েকজন লোকের নজর তন্দ্রার দিকেই। কিন্তু ও সেটা খেয়াল করেছে বলে মনে হল না। ও হাসিখুশি হয়ে বসল, দেখতে লাগল ঘরের চারদিকে। আমার বিশ্বাস, ঘরের প্রতিটি লোক নির্ঘাত ভেবেছে ও ফষ্টিনষ্টি করার জন্যে কাউকে খুঁজছে। ওর ওই পোশাক দেখে আর কী-ই বা তারা ভাববে? অপমানে মাটিতে মিশে গেলাম। লোকগুলোর মনের ভাব আমি সহজেই অনুমান করতে পারছি। তন্দ্রাকে দেখে ওরা ভেবেছে কোনও বেশ্যাকে আমি রাস্তা থেকে তুলে এনেছি। লিপস্টিকের কল্যাণে ওর ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল, সামনে ঝুঁকে বসায় বুকের উপত্যকা উন্মুক্ত। টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে নেহাত লজ্জা হল, নইলে সেই মুহূর্তেই রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, বাড়ি ফিরেই ওই ব্লাউজটা জ্বলন্ত উনুনে গুঁজে দেব। তাহলে আর কোনওদিন আমাকে

এরকম লজ্জায় পড়তে হবে না। আর আশ্চর্যের কথা, বেচারা তন্দ্রা টেরও পাচ্ছে না ওকে নিয়ে সবার মনে কী কাণ্ডটাই না হয়ে চলেছে। ও এতই সরল আর নিষ্পাপ! খুশি হয়ে ও চারপাশে দেখতে লাগল, আর আমি কাউকে না দেখার ভান করতে লাগলাম। যদিও নজরে সবাইকেই পড়ছিল। রেস্তোরাঁয় আরও ক'জন মেয়ে ওই ধরনের কি তার চেয়েও বাজে পোশাক পরে এসেছে। তখনই বুঝলাম, রেস্তোরাঁটা বিশেষ সুবিধের নয়। এখানে আমাদের আসা ঠিক হয়নি। এখানে আগে কখনও আসিনি। কিন্তু রেস্তোরাঁটার নাম আছে। আর সেই নাম শুনে আমি ঠকেছি। রেস্তোরাঁর দেওয়ালের রঙ গোলাপি। ঘরের আলো প্রয়োজনের তুলনায় কম উজ্জ্বল। সেই অল্প আলোতেও দেওয়ালে আঁটা স্তনসর্বস্ব অভিনেত্রীদের নোংরা ছবিগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। মেনু কার্ডে দেখলাম, খাবারের দাম অত্যন্ত বেশি। স্বাভাবিক।

বেয়ারা এসে তন্দ্রার পেছন থেকে টেবিলে ঝুঁকে পড়ল। একটু বেশিই। হলফ করে বলতে পারি, ব্যাটা তন্দ্রার লো কাট ব্লাউজের ভেতরে উঁকি মারার চেষ্টা করছে। লোকটার সেই আঠালো হাসিটা মনে পড়লে এখনও আমার রাগ হচ্ছে। বেয়ারাটার সরু গোঁফ ও কোঁকড়ানো বাবরি চুল। কথাবার্তার ভঙ্গিও কেমন অদ্ভুত। সুতরাং সে যদি অর্ডার ভুল করে অন্য খাবার নিয়ে আসে তাহলে আমার ধৈর্যের বাঁধ যে ভেঙে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী।

এমনিতে বিদেশি খাবার আমি খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু তন্দ্রার কথা মনে রেখেই অপছন্দের কাজ আমাকে করতে হয়। বেয়ারাকে বলেছিলাম ফ্রায়েড রাইস আর চিলি প্রন নিয়ে আসতে। তন্দ্রা চিংড়ি মাছ ভালোবাসে। যখন সে ফিরে এল, তার হাতে চাও-মিন আর সুইট অ্যান্ড সাওয়ার প্রন। দেখলে বমি আসে। শুরু থেকে এত কিছু দেখে এটা আর হজম করা যায় না। রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তা হলেও নিজেকে সংযত করা উচিত ছিল। তন্দ্রাও বলছে, প্লেট দুটো আমার বেয়ারার মুখে ছুড়ে মারা উচিত হয়নি। কিন্তু তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। এই হ্যাংলা মানুষগুলোর স্পর্ধা অসহ্য। রাগের মাথায় কোনও ভাবনাচিন্তা না করেই যা করার করে ফেলেছি। দু-হাতে দুটো খাবারের প্লেট তুলে নিয়ে চকিতে বসিয়ে দিয়েছি বেয়ারাটার দু-গালে। লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে নোংরা ভাবে হাসছিল। খাবারে মাখামাখি মুখ নিয়ে সটান পড়ে গেল মেঝেতে। এরকম পরিস্থিতিতে বোধহয় এর চেয়ে ভদ্র ব্যবহার করা যায় না। আমি চিৎকার করে গালিগালাজও করিনি, লোকটাকে কোনও কথাও বলিনি, আর হাত-পা ছুড়ে ভিড়ও জমাইনি। শুধু প্লেট দুটো ওর মুখে ছুড়ে মেরেছি।

তারপর আমরা বেরিয়ে এসেছি। কেউ আমাদের বেরিয়ে যেতে বলেনি। আমরা নিজে থেকেই চলে এসেছি। নোংরা ব্যবহারের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ায় রেস্তোরাঁর লোকগুলো মনে হয় আমার ওপর খুশিই হয়েছে। বেরিয়ে আসার সময় তন্দ্ৰা কাঁদছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি সকলেই আমাদের দিকে তাকিয়ে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে তারা তন্দ্রার শরীরের দিকে তাকিয়ে। কেউ-কেউ ক্রুদ্ধভাবে এই ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করছে, কেউ বা হাসাহাসি করছে। কিন্তু আমি সেসব গায়ে মাখলাম না। মাথা সোজা রেখে সদর্পে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এতটুকু সময়ের জন্যে নিজেদের সম্মান আমি নষ্ট হতে দিইনি।

তন্দ্রা কিছুতেই বুঝবে না, এর সবটাই ওর দোষ। ও সোজা ওর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দরজায় খিল দেওয়ার শব্দ আমি শুনেছি। একে মেয়েলিপনা ছাড়া আর কী বলব। আমি কখনও ওর ঘরে যাই না।

যাই হোক, আজ সন্ধের ঘটনায় তন্দ্রার অন্তত একটা শিক্ষা হবে। এবারে ও হয়তো বুঝবে এত ঘন-ঘন বাইরে বেরনোটা ঠিক নয়।

৯ জুন

আজ সকালেও তন্দ্রার রাগ পড়েনি। কিছুক্ষণ তো আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। তাতে ক্ষতি নেই, কারণ তখনও আমার মনে ঘুরছে সেই সন্ধেটার কথা, মনে পড়ছে বীভৎস রেস্তোরাঁটার কথা। কিন্তু ও একবার বলে বসল, অমন বিনা কারণে আমার নাকি রেগে ওঠাটা ঠিক হয়নি। বিনা কারণে! এমনকী এরকম ইঙ্গিতও দিল যে, এটা আমার রোগের একটা লক্ষণ! মাসের এই মাঝামাঝি সময়ে! এতেই বোঝা যায়, রোগটাকে তন্দ্রা এখনও ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। টেবিলের কানা আঁকড়ে ধরে নিজেকে সংযত করেছি। ওকে কোনও কথাই বলিনি। কিন্তু আমার মুখে সম্ভবত ভয়ঙ্কর রাগ ফুটে উঠেছিল, কারণ তন্দ্রা কোনও কথা না বলে উঠে চলে গেল। ওকে দেখে মনে হল যেন শাস্তি পেয়েছে।

ওর বোকামোর ব্যাপারে আমাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে। কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে জিনিসটা বুঝে ওঠা বেশ কষ্টকর। তন্দ্রাকে যেদিন অসুখটার কথা সমস্ত খুলে বলেছি, তখন ও যা আঘাত পেয়েছে তা বলার নয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় ওই আঘাত ওকে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ করে তোলেনি তো? সেরকম না হলেও কিছুটা অসুস্থ ও হয়েছে। নইলে মাঝে মাঝে অমন যুক্তিহীন কাজ করে বসে কেন? যেমন, ওর ধারণা ওই বেশ্যা-মার্কা ব্লাউজটায় ওকে দারুণ মানায়, তারপর বাচ্চা মেয়ের মতো রোজ সন্ধেয় বেড়াতে বেরনোর বায়না, আর যুক্তিসঙ্গত সত্যিকারের রাগকে আমার রোগের লক্ষণ বলে মনে করা। নাঃ, ওর ব্যাপারে আমাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে। বেচারা!

যখন আমাদের বিয়ে হয় তখন পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। আরও পরে, অনেক পরে, অসুখটা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই খারাপের দিকে যাওয়াটা এত ধীরে হয়েছে যে, আমি আগে থেকেই তা অনুমান করতে পেরেছি, এবং কোনওরকম দুর্ঘটনা যাতে না হয় তার বন্দোবস্তও করেছি। অবশ্য তখন পাতালঘরটা হয়নি—তৈরি করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন যখন হল, তখন ওটা তৈরির জন্যে হাতে প্রচুর সময়ও ছিল।

হ্যাঁ, পরিবর্তন আমার একটা হত। তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনকার মতো এতটা হত না। পুরোটা তো হতই না। তখনও আমাকে মানুষের মতোই দেখাত। প্রথমদিকে, যখন আয়নায় তাকাতে ভয় পেতাম না, নিজের চেহারা আমি দেখেছি। স্পষ্ট মনে আছে, আমার মুখ দেখে মনে হত যেন সপ্তাখানেক দাড়ি-গোঁফ কামাইনি। ব্যস, আর কিছুই নয়। দাঁতগুলো ছিল লম্বা, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেগুলো ঠোঁট দিয়ে ঢাকা দিতে পারতাম। দেখে মনে হত আমার দাঁত উঁচু। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল চোখ দুটোর। সে দুটো নিঃসন্দেহে ছিল কোনও জন্তুর চোখ—অন্তত মানুষের চোখ তো নয়ই। কিন্তু যে আমার অসুখের কথা জানে না, জানে না স্বাভাবিক সময়ে আমাকে কেমন দেখায়, তার চোখে মোটেও অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়বে না। তারা শুধু ভাববে আমাকে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত।

নিজেকে সামলে রাখার ক্ষমতা সে-সময়ে আমার ছিল। অসুখটার দাপটে কখনও কাবু হতাম না। শুধু শরীরের ভেতর ওটা জ্বরের মতো আগুন জ্বালিয়ে দিত। আর আমিও মোটামুটিভাবে 'আমি'তেই থাকতাম। এসব পাতালঘরের দরকার হয়ে পড়ার অনেক আগের ঘটনা। তন্দ্রাকেও তখন এ-অসুখের কথা বলিনি। সব গোপন রেখে ওকে বিয়ে করাটা হয়তো আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু কখনও ভাবিনি অসুখটা আরও খারাপের দিকে মোড় নেবে। আর আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তন্দ্রাকে সব জানিয়েও কোনও লাভ হত না। আমাকে ও বিয়ে করতই।

সেইসব রাতে, যখন অসুখটা হত, আলো নিভিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তাম। অবশ্য আমাদের শোয়ার ঘর আলাদা। তন্দ্রাকে বলতাম, আমার শরীরটা ভালো নেই। ও আর আমাকে বিরক্ত করত না। ক্রমে ক্রমে অসুখের মাসিক নিয়মটা নিশ্চয়ই ও খেয়াল করেছিল, কারণ একবার এই মাসিক অসুখ নিয়ে ও বেশ একটা

স্থূল রসিকতা করে আমার সঙ্গে। আর আমিও স্বামীকে কী বলা উচিত না বলা উচিত, তার ওপরে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু ক্রমে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। অবশেষে ঠিক করলাম, আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়, তাই মাসে একবার করে শহরের বাইরে চলে যেতে লাগলাম। ওকে বলতাম ব্যবসার কাজে যেতে হচ্ছে। আমার ধারণা, ও অবিশ্বাস করত না। ওর কথাবার্তায় সন্দেহের কোনও সুর ছিল না, আর এই বাইরে যাওয়া নিয়ে অশ্লীল কোনও ঠাট্টাও করত না। ও জানত, রক্ষিতা পোষা অথবা মাসে একটা রাত পয়সা দিয়ে ফুর্তি লুটতে যাওয়া আমার চরিত্রের বাইরে। সুতরাং ও আমাকে বিশ্বাস করত। কোনও প্রশ্ন করত না।

আমি চলে যেতাম তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরের কোনও ছোট টাউনে। প্রতি মাসে এক নতুন টাউন বেছে নিতাম। গিয়ে উঠতাম কোনও ছোট সস্তার হোটেলে। কারণ, সস্তার হোটেলে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা কুৎসিত কোনও লোককে কেউ খেয়াল করবে না। সেখানে একটা ছোট্ট নোংরা ঘরে কাটিয়ে দিতাম ভয়ঙ্কর সেই দীর্ঘ রাত। অবস্থা যত খারাপই হোক না কেন, সারাটা রাত ঘর ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যেও বেরোতাম না। আর অবস্থা খারাপ কাকে বলে! ভীষণ ইচ্ছে করত বাইরে বেরিয়ে পড়তে। কী যেন একটা...করতে ইচ্ছে করত...হয়তো নগ্ন হয়ে জঙ্গলে ছুটে বেড়ানোর ইচ্ছেটা আবার মাথাচাড়া দিত। কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ করে সে ইচ্ছেকে দমন করতাম। ঘর ছেড়ে বেরোতাম না। ভেতর থেকে সবসময় দরজায় তালা দিয়ে রাখতাম। কেউ আমাকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখলে হয়তো আরও ভালো হত, কিন্তু হোটেলের কোনও বেয়ারাকে তো সে-অনুরোধ করা যায় না। তাতে লোকের সন্দেহ হত। সুতরাং নিজের মনের জোরের ওপর ভরসা করতেই হত। সৌভাগ্যবশত আমার মন অত্যন্ত শক্ত, তাই কোনওরকমে সব সামলে নিতাম। সময়ে সময়ে অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ত, কিন্তু তাও হার স্বীকার করিনি।

আরও পরে যখন বুঝলাম ব্যাপারটা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন পাতালঘরের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এ-পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই মাথায় ঘুরছিল। সুতরাং তন্দ্রাকে অসুখের কথা সব খুলে বললাম। সে যে কী কষ্ট। তন্দ্রা বুদ্ধিতে দুনিয়ার সেরা নয়, তাই প্রথমটায় পুরো ব্যাপারটা ইয়ার্কি মেরে উড়িয়ে দিল। বিশ্বাসই করতে চাইল না। ভাবল, আমি ঠাট্টা করছি। কিন্তু যখন কন্ট্রাক্টর ডেকে পাতালঘর তৈরির কাজ শুরু করলাম, তখন ও বুঝতে পারল আমি ঠাট্টা করছি না। হয়তো ভাবল, আমার মাথার ঠিক নেই। নাঃ, সে-কথা ও মুখে কখনও বলেনি। তবে ওর চাউনিতে সেটা স্পষ্ট বোঝা যেত। যখন পাতালঘরের দেওয়ালে গদি মোড়ার কাজ শুরু হল, তখন ও আপনমনেই গজগজ করত আর মাথা নাড়ত। যেন বলতে চাইত, এ-পাগলামির কোনও মানে হয়। কোনও মানে হয় এসব পণ্ডশ্রমে সময় নষ্ট করার? এ-মনোভাব হওয়াটাই স্বাভাবিক। ওকে একটুও দোষ দেওয়া যায় না।

অবশ্য এখন ও বোঝে। ধীরে-ধীরে বুঝতে পারছে। যদিও মাঝে মাঝে বোকার মতো ভুল করে, শরীরের আর মনের অসুখের পার্থক্যটা বুঝতে চায় না, বুঝতে চায় না স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকের তফাত। পারবে, সময় হলেই পারবে।

পাতালঘর তৈরি হয়েছে আজ ছ'মাস। প্রতি মাসেই সে ঘরে আমাকে যেতে হয়েছে, আর তন্দ্রাও বিনা প্রশ্নে ওর কর্তব্য পালন করেছে। ও বউ হিসেবে খুব ভালো। মাঝে-মাঝে ওর নির্বুদ্ধিতায় বা অবুঝ ব্যবহারে আমি যে সামান্য বিরক্ত হই, সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সংসারে এমনটা হয়েই থাকে—বিশেষ করে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বুদ্ধির তফাতটা এত বেশি।

আমার বউকে নিয়ে আমি খুশি। ওর দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে আমাকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে। অবুঝ বলে ক্ষমা করতে হবে। ওর মনে কোনওরকম আঘাত দিলে চলবে না। আঘাত আমি কাউকে কখনও দেব না...।

৯ জুন

প্রতি মাসের সেই বিশেষ রাতে তন্দ্রার আড়ষ্ট ব্যবহারকে আমি কখনও দোষ দিইনি। এর সূত্রপাতের জন্যে আমিই দায়ী। যদিও আমার ভূমিকা ছিল নিরুপায় দর্শকের মতো। কারণ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি, কেউ কখনও এসে মাঝরাতে পাতালঘরের দরজা খুলে আমাকে স্বাধীনতা এবং মুক্তি দেবে। তখন আমি—কিংবা সেই ভয়ঙ্কর-আকস্মিক সেই ঘটনায় বিহ্বল, হতচকিত। তারপর পাতালঘরের সিঁড়ির ধাপে আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি লোকটাকে। তার দু-চোখে উদগ্র কৌতূহল, ক্রমে ক্রমে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে নিঃসীম গাঢ় আতঙ্ক সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে...তারপর...।

না, প্রথম থেকে গুছিয়ে শুরু করাই ভালো।

পাতালঘর তৈরির পর সেটা দ্বিতীয় মাস। নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পরিবর্তনটা তখনও আমার ভালো করে সয়ে ওঠেনি। পাতালঘরে যাওয়ার সময় হয়ে এলেই মনটা কেমন অস্থির হয়ে পড়ে, মেজাজ হয়ে ওঠে রুক্ষ। তখনও পর্যন্ত তন্দ্রা বেশ সহজভাবেই আমার কাছাকাছি থাকত। সেদিনও ছিল।

দিনটা সকাল থেকেই ছিল মেঘলা। তার ওপরে ডিসেম্বরের শীত, সন্ধে হতেই অঝোরে বৃষ্টি নামল। সে-বৃষ্টির বিরাম নেই। মনে আমার মিশ্র অনুভূতি। একই সঙ্গে বাইরের বৃষ্টির কথা, তন্দ্রার কথা ও আমার অসুখটার কথা ভাবছিলাম। চিন্তার সূত্র হঠাৎই টুকরো-টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দে। ভীষণ ব্যস্ততায় কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

আমার বিরক্তি আচমকা বেড়ে উঠল। সাধারণত পাতালঘরে যাওয়ার আগে আমি চুপচাপ থাকি, তন্দ্রার সঙ্গেও বেশি কথা বলি না। কিন্তু এ তো দেখছি অপ্রত্যাশিত উপদ্রব!

তন্দ্রা ঘরে এল। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ দরজা খুলবে কি না। আমি সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে কিছুক্ষণ হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত থেকেছি। সংবিৎ ফিরে দেখি তন্দ্রা দরজা খুলে দিয়েছে এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বছর পঁয়তিরিশের একজন পুরুষ। গায়ে বর্ষাতি, হাতে ব্রিফকেস। মাথার চুল ভিজে লেপটে আছে কপালের ওপর। গাল বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

‘এ অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।’ কপালের ভিজে চুল সরিয়ে সে বলল, ‘কিন্তু কী করব বলুন, ঝড়-বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে ফেলেছি’—তন্দ্রার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরে বসে থাকা আমাকে দেখল আগন্তুক।

তন্দ্রা আমার দিকে একপলক তাকিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ করে বলল, ‘আসুন—ভেতরে আসুন।’

আগন্তুক ভেতরে ঢুকল। তার বর্ষাতি থেকে জল ঝরতে লাগল। তন্দ্রা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

‘নমস্কার—’

তাকিয়ে দেখি লোকটি আমার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি নির্লিপ্তভাবে একটা হাত তুলে প্রতিনমস্কারের ইঙ্গিত করলাম। তারপর মনোযোগ দিলাম একটা বইয়ের দিকে। আড়চোখে লক্ষ করলাম, তন্দ্রা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার অসহযোগী মনোভাব আগন্তুক ও তন্দ্রাকে বিব্রত করে তুলল। ও লোকটিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে। যাওয়ার সময় ব্রিফকেসটা আমার চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে তন্দ্রাকে অনুসরণ করল সে। তার বিদায়ী হাসির উত্তর জানাতে সামান্য হাসতে চেষ্টা করেছি, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছি। আমি সহজভাবে হাসতে পারছি না। ঠোঁটে টান লাগছে।

ওরা চলে যেতেই হাতের বই রেখে ঝটপট উঠে দাঁড়ালাম। মুখের ওপর হাত বুলিয়ে চিৎকার করে ডাকতে চাইলাম তন্দ্রাকে। কথা জড়িয়ে গেল। বাইরের বজ্রপাতের শব্দে, বৃষ্টির শব্দে সে চিৎকার আরও

অস্পষ্ট শোনাল। কিন্তু দেখি, তন্দ্ৰা হঠাৎই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের কোনও ইশারা ওকে জানিয়ে দিয়েছে—আর সময় নেই। কার্যকারণহীন ভয় ফুটে উঠেছে ওর চোখেমুখে। ‘চলো’ ধীর স্বরে ওকে বললাম।

‘চলো—’ ও পাতালঘরে নামার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ওকে অনুসরণ করে আমি সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, সেই অচেনা আগন্তুক বিস্ময় এবং কৌতূহল নিয়ে দূর থেকে আমাদের লক্ষ করছে।

পাতালঘরের দরজা বন্ধ করার ঠিক আগে শান্ত গলায় তন্দ্রা বলল, ‘ভদ্রলোক সেলম্যান—বলছেন, কাল সকালেই চলে যাবেন—রাতটা বসবার ঘরেই কাটিয়ে দেবেন—’

উত্তর দিলাম না। উত্তর দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা আমার নেই। কিন্তু মনে-মনে বললাম, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তন্দ্রা। তারপর শেষবারের মতো ওর চোখে তাকালাম। অথচ অবাধ্য দৃষ্টি যে ওর গলার আঁকাবাঁকা নীল শিরার দিকে ছুটে যেতে চায়!

দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে দিল তন্দ্রা। তালা দিতে যাবে, সিঁড়ির দরজা থেকে কেউ যেন ওকে ডাকল। হয়তো আমাদের অতিথি তন্দ্রাকে বা আমাকে খোঁজার ভান করে পাতালঘরের কাছে নেমে আসতে চায়। কানে এল তন্দ্রার দ্রুত পায়ের শব্দ। তালা না দিয়েই ও সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সুতরাং ঘরের এক কোণে বসে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রইলাম...।

এর পরের ঘটনা স্মৃতির পাতায় বিক্ষিপ্ত, ঝাপসা অথচ ইঙ্গিতময়। রাত হয়তো তখন অনেক হবে—ওটা পাতালঘরের ভেতরে বন্য আক্রোশে দাপাদাপির চূড়ান্ত করছে—হঠাৎ শোনা গেল দরজার খিল খোলার শব্দ। ওটা চকিতে থেমে যায়। ওত পেতে বসে...পাতালঘরের দরজা ধীরে-ধীরে খুলে যায়...দরজায় দাঁড়িয়ে এক পুরুষের ছায়ামূর্তি। প্রথম নজরে সে কিছু দেখতে পায়নি। তাই কী ভেবে ফিরে যায় সিঁড়ির দিকে। এমন সময় ভয়ঙ্কর জিঘাংসা পাতালঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। মুক্তি। আগন্তুক থমকে দাঁড়ায় সিঁড়ির ধাপে। ফিরে তাকায়। তার দু-চোখে নিঃসীম গাঢ় আতঙ্কের বন্যা। চিত্রার্পিত শ্লথ ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন তার মানসিক ভারসাম্য পুরোপুরি লোপ পেয়েছে...।

সকালবেলায় পাতালঘরের বাইরে আমাকে আবিষ্কার করে তন্দ্রা ভীষণ অবাক হল। ওপরে এসে, পাতালঘরের খিল কে খুলল, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আমি প্রথমে নিস্পৃহ ভাব দেখালাম। পরে বললাম, ‘ওই সেলসম্যান ভদ্রলোক হয়তো চলে যাওয়ার আগে খুলে দিয়ে থাকবেন।’

উত্তরে তন্দ্রার চোখে যে-ভয় ও দ্বন্দ্ব ফুটে উঠল তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ও আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে চেয়ারের পাশে রাখা অক্ষত ব্রিফকেসটার দিকে একটা আলতো দৃষ্টি ছুড়ে দিল। কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমার স্ত্রী ওই আগন্তুকের অন্তর্ধানের আসল কারণ তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। ওর ভয়, সন্দেহ, দ্বিধা—সবই ছিল অনুমাননির্ভর।

মাঝরাতের ঘটনার ধারাবাহিকতা আমার স্মৃতির নাগাল এড়িয়ে গেলেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সে তার মাইলফলক গেঁথে রেখে গেছে। নইলে এখনও আমার মনে পড়ে কেন সেই বৃষ্টিঝরা রাতের কথা? যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, আমি মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলেছি, আর আমার ঠিক সামনেই কারও ছুটন্ত পায়ের শব্দ...দুঃস্বপ্নের ঘোরে কেউ মরণপণ ছুটে চলেছে। আমি নিজেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেও ওটা বাঁধ মানে না। তীব্র আবেগের প্ররোচনায় এগিয়ে চলে। অবশেষে সেই আগন্তুক অন্ধকার ভিজে পথে দিক ঠাহর করতে পারে না। আগাছা ও জঙ্গলের সীমা শেষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতল খাদে। তার চিৎকার আমি শুনতে পাইনি। চিৎকার করার ক্ষমতা তার ছিল না। অন্ধ ক্রোধ ও হতাশায় ওটা ফুঁসে উঠতে লাগল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে চলল...।

বাড়িতে ফিরে এসেও ওই প্রাণীটার রাগ কমেনি। সারা বাড়ি টহল দিয়ে বেড়িয়েছে। বেশ মনে পড়ে, তন্দ্রার শোয়ার ঘরের দরজার বাইরে ঘাপটি মেরে বসে ওটা অপেক্ষা করছিল...একবার দরজায় চাপ দিয়ে পর্যন্ত দেখেছে...দরজা খোলেনি...বন্ধ। অথচ আমি জানি, তন্দ্রার কোনও ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ওটা সবসময় তো আমার কথা শোনে না। অস্থির হয়ে পড়ে।

অবশেষে আবার সচেতন হয়ে উঠলাম। আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। পাতালঘরে ফিরে গিয়ে এক কোণে শ্রান্ত শরীরে বসে রইলাম। তন্দ্রা এসে আমাকে খোলা ঘরে আবিষ্কার করল...।

এ-ঘটনায় আমি সাবধান হইনি...হওয়ার কথাও নয়। অন্যের গোপনীয়তায় কেউ এসে আচমকা অধিকার জাঁকিয়ে বসুক, এ আমি একটুও পছন্দ করি না। পাতালঘরে কাউকে আমি আসতে বলিনি, খিলও খুলতে বলিনি। তবে কেন এসেছিল সেই আগন্তুক? অসুখের সময়ে কেউ আমাকে দেখবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তা ছাড়া তার গায়ে আমার আঁচড়টি পর্যন্ত পড়েনি...সে নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছিল। এত সব চিন্তা করে মনে হয়, যতটা প্রয়োজন ততটা গুরুত্ব বোধহয় অসুখটাকে আমি দিইনি।

৯ জুন, সন্ধ্যা

না, সব কথা এখনও খুলে বলিনি। তাই অস্বস্তি হচ্ছে। কোনও মিথ্যে ঘটনা লিখেছি তা নয়, তবে হোটেলের সেই মাতালটার কথা এখনও আমি বাদ রেখে দিয়েছি। সব কথাই তো আমাকে লিখতে হবে, নইলে এই ডায়েরি লেখার মানে কী! সুতরাং তার কথাই এখন লিখব। অবশ্য তার সঙ্গে এমন কিছু হয়নি যার জন্যে আমাকে দোষ দেওয়া যায়।

এ-ঘটনা ঘটে পাতালঘর তৈরির আগে। শেষ যে-রাতটা আমি শহরের বাইরে হোটেলে কাটিয়েছিলাম সেই রাতে। তখন পাতালঘর তৈরির কথা ভেবেছি, কিন্তু তন্দ্রার জন্যে ঘর তৈরির কাজে হাত দিতে পারিনি। কারণ, তাহলে ওকে আমার অসুখের সব কথাই খুলে বলতে হয়। মনে হয়, ওই মাতাল লোকটার ঘটনাই শেষ পর্যন্ত আমাকে মনস্থির করতে বাধ্য করে। সেই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারি, পরিস্থিতি-বিশেষে আমি কীরকম বিপজ্জনক হয়ে উঠি। আমার নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা কীরকম পলকা হয়ে যায়। মোটের ওপর, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে, কারণ সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি তৈরি হল পাতালঘর। তা ছাড়া এখনও বলব, আমি নির্দোষ। সে-রাতে যা হয়েছে তার জন্যে আমি দায়ী নই। দায়ী ছিল ওই মাতালটা নিজেই। ঠিক বৃষ্টিভেজা রাতের সেই আগন্তুকের মতো...।

সেটা ছিল একটা সস্তা দরের নোংরা হোটেল। অন্যান্য যেসব হোটেলে উঠতাম সেগুলোর মতোই—বেশ মনে আছে। একটা সরু গলির মধ্যে হোটেলের ঢোকার দরজা। দরজায় পুরোনো একটা সাইনবোর্ড। রঙ চটে গেলেও বোঝা যায় এককালে হোটেলের নামটাই লেখা ছিল। ঢুকতেই চোখে পড়ে ফাটলধরা ময়লা বারান্দা। ডান দিকে চুন-বালি খসা একটা ছোট্ট ঘর, অফিসঘর। আরও এগিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। বিভিন্ন অসমান ধাপে ঘুরপাক খেয়ে উঠে গেছে সিঁড়িটা। অফিসঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই। দু-চারবার ‘কেউ আছেন নাকি?’ বলে চিৎকার করতেই ঢুলু ঢুলু চোখে একটা রোগা চেহারার লোক সিঁড়ির নীচের ফোকর থেকে বেরিয়ে এল। পরনে ময়লা পাজামা, আর চেক চেক ছাপা শার্ট। আমার মুখের কাছে এসে হাই তুলে প্রশ্ন করল লোকটা, ‘কী চাই?’

বমি পেল। হাইয়ের সঙ্গে ভেসে এল দিশি মদের কদর্য গন্ধ। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল সেটা কী ধরনের হোটেল। কারা রাত কাটাতে আসে সেই হোটেলে। সেই মাতালটাও এসেছিল। এসব লোকের মরে

যাওয়াই ভালো।

লোকটা টেবিলের পেছনে গিয়ে কোত্থেকে একটা ময়লা খাতা বের করে তাকাল আমার দিকে।

শান্ত স্বরে বললাম, 'রাতটা থাকতে চাই।'

লোকটা এক হাত পেতে অন্য হাতে খাতাটা খুলে এগিয়ে দিল আমার দিকে। একশোটা টাকা দিয়ে নাম সই করলাম খাতায়। লোকটা জড়ানো গলায় বলল, 'আরও পঞ্চাশ টাকা দিন।'

বুঝলাম গলা কাটছে, তবুও আপত্তি করলাম না। আমার হাতে নষ্ট করার মতো বেশি সময় নেই।

আমার মুখে তিন-চারদিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কোনও হোটেলে গিয়ে ওঠার আগে দু-তিনদিন আমি দাড়ি কামাতাম না। কারণ অসুখের সময় কেউ যদি আচমকাই আমাকে দেখে ফেলে, তাহলে অবাক হয়ে ভাববে এত তাড়াতাড়ি, মাত্র দু-তিন ঘণ্টায় কী করে কোনও লোকের মুখময় দাড়ি গজায়। ব্যাপারটা ছোট্ট হলেও মারাত্মক। তাই আমি সাবধান থাকি। কেউ আমাকে কখনও সন্দেহ করেনি। অবশ্য আজকের যুগে কে-ই বা এসব নিয়ে মাথা ঘামায়! আজ মনস্তত্ত্ববিদদের যুগে আমি এক কিংবদন্তি।

লোকটা নিজেও দাড়ি কামায়নি। হয়তো এই হোটেলের কেউই দাড়ি-টাড়ি কামায় না। দেড়শো টাকা পকেটে ঢুকিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে আমাকে একটা চাবি দিল সে।

'রুম নম্বর তিন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ-দিকে।'

তারপর আমাকে একা রেখেই টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

ওপরে ঘরে গিয়ে হাতের সুটকেসটা এক কোণে রাখলাম। ভেতর থেকে খিল-ছিটকিনি দিয়ে দরজা ভালো করে বন্ধ করলাম। সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। জামাকাপড় ছাড়লাম না। ঘরে জানলা একটাই। ছোট। সবক'টা গরাদে নেই। জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়াল চোখে পড়ে। সুতরাং চাঁদ দেখতে পেলাম না। চাঁদ না দেখলে পরিবর্তনের সময় ভীষণ কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয় অমানুষিক। আর সেইজন্যেই চাঁদটাকে আমি সবসময় কল্পনা করে নিই, অন্ধকার আকাশে বিশাল হলদে থালার মতো। ওই নোংরা ছোট ঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে কী ইচ্ছেটাই না করছিল। মনে আছে, কী ভয়ঙ্কর ধৈর্য নিয়ে আমি প্রতীক্ষায় থেকেছি। ভগবানকে ডেকেছি, যাতে পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি এসে আবার তাড়াতাড়ি চলে যায়। বারবারই উঠে জানলার কাছে গেছি, ঘরে পায়চারি করেছি, এক কোণে রাখা কুঁজোর নোংরা জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপটা মেরেছি। তারপর নিশ্চয়ই আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম, কারণ পরের যে-ঘটনা মনে পড়ে তাতে আমার শরীরে পরিবর্তন এসে গেছে। আমি চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, খালি এপাশ-ওপাশ করছি, সেইসঙ্গে অধীর ক্রুদ্ধ গর্জন। সারা
শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছে। বিছানাও ভিজে। শরীরের তলায় বিছানার সস্তা ছাপা চাদর কুঁচকে গেছে। এক হাতে চেপে ধরে আছি খাটের মাথার কাছে কাঠের বাজু। সে হাত আর আমার হাত নয়—পালটে গেছে। অবস্থা ভীষণ খারাপ। যেন প্রচণ্ড জ্বরে ভুল দেখছি। কিন্তু শরীরের শক্তি আমার কমেনি, তাই কোনওরকমে সে যন্ত্রণা সহ্য করছি আর ভাবছি এত খারাপ অবস্থা আগে কখনও হয়নি।

তার ঠিক পরেই শুনতে পেলাম বারান্দা ধরে হেঁটে আসা মাতালটার পায়ের শব্দ। মাতালদের আমি বরাবরই ভীষণ ঘৃণা করি—শুধু মাতাল কেন, যারা ওষুধ বা মাদকদ্রব্য ছাড়া সুখী হয় না, সন্তুষ্ট হয় না, কিংবা যারা জীবনধারণের জন্যে কৃত্রিম সাহায্যের আশ্রয় নেয়, তাদেরও। এই মাতালটা তারস্বরে চিৎকার করে গান গাইছিল আর পায়ে বিচিত্র শব্দ তুলে এগিয়ে আসছিল।

সে যখন আমার ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল তখনও আমি নিশ্চল নিস্পন্দভাবে শুয়ে। নিশ্চয়ই লোকটা ঘর ভুল করে থাকবে, কারণ সে এসে থামল আমারই দরজার সামনে। ঠেলে খুলতে চেষ্টা

করল দরজা। তারপর দুমদুম করে ধাক্কা মারতে শুরু করল। আর জড়ানো গলায় বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল বারবার যে, তার ঘরে কোন হতভাগা এসে ঢুকেছে।

সব শুনেও আমি নিজের জায়গায় নিথর। আমার চোখ কোটরে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ঘুরছে, ঠোঁটে আমার ফেনার রাশি। লোকটার অশ্রাব্য গালিগালাজে তার প্রতি এক প্রলয়ঙ্কর ঘৃণা আমাকে পেয়ে বসল। এ রকম ঘৃণা আমি কখনও কাউকে করিনি। একটা বীভৎস ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মনে খেলে গেল...যদি মাতালটার প্রচণ্ড ধাক্কায় এই সস্তা দরজার পলকা খিল ভেঙে পড়ে? যদি ঘরে ঢুকে লোকটা আমার এই অবস্থা দেখে? ক্রোধে আতঙ্কে আর চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম, ছুটে গেলাম দরজার কাছে, দরজায় কান পেতে ঝুঁকে পড়লাম। শুনতে চেষ্টা করলাম।

লোকটার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ও চাপা জড়ানো স্বগতোক্তি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। দরজাটা চেপে ধরলাম, যাতে মাতালটার আক্রমণে সেটা ভেঙে না পড়ে। আমার গায়ে এখন অমানুষিক শক্তি, কারণ আমি এখন আর 'আমি' নই, পালটে গেছি। খিল ভেঙে দরজা খোলে কার সাধ্যি! গালের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতেও খসখসে হাতে দরজাটা বড় মোলায়েম ও গরম ঠেকল।

দরজার ধাক্কা ক্রমে প্রচণ্ডতা ও কম্পাঙ্কে বাড়তে লাগল। ভয় পেলাম, এই শব্দে হোটেলের সবাই হয়তো জেগে উঠতে পারে, তারপর ঝঞ্ঝাট হতে পারে। হয়তো সেই পাজামা পরা ম্যানেজারটা—হয়তো ম্যানেজারই হবে—এসে বলবে, দরজা আমাকে খুলতেই হবে। তখন? নিঃশব্দে প্রতীক্ষায় রইলাম। শরীরের ভেতর রক্ত ফুটছে টগবগ করে, উথলে উঠছে গলা দিয়ে। লোকটা শব্দ করেই চলল। মনে হয়, সেই মুহূর্তেই আমি দরজা খুলেছিলাম।

না, লোকটাকে কোনওরকম আঘাত আমি করিনি। কিন্তু আমাকে দেখার পর তার সেই চোখের দৃষ্টি আমি কোনওদিন ভুলব না। তার চোখ, মুখ...লোকটা চকিতে এক পা পিছিয়ে গেল। আমারও ভীষণ ইচ্ছে হল এগিয়ে যাওয়ার, কিন্তু জানি, সেটা কোনওমতেই ঠিক হবে না। হয়তো জায়গায় দাঁড়িয়েই বিদ্যুৎঝলকের মতো লোকটাকে আক্রমণ করেছিলাম, ভালোমতো মনে নেই। কারণ আচমকাই লোকটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। যেন ভেজা কাপড়ের এক পুঁটলি। আর তা থেকে অ্যালকোহল ও রক্তের মিশ্র বীভৎস গন্ধ বেরোচ্ছে।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম। আমার আঙুল বাতাস আঁকড়ে ধরছে। তারপর নিজেকে সামলে নিলাম। সজোরে দরজা বন্ধ করে আবার খিল ও ছিটকিনি এঁটে দিলাম ভেতর থেকে। মনে আছে, দরজায় হেলান দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাঁফিয়েছি। নিশ্চয়ই ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জেগে উঠে মাতালটা আরও লোকজন ডেকে আনবে এবং তারা দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকবে। তার মধ্যেই আমাকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে, হয়তো এই ভয়ই অনুঘটকের কাজ করে থাকবে, কারণ সঙ্গে-সঙ্গেই আমি আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছি, আর যখন চোখ খুললাম, দেখি আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছি।

পরদিন সকালে সেই ম্যানেজারকে ভীষণ উত্তেজিত দেখলাম। শুনলাম, একটু আগেই মাতালটার দেহ সরানো হয়ে গেছে। ম্যানেজার আমাকে জিগ্যেস করল, 'রাতে কোনও গোলমাল শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, বাইরের বারান্দায় কেউ যেন গান গাইছিল—মাতাল অবস্থায়।'

এবার সে বলল, 'হোটেলের একজন বোর্ডার গত রাতে মারা গেছে। আপনার ঘরের দরজার কাছে তার ডেডবড়ি পড়ে ছিল।'

আমি ভীষণ অবাক হয়ে সে-বিষয়ে আরও প্রশ্ন করলাম।

ম্যানেজার বলল, 'দেখে মনে হয় ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। এ ছাড়া অন্য কারণ তো দেখছি না। একজন বেয়ারা আমাকে বলছিল, ভদ্রলোক নাকি নীচে খাওয়ার ঘরে বসে বোতলের পর বোতল মদ

গিলছিলেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নিশ্চয়ই তাঁর অনেক পরিশ্রম হয়েছে। সেই ধকলটাই তিনি আর সইতে পারেননি। জানেন তো, মদ খেলে হার্টের কীরকম ক্ষতি হয়? একেবারে শেষ করে দেয়। তা ছাড়া ভদ্রলোকের কপালের পাশে, ঠিক রগের কাছটায়, একটা বড় কাটা দাগ ছিল। সেটা হয়তো পড়ে যাওয়ার সময় হয়ে থাকবে—'

এবং মৃত্যুর ব্যাপারটা যাতে ধামাচাপা পড়ে সে-বিষয়ে মোটামুটি ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছেন।

এই হল হোটেলের সেই মাতালের কাহিনি। এতে আমার কোনও দোষ ছিল না। আমি তাকে কোনওরকম আঘাত করিনি।

১১ জুন

লাইব্রেরিয়ান মহিলাটি আজকাল আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। এ-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভীষণ ভয় পেয়েছি। কোনও কিছু সন্দেহ করার মতো বুদ্ধি তার আছে বলে কখনও ভাবিনি, কিন্তু এখন দেখছি, না ভেবে ভুল করেছি...যেসব ব্যাপার বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিছক হেসে উড়িয়ে দেয়, এ-মহিলা সে সব বিশ্বাস করতে রাজির চেয়েও বেশি। অর্থাৎ আমার পক্ষে দারুণ বিপজ্জনক। জানি না এখন কী করব। লাইব্রেরিতে আর যাব না, কিন্তু সে যদি ইতিমধ্যেই আমাকে সন্দেহ করে থাকে...কী জানি। এরকম একটা বোকা মেয়েছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও মানে হয়!

আজ লাইব্রেরিতে গিয়েই মহিলাটি সম্পর্কে আমার সন্দেহের সূত্রপাত। তার টেবিলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় রোজকার মতো সৌজন্যের হাসি বিনিময় হল, কিন্তু লক্ষ করলাম, তার টেবিলে একটা ক্যালেন্ডার রয়েছে।

সকলের চোখের সামনে প্রকট ক্যালেন্ডারটা, যেন সে কোনও তারিখ খুঁটিয়ে দেখছে। আগে ওখানে কোনও ক্যালেন্ডার ছিল না। তাহলে এখন, আজ, হঠাৎ কেন এল? লাইব্রেরির কোনও বই মেম্বাররা নিয়ে ক'দিন করে আটকে রাখছে, এ যদি জানা প্রয়োজন হয় তাহলে ক্যালেন্ডার তো বরাবরই তার কাছে

থাকবে। তাছাড়া, বইয়ের পেছনে তো তারিখের ছাপ মারা থাকে। উহুঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কবে কবে পূর্ণিমা আছে সেটা দেখার জন্যেই ক্যালেন্ডারটা আনা হয়েছে।

ওটা দেখামাত্রই এ-কথা আমার মনে এসেছিল, কিন্তু তখনও এতটা নিশ্চিত হতে পারিনি। হয়তো মহিলাটি নির্দোষ হলেও হতে পারে। সন্দেহের অবকাশে সবাইকেই আমি রেহাই দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু যখন সে পেছনের অন্ধকার ঘর পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে এল...

লাইব্রেরির পেছনের ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার। বড়-বড় গবেষণার বইগুলো ওই ঘরেই থাকে। ও-ঘরে খুব একটা কেউ যায় না। সেখানে পুরোনো একটা বই দেখছি, হঠাৎ লাইব্রেরিয়ান সে-ঘরে এল। দু-হাত ভরতি বই। যেন তাকে রাখতে এসেছে, এরকম ভান করতে লাগল। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেবে একটা মেয়েছেলে!

সে আমাকে লক্ষ করছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বোকা-বোকা হাসল। আবোল-তাবোল কী একটা বলল—আমি একদৃষ্টে তাকিয়েই আছি—তারপর বইগুলোকে উলটোপালটা জায়গায় কোনওরকমে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিয়ে ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে গেল। মহিলাটি হাঁটে ভারি বিশ্রীভাবে। চলার সময় তার পেছনটা অশ্লীল ইশারায় খারাপভাবে দুলতে থাকে। তার চেহারা মোটাসোটা অথচ নোংরা। বয়েস হয়েছে, তবে সে রকম ছাপ পড়েনি। বহুবার দেখেছি, অল্পবয়েসি ছেলেরা টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলছে। এমন ভান করছে, যেন কয়েকটা বই সম্পর্কে তাদের ভীষণ কৌতূহল। মেয়েটা যে বদ

স্বভাবের তা আমি ভালোই জানি। সে যে এখনও আইবুড়ি তাতে আর আশ্চর্য কী! দেখে তো সতী বলেও মনে হয় না। কিন্তু ও যে সন্দেহ করছে, তাতে আমি ভয় পাচ্ছি। মেয়েটা বিপজ্জনক। জানি না, হুট করে কী করে বসবে...।

বেরোনোর সময় সে আমার সঙ্গে গায়ে পড়েই আলাপ করতে চাইল। আমি কেন তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি সে-কথা জিগ্যেস করল। অর্থাৎ জোর করে আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়, গাঢ় করতে চায় পরিচয়-সৌজন্যের সূক্ষ্ম রেখা। সংক্ষেপে ও নীরবে। তার কথায় সায় দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পেছনে না তাকালেও বুঝতে পারলাম তার লোভী চোখ আমার শরীরে এখনও আমূল বিদ্ধ।

এবারে বুঝেছি ভদ্রমহিলা কেন আমার সঙ্গে আলাপ গড়ে তুলতে চায়, যাতে সে আমার সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে পারে। সে ভান করছে যেন আমার সঙ্গে ছেনালি করছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য। আরও অনেক গভীর। কিন্তু ছেনালি নষ্টামি করার জন্যে আমার মতো মানুষকে বেছে নিয়ে সে বিরাট ভুল করেছে। তার বোঝা উচিত ছিল।

অবশ্য এর পরেও স্বীকার করব, ভদ্রমহিলা হয়তো সত্যিই আমার সঙ্গে আলাপ জমাতে চায়। জানি, মেয়েদের কাছে আমার চটক আছে। আর এ তো সামান্য এক নষ্ট মেয়েছেলে। হয়তো এর একগাদা পুরুষবন্ধুও আছে। কিন্তু তাকে দেখে তন্দ্রার চেয়েও সাদাসিধে মনে হয়। তা যদি হয়, তাহলে আর ভয়ের কিছু নেই। অবশ্য তা বলে কোনও মেয়ে এভাবে কোনও বিবাহিত সুখী পুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করবে, এ অত্যন্ত জঘন্য। এ-ধরনের মেয়েদের মরে যাওয়াই উচিত। এদের বেঁচে থাকা ঠিক নয়, সমাজকে এরা দূষিত করে।

নাঃ, হঠাৎ করে লাইব্রেরিতে যাওয়া বন্ধ করাটা মোটেও ঠিক হবে না। এতে তার সন্দেহ আরও বাড়বে। বরং মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে দেখি, ও আমার সম্পর্কে ঠিক কতটুকু জানে...।

১৫ জুন

আজ আবার লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। আবারও মেয়েটা আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে। এবার তার সঙ্গে মিনিটকয়েক কথা বলেছি তার হাবভাব বোঝার জন্যে। কিন্তু সে যে কী ভাবে, তা বলা মুশকিল। এ-ধরনের মেয়ে সম্পর্কে খুব একটা অভিজ্ঞতা আমার নেই। এ-মেয়েটা যেন আমাকে লোভ দেখাচ্ছে। কী সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু আমার সন্দেহ একেবারে হয়তো অমূলক নয়। এমন কোনও প্রশ্ন আমাকে সে জিগ্যেস করেনি যাতে মনে হতে পারে যে, সে আমাকে সন্দেহ করে। কিন্তু যেভাবে জোর করে সে আলাপের জের টেনে চলেছে তা দেখলে রীতিমতো ঘেন্না হয়। নিজের ভয়ঙ্কর রাগ চেপে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপর মেয়েটা যখন পেছন নাড়িয়ে বুক ঝুঁকিয়ে বসল তখন আর একটু হলেই রাগে চিৎকার করে উঠেছিলাম।

মুখে দুষ্টু হাসি হেসে সে চোখ ঠেরে কথা বলছে। পরনে তার আঁটোসাটো বুক খোলা একটা ব্লাউজ, (তন্দ্রা সেদিন যেরকম পরেছিল?)। তাতে যে-কারণে ব্লাউজ পরা, সেই কারণ নিজেই অর্ধেকের বেশি প্রকট। একটা মেয়ের যুবতী শরীরকে ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে টেনে বের করে নিলে কীরকম হয়? ক্যালেন্ডারটা আজও টেবিলে রয়েছে, কিন্তু আড়চোখে চেয়ে দেখি তাতে চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির পালা দাগ দেওয়া নেই। সুতরাং মনে হয় না, একে আর ভয় পাওয়ার কোনও কারণ আছে। আমি যতটা ভেবেছিলাম মেয়েটা তার চেয়েও বেশি বোকা।

এরপর কবিতার বই নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, কয়েকটা কবিতা পড়ার ভানও করলাম, যাতে তাকে ভুল পথে ঠেলে দেওয়া যায়। কবিতা আমার একটুও ভালো লাগে না। যতসব বাজে জঞ্জাল। কিন্তু

মেয়েটাকে বোকা বানানো গেছে। এখন শুধু ভগবানকে ডাকছি, যেন কেউ মেয়েটার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে না দেখে থাকে। তাতে লোকে আমাকে ভুল বুঝবে। আমি লম্পট নই।

২৪ জুন

আজ লাইব্রেরিয়ানের আসল মতলব বোঝা গেল। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই— মেয়েটা নষ্ট চরিত্রের। আমার অসুখ নিয়ে কোনও সন্দেহ সে করেনি। সে নেহাতই আমাকে চায়। আমার ধারণা, পুরুষদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করাটাই তার পেশা। তাকে দেখে এ-ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে বলেই মনে হয়।

আজ বিকেলে আবার আমার পেছন পেছন মেয়েটা আঁধারি ঘরটায় এসেছে। তখন লাইব্রেরি প্রায় বন্ধ হওয়ার সময়, তাই গোটা লাইব্রেরিতে শুধু আমরাই একা ছিলাম। তার ঘরে ঢোকার শব্দ আমি শুনতে পাইনি। কারণ আমি একমনে পড়ছিলাম। উঁচু-উঁচু ব্যাকের মাঝে ঠিকরে আসা আলো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, সুতরাং চোখের নজরেও অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন। হঠাৎই দেখি ভদ্রমহিলা আমার ঠিক পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে উঠে সরে যেতেই খিলখিল করে হেসে উঠল সে। জিগ্যেস করল, ‘আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন বুঝি?’ চোখে এক অশ্লীল ইঙ্গিত। আমি কিছু বলে ওঠার আগেই আরও বলল, ‘আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অন্তত আপনার।’

তার চোখের বদ ঝিলিকে নষ্ট আত্মার ছায়া। চিকচিক করে জ্বলছে সেই চোখ। আর তাদের ভয়ঙ্কর রূপের দিকে মুগ্ধ আমি তাকিয়ে আছি। যেন চঞ্চল কোনও আগুনের শিখা আমার সামনে দপদপ করছে...কী অদ্ভুত তার সম্মোহনী শক্তি। কিন্তু কেন? কোনও নীতিবাগীশ লোককে নীচ প্রবৃত্তি ও অশুভ কেন এমনভাবে টানে? কেন সে পারে না চোখ ফিরিয়ে নিতে? পাপকে দেখার আতঙ্ক কি এতই প্রবল? শত চেষ্টা করেও পারলাম না অন্যদিকে চোখ ফেরাতে, আর অসভ্য মেয়েছেলেটা আমার ঘৃণাকে লিপ্সা বলে ভুল করল। আরও কাছে এগিয়ে এল আমার। কীসব বলল মনে নেই। আজেবাজে কিছু কথা। অশ্লীল হেসে কিছু একটা বলতে হয়, তাই বলল। মনে হয় জিগ্যেস করেছিল আমি কেন এত লাজুক আর শান্ত।

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। চেষ্টা করেও তার সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারিনি। মনে আছে, তাকে দেখে আমার কী প্রচণ্ড ঘেন্না করছে সে-কথা বলতে মুখ খুলেছিলাম, কিন্তু মুখে কথা আসেনি। আর তারপর সে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল আমার হাত। তার আঙুল আলতো করে ছুঁয়ে গেল আমার বাহু, কিন্তু তাতেই মনে হল সে-স্পর্শ যেন স্বয়ং শয়তানের। একটা বরফ-শীতল ঘৃণার স্রোত বাহু বেয়ে চলে গেল হাৎপিণ্ডে, সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল। বই, বইয়ের ব্যাক, দেওয়াল—সব কিছু মিলিয়ে গেল এক লাল কুয়াশায়। শুধু দেখা যায় তার জঘন্য মুখ—ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

মেয়েটা কি আমাকে চুমু খেতে আসছে? যদি ওই চড়টা না মারতাম তাহলে আমার বিশ্বাস সে সত্যি-সত্যিই আমাকে চুমু খেত। চড় যে মারব, সেটা কখন ঠিক করলাম জানি না। এ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আত্মরক্ষার তাগিদে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখন কীভাবে কাজ করে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং সেই কারণেই তাকে থামাতে হল। ভদ্রমহিলার গালে সর্বশক্তিতে এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দিলাম। আগে কখনও কোনও মেয়ের গায়ে হাত তুলিনি, কিন্তু এতে আমার দুঃখ নেই। এ-প্রাণীটা মেয়েছেলেরও অধম, মানুষেরও অধম। নিজের জীবনের কাছেই সে এক ঘৃণার বস্তু, পুরুষের শরীর শুষে বেঁচে থাকা এক জীবাণু।

চড়টা মেরেই আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে এসেছি ঘর থেকে। সে আর আমার পেছন-পেছন আসেনি। একটা কথাও বলেনি। মনে হয় আমার হাতে চড় খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। হয়তো পড়ে গেছে মাটিতে। সেটা দেখার জন্যে আর অপেক্ষা করিনি। সোজা লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে চলে এসেছি বাড়িতে। আমার হাত

এখনও কাঁপছে। এ এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। জানি, এ আমি কখনও ভুলব না। মনে শুধু এইটুকু আশা যে, ভালো কিছু অন্তত করতে পেরেছি। আমার বিচারবুদ্ধি ও আচরণ দেখে মেয়েটা বুঝবে যে, দুনিয়ার সব লোককেই বিকৃত কামের ফাঁদ পেতে নষ্ট করা যায় না।

২৪ জুন, রাত

সত্যি কথা বলতে কী এইমাত্র ভীষণ এক আঘাত পেয়েছি। অত্যাশ্চর্য কাকতালীয় সন্দেহ নেই। একটু আগে বিকেলের ডায়েরি লেখা শেষ করে নীচে গিয়েছিলাম রেডিয়োতে খবর শুনতে। লাইব্রেরিয়ানকে কেউ খুন করেছে মনে হয়। খবরে বলল, লাইব্রেরির পেছনের ঘরে ভদ্রমহিলাকে পাওয়া গেছে। দুটো উঁচু বইয়ের র‍্যাকের মাঝে তার দেহটা পড়ে ছিল। মাথায় পাওয়া এক প্রচণ্ড আঘাতে তার ঘাড় ভেঙে গেছে। মাথাটা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে পেছনদিকে। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা আমার সঙ্গে নোংরা মতলব হাসিল করার চেষ্টা করেছিল, মনে হয় এ ঘটনা ঠিক সেই জায়গাতেই ঘটেছে। আমার ধারণা, হয়তো একই রকম পরিস্থিতিতে ঘটেছে। পুরুষ দেখলেই পেছনের ঘর পর্যন্ত অনুসরণ করা তার স্বভাব ছিল, আর সেই জর্জর কাম অনুসরণে সভ্যতা-ভব্যতার লেশমাত্র থাকত না। মনে হয়, আমার কাছে প্রত্যাখ্যান পেয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে অথবা মরিয়া হয়ে ওঠে। জানি না, মনের জোর আছে এমন পুরুষের মুখোমুখি হলে এসব ইতর মেয়েছেলেরা কী করে। আমার অনুমান যে, সে আমার পরের পুরুষটিকে কবজা করে ফাঁদে ফেলার জন্যে আরও বেশি পরিশ্রম করেছিল। আর সেই লোকটি, অর্থাৎ খুনি, নিশ্চয়ই কোনও আদর্শবাদী মানুষ ছিল, আমারই মতো। মেয়েটার কদর্য ইঙ্গিতে নিজের রাগ সে আর সামলে রাখতে পারেনি। হয়তো সে মেয়েটাকে মারতে চায়নি —যদিও মরে গিয়ে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে—শুধু আমারই মতো এক বিরাশি সিক্কার চড় বসিয়ে দিয়েছিল। শুধু নিজেকে সংযত করতে না পারায় তার আঘাত হয়ে গেছে মারাত্মক। আমার ধারণা, এইরকমটাই হয়ে থাকবে। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। সে যাই হোক, ওই নোংরা মেয়েছেলেটার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। সে মারা গেছে ভালোই হয়েছে। বাঁচা গেছে।

আমার স্ত্রীও শুনল খবরটা, তারপর আমাকে জিগ্যেস করল, ‘যে-সময়ে মেয়েটা খুন হয় ওই সময়ে তুমি লাইব্রেরিতে ছিলে না?’

‘মনে হয় আমি বেরিয়ে পরার পরেই খুনটা হয়েছে।’

তন্দ্রাকে বললাম না যে, আমি জানি খুনটা কেন কীভাবে হয়েছে। তাতে ওর অস্বস্তি আরও বাড়ত। এ-ধরনের মেয়েছেলেও যে থাকতে পারে, তা ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না, বরং শুধুই দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে পড়বে।

‘তুমি তাহলে পুলিশে যাও।’ তন্দ্রা বলল, ‘তুমি হয়তো ওদের কোনও সাহায্য করতে পারবে।’

‘কী করে করব?’ বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘লাইব্রেরিতে তখন অন্য কোনও লোককে আমি দেখিনি। সুতরাং, শুধু-শুধু পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না।’

কিন্তু খুনিকে আমি মনে-মনে সমর্থন করি। খুন করা এক বীভৎস পাপ, মানছি, কিন্তু কিছু-কিছু পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন আছে। যখন কারও আদর্শ, নীতি বিপন্ন হয়, তখন খুব সহজেই মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, করে বসে এমন কাজ, স্বাভাবিক অবস্থায় যে-কাজের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তন্দ্রাকে এসব খুলে বলা যায় না। সময়ে সময়ে যে আইনের নীতি ঠিক নাও হতে পারে, সে কথা বোঝার মতো বুদ্ধি ওর নেই।

সুতরাং আমার উত্তর শুনে ও একমত হল। যদিও জানি, মনে-মনে ও ভাবছে, সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন আমি করছি না।

নিঃসন্দেহে পুলিশ আজ নয় কাল অপরাধীকে ধরবেই। হয়তো খুনি নিজেই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। বুঝবে, নেহাত আত্মরক্ষার তাগিদে প্রয়োজনে পড়ে খুনটা সে করেছে, এবং তার কাহিনি শুনে আদালত তাকে এমন কিছু কঠিন শাস্তি দেবে না। শাস্তি তাকে পেতে হবেই, কারণ সেটাই আইন, কিন্তু আমি ভাবছি তাকে শাস্তি না দিয়ে প্রশংসা করা উচিত। তার একমাত্র অপরাধ, নিজেকে সে সংযত করতে পারেনি—যে-অবস্থা আমার হয়েছিল। কিন্তু আমার কথা আলাদা। সবাই যে আমার মতো শক্ত মনের সংযমী মানুষ হবে এটা কী করে আশা করি!

২৭ জুন

আজ সকালে চা খাওয়ার সময় তন্দ্রার সঙ্গে বড় অদ্ভুত কথাবার্তা হল। কয়েক মিনিট ধরেই মনে হচ্ছিল ও কী একটা বলবে, কিন্তু ইতস্তত করছে। আমি আন্দাজ করলাম ও হয়তো মাসের তারিখ নিয়ে, (দিনটা যে আবার কাছে এগিয়ে আসছে) অথবা পাতালঘর নিয়ে, বা হয়তো কোনও ডাক্তার দেখানো নিয়ে কিছু বলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তা নয়।

'ওরা এখনও খুনিকে ধরতে পারেনি।' ও বলল।

অর্থাৎ লাইব্রেরিয়ানকে যে খুন করেছে তন্দ্রা তার কথাই বলছে। আপাতদৃষ্টিতে পুলিশ কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি। ঝোঁকের বশে হয়ে যাওয়া খুনের সমাধান করা সহজ কাজ নয়। কারণ সেক্ষেত্রে খুনের কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, আর এক্ষেত্রে খুনি সম্ভবত লাইব্রেরিয়ানের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। প্রার্থনা করতে লাগলাম, খুনি যেন কাগজ-কলমের আইনকে ফাঁকি দিতে পারে। সে যা করেছে তা আদর্শ ও নীতির মহৎ আইনের নির্দেশেই করেছে।

মৃদু স্বরে বললাম, 'হয়তো কোনওদিনই ধরতে পারবে না।'

'তুমি যে সে-সময়ে ওখানে ছিলে সে-কথা ওদের গিয়ে বললে ভালো হয় না?'

তন্দ্রা প্রশ্ন করল।

'কেন?'

'না...মানে, খুনি যখন খুন করে তখন তুমি হয়তো ওই লাইব্রেরিতেই ছিলে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তুমি বাড়িতে আসার আগেই খুনটা হয়েছে। হয়তো তুমি তাদের কোনও সূত্র দিলেও দিতে পারবে...'

'তোমাকে তো বললাম, আমি কিছুই দেখিনি।'

'পুলিশে যেতে কি তোমার...ভয় করছে?' ইতস্তত করে ও প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা করার সময় ও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কী করে এ-ধারণা ওর মাথায় এল বলতে পারি না।

'পুলিশে যেতে আমার কীসের ভয়?' আরও বললাম, 'আমি কিছুই জানি না। আমি চাই লোকটা যেন সাজা না পায়, কারণ, লাইব্রেরিয়ানটি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ ছিল।'

এ-কথা বললাম না যে, ওই মেয়েই আমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু তন্দ্রা হয়তো আন্দাজ করে থাকবে, কারণ ও ভীষণ অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকাল, তারপর টেবিল ছেড়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

ওর কাছ থেকে এ-আচরণ বড় বিচিত্র। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সাঙ্ঘাতিক। হয়তো তন্দ্রার বেলায়ও তাই হয়েছে। মধ্যবিত্তদের এক অদ্ভুত ধারণা আছে যে, মানুষের তৈরি আইনের ক্ষমতা মানুষের

চেয়েও অনেক বেশি। বুঝি না মানুষ কী করে এত সহজে অন্যের নির্দেশে চলে। সমাজের নিয়মকে তারা ঈশ্বরের নিয়ম বলে কেন মনে করে? সাধারণ আইন ও পরিস্থিতি-নির্ভর আইনের কোনও তফাত তারা বোঝে না। বোঝে না প্রকৃতির চিরন্তন আইন, ঈশ্বর ও আদর্শবাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য। নিজেদের তৈরি আইনের হেরফের অথবা কখনও ভুল আইন তাদের নিজেদের পথেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কার থেকেই এসবের উৎপত্তি, এবং এ দেখে আমার সত্যি কষ্ট হয়। শুধু একবার ভাবুন, আমার নিজের বেলায় ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াবে...যদি কেউ আমার এই অসুখের কথা জানতে পারে তাহলে তারা আমাকে ঘৃণা করবে, শাস্তি দেবে। দেশের হর্তাকর্তারা হয়তো এ-অসুখ হওয়াটা বেআইনি বলে একটা আইন পাশ করিয়ে দেবেন। কিন্তু তাতে লাভটা কী হবে? অসুখ-বিসুখ তো আর সরকারি নিয়ম মেনে চলে না। সুতরাং অক্ষম নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে লোকে অপরাধী ভাববে। এ-কারণেই অসুখটার কথা কাউকে আমি জানতে দিতে চাই না। পুরোনো, প্রায় ভুলে যাওয়া সংস্কার, আতঙ্ক ও কুসংস্কার একসঙ্গে হাত মেলাবে সরকারি আমলাদের নতুন শক্তির সঙ্গে, তারপর আমাকে ধ্বংস করবে। এ বড় ভয়ঙ্কর রোগ। সমস্ত খুঁটিনাটি জানা সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা কারও নেই। মাঝে-মাঝে ভীষণ আফসোস হয়। তিনশো বছর আগে হলে লোকে আমার এই ক্ষমতাকে অন্তত স্বীকার করত, ভয় পেত। কিন্তু আজ শুধু আমার বিরুদ্ধে আইন তৈরি হবে। আমার মানসিক ভারসাম্য যে এখনও বজায় আছে সে নেহাতই আমার সৌভাগ্য। নইলে এসব চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যেতাম।

ওই সময়টা কাছে এগিয়ে এলেই আমার এরকম আজেবাজে চিন্তা হয়। নিষ্ফল আক্রোশ আর হতাশা আমাকে কুরে কুরে খায়। পাতালঘরটাকে আমি ঘেন্না করি...ভীষণ ঘেন্না করি...বিশ্বাস করুন...।

১ জুলাই

আগামীকাল আবার আমাকে পাতালঘরে যেতে হবে।

বারবার সে-কথা না ভাবতে চেষ্টা করেছি। অন্য চিন্তায় মেতে থাকব বলে এই ডায়েরি লেখাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু অসম্ভব। সে-চিন্তা আমার মন থেকে যাচ্ছে না, বরং শরীরে মনে ঢেউয়ের মতো উথালপাথাল করে। এই স্নায়বিক চাপ আর বেশি-দিন সইতে পারব বলে মনে হয় না। এখন লিখতে বসে আমার হাত কাঁপছে, শরীর ঘামছে। অসুখ হয়েছে বলে এভাবে নিজেকে শাস্তি দেওয়াটা ভীষণ অন্যায় হচ্ছে। অবুঝ স্বার্থপর এক সমাজের জন্যে নিজেকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া নিতান্তই অবিচার। সময়টা এগিয়ে এসেছে বলে এসব ভাবছি, না কি এটাই বাস্তব সত্য, তা জানি না। অসুখের সময়-চক্র শুরুর সঙ্গে-সঙ্গে আমার চিন্তারও যে পরিবর্তন হয়, তা জানি। সে-কথা অস্বীকার করি না। তা সত্ত্বেও আমার যুক্তিতে কোনও ফাঁক নেই।

পাতালঘরটা অসুখটাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে না তো? এ নিয়ে আগে কখনও ভাবিনি। মনে হয়তো কথাটা এসেছে, কিন্তু যুক্তিহীন চিন্তা ভেবে আমল দিইনি। অথচ এ-কথাও তো সত্যি যে, পাতালঘরে যাওয়া শুরু করার আগে অসুখটা এতটা খারাপ ছিল না। তখনও নিজের ওপর আমার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল। এমনকী শেষবার যখন হোটেলে রাত কাটিয়েছি, যেবার মাতালটা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল, সেবারও আমি নিজেকে সামলে রাখতে পেরেছিলাম। মাতালটার মৃত্যুই ছিল পাতালঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রধান কারণ। কিন্তু এখন পেছনে তাকিয়ে বুঝতে পারছি তার মৃত্যুতে আমার কোনও হাত ছিল না, এবং সেই প্রধান কারণ পুরোপুরি মিথ্যে। ঠিকমতো বিচার-বিবেচনা না করেই আমি কাজ করেছি। এ-কথা ভেবে দেখিনি পাতালঘর আমার অসুখকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, আমাকে নিরাপদ রাখার বদলে আমার ক্ষতি

করতে পারে। এর একটা প্রমাণ বর্ষার রাতে সেই আগন্তুকের ঘটনা। তাই এখন ভাবছি, ওই ঘরই হয়তো আমার অসুখকে ক্রমশ বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ-ভাবনার যুক্তিগত কারণও আছে। আকাশ দেখতে পেলে আমার কষ্ট বরাবর কম হত, আর এখন বদ্ধ ঘরে নিজেকে বন্দি রাখার ফলে অবস্থা হয়ে উঠেছে আরও মারাত্মক। এ-সবই আমার অনুমান। সত্যি-মিথ্যে জানি না। তবে যাই হোক, একটিবার পরখ করে দেখতে দোষ কী!

সাহস করে কালকের রাতটা পাতালঘরের বাইরে কাটালে কেমন হয়? পারব...?

৩ জুলাই, সকাল

লিখে আমার মনের ভাব বোঝানো যাবে না। আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে। জানি, ব্যাপারটা আমার দোষ নয়, কিন্তু তাতে মনের লজ্জা তো দূর হয়। না, আর বীভৎসতাও কমে না। এত যন্ত্রণা কোনও মানুষের শরীর সহ্য করতে পারে না। আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে চুরমার হয়ে যাবে, গলে জল হয়ে যাবে মস্তিষ্ক। তাহলে সমস্ত স্মৃতি তরল হয়ে চুঁইয়ে পড়বে, এবং আমিও মারা যাব। কিন্তু কই, আমি তো এখনও বেঁচে আছি। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো ছিল। আত্মহত্যার কথাও ভেবেছি। সত্যি-সত্যি ক্ষুর বের করে তাকিয়ে থেকেছি আমার কবজির নীল শিরাগুলোর দিকে। কিন্তু পারিনি। কারণ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা তাজা রক্ত আমাকে ওই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেবে। শরীর থেকে ধীরে-ধীরে আত্মার নিষ্ক্রমণের মুহূর্তেও আমার মনে পড়বে সেই নৃশংস রাতের কথা...ওভাবে আমি মরতে পারব না। ঘুমের ওষুধ সঙ্গে থাকলে এই মুহূর্তে খেয়ে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু নেই। কখনও ঘুমের ওষুধ আমি ব্যবহার করিনি। ওষুধপত্র খাওয়াটা আমি পছন্দ করি না।

এখন একটু ভালো লাগছে। এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম। বিশ্রামের পর আরও স্পষ্টভাবে ঘটনাগুলো দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সেসবের জন্যে আমিই দায়ী। আত্মহত্যা করলে আমি শাস্তি পাব, কিন্তু যে-অসুখটা আমাকে ভয়ঙ্করে পরিবর্তন করে অমানুষিক অপরাধ করিয়ে নিল, সে তো শাস্তি পাবে না!

নিজের প্রতি ঘৃণায় আমার মনে আগুন জ্বলছে, এ-ঘৃণা অতলান্ত। ইস, যদি কাল রাতটা পাতালঘরে থাকতাম...কিন্তু কী করে জানব? কল্পনায় কী করে বুঝব কী ঘটতে চলেছে? আমি খুব শান্তশিষ্ট মানুষ। আমার দেহ যে এ-ধরনের কাজে ব্যবহার হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে। মনে হচ্ছে, মাংসকাটা ছুরি নিয়ে নিজের হাত দুটো কবজি থেকে কেটে ফেলি, দাঁতগুলো উপড়ে ফেলি গোড়াসমেত। ঈশ্বর জানেন, যদি অতীতকে পালটে ফেলা সম্ভব হত তাহলে এ প্রশ্ন উঠত না। ওই ঘটনা ঘটবার আগে নিজেকে আমি খুন করে ফেলতাম। কিন্তু এখন সে-প্রশ্ন অবান্তর। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। কিন্তু আমার এত লজ্জা করছে...

আজ সকালে বাড়ি ফিরে এসে স্বাভাবিকভাবে চলার চেষ্টা করেছি। ভীষণ কষ্ট হলেও এমন ভাব করেছি যেন কিছুই হয়নি। আমার স্ত্রী মুখে কোনও কথা না বললেও দেখেছি, অবাক চোখে আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। সারাটা রাত কোথায় কাটিয়েছি সে-কথা পর্যন্ত জিগ্যেস করল না। তবুও ওকে বললাম, ব্যবসার কাজে হঠাৎই আমাকে চলে যেতে হয়েছিল। জানি না আমার কথা ও বিশ্বাস করল কিনা। কাল রাতটা যে...'সেই' রাত ছিল সে-কথা দুজনের কেউই মুখ ফুটে উচ্চারণ করলাম না। হয়তো ও ভাবছে, এ-মাসে সেরকম কিছু হয়নি, অথবা ভাবছে অসুখটা আমি সামলে উঠতে শিখেছি। অথবা হয়তো...অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-কথা আমাকে লিখতে হচ্ছে...হয়তো ও ভাবছে অসুখটার কথা আমি ভুলে গেছি এবং এ-অসুখ নিতান্তই

মনের অসুখ। কী জানি, জানি না। ওর চালচলনে মনে হল যেন আমাকে কিছু জিগ্যেস করবে, কিন্তু করল না। এ-ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে পরে, যখন আরও স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারব। আমার মনে এখনও আগুন জ্বলছে। গত রাতের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। মেয়েটার মুখ সর্বক্ষণ চোখের সামনে ভাসছে...এখন কাজের মধ্যে শুধু বারবার দাঁত মেজেছি, আর নখের ভেতরগুলো জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি। গায়ের জামাটা আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছে।

৩ জুলাই, বিকেল

ঘটনাটা সব খবরের কাগজেই বেরিয়েছে!

শেষ শহর সংবাদ সংস্করণে শেষ রাতের ঘটনাও খুঁটিনাটি সমেত প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এ-কথা আমি আগে ভাবিনি। নিজের চিন্তায় এত বেশি মগ্ন ছিলাম যে, সেই দুশ্চিন্তায় পৃথিবীর বাকি লোকের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই খবরটা প্রতি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে, আর ওরা সমস্ত ঘটনাটা ভুল ব্যাখ্যা করেছে!

দুপুরে খেতে বসেই খবরের কাগজ আমার প্রথম চোখে পড়ে। সারা সকাল নিজের দুশ্চিন্তায় কাগজ দেখে উঠতে পারিনি। তন্দ্রা, খাওয়ার টেবিলের একপাশে কাগজগুলো ভাঁজ করে সাজিয়ে রেখেছিল। প্রথম পৃষ্ঠার খবর হওয়ার ফলে ভাঁজ করা অবস্থাতেও ওই খবরটা স্পষ্ট চোখে পড়েছে। সুতরাং খাওয়া শুরু করার আগে ওগুলো পড়তে শুরু করলাম। সে-সময়টা তন্দ্রা চেষ্টা করে অন্যমনস্ক থাকার ভান করল। একদিক দিয়ে ভালোই হল, কারণ মনের ক্ষোভ বা রাগ লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। কাগজের রঙচড়ানো খবরের ঢং যে-কোনও সংযমী শক্ত মানুষকেও ধৈর্য হারাতে বাধ্য করবে। তন্দ্রা জানে আমি কীরকম শক্ত ধাতের মানুষ। আমার শুধু একটাই আশা, ও যেন অন্তত বুঝতে পারে কাগজের খবরগুলো কীরকম মিথ্যে করে লেখা। ওরা কল্পনায় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ঘটনাটাকে যা নয় তাই করে সাজিয়েছে। এতটা বাড়িয়ে লেখা ওদের ঠিক হয়নি।

বাড়িতে আমি দুটো কাগজ রাখি। সে দুটোতেই যখন প্রথম পাতায় ওই খবর জায়গা পেয়েছে, তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না অন্যান্য কাগজ কী করেছে। ওরা লিখেছে, এ-কাজ নিঃসন্দেহে কোনও পাগল খুনির! পাগল খুনি! যতরকম ভয়ঙ্কর বীভৎস শব্দ আছে, যতরকম সস্তা চমক আছে, যতরকম নৃশংস কথা হতে পারে, সমস্ত জঘন্য খুঁটিনাটি বিবরণসমেত তাতে লেখা। আর প্রত্যেকটা কাগজেই (নিজের দুটো কাগজ শেষ হওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ কাগজও কিনে পড়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে) এ-ঘটনাকে উন্মত্ত ব্যক্তির কাজ বলে উল্লেখ করেছে। কাগজের কাজ হল প্রকৃত ঘটনাকে শুধুমাত্র তথ্যসমেত তুলে ধরা। যে-জিনিস তারা জানে না তা নিয়ে উলটোপালটা তত্ত্ব কেউ তাদের কাছে শুনতে চায়নি। কিন্তু কাগজ বিক্রির দিকে ওদের এত ঝোঁক যে, তার জন্যে আজেবাজে অশ্লীল কথা লিখতেও ওরা পেছপা হয়নি। কী সাঙ্ঘাতিক নোংরা চরিত্রের ইতর লোকগুলো। এমনকী এ-কথারও ইঙ্গিত দিয়েছে। যে, খুনটা যৌনতাভিত্তিক! এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগল। প্রত্যেকটা কাগজেই ইঙ্গিত করেছে যে, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমার ভীষণ বমি পাচ্ছে। ওরা লিখেছে যে, মেয়েটির বেশবাস ছিল অগোছালো বিস্রস্ত, ছিন্নভিন্ন ঊরু রক্তাক্ত, নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়া হয়েছে পেট চিরে, গায়ের ব্লাউজ, ব্রা, আর শায়া শতচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো-টুকরো, এবং গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাশবিক আক্রমণে নৃশংসভাবে বিধ্বস্ত। সমস্ত তথ্যই এমনভাবে সাজানো যাতে মনে হয় মেয়েটিকে বলাৎকার করা হয়েছে। মেয়েটা যেরকম ধস্তাধস্তি করেছিল তাতে যে বেশবাস বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে পারে, তা কী ওরা বোঝে না? না কি লোকগুলো এমনই বিকৃত

মনের যে, প্রতিটি কাজকেই যৌনতা প্রণোদিত ছাড়া ভাবতে পারে না? না কি ওরা সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছে—বেশি কাগজ যাতে বিক্রি হয় সেইজন্যে?

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছে! কাগজগুলো যে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে তা আমার জানা ছিল না! আর জনতাকেও বলিহারি যাই...কাগজের বিক্রি বাড়াতে কিছু চটকদার আগাপাস্তলা মিথ্যে খবর দিলেই হল, লোকে হু-হু করে কাগজ কিনবে। আমাদের সমাজটার হল কী যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এ-ধরনের খবর পড়ে খুশি হয়! এ-ধরনের সমাজে কোনও অসুস্থ মানুষ কী করে আশা করবে যে, সে ভালো হয়ে উঠবে? ভীষণ দুঃখ পেলাম। মনে এখন শুধু দুঃখ আর হতাশা।

কাগজগুলো সব আমার ঘরে রয়েছে। সবকটার চেহারা একই রকম। শিরোনামে সামান্য তফাত থাকলেও মিথ্যেগুলোয় কোনও তফাত নেই। 'জঙ্গলে উন্মত্ত খুনির হাতে যুবতীর মৃত্যু' থেকে শুরু করে 'আসক্ত শয়তানের হাতে তরুণী নিহত' ও 'লাভার্স লেনে যুবতীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ' পর্যন্ত সবরকম শিরোনামই রয়েছে। আর কোনও গল্পেই শারীরিক অসুখের কোনও উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ওরা সবাই কি অন্ধ? না কি সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়? নির্দোষ ব্যক্তির চেয়ে মানসিক রোগীকে ওরা কি বেশি পছন্দ করে? এখন আমি কী করি? ভেবেছি প্রত্যেকটা কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি লিখব, জানাব আসলে গত রাতে কী ঘটেছিল, আমার অসুখটাই বা আসলে কী। চিঠিগুলো ওরা নির্ঘাত ছাপবে, তা সে বিক্রি বাড়াবার জন্যে হলেও। কিন্তু কে জানে, কলম চালিয়ে চিঠির এখানে ওখানে আবার ইচ্ছেমতো পালটে দেবে কি না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যেটুকু সত্যি ওই চিঠিতে থাকবে, সেটুকু ওরা নষ্ট করে ছাপবে। খবরের কাগজের সম্পাদকদের বিশ্বাস নেই, এ-কথা অনেক ঠেকে শিখেছি। এই নোংরা কাগজের সম্পাদকগুলোকে যদি কোনও বন্ধ ঘরে একা পেতাম, বন্ধ পাতালঘরে, মাসের সেই ভয়ঙ্কর রাতে...? সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওদের মুখের চেহারাগুলো কিরকম পালটে যায় সেটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। তখন ওরা বুঝতে পারবে আমার নামে নোংরা কুৎসা ছড়িয়ে কী ভুলই না ওরা করেছে। ওদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার এই একমাত্র উপায়। নিজেদের ভুলের মাশুল কীভাবে দিতে হয় ওরা সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে। এতে ভুল শোধরানোর কোনও পথ থাকবে না, তবে এ-শাস্তি ওদের পাওয়া উচিত। ওরা...।

না, এসব ভাবা ঠিক হচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছি, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের দ্রিমিদ্রিমি শব্দ, শিরা দিয়ে টালমাটাল গতিতে ছুটে চলেছে উষ্ণ রক্ত। মনে হয় এ গত রাতেরই কোনও প্রতিক্রিয়া, অসুখের পরবর্তী প্রভাব। নিজের ভাবনাকে এভাবে বলগাহীনভাবে এগোতে দেওয়াটা হয়তো ঠিক নয়। এতে অসুখটার সঙ্গে যুদ্ধ করার বদলে আমার মন তার আবেগের শিকার হয়ে পড়েছে। বিনা প্রয়োজনে কখনও এটাকে প্রভাব বিস্তার করতে দেব না। কিন্তু আমার মনের বর্তমান অবস্থা একেবারে অযৌক্তিক নয়। অচেনা অজানা লোকেরা, যারা সত্যের 'স'-ও জানে না, আমার গায়ে বিনা কারণে মিথ্যে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে। তারা সত্যের পরোয়া করে না। ওদের শাস্তি পাওয়া দরকার। এসব লোক মরে গেলেই ভালো।

আমার ভীষণ বিরক্তি এবং রাগ হচ্ছে। আর লিখতে পারছি না। পরে কাগজওলাকে বলব, ওইসব আজেবাজে নোংরা কাগজ আমাকে যেন আর না দেয়...।

৩ জুলাই, রাত

শত কষ্ট হলেও সত্যি-সত্যি কী ঘটেছিল তা বলতে আমি বাধ্য। সমস্ত ঘটনা, সমস্ত সত্য—সব আমাকে লিখতে হবে। এভাবে আত্মশুদ্ধি হলে হয়তো আমি স্বস্তি পাব, অথবা আমার হতাশা হয়তো আরও বাড়বে... কিন্তু সেসব না ভেবেই আমাকে এ-কাজ করতে হবে। সেটা যে কোনও অসুস্থ লোকের কাজ, কোনও

বিকৃতকামীর নৃশংস অপরাধ নয়, তা আমি প্রমাণ করবই। আমি একজন বিকৃত মানসিকতার পুরুষ, এই আখ্যাটাই আমাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। আমি একজন বিকৃতকামী। এত লোক থাকতে সবাই আমাকেই এরকম ভুল বুঝল!

আমার একমাত্র প্রার্থনা, তন্দ্রা যেন খবরের কাগজগুলোর কথা বিশ্বাস না করে। কোনও ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতা ওর নেই। নিজের মত গড়ে তোলার বদলে ও যা পড়ে তাই বিশ্বাস করে। ও আমাকে ওই চোখে দেখবে, মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস করবে, সে-কথা ভাবতে গেলে আমি পাগল হয়ে যাই। ও যদি বিশ্বাস করে বসে যে, সত্যিই আমি একটা অল্পবয়েসী মেয়েকে ধর্ষণ করেছি, তাহলে ওর মনের অবস্থাটা কী হবে? আমি এরকম নোংরা নৃশংস কাজ করতে পারি, এ-কথা কেউ ভাবতে পারে মনে হলেই আমি স্থবির হয়ে যাই। যে এ-কথা বিশ্বাস করবে তাকে আমি ঘেন্না করি, ভীষণ ঘেন্না করি। বরাবরই শরীরে ও মনে আমি অত্যন্ত পবিত্র। এমনকী স্ত্রীর সঙ্গেও যৌনসংসর্গ যথাসম্ভব কম রাখতে আমি চেষ্টা করেছি। যৌন ক্ষুধায় অস্থির হওয়ার মতো অপরাধও কোনওদিন আমি করিনি। যা করেছি শুধু তন্দ্রাকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্যেই করেছি। আমার ধারণা ও একটু বেশি কামপ্রবণ, কিন্তু ওকে আমি শাসনে রাখতে পেরেছি। উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পেরেছি সংযমই স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার মূলমন্ত্র। যৌনসংসর্গে উচ্ছৃঙ্খল হওয়া মাদকদ্রব্যের নেশা করা, কিংবা মাতলামির মতোই নোংরা রুচির কাজ।

হয়তো প্রেমিক-প্রেমিকাদের গোপন মিলনের জায়গায় ওই ঘটনাটা ঘটার ফলেই খবরের কাগজওলাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা নিতান্তই কাকতালীয় যোগাযোগ। শপথ করে বলতে পারি, নোংরাভাবে মেয়েটাকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করিনি। পরিবর্তন হলেও যদি আমার মনে সে লোভ আসত, তাহলে তাকে দমন করার মতো ক্ষমতা আমার নৈতিক আদর্শ দেখাতে পারত। কিন্তু সে-লোভ আমার হয়নি। তার সামান্য ইশারাও পাইনি। মেয়ের জায়গায় কোনও পুরুষ হলে যেমনটি হত, ঠিক তাই। প্রথমত মেয়ে, তার ওপর যুবতী, সুন্দরী। চোখে-মুখে সস্তা চটকের সাজ। বিশ্বাস করুন, যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। দিব্যি করে বলছি। কারণ আমি জানি, কোনও অবস্থাতেই কোনও মেয়ের ওপর অবস্থার সুযোগ আমি নেব না।

ওরা যে ব্যাপারটা ভুল বুঝেছে তাতে একদিক দিয়ে মনে হয় ভালোই হয়েছে। এতে পুলিশ ভুল পথে এগোবে। ওরা কোনও পাগল বিকৃতকামী মানুষকে খুঁজবে। আমাকে সন্দেহ করার কোনও উপায় নেই। আমার চালচলন, জীবনযাত্রায় কোনওদিন নিন্দের আঁচ পর্যন্ত লাগেনি। ওরা যতই তদন্ত করবে, ততই সত্য থেকে দূরে সরে যাবে। একটু আগে রাতের খবরে বলল, এই খুনের সঙ্গে লাইব্রেরিয়ানের মৃত্যুর কোনও যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। বেচারা অন্ধ গর্দভগুলো! এ-কথা ওরা ভাবল কেমন করে? আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। মনে হয়, দুটো খুনকে একই খুনির কাজ বলে ওরা নিজেদের পরিশ্রম বাঁচাচ্ছে। সে যাই হোক, অন্তত এটুকু নিশ্চিত যে, সত্যের খোঁজ ওরা কোনওদিনই পাবে না।

সমস্ত ঘটনা গুছিয়ে লেখার মতো মনের অবস্থা এখনও ফিরে পাইনি। খবরের কাগজওলাদের ওপর আমার বিরক্তি, রাগ একটুও কমেনি। তা ছাড়া গত রাতের ঘটনায় মন অত্যন্ত বিচলিত। আসলে কী হয়েছিল সব কাল লিখব। খুব ঠান্ডা মাথায় কোনও কিছু বাদ না দিয়েই লিখব।

৬ জুলাই

শান্ত মনে যতক্ষণ না সব কিছু গুছিয়ে লিখতে পারব বলে মনে করেছি ততক্ষণ অপেক্ষা করেছি। এর আগে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি তৈরি। সে-রাতে কী হয়েছিল সমস্ত এখন বলব, প্রমাণ করে দেব খবরের কাগজওলারা কী মারাত্মক ভুল করেছিল।

সেদিন বিকেলে বহুদূর পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম। পায়ে হেঁটে। বিকেলের টিফিন সেরে যখন বেরিয়েছি তখনও সূর্য অস্ত যেতে অনেক দেরি। সে-রাতটা যে কোন রাত তা তন্দ্রার হয়তো খেয়াল ছিল না, অথবা হয়তো ও ভেবেছিল, আমি একটু পরেই ফিরে আসব। অন্তত বেরোনোর সময় কোনও কথা ও জিগ্যেস করেনি। রাতটা যে কোথায় কাটাব তার ছিটেফোঁটা বুদ্ধিও মাথায় আসেনি, তবে এটুকু জানি, ওই অসহ্য পাতালঘর থেকে আমাকে চলে যেতে হবে অনেক দূরে। ওই ঘরে ফিরে যাওয়ার যন্ত্রণা আমি সইতে পারব না। আমাকে পালিয়ে যেতে হবে শহর ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে। কোনওরকম ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। আমার ধারণা...তখন সে-ধারণা একেবারে বদ্ধমূল সত্যিই আমার বিশ্বাস, পাতালঘরে বন্দি থেকেই গত কয়েক মাসে পরিবর্তনের ধাপগুলো এত দ্রুতগতিতে খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। বাইরের হাওয়া-বাতাস, আকাশ, চাঁদ, এসব থেকে আড়ালে থাকার পরিবর্তন আনতে শক্তি দরকার হয় আরও বেশি। সুতরাং, স্বাভাবিক কারণেই পরিবর্তনের চরিত্রও হয়ে উঠেছে আরও মারাত্মক। এখন জানি, আমার সে বদ্ধমূল ধারণা পুরোপুরি ভুল। যে-পরিশ্রম করে পরিবর্তনটা আসে তার সঙ্গে তার ভয়ঙ্করতার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তখন আমার বিশ্বাস এটাই ছিল। কোনও বিপদের আভাস আমি পাইনি।

উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম, তারপর সন্ধে হয়ে আসতেই লোকালয় ছেড়ে রওনা হলাম। হেঁটে চললাম শহরের পশ্চিম দিকে। ধীরে অথচ অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম। খুব শিগগিরই শহর, লোকালয় পড়ে রইল পেছনে। হঠাৎই দেখি, আমি দাঁড়িয়ে খোলা রাস্তায়। চওড়া সড়কে প্রচণ্ড শব্দ তুলে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে মাঝে মাঝে ছুটে যায় মোটরগাড়ি। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। গাড়ি আমি কোনওদিনই পছন্দ করি না, বরং হাঁটতে অথবা ট্রেনে চড়তে ভালো লাগে। হয়তো আমি একটু সেকেলে, কিন্তু তাতে ক্ষতিটা কী? আজকের দিনে, আজকের মতো অলস শিথিল যুগে, সেটাই হয়তো নীতি ও পবিত্রতার লক্ষণ। একসময়ে আঁধার নেমে এল, রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। বুঝলাম, এবার আমাকে একেবারে নির্জনে যেতে হবে, সুতরাং প্রথম মেঠো পথটা চোখে পড়তেই বড় রাস্তা ছেড়ে সেদিকে পা বাড়ালাম।

রাস্তাটা সরু, এবড়োখেবড়ো। এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে। রাস্তার দু-ধারে বড়-বড় গাছ। আরও দূরে তাকালে দেখা যায় গাছের ঘন সারি। বড় রাস্তার শব্দ ক্রমে আমার কানে মিলিয়ে আসে। এ-রাস্তায় গাড়ি নেই। কোনও পথচারীও নেই আমার মতো। কিন্তু ধুলোময় পথে ভালো করে তাকালে চোখে পড়ে গাড়ির চাকার দাগ। তখনও বুঝিনি, এ-পথে গাড়ি-ঘোড়া লোকজন আসার সময় তখনও শেষ হয়নি। বিশ্বাস করুন, দিব্যি করে বলছি, তখনও আমি জানতাম না এ পথ এগিয়ে গেছে এখানকার 'প্রেমকুঞ্জের' দিকে। এ-কথা আমার মনেও আসেনি। এ-সব আমি পছন্দও করি না। না, আমি কচি খোকা নই। আমি জানি, বিয়ের আগেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে কত নোংরা কাজ এখানে হয়। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভেতরে। জঙ্গলে। কিন্তু তখনও বুঝিনি, সেরকম একটা জায়গার দিকেই আমি এগিয়ে চলেছি।

রাস্তাটা চড়াই। সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ওপরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরও কোনও লোকজনের দেখা পেলাম না। বারকয়েক দু-একটা কুকুর চোখে পড়ল। ওরা আমাকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি তেড়ে যেতেই লেজ গুটিয়ে পালাল। পালানোর সময় বারবার পেছন ফিরে দেখতে লাগল আমাকে। কুকুররা বরাবরই আমাকে দেখলে ভয় পায়। ভয়ঙ্কর চেহারার সাহসী কুকুরও আমাকে দেখলে ছুটে পালায়। এতে বেশ মজা লাগে। এমনটা কেন হয়, কেউই বুঝতে পারে না। হঠাৎ

একটা বিশাল হাউন্ড রাস্তার ঠিক মাঝে আমার সামনে রুখে দাঁড়াল। কোত্থেকে ওটা এল কে জানে। কারই-বা কুকুর? একের পর এক এত কুকুর আসছে কোথা থেকে? ওরা কি আমার গন্ধ পায়?

হাউন্ডটার ছুঁচলো দাঁত প্রকট। এই আঁধারেও স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমি এক অদ্ভুত শব্দ করে চকিতে এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে। কুকুরটা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে পালাল। ব্যাপারটা এত মজার যে, আমার ভীষণ হাসি পেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলার মাথায় পৌঁছে গেলাম। রাস্তাটা শেষ হয়েছে এক বিশাল গর্তের কাছে। হয়তো কোনও কারণে এখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছিল, সঠিক বলতে পারি না। তবে লোকজন কেউই নেই। নিস্তব্ধ। নির্জন। অন্ধকার ইতিমধ্যে আরও জাঁকিয়ে বসেছে। আমি বিশ্রাম নিতে থাকলাম। একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর বসে জামার দুটো বোতাম খুলে দিলাম। বেশ গরম লাগছে। এতটা পথ উঠে এসে রীতিমতো ঘামছি। এখন এই খোলা জায়গায় একা একা বসে ভালো লাগছে। মনে পড়ছে ছোটবেলার কথা। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ভাবলাম পরিবর্তন খুব সামান্যই হবে এবং পুরোনো দিনের মতো এই জঙ্গলে ছোটাছুটি করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। একবারের জন্যেও মনে হয়নি অন্য কোনও মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। চারদিক এত নির্জন, এত শান্ত। শহরের শব্দ আর জঙ্গলের শব্দ এক নয়। এ শব্দে এক অদ্ভুত মায়া আছে। যেন সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো। চোখ বুজে বসে থাকতে ভীষণ ভালো লাগছিল। আমার ধারণা, ওভাবেই সারাটা রাত আমি কাটিয়ে দিতাম, আর নৃশংস কোনও ঘটনাও সেখানে ঘটত না—যদি না কালো গাড়িটা হঠাৎই এসে হাজির হত...।

বহুদূরে থাকতেই গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ আমার কানে এল। প্রথমে ভেবেছিলাম গাড়িটা হয়তো বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু ক্রমে সে শব্দ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। বিরক্ত হলাম। এ-সময়ে কেউ এসে পড়ুক, আমি চাই না। এই নির্জন খাদের দিকে গাড়ি নিয়ে কে-ই বা আসবে? কেন আসবে? গাড়িটা যে এ-পথেই আসছে সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর পাথর ছেড়ে ধীরে-ধীরে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম। ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুটা ঢুকে আত্মগোপন করলাম। জানি, বাইরে থেকে কেউ আমাকে আর দেখতে পাবে না। আস্তে হাঁটুগেড়ে বসলাম। হাঁটুর তলায় ঝরাপাতা, মাটি শুকনো ও ভঙ্গুর। তবু কেমন এক অদ্ভুত আস্বাদ হাঁটু দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার শরীরে ঢুকতে লাগল। অন্ধকার এখনও ঘন হয়নি। সুতরাং সামনের কাঁচা রাস্তা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট। এখানে ঘাপটি মেরে বসে রাস্তার শেষে গর্তটাও দেখতে পাচ্ছি। একটু পরেই ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গাড়িটা উঠে এল। রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল। অপেক্ষায় রইলাম। ভাবলাম, গাড়ির ড্রাইভার এখনই দেখতে পাবে যে, সামনে আর পথ নেই এবং গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা হল না। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হল। মনে-মনে প্রচণ্ড রাগ হল। যেন আমার গণ্ডি দেওয়া জমিতে কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে। নিচু হয়ে ঝোপের ফাঁকদিয়ে গাড়িটাকে দেখতে লাগলাম। আর তখনই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে।

গাড়িতে একটা মেয়ে রয়েছে। দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। গাড়িতে কী হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও যথেষ্ট শব্দ, খিলখিল হাসি ও টুকরো-টুকরো কথা আমার কানে এল। এবার বুঝলাম গাড়িতে কী কাণ্ডটা হচ্ছে। শরীরের ভেতর রাগ উথলে উঠল। আমার হাতের আঙুল বসে গেল শুকনো মাটিতে, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল চাপা গর্জন। খালি ভাবছি, এই বোধহয় ওরা চলে যাবে। ওরা এখনও যাচ্ছে না কেন? কিন্তু ওরা গেল না। হঠাৎই জমাট হয়ে এল অন্ধকার এবং মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ল গাড়িটার কালো চকচকে শরীরে। আর তার ভেতর থেকে ভেসে আসছে ইতর নোংরা শব্দ। ইচ্ছে হল চলে যাই, যত জোরে পারি ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু কী একটা অদ্ভুত আকর্ষণ

আমাকে বেঁধে রাখল। যেতে আর পারলাম না। এমনকী গাড়িটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। মনে হয় পরিবর্তনটা তখনই এসে থাকবে, কিন্তু কখন যে ওটা শুরু হল আর শেষ হল, টেরই পাইনি। এমনকী শেষ হওয়ার পরও বুঝতে পারিনি আমি অমানুষ হয়ে গেছি।

আর তখনই ওরা গাড়ি থেকে নেমে এল। মেয়েটা খিলখিল করে খুব হাসছে, বেশবাস মোটামুটি বিস্রস্ত। ও প্রথমে নেমে গাড়িটার একপাশে দাঁড়ালো। নিজের শাড়ি, ব্লাউজ ঠিকঠাক করতে লাগল। লোক দুটো এবার গাড়ি থেকে নামল। একজনের হাতে একটা বড় চাদর। সেটা সে পথের ধারে শুকনো পাতার ওপর ছড়িয়ে দিল। অন্য লোকটার হাতে একটা বোতল। সম্ভবত মদের বোতল। সে বেরিয়ে এসেই এক হাতে মেয়েটাকে জাপটে ধরে চুমু খেল। দেখলাম, তার ঠোঁট পিষে যাচ্ছে মেয়েটার ঠোঁটে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, মেয়েটার মুখে ফুটে উঠছে তৃপ্তির আমেজ। না, মেয়েটা ভালো নয়।

ঝোপের আড়ালে গুড়ি মেরে বসে সবই দেখলাম। ওরা তিনজনে চাদরটার ওপরে ঘন হয়ে বসল। দ্বিতীয় লোকটা টেনে খুলে নিল মদের বোতলের ছিপি। তারপর দুজনে মিলে ঢকঢক করে মদ খেতে লাগল। একবার বোতল থেকে এ এক চমুক খায়, তারপর ও খায় এক চুমুক। আর ফাঁকে-ফাঁকে চলল মেয়েটাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি। চলল ওর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ নিয়ে বিচিত্র খেলা। একে-একে খসে গেল ওর গায়ের শাড়ি, কুশলী হাতের প্রচেষ্টায় খুলে গেল ওর ব্লাউজ। অবশেষে উন্মুক্ত হল ব্রা। মেয়েটা শুয়ে পড়ল চাদরের ওপর। ধীরে-ধীরে তুলে ধরল শেষ অন্তর্বাস।

এবার শুরু হল তিনটে শরীরের মিলিত শ্রম। চাঁদের আলো পিছলে যায় তিনটে অর্ধ অনাবৃত সরীসৃপ-শরীরে...প্রথমে একজন তারপর আর একজন...ওঃ, আমি আর লিখতে পারছি না। এমন কিছু-কিছু জিনিস আছে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ যার মুখোমুখি হতে পারে না। ওরা কীসব করতে লাগল, আমি গুড়ি মেরে বসে রইলাম ঝোপের আড়ালে, সমস্ত একে-একে দেখলাম...।

নিজেকে সংযত করলাম। হয়তো সামনের বীভৎস দৃশ্য আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। সেই কারণেই মনে সংযম এসেছে বিনা আয়াসে। ইচ্ছে হল নখ-দাঁত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি জঘন্য নোংরা কীটগুলোর ওপর, ওদের চরম শাস্তি দিই, শেষ করে দিই ওদের অশ্লীল নষ্টামির। কিন্তু অপেক্ষায় রইলাম। অনেকক্ষণ পর কামতৃপ্ত দুটো মানুষ উঠে বসল, নিজেদের জামাকাপড় পরতে লাগল। মেয়েটা তখন আধশোয়া অবস্থাতেই হাসছে। দুষ্টু হাসি।

কিছুক্ষণ ও চাদরের ওপরে শুয়ে রইল। ওকে দেখে পরিতৃপ্ত বলেই মনে হল। যেন এই বদ কাজে ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। মেয়েটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম। দেখলাম ওর ঠোঁটে শয়তানির বাঁকা হাসি। হাঁটু মুড়ে মাথা এলিয়ে ও আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। দেখলাম ওর নরম গলা, ঢেউ খেলানো পিঠ, সাদা ধবধবে ঊরু। মেয়েটার সবই যেন দূষিত কদর্য। চাঁদের আলোর এক রুপোলি বর্শা বিদ্ধ করেছে ওর নগ্ন শরীর এবং নিজের দেহকে আবৃত করতে একটুও ব্যস্ত নয় ও। ওর দুধ-সাদা দুটো পা দু-পাশে ছড়ানো, সমস্ত পোশাক-আশাক স্তূপীকৃত একপাশে। এত নীচ অশ্লীল নোংরামি আমি কখনও কল্পনাও করিনি।

এরপর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। কী হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। লোক দুটো আচমকাই উঠে বসল গাড়িতে। ওরা কর্কশভাবে হাসছে। তারপর দুজনের একজন জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মেয়েটাকে কী যেন বলল। মেয়েটা চমকে উঠে বসল, সোজা হয়ে দাঁড়াল এক লাফে। চিৎকার করে ছুটে গেল গাড়িটার দিকে। চেষ্টা করল দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। মেয়েটার মুখে ফুটে উঠেছে অসহায় ত্রস্ত ভাব, আর লোক দুটো খুশি খুশি, গাড়িটা ঘুরিয়ে ওরা যে-পথে এসেছে সেই পথে রওনা হল। মেয়েটা গাড়িতে ওঠার জন্যে কাতর স্বরে ওদের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। কিন্তু ওদের মন ভিজল না। গাড়িটা চলে গেল। যাওয়ার সময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন হাত নেড়ে বিদায়

জানাল মেয়েটাকে। আর ও অভদ্র নোংরা ভাষায় ওদের গালাগালি দিতে লাগল। সেসব শব্দ দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

মেয়েটা দাঁড়িয়েই রইল, চোখের নজর ঢালু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলা গাড়িটার দিকে আর আপনমনেই কীসব বিড়বিড় করতে থাকল। ওর হাত দুটো কোমরের পেছনে, নিতম্বে। ওর বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো মাঝে-মাঝে শুনতে পেলেও তার অর্থ বিন্দুমাত্রও বুঝলাম না, কারণ কোনওদিন ওসব কথা শুনিওনি। অথচ আমার বয়েস নেহাত কম নয়। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে, শব্দগুলোর সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌনতার সঙ্গে। কারণ রাগ হলেও মেয়েটার নোংরা চরিত্র বদলায়নি। বদলাতে পারে না। এর চেয়ে বড় পাপী আমি জীবনে দেখিনি। আমার ধারণা, নিজেদের বাসনা চরিতার্থ হলে পর লোকদুটো হঠাৎই ভয় পেয়ে যায়, এবং নিজেদের পাপের জন্যে, অন্যায়ের জন্যে মেয়েটাকে দায়ী করে ওকে শাস্তি দিতে ফেলে পালায়। এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা আমার মাথায় আসছে না। তবে চলে যাওয়ার সময় ওরা অমন হাসছিল কেন কে জানে। নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সমস্ত ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু এটুকু বুঝি কোনটা পাপ, অন্যায়, এবং এই মেয়েটা পাপী। একে শাস্তি দেওয়া উচিত।

মেয়েটাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কী ইচ্ছে ছিল তাও জানি না। মেয়েটা চাদরের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম, বেরিয়ে এলাম খোলা জায়গায়। মেয়েটা তখন নিচু হয়ে শায়াটা তুলছিল। আমি নিঃশব্দে ঠিক ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েটা শায়াটা সবে মাথা গলিয়ে গলায় পরেছে, নামাতে যাবে কোমর পর্যন্ত—এমন সময় আমি হয়তো অস্ফুট কোনও শব্দ করে থাকব—হঠাৎই ও চকিতে ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে।

ও চিৎকার করেছিল কিনা ঠিক মনে নেই। ওর মুখ ত্রাসে বিস্ময়ে বিস্ফারিত, কিন্তু কোনও শব্দ আমার কানে এল না। হয়তো আতঙ্কে ওর চিৎকার গলায় আটকে গেছে, কিংবা আমার কান হয়তো তখনকার মতো স্থবির হয়ে পড়েছিল। টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা—হাত দুটো ওপরে তোলা, হাতের তালু সামনে এগিয়ে আমাকে বাধা দেওয়ার কাল্পনিক প্রচেষ্টায় রত। শায়াটা নেমে গেছে ওর পা পর্যন্ত, সেখানে জট পাকিয়ে রয়েছে। ওর মুখে অদেখা অচেনা বিকৃত ভয়ের অসংখ্য রেখা। আমি ধীরে-ধীরে ওকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম। আমার নখর হাত সামনে থাবার মতো বাড়ানো, দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁটের আবরণ।

আরও কাছে যেতেই মেয়েটা শায়া পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ওর চোখ আমার মুখ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সরল না। ওর শরীরে উবু হয়ে যখন ঝুঁকে পড়লাম তখনও ও সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে। ওর আতঙ্ক আমাকে যেন আরও উৎসাহ জোগাল। শপথ করে বলছি, আমি শুধু ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে কী যেন একটা নেশা আছে...আতঙ্কের অদ্ভুত গন্ধ, আমেজ...আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। ভয় ও রক্তের গন্ধ অনেকটা একই রকম। পারলাম না নিজেকে সংযত করতে। এ-সবই ওই মেয়েটার দোষ। ওই লোক দুটোর মতো আমাকেও সে বাধ্য করল এই নৃশংস কাজে। দেখলাম ওর সাদা উরুর ঝলক, নড়ে উঠল ওর রঙিন ঠোঁট, আর আমার মনে জেগে উঠল ছিন্নভিন্ন করার ইচ্ছে, ফালা ফালা করে ধ্বংস করার ইচ্ছে। মনে হল আমার ধারালো নখ বসিয়ে দিই ওর নরম মাংসে, যাতে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে উষ্ণ রক্ত, শেষ হয়ে যায় ওর কলঙ্কিত নোংরা জীবন।

আর তখনই আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম মেয়েটার ওপর।

সর্বক্ষণ ও সরাসরি চেয়ে রইল আমার চোখে।

অবশেষে ওর চোখ হয়ে এল আচ্ছন্ন, ঘোলাটে। অস্বাভাবিক সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিল মেয়েটা।

পরে কী হয়েছিল মনে নেই। মনে নেই ওর মৃতদেহের ওপর কতক্ষণ আমি উবু হয়ে বসে ছিলাম, কিংবা কী করেছি ওর দেহ নিয়ে। খবরের কাগজে মেয়েটার মৃতদেহের যে-অবস্থার কথা লিখেছে তা যদি সত্যি

হয়ে থাকে তাহলে আমি নিশ্চয়ই বেশ কিছু সময় ওখানে বসে কাটিয়েছি। কিন্তু আর কিছু ওরা ঠিক লেখেনি। এসব যে গুছিয়ে লিখতে পারলাম তার জন্যে আনন্দ হচ্ছে। অন্তত সত্যি ঘটনাটুকু তো কাগজে-কলমে লেখা রইল।

এই হল আসল ঘটনা—ঠিক যেভাবে সব ঘটেছিল।

২০ জুলাই

গত দু-সপ্তাহ আর ডায়েরি লিখিনি। এমনকী ওটা পড়িওনি। মনে হয় ওই শেষ ঘটনাটা লেখার পর আমি নিস্তেজ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অসুখটার কথা কিছুদিন ভুলে গিয়ে আরাম করতে বেশ ভালোই লেগেছে। এই হল আধুনিক সভ্যতার এক বিরাট দোষ : এখানে আরাম বা বিশ্রামের সময় নেই। সৌভাগ্যক্রমে কোনওদিনই অর্থ, যশ অথবা সুখের পেছনে দৌড়নোর নেশা আমার ছিল না। নিজের ইচ্ছেয় তারা কেউ আমার কাছে এলেই আমি সন্তুষ্ট, না এলেও অসন্তুষ্ট নই। আমি যুক্তিবাদী, সুখ-দুঃখে নির্বিকার এবং নিঃসন্দেহে কালের ইতিহাসে কয়েকশো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তার জন্যে আমার কোনও অভিযোগ নেই। অহঙ্কার প্রকাশ করা আমার স্বভাব নয়, তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমে ক্রমে এই অসুখটাকেও জীবনের অন্যান্য ঘটনার মতো আমি মানিয়ে নিতে পারব। হাজার হলেও মাসে একটা মাত্র রাত তো! বছরে মাত্র বারোটা রাত আমাকে কষ্ট পেতে হবে। এর চেয়েও খারাপ অসুখ তো আমার হতে পারত! অনেকেরই তো হয়। কিন্তু সে-অসুখগুলো সবার কাছে সাধারণ ও পরিচিত বলে বিশেষ কোনও গুরুত্ব পায় না। আর আমার অসুখটা যেহেতু অপরিচিত, সেহেতু সত্যিকারের যত না তার চেয়েও বেশি লোকে ভয় পায়। ক্যানসার, কুষ্ঠরোগ কিংবা অন্ধ হয়ে যাওয়ার চেয়ে নিশ্চয়ই এ-অসুখ ভয়ঙ্কর নয়। একমাত্র নিজের অহঙ্কারই আমাকে ভাবতে শিখিয়েছিল এ-অসুখ নৃশংস, ভয়ানক। সেসব চিন্তাকে এখন দূরে সরাতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। অসুখটাকে আমি চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ বিচার করতে শিখেছি। এ যদি আমার পরীক্ষা হয়ে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় আমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। এখন আমি অনেক সুখী, অন্তত আগের চেয়ে। কারণ এই প্রথম আমি গুছিয়ে ভাবতে পারছি—অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে যেরকম গুছিয়ে চিন্তা করতে পারি অসুখটা নিয়েও সেরকম পারছি। ছোট-ছোট সুখ, ছোট-ছোট আনন্দ-খুশির মতো এই যন্ত্রণাকেও আমি মেনে নিয়েছি। নিষ্ঠুর সমাজকে নিয়ে যেমন বাঁচতে শিখেছি, তেমনই এই অসুখকে নিয়েও আমি বাঁচতে পারব। তন্দ্রার স্বল্পবুদ্ধি যদি আমাকে ধৈর্যের সীমা অতিক্রম না করায়, তাহলে এই অসুখও পারবে না।

সেই রাতের কথা যা লিখেছি সবই পড়ে দেখেছি। ও-লেখার সবটাই বাস্তব এবং সত্যি। আমার ধারণা, ওই লেখার ফলে আমি নিজেকে আরও স্পষ্ট চোখে নিখুঁতভাবে দেখতে পাচ্ছি। একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে। ক'দিন আগে হলেও এ নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় পড়তাম। কিন্তু এখন নিজেকে আরও বেশি করে বুঝতে পারছি...ব্যাপারটা হল, সেই রাতের ঘটনা লেখার সময়ে আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে 'আমি' বলেই উল্লেখ করেছি। কখনও 'ওই প্রাণীটা' বা 'অমানুষটা' বলে উল্লেখ করিনি। স্পষ্টই বোঝা যায়, ওই শব্দগুলো সত্যের মুখোমুখি না হয়ে আত্মরক্ষার নিষ্ফল মিথ্যে প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ 'ওই প্রাণী' বা 'অমানুষ'—যাই বলি, সেটা আসলে আমিই। আমরা এক ও অদ্বিতীয়—বাইরের রূপ আমাদের যাই হোক না কেন, আসলে আমরা একই। এ-কথা স্বীকার করতে আমি এতটুকু ভয় পাচ্ছি না। এতেই বোঝা যাচ্ছে আমার চিন্তা কীরকম সুষম পথে চলেছে। কী সুন্দর গুছিয়ে ভাবতে শিখেছি আমি। কিন্তু আমার লেখার ধরনটা হঠাৎ পালটে গেল কেন? সে কি ওই ঘটনার খুঁটিনাটি মনে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বলে? না

কি সেই ভয়ঙ্কর অমানুষটা ক্রমশ আমার শরীর ও মনের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, এবং আমিও ওটার দিকে এগিয়ে চলেছি? অথবা নিছকই লেখার সুবিধের জন্যে? কারণ যাই হোক না কেন, লক্ষণটা খারাপ নয়, ভালো। এতে অস্বীকারের গোঁয়ার্তুমির চেয়ে সততা বেশি দেখা যাচ্ছে। অবশ্য সে-রাতটা এক অস্বাভাবিক রাত ছিল...এক বিস্ময়কর রাত...পাতালঘরের ভয়ঙ্কর রাতগুলোর চেয়ে ওই রাতের স্মৃতি যে অন্যভাবে মনে পড়বে, এতে আর আশ্চর্য কী! এখন ধৈর্য ধরে দেখতে হবে পাতালঘরে এ-রাতটা কেমন যায় : বন্দি রাত। ডায়েরিটা তখন সঙ্গে করে নিয়ে যাব। এবারে প্রচুর সময় হাতে নিয়ে যেতে হবে। বাইরে থাকার ঝুঁকি আর নেব না। নতুন কোনও দুর্ঘটনাকে আর কখনও প্রশ্রয় দেব না। কিন্তু...এখন ঠিক বুঝতে পারছি না সে-রাতে বাইরে থেকে খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে। হয়তো ভালোই হয়েছে। কথাটা নির্মম মনে হলেও আমি নিরুপায়। বাস্তব সব সময়েই নির্মম। আর যদি কেউ ভেবে দেখে যে, কত নিষ্পাপ তরুণকে ওই মেয়েটা নষ্ট করত, কীভাবে তাদের ঠেলে দিত পাপ, অন্যায় আর ধ্বংসের পথে হ্যাঁ, তাহলে হয়তো বলা যায়, অনেক ভালো মানুষকে আমি রক্ষা করেছি। আর মেয়েটার মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। ওর বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বয়েসে কম হলেও পাপের ভারে ও বৃদ্ধা। দুশ্চরিত্র কলুষিত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে ও মোটেই সুখী হত না...।

ওই ঘটনার পরের দিন আমি সত্যি-সত্যি আত্মহত্যার কথা ভাবলাম কী করে! তখন মনে আবেগ বেশি ছিল, তাই স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছি। কিন্তু এখন সব ঠিক আছে। অনেক—অনেকদিন পরে গত দুটো সপ্তাহ ভীষণ ভালোভাবে কেটেছে। এর কারণ বলা মুশকিল, তবে ব্যাপারটা যেন অনেকটা, আমি কোনও কাজে সফল হয়েছি...যেন হঠাৎই কিছু পেয়েছি, অনেক দিন ধরে মনের অজান্তে যে জিনিসটা আমি খুঁজছিলাম যেন হঠাৎই সেটা আমার হাতে এসে গেছে। অথচ তবুও কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। কী পেলাম তা জানি না। সেটা চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই জিনিসটা অদৃশ্য, অস্পৃশ্য—হয়তো আমার মনের কোনও হতাশা—যার অস্তিত্ব আছে বলে জানতাম না—চিরকালের মতো দূরে সরে গেছে। হয়তো সেই রাতের ঘটনার আঘাতে আমার মনের আড়াল আবরণ চুরমার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এরকমই কিছু একটা হয়ে থাকবে। মনের চিন্তাভাবনা আবেগের পথ ধরে আমি ঠিকঠাক এগোতে পারছি না, তবে সেটা অনুভব করতে পারছি। এ কোনও নতুন অনুভূতি নয়, এ আমার তৃপ্তিকে এক নতুন গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছে। মনে পড়ে, ছোটবেলায় এরকম হত। আমার সুন্দর আদরের খেলনাটা যখন ভেঙে ফেলি, তখন অনেকটা এরকম লেগেছিল। যে-নৃশংস কুকুরটা আমাকে আক্রমণ করেছিল, তাকে মেরে ফেলার সময়ও এরকম হয়েছিল। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, তিন-তিনটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কী করে একই অনুভূতির জন্ম দেয়! আমার ভারি অবাক লাগছে...।

২৮ জুলাই

দিনটা এগিয়ে আসছে। আমি একেবারে নির্বিকার। আমার শরীর পুরোপুরি সুস্থ, মনও পরিষ্কার। আমি পবিত্র জীবন যাপন করি। তা সত্ত্বেও যদি আমাকে একটা রাত কষ্ট পেতে হয় তাহলে সে নিয়ে অনুযোগ করার কিছু নেই। শুধু আমার বউ যদি এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করাটা বন্ধ করত! সারাটা মাস ওকে বড় বেশি দূরের মানুষ বলে মনে হয়েছে। হয়তো খবরের কাগজের মিথ্যে খবরগুলোর কিছু-কিছু বিশ্বাস করে ও আমার ওপর রাগ করে থাকবে। কিন্তু সে-কথা ও মুখে বলেনি। ওই ব্যাপারে একটা কথা পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। খবরটা এখন আর প্রথম পাতায় নেই, নতুন কেচ্ছাকাহিনি, মিথ্যে গপ্পো তার জায়গা নিয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনই ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে এক প্যারায় প্রকাশিত হচ্ছে পুলিশী তদন্তের অগ্রগতির কাহিনি।

প্রত্যেকদিনই ওরা বলে, অপরাধী গ্রেপ্তার হল বলে! আমার হাসি পায়। ভগবান করুন, ওরা যেন কোনও নির্দোষ ছাপোষা লোককে গ্রেপ্তার না করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস, যদি ওরা কাউকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে সে কোনও দাগী বিকৃতকাম অপরাধী হবে এবং সে হয়তো আমার অপরাধের চেয়েও বড় কোনও অপরাধের জন্যে দায়ী—সুতরাং আমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই! ভুল পাপে শাস্তি পেলে কোনও অবিচার হয় না, যদি সে-পাপী অন্য কোনও পাপ করে থাকে। আর আমার কথা যদি ওঠে বা সেই লোকটির, যে লাইব্রেরিয়ানকে খুন করেছে...তাহলে বলব, কোনও অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

২৯ জুলাই

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে যখন ফিরে আসছি দেখি একজন মিস্ত্রি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। বাইরে একটা লরি দাঁড়িয়ে ছিল। লরিটা যেন আমার খুব চেনা। পাতালঘর তৈরির সময় এই লরিতেই কি মালপত্র ইট-সিমেন্ট সব এসেছিল। কিন্তু মিস্ত্রিটাকে চিনতে পারলাম না। হয়তো নতুন কোনও লোক। তন্দ্রাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করতেই ও চমকে উঠল, তারপর অস্বীকার করে বলে উঠল, 'না তো, কেউ তো আসেনি।'

প্রথমে কৌতূহল হল। তারপর ভাবলাম, ও আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে না তো? নইলে চমকে উঠে এত নার্ভাস হয়ে পড়বে কেন? কিন্তু এ-চিন্তা ভয়ঙ্কর। এ-ভাবনা মনে আনা আমার উচিত হয়নি। এ-জিনিস চিন্তা করাও পাপ। আসল ব্যাপারটা যে কী সেটা এখন অনুমান করতে পারছি। নিশ্চয়ই পাতালঘরটাকে আরও আরামের করে তোলার জন্যে নতুন কিছু ও করে থাকবে। হয়তো নতুন গদি লাগিয়েছে আরও পুরু করে, অথবা লাগিয়েছে বেশি পাওয়ারের আলো। এ ছাড়া আর কী হতে পারে জানি না। হয়তো তন্দ্রা আমাকে চমকে দিতে চায়, তাই এখন কিছু বলছে না। ওর ধারণা, পাতালঘরে গিয়ে সেটা হঠাৎ দেখলে আমি ভীষণ খুশি হব। বলা যায় না, হতেও পারি। মিস্ত্রিটা যদি পাতালঘরে গিয়ে থাকে তাহলে দেওয়ালে গদি লাগানোর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ তন্দ্রা তাকে গুছিয়ে বলতে পেরেছে তো? বোকাসোকা রাজমিস্ত্রিরাও সময়ে সময়ে চালাক হয়ে ওঠে, সব বুঝতে পারে। আমার ধারণা, ওদের অনেকে হয়তো খবরের কাগজও পড়ে। সে যাই হোক, নিজেদের ঘরের দেওয়ালে গদি লাগাব, এতে কার কী বলার থাকতে পারে? আমাদের খুশি, তাই লাগিয়েছি।

এখন আবার ভাবছি, লোকটা পাতালঘরের দরজায় আরও জবরদস্ত তালা লাগাতে আসেনি তো? তন্দ্রাকে ক'দিন ধরে বড় অদ্ভুত লাগছে...যেন অনেক দূরের মানুষ। সম্ভবত ও ভয় পেয়ে থাকবে। বেচারা! এরকমটা কেন হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। ওর সঙ্গে আরও মিষ্টি ব্যবহার আমাকে করতে হবে, ক্ষমা করতে হবে ওর দুর্বলতা। ওকে ভালোবাসার কোনও প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন। দেখি, আজ রাতে ওর ঘরে যাব।

ওর সঙ্গে শোব। আমি গেলে ও বরাবরই খুশি হয়, চোখেমুখে ফুটে ওঠে কৃতজ্ঞতার ছাপ। ওর কাছে যাইনি আজ অনেক দিন। কিন্তু সে ওর দোষ। ও আমাকে হাবভাবে এটা কখনও জানায় না। জানে না, আমি এসব যা করি সব ওরই সুখের জন্যে। হয়তো ও ভাবছে, যতটা সম্ভব এসব কামনা-বাসনা এড়িয়ে চলাই ভালো...।

৩০ জুলাই

তন্দ্রা ভীষণ পালটে গেছে।

মেয়েমানুষের মনের হদিস কে বুঝতে পারে?

সবচেয়ে সরল ও নির্বোধ মেয়েরও মনের গভীরতার তল পাওয়া যায় না। আমার ধারণা, অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে কোনও মানুষের চেয়ে আমি কম নই। আমার যুক্তিবাদী মন যে-কোনও যুক্তিবাদী গভীরতা পরিমাপ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তন্দ্রার ব্যবহারে এতটা পরিবর্তন কী কারণে এল তা আমি তলিয়ে উঠতে পারছি না। বেশ কিছুদিন ধরে এটা লক্ষ করছি, কিন্তু কাল রাতে ব্যাপারস্যাপার চরমে পৌঁছেছে। হয়তো কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই এরকমটা হচ্ছে। হয়তো স্ত্রী-মনের অণু-পরমাণুর গতি এরকমই চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, অস্থির। এ কথা ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে। আমি নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবন পছন্দ করি। তা বলে অন্যান্য সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করি না। বরং খোলা মনে মেনে নিই। খোলা মন না থাকলে আমার মতো পরিস্থিতিতে কোনও মানুষ বাঁচতে পারে না। যদি জানতে পারি যে, এ ধরনের অসুখ নিয়ে মানসিক ভারসাম্য একমাত্র আমিই বজায় রাখতে পেরেছি, তাহলে এতটুকুও অবাক হব না। হয়তো এ-উক্তির কোনও মূল্য নেই, কিন্তু তবুও মূলধন করার জন্যে নিজের নৈতিক উৎকর্ষগুলো কোনও মানুষের জানা দরকার। অহঙ্কারকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিই না।

গত রাতে ওর ঘরে গিয়েছিলাম। ও সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছিল। তার একটু পরেই ঠিক করলাম, ওর ঘরে যাই। কিন্তু সবই অন্যরকম ঠেকল। ওর ঘরের দরজা খুলতেই চকিতে উঠে বসল তন্দ্রা : গায়ের চাদরটা গলার কাছে আঁকড়ে ধরা, বিস্ফারিত দু-চোখ আমারই দিকে তাকিয়ে। যেন অন্ধকারে শুয়ে ও এই মুহূর্তটারই প্রতীক্ষা করছিল। ভাবছিল, কখন আমি আসব। এতেই আমার অবাক লেগেছে। আর যেভাবে ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল...হ্যাঁ, অস্বীকার করব না, সে-চাউনি উলঙ্গ আতঙ্কের। ওর গায়ে হাত রাখতেই ও কুঁকড়ে গেল। কোনও কথা না বললেও ওর শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, ওর হাত খুঁজতে লাগল আমার মুখ। ওর মুখের অভিব্যক্তিতে, চোখের চাউনিতে আমার ঘেন্না হল। যেন ও ভাবছে এ রাতটাই আমার অসুখের রাত। হয়তো দিনক্ষণের হিসেব ও হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এটা তো ওর জানা উচিত যে, দিনের হিসেবে আমার কোনও ভুল হবে না! আমার বউ কেন আমাকে ভয় পাবে? এ কি খবরের কাগজের সেই নৃশংস মিথ্যে গল্পগুলোর পরিণাম? না কি পরিস্থিতির চাপে ও ভেঙে পড়েছে? আমার প্রতি সহানুভূতিতে আমার সঙ্গে তন্দ্রাও হয়তো কষ্ট পাচ্ছে? না, এ একেবারে অসম্ভব নয়। আমার পাতালঘরে যাওয়ার রাতটা এগিয়ে এলে ওকে দেখে সত্যি একটু অন্যরকম মনে হয়। শুনেছি ভালোবাসার মানুষের জন্যে অনেকে কষ্ট পায়। এমনও শোনা গেছে, স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে স্বামী প্রসব বেদনা অনুভব করে। এটাও হয়তো অনেকটা সেইরকম। এ-কথা ভাবতেই আমার ভালো লাগছে, কারণ তন্দ্রা আমাকে ভয় পায়—এ-চিন্তা মনে আনতেও আমার কষ্ট হয়।

আমাদের বিয়ের প্রথম-প্রথম তন্দ্রা আমাকে ভীষণ ভালোবাসত। এমনকী আদর সোহাগও করত। সে-আদর-ভালোবাসা ছিল বলগাহীন, উত্তাল। সত্যি বলতে কী, সংযমী হওয়ার জন্যে ওকে কয়েকবার মুখ ফুটে পর্যন্ত আমি অনুরোধ করেছি। ইন্দ্রিয়গত মাৎসর্যে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া কোনও মেয়ের পক্ষেই ঠিক নয়। সঠিক জানি না, ইন্দ্রিয়গত মিলনে সুখ-তৃপ্তি অনুভব করাটা পাপ কিনা, তবে তাতে গা ভাসিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই পাপ। একবার তন্দ্রা চেষ্টা করেছিল বিবাহজনিত সম্পর্কে প্রধান ভূমিকা নিতে। কয়েকবার সরাসরি এসে আমাকে জিগ্যেস করেছিল আমি ওর সঙ্গে এখন শুতে যাব কিনা। এ নিয়ে ওকে কঠোরভাবে এক বক্তৃতা দিয়েছি। সত্যি, ওকে দোষ দেওয়া যায় না। ও তো নিষ্পাপ, অনভিজ্ঞ—বুঝতে পারে না ওর আচরণে দোষটা কোথায়। ওর অতিরিক্ত কামনা, উলঙ্গ তৃষ্ণা দিয়ে ও আমাকেই খুশি করতে চেয়েছিল। মনে হয়, সত্যিকারের একজন তরুণীর এটুকু বোঝা উচিত যে, এটা পাপ। কিন্তু আমি বিচার করার কে? নিজেকে নীতিবাগীশ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কখনও আমি করিনি। আমি শুধুই একজন নীতিবাদী মানুষ,

জীবনযাপনের প্রকৃত পথ সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করি। তন্দ্রার প্রতি ব্যবহারে একটু কঠোর আমাকে হতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে ওর ভালোর জন্যেই।

গত রাতের ব্যাপারটা অবশ্য একেবারে অন্যরকম। ওর মধ্যে এতটুকু ইচ্ছে কিংবা আকুতি দেখিনি। সবকিছু হয়ে যাওয়ার পর যখন আমি চলে আসছি, তখন ও যেন খুশি হল, স্বস্তি পেল। তার আগে সারাটা সময় ও শুয়ে শুয়ে চোখ তুলে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে থেকেছে আমার মুখের দিকে। এতে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। স্বামীর দায়িত্ব পালনের সময় কখনওই আমি ঠিক সহজ হতে পারি না, স্বস্তি পাই না। কিন্তু এ আরও খারাপ। একে ঠিক...অস্বস্তি বলা যায় না, কিন্তু অন্য কোনও প্রতিশব্দও আমার জানা নেই। যেন ক্রমে বেড়ে ওঠা এক বিপজ্জনক অনুভূতি। ও যেন আমার দিকে এমন করে আর না তাকায়! ভয়, ত্রাসের মধ্যে কী যেন একটা আছে...জানি না সে কী...এতে মনে হয় কল্পনায় ভেসে ওঠে... অস্পষ্ট সব ছবি। সঠিক বুঝিয়ে বলা মুশকিল। আমার মনের শান্ত পরদার ঠিক নীচেই যেন গুড়ি মেরে লুকিয়ে থাকে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত সব ইচ্ছে—ঝাপসা, নোংরা, অন্ধকার। এবং কোনও কারণে নৃশংস, ভয়ঙ্কর। পরদায় ঢাকা বিভিন্ন ছবি। এর চেয়ে ভালোভাবে আর বলতে পারব না।

৩১ জুলাই

বরাবরের মতো ভয় ও বিরক্তি নিয়ে আগামীকালের প্রতীক্ষায় আছি, অবশ্য সঙ্গে একটু কৌতূহলও হচ্ছে। জানতে ইচ্ছে করছে, অসুখটার ওপর গত মাসের প্রভাব কতটা পড়েছে। গোটা জুলাই মাসটা এত শান্তিতে কেটেছে। নিজের সঙ্গে অনেক ভালোভাবে আমি বোঝাপড়া করতে শিখেছি। সুতরাং অসুখটায় যদি সত্যিই কোনও পরিবর্তন দেখতে পাই তাহলে আমি এতটুকু অবাক হব না। ওটার রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে গত মাসটা হয়তো অনুঘটকের কাজ করে থাকবে হয়তো ভালোর দিকেই। যাই হোক না কেন, আমার ধারণা, সে পরিবর্তন আমি নির্বিকারভাবে মেনে নিতে পারব।

তন্দ্রাকে যদি এতটা অস্বাভাবিক বা দূরে-দূরে মনে না হত তাহলে ওকে হয়তো আগ্রহ নিয়েই আমার আশা ও অনুমানের কথা বলতাম। তবে এখন বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না, অন্তত যতক্ষণ না আমি নিজে জানতে পারছি। মিথ্যে আশা-আনন্দ জাগিয়ে কোনও লাভ নেই। আজ সকালেও ও বড় অদ্ভুত ব্যবহার করল। রুমালটা বসবার ঘরে ফেলে এসেছিলাম। সেটা আনতে গেছি, নজরে পড়ল তন্দ্রা আড়ালে থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে আমাকে দেখছে। শুধু ওর কপাল ও কাজল-কালো চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। চকিতে ও সরে গেল।

এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। জিগ্যেস করলাম, ‘কী ব্যাপার, তন্দ্রা? কী খুঁজছ?’

‘না—মানে, কিছু না—’ তারপর কী ভেবে ও বলল, ‘তুমি কি এখন ওই ঘরে যাচ্ছ?’

অবাক হলাম।

‘কোন ঘরে?’

তন্দ্রা চোখ নামাল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ‘ইয়ে পাতালঘরে...’

ওর অভিব্যক্তি আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ও কী বলতে চায়। বিরক্তি ও রাগে উত্তর দিলাম, ‘হঠাৎ এ-কথা মনে হওয়ার কারণ?’

আশ্চর্য! এ-কথা হঠাৎ ও ভাবছে কেন? ও তো জানে, পাতালঘরটাকে আমি কী অসম্ভব ঘৃণা করি। নিতান্ত প্রয়োজন না পড়লে সেখানে আমি যাই না। সুতরাং নিশ্চুপ তন্দ্রার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললাম, ‘তুমি জানো না, নেহাত দরকার না পড়লে আমি ওখানে যাই না?’

ও যেন একটু আশ্বস্ত হল।

দিনটা যত কাছে এগিয়ে আসছে ওর মানসিক চাপ তত বেড়ে উঠছে। হয়তো ভয় পেয়ে ভাবছে, সময় হওয়ার আগেই অসুখটা শুরু হতে পারে। আমাকে হয়তো পাতালঘরে আরও বেশি সময় কাটাতে হতে পারে—এক রাতের জায়গায় দু-রাত। দু-রাত! ঈশ্বর করুন, তা যেন কোনওদিন না হয়।

বুঝতে পারছি, তন্দ্রা কেন এত চিন্তিত হয়ে পড়ছে। ও যে আমাকে ভালোবাসে এ তারই একটা প্রমাণ। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয়, আমার অসুখটাকে ও একেবারেই বুঝে উঠতে পারেনি। এ আমারই দুর্ভাগ্য।

১ আগস্ট

শরীরে শক্তি আমার টগবগ করে ফুটছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকটা পথ চটপট হেঁটে এসেছি। একটা খোলা মাঠে বাচ্চাদের খেলতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ওদের বাঁচার উৎসাহের অংশ নিতে চেয়েছি। তখনই মনে পড়ল, আমার কখনও ছেলেমেয়ে হবে না। কোনও সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে আমি পারব না। পারব না এ ভয়ঙ্কর অভিশাপের বোঝা তাদের মাথায় তুলে দিতে। ভীষণ দুঃখ পেলাম। বাচ্চাগুলো আনন্দ খুশিতে এত প্রাণবন্ত, এত উচ্ছল যে, ভাবতে কষ্ট হয়, প্রকৃতির নিয়মে ওদেরও বড় হতে হবে, মুখোমুখি হতে হবে জীবনের জটিল সমস্যার। আমার ছোটবেলাটা সুখের ছিল না। অন্তত আমার তা মনে পড়ে না—অবশ্য দু-একটা বিশেষ ঘটনা ছাড়া। তা বলে অন্য কাউকে আমি হিংসে করি না, কারণ আমার শৈশব আমাকে পৌঁছে দিয়েছে সত্যিকারের পৌরুষের দিকে। আমার গোটা অতীত জীবনটার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলতে পারি, এমন কোনও কাজ আমি কখনও করিনি যার জন্যে আজও আমার দুঃখ হয়। যা কিছু আমার দুঃখ, সব অন্য কারণে। যে-কারণ আমার সৃষ্টিরও আগে নিহিত। যদি কেউ নিজের জীবনধারাকে এক অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত রেখায় দেখতে পায়, যাতে কোনও জটিলতা নেই, কোনও কলঙ্ক নেই, কোনও লজ্জা নেই, যেমনটি সে চেয়েছিল ঠিক তেমনটি, তাহলে সেটা হল তার জীবনের চরম শান্তি।

আজ রাতের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছি। কখন পরিবর্তনটা আসবে। আমার স্থির বিশ্বাস, আজ একটা না একটা উন্নতির লক্ষণ দেখবই...না কি আমি জানি যে, উন্নতির কোনও প্রয়োজন নেই, যতটা ভাবতাম আমার অসুখ ততটা খারাপ নয়! আশা করি ওই অমানুষটার মনোভাবও আমারই মতো স্থির, শান্ত থাকবে।

থাকবে কিনা সেটা জানা যাবে আজ রাতে। পাতালঘরে।

১ আগস্ট, রাত

যাক, দরজায় খিল দেওয়া হয়েছে। তন্দ্রা ওপরে চলে গেছে। পাতালঘরে আমি একা। তন্দ্রা আমার সঙ্গে আজ খুব মিষ্টি ব্যবহার করেছে। যেসব খাবার আমি ভালোবাসি বেছে বেছে সেগুলো রান্না করেছে। আর খাওয়ার সময় আমার সামনে বসে এ-কথা সে-কথা নিয়ে শুধু বকবক করে গেছে। খুশিতে মুখ উজ্জ্বল। সম্ভবত ও চেষ্টা করেছে আমার মনটাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে, পাতালঘর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ওর এই অবুঝ চেষ্টার প্রশংসা করতে হয়। সুতরাং ওকে নিশ্চিন্ত করে হাতে প্রচুর সময় নিয়ে নীচে নেমে এলাম। ভেবেছিলাম ও হয়তো নাভার্স হয়ে পড়বে, ভয় পাবে, তাই ওকে সঙ্গে না নিয়েই আমি চলে এসেছি পাতালঘরে। ওর আতঙ্কবিকৃত মুখ আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। জানি একটু

পরেই ও নেমে আসবে। বাইরে থেকে খিল দিয়ে দেবে দরজায়। সত্যিই তাই হল। আমি নেমে আসার প্রায় মিনিটপাঁচেক পর ও এল। দরজায় খিল দিয়ে ফিরে গেল ওপরে।

পাতালঘরে নতুন কিছু চোখে পড়ল না। কিন্তু ভেবেছিলাম, নতুন কিছু অবশ্যই দেখতে পাব। তন্দ্রা হয়তো মিস্ত্রি দিয়ে সে-কাজ করিয়ে থাকবে। কিন্তু কই? তালাও সেই একই আছে। দেওয়ালের গদিও সেই একই জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। হয়তো মিস্ত্রি ডেকে ও ঘর সারাবার এবং গদি সারাবার হিসেব নিতে চেয়েছিল। হয়তো পরের মাসে সারাইয়ের কাজ হবে। ভাবছি একটা বেশি পাওয়ারের আলো ঘরে লাগালে ভালো হত। এই আলোতে ডায়েরি লিখতে বেশ কষ্ট হয়। বিশেষ করে ঘরের কোণে আলো প্রায় পৌঁছয় না। যদি...।

এইমাত্র একটা ভয়ঙ্কর জিনিস আমার নজরে পড়েছে। এর মানে বুঝতে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। একটা ঠান্ডা ইস্পাতের ছুরি যেন আমার শিরদাঁড়া কেটে নেমে যাচ্ছে। শরীরের মাংস জমাট বেঁধে গেছে বরফে। একটু আগেও লিখছিলাম। লিখতে-লিখতে হঠাৎ চোখ পড়েছে দেওয়ালে, আর...দেওয়ালে একটা ফুটো রয়েছে! ছোট্ট ফুটো। প্রথমটায় আমার চোখে পড়েনি। ছোট হলেও একজনের দেখবার পক্ষে যথেষ্ট...অন্তত পাতালঘরটুকু দেখবার পক্ষে। ফুটোটা আগে ছিল না। তাছাড়া মেঝেতে এখনও সিমেন্ট বালির গুঁড়ো পড়ে রয়েছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে নেই যে, ফুটোটা নতুন করা হয়েছে। হয়তো এইজন্যেই সে-মিস্ত্রিটা এসেছিল। কিন্তু দেওয়ালে ফুটো করিয়ে তন্দ্রার কী লাভ? ওকে কি ভূতে পেয়েছে? এরকম নিষ্ঠুর অমানুষিক কাজ ও করবে কেন? নিশ্চয়ই ও পাগল হয়ে গেছে। পরিবর্তন হওয়ার পর ও নিশ্চয়ই পাতালঘরে উঁকি মেরে দেখবে! কিন্তু সে দেখে ওর লাভ কী? এ আমি বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছি না। তন্দ্রা! তন্দ্রা পারল এমন নৃশংস পাশবিক কাজ করতে! ও আমাকে দেখবে...পালটে যেতে দেখবে...মানুষ থেকে একটা অমানুষে...এ আমি ভাবতেও পারছি না। যে-দেওয়ালে ফুটোটা আছে এখন আমি সেখানে উবু হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছি। জানি, ফুটো দিয়ে এখন আমাকে দেখা যাবে না, কিন্তু পরে কী করব? পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার পর? ওটার তো এত বুদ্ধিসুদ্ধি নেই, বুদ্ধিসুদ্ধির পরোয়াও করে না। সে কি তখন পারবে এই দরজার কাছে গুড়ি মেরে তন্দ্রার দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকতে? একবার ভেবেছিলাম গায়ের জামাটা খুলে ফুটোতে গুঁজে দেব, কিন্তু ভয় হয় অসুখের মধ্যে ভয়ঙ্কর দাপাদাপির সময় জামাটা হয়তো ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মেঝেতে। কিংবা তন্দৰা হয়তো কোনও কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জামাটা ফেলে দেবে ঘরের ভেতর। আমার কিছুই করার নেই। আমাকে ও দেখবেই!

ভয়ে, আশঙ্কায় আমার শরীর খারাপ লাগছে। ভীষণ বমি পাচ্ছে। মাথাও ঘুরছে। তন্দ্রা আমার সঙ্গে কেন এমন করছে? এ কি নিছকই অসুস্থ কৌতূহল? ওর মনে এমন কি কোনও বিকৃতি আছে যা আমার আগে নজরে পড়েনি? না কি এখনও ও আমাকে অবিশ্বাস করে? তাই প্রমাণ চায় যে, আমি পাগল নই—এ সবই আমার কল্পনা নয়, সত্যি। জানি না। ও আমাকে ধীরে-ধীরে পালটে যেতে দেখবে এ সাঙ্ঘাতিক চিন্তা আমি মনেও আনতে পারছি না। ভগবান জানেন, দেখার পর ওর মনের অবস্থা কী হবে! আমার একমাত্র কামনা, ও যেন এটাকে অসুখ বলে বুঝতে পারে, সত্যের মুখোমুখি হয়ে ও যেন পাগল না হয়ে যায়। কিন্তু ওর মন তেমন শক্ত নয়, আর আমার ভয় হচ্ছে...আমাকে অন্য চেহারায় দেখার সময় অন্যান্যদের চোখের দৃষ্টি আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওই সেলসম্যান লোকটা, মাতালটা, মেয়েটা...ওদের মুখে ফুটে উঠেছিল বিকৃত মানসিকতার ছায়া। আর তন্দ্রার সেরকম মনের জোর কোথায়? স্বাভাবিক অবস্থাতেই দেখেছি আমার দিকে চেয়ে ওর চোখের পাতায় উলঙ্গ আতঙ্ক থরথর করে কাঁপছে। খবরের কাগজে মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার ওই মিথ্যে গল্পগুলো পড়ার পর...সে-রাতে বিছানায়...ওর চোখেমুখে ছিল আতঙ্ক...মুখ চাঁদের মতোই চকচকে সাদা...কাঁপছে, বিকৃত হয়ে চেনা চেহারা পালটাচ্ছে অতি ধীরে...আর অবশেষে আমি দেখতে পাচ্ছি শুধু নগ্ন আতঙ্ক। অন্যান্য অভিব্যক্তি মিলিয়ে গেছে কোন অতলে...আমি

তাকিয়ে থাকি...মনে হয়...খালি মনে হয় এ-আতঙ্ককে বাঁচতে দেওয়া ঠিক নয়...একে বিনাশ করতে হবে...স্বাভাবিক হওয়ার পর কী করে আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়াব...যখন...।

ওপরের দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম।

মনে হয় তন্দ্রা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। নেমে আসছে পাতালঘরে আমাকে দেখতে...।

২ আগস্ট?

মনে হয় সকাল হয়েছে। এখন ঠিক আছি—যদিও খুব ক্লান্ত। আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো। শিগগিরই তন্দ্রা দরজা খুলতে নেমে আসবে। গত রাতের পর কী করে ও আমার মুখোমুখি হবে?

ওকে কত করে চলে যেতে বলেছি কিন্তু ও আমার কথার উত্তর পর্যন্ত দেয়নি, শুধু পাতালঘরের ভেতরে চোখ রেখে অপেক্ষা করেছে। উত্তেজিত থাকার ফলে অসুখটা সময়ের আগেই শুরু হয়ে গেছে, এবং সমস্ত সংযম আমি হারিয়ে ফেলেছি। ও স-ব দেখেছে। ওকে আমি ঘেন্না করি। ও যা করেছে তার কোনও ক্ষমা নেই। রাগে, লজ্জায়, ঘেন্নায় আমার শরীরে আগুন জ্বলছে। যখন ও দরজা খুলবে তখন আমাকে ভীষণ শান্ত সংযত থাকতে হবে। নইলে হয়তো ওর গায়ে হাত তুলে বসব। হাত তোলাই উচিত। আরও খারাপ শাস্তি ওকে দেওয়া উচিত। ও যা অন্যায় করেছে তাতে কোনও শাস্তিই যথেষ্ট নয়। ওর জন্যেই অসুখটা কাল আরও খারাপের দিকে গেছে। স্পষ্ট মনে আছে, আমি গর্জে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছি দেওয়াল থেকে দেওয়ালে, চেয়েছি দাঁতে নখে সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে পাতালঘর থেকে মুক্তি পেতে, চেষ্টা করেছি ফুটোটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিতে, আর সারাটাক্ষণ তন্দ্রা দাঁড়িয়ে ছিল ফুটোটার কাছে, অবিনাশী দেওয়ালের ওপাশে। দেখছিল পাতালঘরের প্রতিটি ঘটনা। ও একটা পিশাচ, ডাইনি, শয়তান! ভাষায় ওকে বর্ণনা করা যায় না...।

২ আগস্ট?

আজ তারিখ কত, জানি না। সময় বোঝারও কোনও উপায় নেই। মনে হয় যেন এক যুগ কেটে গেছে। এই ডায়েরি নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ এখন ডায়েরি লেখা অনর্থক। পেনের কালিও শেষ হয়ে এসেছে। আলোটাও হয়ে এসেছে ক্ষীণ, নিষ্প্রভ। হয়তো একটু পরেই সব অন্ধকার হয়ে যাবে। শরীরের রক্ত দিয়ে হয়তো এই ডায়েরি লেখা যাবে, কিন্তু সে-কষ্ট স্বীকারে কোনও লাভ আছে বলে মনে হয় না...রক্ত আমার একটুও ভালো লাগে না। রক্ত আমাকে বহু স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। এখনও, কিছু একটা লিখতে হবে, এই চিন্তাটা আমার মন জুড়ে রয়েছে। পাগল হয়ে যাওয়ার পথে এ এক প্রতিবন্ধক, আমার বন্ধু। খিদে তেষ্টা আমি সইতে পারি, কিন্তু মানসিক সুস্থতা হারিয়ে আমি বাঁচতে পারব না।

এখনও বুঝতে পারছি না তন্দ্রা কেন আমার সঙ্গে এমনটা করল। ওর প্রতি এতটুকুও রাগ আমার নেই, কেন জানি না। কখনও-সখনও ও নেমে এসে উঁকি মারে এই পাতালঘরে। দিনে একবার, সপ্তাহে একবার... কী জানি? আমার কাছে কোনও তফাত নেই। কখনও কোনও কথা ও বলে না। কথা বললে তার উত্তরও দেয় না। কখনও-কখনও এক অদ্ভুত শব্দ করে ও, অনেকটা যেন খলখল হাসির শব্দ। ও কি পাগল হয়ে গেছে? যখন ওকে অনুনয় বিনয় করি ও চলে যায়...।

২

ভীষণ খিদে পাচ্ছে।

দেওয়াল থেকে গদিগুলো ছিঁড়ে খেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। উলটে তেষ্টা আরও বেড়েছে। আলোটা এখন একেবারে নিভু-নিভু। ওটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে কোনওরকমে লিখতে পারছি। চোখের নজরও ঝাপসা হয়ে এসেছে। শরীর দুর্বল, মাথা ঝিমঝিম করছে। আর বেশি লিখতে পারব বলে মনে হয় না।

এখন বুঝেছি, এখানেই আমাকে মরতে হবে। তার জন্যে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। আমি মারা যাব ঠিক, তবে নিজের দোষে নয়। এটুকুই আমার সান্ত্বনা। এ পরিণতির জন্যে আমি দায়ী নই। যেমন আমার জীবনের যত দুঃখ যত কষ্ট সবকিছুর জন্যে দায়ী আমার পূর্বপুরুষদের পাপ। আমি নির্দোষ। আর এখন আমি মরতে চলেছি আমার স্ত্রীর পাগলামির শিকার হয়ে। এ অন্যায়, তবে ভালোই হয়েছে। এখন শুয়ে পড়ব। আর কিছু বোধহয় লেখার নেই।

বুঝতে পারছি রাত হয়েছে। কামড় বসিয়ে দিলাম হাতে...।

এখানেই ডায়েরি শেষ। অবশ্য এর পরের কয়েকটা পাতায় কিছু অসংলগ্ন দুর্বোধ্য আঁচড়ের দাগ আমার চোখে পড়ল। সেগুলো হয়তো অন্ধকারে ডায়েরি লেখার চেষ্টায়, অথবা মানুষের হাত-ওলা কারও অসতর্ক হিজিবিজি। ধীরে-ধীরে বাঁধানো ডায়েরিটা বন্ধ করে জানলা দিয়ে তাকালাম বাইরের বৃষ্টির দিকে। ভীষণ শব্দে কোথাও বাজ পড়ল, বাইরের উঠোনে বিশাল দেবদারু গাছ ঝড়ে টলোমলো, আকাশে ঘন মেঘ অচঞ্চল, স্থির। দূরে শোনা গেল কোনও কুকুরের আর্ত চিৎকার।

বহুক্ষণ একভাবে বসে রইলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডায়েরিটা পকেটে রাখলাম। ক্রমশ রাত বাড়ছে। দোতলার সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম। সামনেই সেই প্রাচীন দরজা। পাতালঘরে যাওয়ার পথ। আমাকে সেখানে যেতে হবে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলাম, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। দরজা খুলতেই সেই ভ্যাপসা গুমোট হাওয়া আমাকে ঘিরে ধরল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। যেন কোনও অন্ধকার কবরে নেমে চলেছি।

ডায়েরির কথামতো পাতালঘরটা একটা কোণে দাঁড়িয়ে। সিমেন্টের মেঝেতে আমার পায়ের শব্দ অস্বাভাবিক সোচ্চার। পাতালঘরের দরজায় খিল দেওয়া। কোনও কিছু না ভেবেই চটপট খিল খুলে ফেললাম। বিচিত্র শব্দ তুলে খিলটা খুলল। মরচের গুঁড়ো, ধুলো, মাটি ঝরে পড়ল মেঝেতে। দরজাটা খুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু খুলল না। তখনই নজরে পড়ল দরজায় এক বিরাট তালা। সময়ের প্রকোপেও সে তালা দুর্বল হয়নি। আর দরজাটাও নেহাত পলকা নয়। কোণের দিকে সরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম ফুটোটা। ফুটোর চারপাশে সিমেন্ট বালি খসে পড়েছে। চোখ রাখলাম ফুটোতে, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু অন্ধকার। সুতরাং অত্যন্ত শান্তভাবে ফিরে এলাম সিঁড়ির কাছে, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলাম। ওপরে গিয়ে ওই তালার চাবিটা খুঁজে দেখতে হবে। ওটা তন্দ্রাকাকিমার কাছে যখন ছিল, তখন এই বাড়িতেই কোথাও না কোথাও আছে। খুঁজে আমাকে দেখতেই হবে। সিঁড়ির ওপরের ধাপে পৌঁছতেই গোটা সিঁড়িটা কেঁপে উঠল আমার ভারে। তারপর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল। প্রচণ্ড এক লাফে আমি ছিটকে গেলাম দরজার বাইরে। উলটে পড়লাম মেঝেতে। উঠে দাঁড়িয়েই উন্মাদের মতো ছুটতে শুরু করলাম। সদর দরজা খুলে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আমি ছুটে চললাম।

আমার সাহস আছে, শক্তিও কম নেই, কিন্তু সেদিন আমি শুধু ছুটেছি। ওই বাড়ি থেকে চলে গেছি অনেক দূরে। বৃষ্টিতে আমার শরীর ভিজে সারা। হু-হু বাতাসে কেমন শীত-শীত করছে। জ্যাকেটটা আমি ভুলে ফেলে এসেছি।

এসব বেশ কিছুদিন আগের কথা। তন্দ্রাকাকিমার ওই বাড়িতে আর ফিরে যাইনি। কিন্তু একদিন যাব। প্রায়ই কৌতূহল হয় পাতালঘরে এখন কী আছে, কে আছে? ভয় পাওয়ার মতো নিশ্চয়ই কিছু নেই। কারণ সেসব ঘটনা তো বহুদিন আগের। আর তন্দ্রাকাকিমা নিশ্চয়ই পরে একসময় ওই ঘরে গিয়েছিলেন, নইলে ডায়েরিটা পেলেন কী করে? পুরোনো খবরের কাগজ ঘেঁটে দেখেছি। একটা অমীমাংসিত খুনের ঘটনা আমার নজরে পড়েছে। হতে পারে এই খুনটার কথাই হয়তো ডায়েরিতে উনি লিখেছিলেন। কিংবা নাও হতে পারে। উনি নিশ্চয়ই পাগল ছিলেন, এর সবটাই হয়তো তাঁর কল্পনা। কল্পনা না হয়ে পারে না। কিন্তু তবুও খালি ভাবি, সে-রাতে তন্দ্রাকাকিমা পাতালঘরে কী দেখেছিলেন? তখনই কি তিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী পাগল, আর সেইজন্যেই তাঁকে বন্দি রেখে চলে গেছেন? না কি তিনি অন্য কিছু দেখেছিলেন? এমন কিছু, যা দেখে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?

সে যাই হোক, কোনওদিন আমি জানতে পারব না। তন্দ্রাকাকিমা নিজে কোনও ডায়েরি রাখতেন বলে মনে হয় না। এতে অবশ্য আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কী-ই বা থাকবে। অলৌকিকে আমি বিশ্বাস করি না। কোনওদিন করিনি।

কাকার ডায়েরিটা আমার কাছে রয়েছে, সময় পেলেই ওটা বারবার পড়ি, চেষ্টা করি আসল সত্যকে খুঁজে বের করতে। কোনও-কোনও দিন উজ্জ্বল পূর্ণিমার রাতে ডায়েরিটা পড়ি, একা বসে থাকি জানলার পাশে, আর মাঝে-মাঝে তাকিয়ে থাকি রুপোলি থালার মতো চাঁদের দিকে। রাত যেন আর কাটতে চায় না। আমি একেবারে একা। তাই বড় একঘেয়ে লাগে। তাই ভাবছি সময় কাটানোর জন্যে ওইসব রাতে ডায়েরি লিখব। সবকিছু কাগজে-কলমে লিখে রাখব। যেমন এই মুহূর্তে আমি চুপচাপ বসে আছি, তাকিয়ে আছি গোল ধবধবে চাঁদের দিকে, আর মাঝে-মাঝে লক্ষ করছি আমার হাত দুটো আঙুল...আঙুলের নখ...।

পিশাচের রাত



এক

শীত চলে যাচ্ছিল। তাই বসন্তও এসে হাজির হয়েছিল দরজায়। কিন্তু প্রকৃতির কী খেয়াল, শীত আবার ঘুরে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে নিয়ে এল বর্ষা। ফলে বসন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

গতকাল সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিকে হয়ে আসা শীত একটু-একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। কাল রাতে শোওয়ার সময় আপনমনে গজগজ করতে-করতে চিকুর মা আলমারি খুলে আবার লেপ-কম্বল বের করে ফেলেছে।

'এভাবে শীত চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার কোনও মানে হয়!' চিকুর বাবা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছিল, চিকুর মায়ের কথায় হেসে ফেলল : 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি। এতে খুব অসুবিধে হয়। ওই যে সেদিন আমি অফিসে বেরিয়ে গেলাম—তারপর চশমাটা ভুলে ফেলে গেছি বলে ফিরে এলাম—তাতে চিকুর খুব অসুবিধে হয়ে গিয়েছিল...।'

চিকু ওয়াকম্যানের হেডফোন কানে লাগিয়ে সবে হিন্দি গান শোনার তোড়জোড় করছিল, বাবার কথায় অনুযোগ করে উঠল, 'কী হচ্ছে, বাবা!'

ব্যাপারটা গত সপ্তাহের। বাবা সকাল দশটা নাগাদ অফিসে রওনা হতেই ও একটা রবারের বল নিয়ে ঘরের মধ্যে ফুটবল খেলতে শুরু করেছিল। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাবা আচমকা ফিরে আসায় কী কেলেঙ্কারি! কারণ, সামান্য জ্বর মতন হয়েছে বলে সেদিন ও স্কুলে যাবে না ঠিক করেছিল। বাবা ওর কথায় সায় দেওয়ায় মা শত জেদ করেও ওকে স্কুলে পাঠাতে পারেনি। এখন মায়ের চেঁচামেচি গ্রাহ্য না করে ও ফুটবল প্র্যাকটিস করছিল। সামনের রবিবার জামতলার তরুণ সঙ্ঘের সঙ্গে ম্যাচ। ম্যাচ তো নয়—একেবারে প্রেস্টিজ ফাইট। তাই...।

বাবা কোনও সময় চিকুকে বকাবকি করে না। চশমা নিতে এসে। ওকে খেলতে দেখে শুধু বলেছিল, 'বল খেললেই দেখবি তোর জ্বর সেরে যাবে।'

তারপর হেসে চলে গিয়েছিল।

চিকু তাতে ভীষণ লজ্জা পেয়ে তিনদিন এমন পড়াশোনা করেছিল যেন ওর মাধ্যমিক পরীক্ষা একেবারে কাছে এসে গেছে। অথচ ও এখন সবে ক্লাস নাইনে পড়ে—টেন-এ উঠবে।

আজ সকালের খবরে চিকু শুনেছে উষ্ণতা এক ধাক্কায় চার ডিগ্রি কমে গেছে। সুতরাং ওর হাতকাটা সোয়েটার আর মাফলার আলমারির তাক থেকে আবার বেরিয়ে এসেছে।

সন্ধে ছ'টার সময় হরিহরবাবুর কোচিং-এ চিকু বাংলা পড়তে যায়। হরিহরবাবু চিকুদের জাঙ্গিকুল হাই-স্কুলের বাংলা স্যার ছিলেন। বছরদুয়েক হল রিটায়ার করেছেন। বাংলা দারুণ পড়ান—তাই ওঁর কোচিং-এ খুব ভিড়। তা ছাড়া ভীষণ পণ্ডিত মানুষ—নানান বিষয়ে অনেক জানেন।

চিকু যখন সাইকেল নিয়ে বেরোল তখন বৃষ্টি পড়ছে কি পড়ছে না। তবে আকাশের এখানে ওখানে বেশ মেঘ জমে রয়েছে।

মা চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে কেব্‌ল টিভিতে সিনেমা দেখছিল। চিকুকে বেরোতে দেখে বলল, 'অ্যাই, ছাতা নিয়ে বেরোবি—।'

চিকু আবদারের গলায় বলল, 'বৃষ্টি তো পড়ছে না!'

'একটু পরেই পড়বে।'

বিরক্তভাবে মায়ের ফোল্ডিং ছাতাটা ব্যাগে ভরে নিল চিকু। তারপর সিঁড়ির নিচ থেকে সাইকেলটা বের করে রাস্তায় চলে এল।

হরিহরবাবুর কোচিং সাইকেলে বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। ঘণ্টি বাজিয়ে জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল চিকু। বৃষ্টি জোরে নামার আগেই ওকে কোচিং-এ পৌঁছতে হবে। ছাতা মাথায় দিয়ে সাইকেল চালানো এক ঝকমারি।

সরু পিচের রাস্তা ভাঙাচোরা কয়েকবছর ধরেই। এই দু-দিনের বৃষ্টি সেটাকে একেবারে বেহাল করে দিয়েছে। রাস্তায় লোকজন কম। যে-ক'জন চোখে পড়ল সকলেই সোয়েটার, মাফলার কিংবা চাদরমুড়ি।

নাটোর মোড়ের কাছে শ্যামাপদদার তেলেভাজার দোকান পেরিয়ে গেল চিকু। সেখানে বেশ ভিড়। সাইকেল-রিকশাগুলো প্যাকপ্যাক হর্ন বাজিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে।

ডানদিকে ঘুরে শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দির পেরোতেই চিকু দেখল দেশপ্রিয় সুইটস-এর পাশে বেঞ্চি পেতে রোহনদারা বসে আছে।

এ-এলাকা রোহনদের কথায় চলে। কোথাও কোনও গোলমাল হলে রোহনরা সবার আগে সেখানে ছুটে যায়। রাতবিরেতে বিপদ-আপদ হলে রোহনরা একডাকে হাজির। গত পুজোর আগে সমীর মিত্রদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। ওদের কাজের লোক কোনওরকমে পালিয়ে এসে রোহনের বাড়িতে খবর দিয়েছিল। রোহন সঙ্গে সঙ্গে দলবল জুটিয়ে মিত্রদের বাড়িতে গিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গুলি-বোমা নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দুজন ডাকাত ধরা পড়েছিল, আর তিনজন পালিয়ে গিয়েছিল। কষে গণধোলাই দেওয়ার পর আধমরা ডাকাতদুটোকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

চিকুকে দেখে রোহন হাত নাড়ল, চেঁচিয়ে বলল, 'কোচিং যাচ্ছিস?'

সাইকেল না থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে চিকু জবাব দিল, 'হ্যাঁ—বাংলা।'

রোহন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় একবার ফেল করার পর আর লেখাপড়া করেনি। ওর বাবার সিমেন্ট-বালি-ইটের দোকান আছে—সেখানে মাঝে-মাঝে বসে। চিকুর সঙ্গে যখনই কথা হয় তখনই লেখাপড়া করতে পারেনি বলে দুঃখ করে। চিকুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'তুই লেখাপড়ায় ফার্স্টক্লাস। ঠিকমতো চালিয়ে যা।'

জলাপুকুরের পাড় দিয়ে সাইকেল প্যাডেল করে যেতে-যেতে চিকুর এসব কথা মনে পড়ছিল। পুকুরের অন্ধকার জলে রাস্তার দু-চারটে টিমটিমে বালবের ছায়া পড়েছে। গ্যাঙর-গ্যাঙ ব্যাঙের দল ব্রিগেডের মিটিং শুরু করে দিয়েছে। কোথায় যেন ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল ওরা! বৃষ্টি হতে-না-হতেই লুকনো আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে শোরগোল হইচই করে দুনিয়া মাথায় তুলেছে।

জলাপুকুরের নামটা কেন যে এরকম অদ্ভুত কেউ জানে না। মাপে প্রকাণ্ড হলে কী হবে, শ্যাওলা আর কচুরিপানায় প্রায় পুরোটাই ঢাকা। পুকুরের দু-কোণে ইট-পাথর পেতে সবাই ঘাটের মতো করে নিয়েছে। সেখানেই বাসনমাজা আর স্নানের কাজ চলে।

জায়গাটা বেশ নির্জন, আর শীতও যেন বেশি। চিকুর এখন হয়তো ভয়-ভয় করত, কিন্তু ব্যাঙের দল ওকে সাহস দিল। ও তাড়াতাড়ি প্যাডেল ঘোরাতে শুরু করল।

জলাপুকুর পেরিয়েই বিশাল এক আমবাগান। চিকু শুনেছে, এককালে এখানে শুধুই আমগাছ ছিল। কিন্তু এখন তারই মাঝে কাঁঠাল, শিমুল, তেঁতুল এসব গাছ গজিয়ে জায়গাটা ঝুপসি হয়ে গেছে। তবে জায়গাটার নাম এখনও সেই আমবাগান।

গাছগাছড়ার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা কাঁচা পথ। এখন বৃষ্টিতে কাদা-কাদা হয়ে গেছে। চিকু সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল। সাইকেলের হেডলাইট ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

আমবাগান পেরিয়ে রাজবাড়ি। তবে বাড়ির এখন যা অবস্থা তাতে পোড়োবাড়ি বলতেও কোনও অসুবিধে নেই। ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটা প্রকাণ্ড এক কালো কচ্ছপের মতো মাঠের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

এককালের রাজার দুই নাতি না পুতি তাদের পরিবার নিয়ে একতলার একপাশের দুটো ঘরে এখন বাস করে। তাই বাড়ির সেদিকটায় দু-চারটে জানলায় রাতে টিমটিম করে আলো জ্বলে।

বাড়িটার নানা জায়গা থেকে বট আর অশ্বত্থের চারা গজিয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটাতো রীতিমতো গাছের চেহারা নিয়েছে। এখন অন্ধকারে সেটা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছিল না। তবে মেঘ সরে গিয়ে আকাশে একটা ছোট্ট জানলা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর সেই জানলা দিয়ে থালার মতো চাঁদটা উঁকি মারতেই চিকুর মনে পড়ে গেল আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় রাজবাড়ির ভাঙা ছাদটা অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল, আর সেইসঙ্গে গোটা তিন-চারেক বট কিংবা অশ্বত্থ গাছকে চেনা যাচ্ছিল।

রাজবাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়েই বাঁদিকে একটা সরু গলি ঢুকে গেছে। সেই গলিতেই হরিহরবাবুর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। একতলাটা থাকার মতো হলেও দোতলাটা এখনও ইট-কাঠ বের করা। বোধহয় টাকার অভাবে শেষ করা যায়নি। বাড়ির লাগোয়া জমিতে দুটো সুপুরি আর একটা চাঁপা গাছ। সুপুরিগাছ দুটো দেখলেই চিকুর হরিহরবাবুর পান খাওয়ার নেশার কথা মনে পড়ে যায়।

দরজার কাছে একটা বাল্‌ব জ্বলছিল। সেই আলোয় চিকু দেখল গ্রিলের গেটের ওপাশে পাঁচ-ছ'টা সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে নিজের সাইকেলটা রেখে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল চিকু।

কিন্তু পড়ার ঘরটায় ঢুকেই ও বেশ অবাক হয়ে গেল।

কৌশিক, প্রিয়াংকা, তিতুন, সুকান্ত আর প্রদীপ্ত গোল হয়ে বসে তেল-মুড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো আর চানাচুর। ঘরে স্যার নেই। চিকুরা একসঙ্গে আটজন বাংলা পড়ে। তবে আজ বোধহয় বৃষ্টি আর শীতের জন্য শ্রাবণী আর উত্তম আসেনি।

চিকু ঘরে ঢুকতেই কৌশিক আর তিতুন সরে গিয়ে শতরঞ্চিতে ওকে বসার জায়গা করে দিল। সুকান্ত বলল, 'নে, মুড়ি-চানাচুর খা। আজ স্যারের শরীর ভালো নেই—পড়াবেন না।'

প্রদীপ্ত চাপা গলায় বলল, 'কাকিমা মুড়ি মেখে খেতে দিলেন।'

কাকিমা মানে হরিহরবাবুর স্ত্রী। ওদের সবাইকে খুব ভালোবাসেন। গোলগাল হাসিখুশি চেহারা। প্রায়ই ওদের নানান জিনিস খাওয়ান।

শতরঞ্চির মাঝখানটায় খবরের কাগজ পাতা—তার ওপরে মুড়ির পাহাড়। চিকু বসেই ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল মুড়ির দিকে। পরপর দু-মুঠো মুড়ি মুখে গুঁজে দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'আমরা কি তা হলে আবার সামনের বুধবার আসব?'

প্রিয়াংকা কপাল থেকে চুল সরিয়ে বলল, 'কাকিমা তো তাই বললেন।'

এমন সময় হরিহরবাবুর স্ত্রী ঘরে এসে ঢুকলেন।

চিকুকে দেখেই আপনজনের মতো একগাল হেসে বললেন, 'চিকু শুনেছ তো, আজকে পড়া হবে না। তোমাদের স্যারের শরীরটা ভালো নেই—জ্বর-জ্বর মতন হয়েছে। আগে থেকে খবরটা দিতে পারলে ভালো হত। এই বিচ্ছিরি ওয়েদারের মধ্যে এসে শুধু শুধু তোমাদের ফিরে যেতে হল।'

'তাতে কী হয়েছে, কাকিমা। আমরা পরের বুধবার আসব।'

'নাও, মুড়ি-চানাচুর খাও। তোমরা কেউ চা খাবে?'

ওরা সবাই মাথা নাড়ল। না, খাবে না। হরিহরবাবু বলেন, 'নেশার বশ হবি না কখ্‌খনও। পোষ যদি মানতে হয় তো সে শুধু ভগবান কি মহাজনের কাছে। দ্যাখ না, কত চেষ্টা করেও আমার পানের নেশাটা ছাড়তে পারছি না।'

সুতরাং, ওরা কেউ-কেউ চা খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও মুখে 'না' বলল।

মুড়ি-চানাচুর শেষ করে ওরা কাকিমাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। প্রিয়াংকা চিকুকে বলল, 'তোমাকে "মোহাব্বতে"-র ক্যাসেটটা দেব বলেছিলাম, এখন আমার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসতে পারো। আর আমাদের

ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেমে একবার শুনেও নিতে পারো—কী দারুণ আওয়াজ... ফ্যানট্যাসটিক।'

'চলো। তবে আমাদের টেপ রেকর্ডারটা অর্ডিনারি টু-ইন-ওয়ান। ওতে খুব একটা ভালো শোনাবে না মনে হয়...।'

এ-ওকে 'টা টা' করে ওরা সাইকেল নিয়ে যে-যার পথে ছড়িয়ে গেল। শুধু প্রিয়াংকা আর চিকুর সাইকেল দুটো একই পথ ধরে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলল।

প্রিয়াংকাদের বাড়িটা চিকুদের বাড়ির উলটোপথে অনেকটা দূরে। ওদের বাড়ি থেকে রেল স্টেশনটা কাছে। সেখানে বেশ কয়েকটা সুন্দর-সুন্দর বাড়ি আছে। ঠিক যেন জলরঙে আঁকা ছবি। চিকু এর আগে দু-চারবার প্রিয়াংকাদের বাড়ি গেছে। ওদের বাড়িতে গেলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় খেয়াল থাকে না। আজ অবশ্য দেরি হওয়ার কোনও ভয় নেই, মা-বাবা চিন্তাও করবে না। ওরা জানে চিকু বাংলা কোচিং-এ পড়ছে।

অন্ধকার পথ ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে চিকু জিগ্যেস করল, 'এই পথ দিয়ে একা-একা ফিরতে তোমার ভয় করে না?'

প্রিয়াংকা শব্দ করে হাসল : 'অন্য দিন করে...আজ করছে না।'

ওদের সাইকেলের চাকা ঘুরতে লাগল।

দুই

বাড়ির দিকে ফেরার সময় রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে চিকু প্রথম বিপদের গন্ধ পেল। পরিস্থিতি আর পরিবেশ কেমন যেন অন্যরকম মনে হল ওর। আর সেইজন্যই একটা আশঙ্কা তৈরি হল। সবকিছুই ঠিক আছে, অথচ যেন ঠিক নেই। কিন্তু গণ্ডগোলটা যে ঠিক কোথায় সেটাই ও ধরতে পারছিল না।

যতটা জোরে পারা যায় ততটা জোরেই সাইকেল চালাচ্ছিল চিকু। আর একইসঙ্গে ওর মনের ভেতরে উথালপাথাল চলছিল, একটাই প্রশ্নের উত্তর ও হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল : গণ্ডগোলটা কোথায়?

চিকুর হাতে ঘড়ি নেই, তবে রাত বোধহয় সওয়া ন'টা কি সাড়ে ন'টা হবে। এতটা রাত না করলেই হত। বৃষ্টি এখন নেই। আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদ উজ্জ্বল চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাস বেশ ঠান্ডা।

চিকুর সোয়েটার ভেদ করে শীত ঢুকে পড়ছে ভেতরে। আজ রাতে মনে হয় লেপ গায়ে দিতে হবে।

রাজবাড়ি পেরিয়ে আমবাগানের কাছাকাছি এসে গণ্ডগোলটা খেয়াল করল চিকু।

এই পথে যাওয়ার সময় পথের আশপাশ থেকে দু-পাঁচটা ব্যাঙের ডাক ওর কানে এসেছিল। হয়তো রাস্তার পাশের নালায় বা জমে থাকা জলে কয়েকটা ব্যাঙ আস্তানা গেড়েছিল।

কিন্তু এখন ওরা আর কেউ ডাকছে না। কেউ যেন ভয় দেখিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

ঠিক তখনই ও খেয়াল করল জলাপুকুরের দিক থেকেও ব্যাঙের কোরাস আর শোনা যাচ্ছে না। চারপাশটা কেমন যেন থমথম করছে। শুধু গাছের পাতার খসখস শব্দ।

জোরে প্যাডেল করে আমবাগানটা পেরিয়ে যেতে চাইল চিকু। ওর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

আমবাগান শেষ হওয়ার মুখে একটা চাপা গর্জন ওর কানে এল। প্রচণ্ড রাগে কোনও পশু গরগর করছে। তার চাপা গোঙানির মধ্যেই হিংস্র ভাব টের পাওয়া যাচ্ছে।

একইসঙ্গে জান্তব একটা গন্ধও নাকে এল।

আতঙ্কে বেপরোয়া গতিতে সাইকেল ছোটাল চিকু। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাথর বা ইটের টুকরোয় হোঁচট খেয়ে ওর সাইকেল শূন্যে লাট খেয়ে পথের ওপরে ছিটকে পড়ল।

চিকু একদিকে, ওর ব্যাগ একদিকে, আর সাইকেল আর-একদিকে। সাইকেলের একটা চাকা তখনও ঘুরছে। হেডলাইটটা কাত হয়ে তেরছাভাবে আলোর বর্শা ছুড়ে দিয়েছে। আলোটা ক্রমেই মিটমিটে হয়ে নিভে আসছে।

চিকুর সারা শরীরে কাদা মাখামাখি। কনুইয়ে একটু চোটও লেগেছে। কিন্তু ভয় বড় আশ্চর্য জিনিস। পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করিয়ে নেয়। ফলে তখন ভয় আর ভগবানে কোনও তফাত থাকে না।

চিকু চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়ল। দু-পা ফেলে এগিয়ে গেল ব্যাগের কাছে। ব্যাগটা এক ঝটকায় তুলে নিয়ে সাইকেলের দিকে এগোতেই জিনিসটা ওর চোখে পড়ল।

সাইকেলের আলো ততক্ষণে ক্ষয়ে এসেছে। কিন্তু পূর্ণিমার আলোয় ক্ষয় ধরেনি। তাই চিকুর দেখতে খুব একটা অসুবিধে হল না।

ও পায়ে পায়ে জিনিসটার কাছে এগিয়ে গেল। সেটা চিনতে পারামাত্রই একটা আতঙ্কের চিৎকার ওর গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে গেল। কিছুতেই গলা দিয়ে বেরোতে পারছিল না।

একটা মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে রয়েছে বৃষ্টি-ভেজা মাটিতে। মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। হাত-পাগুলো এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়ানো। চাঁদের আলোয় রক্তের রং বোঝা যাচ্ছিল না। ফলে মনে হচ্ছিল, বৃষ্টির জমে থাকা কালো জলের ওপরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষটা পড়ে আছে।

চিকুর মাথা কাজ করছিল না। তবে অন্ধ ভয় ওকে দিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজ করিয়ে নিচ্ছিল। ও ছুটে গিয়ে সাইকেলটা তুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এল ভয়ঙ্কর এক গর্জন। এবার গর্জনটা এসেছে জলাপুকুরের দিক থেকে।

এটা কি বাঘের গর্জন? কোথাও থেকে একটা বাঘ কি এসে ঢুকে পড়েছে আমবাগানে?

সাইকেল পাশে নিয়ে কয়েক পা ছুটেই লাফিয়ে সাইকেলে উঠে পড়ল চিকু। তারপর প্রাণপণে সাইকেল চালাতে শুরু করল। আর ঠিক তখনই শুনতে পেল জলাপুকুরে কেউ যেন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চিকুর সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

এই শীতের রাতে বাঘ হঠাৎ জলে ঝাঁপ দেবে কেন?

এবড়োখেবড়ো পথ ধরে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে জলাপুকুরের দিকে তাকাল ও। জলে কী একটা নড়ছে যেন! কেউ যেন প্রবল উল্লাসে জল ঘেঁটে দাপাদাপি করে স্নান করছে।

কৌতূহল বড় আশ্চর্য জিনিস। কখনও-কখনও ভয়কেও ছাপিয়ে যায়। চিকুর বেলায়ও তাই হল। জলাপুকুরের পাড়ে ব্রেক কষে সাইকেল দাঁড় করিয়ে দিল ও। তবে প্যাডেলে পা চেপে তৈরি থাকল। ওর হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জলের শব্দ থামল। কিছু একটা উঠে আসতে লাগল জল থেকে।

প্রাণীটাকে জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল। তবে ওটার মাথায় কচুরিপানা আর শ্যাওলা বোঝাই হয়ে থাকায় মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। লোমশ হাত দিয়ে সেগুলো সরাতে চেষ্টা করছিল। হাতটা মানুষের মতো হলেও আঙুলের ডগায় লম্বা-লম্বা সাদা বাঁকানো নখ। সামনে ঝুঁকে পড়ে কুঁজো হয়ে প্রাণীটা জল থেকে উঠে আসছিল। হাঁটু দুটো সামান্য ভাঁজ করে জলের মধ্যে পা ফেলছে। যেন কোনও চারপেয়ে জন্তু দু-পায়ে হাঁটার চেষ্টা করছে।

একটা হিংস্র গর্জন বেরিয়ে এল প্রাণীটার মুখ থেকে।

চিকুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে এতক্ষণ দলা পাকিয়ে আটকে থাকা চিৎকারটা ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

একটানা চিৎকার করতে-করতে পাগলের মতো সাইকেল ছুটিয়ে দিল চিকু।

ও যখন বাড়ি এসে পৌঁছল তখনও ওর চিৎকার থামেনি। মা-বাবা ছুটে বেরিয়ে এল দরজায়। দেখল চিকুর জামাকাপড় রক্ত আর কাদায় মাখামাখি।

মা ছুটে গিয়ে ওকে জাপটে ধরে আকুলভাবে জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে রে, কী হয়েছে?' চিৎকার করতে-করতেই চিকু আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

তিন

পরদিন সকালে বেলা দশটার মধ্যেই পাশবিক খুনের এই ঘটনাটা জাঙ্গিকুলের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। খুব ভোরে কেউ একজন পথের ওপরে পড়ে থাকা বীভৎস মৃতদেহটা আবিষ্কার করে। তারপর সেই ভয়ঙ্কর খবরটা ছোট এলাকায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ কয়েকবছর ধরে এই আধা-টাউনে খুনের মতো কোনও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেনি। তাই এই খুনটাকে কেন্দ্র করে গোটা অঞ্চল একেবারে তেতে উঠল। পুলিশও তাদের নিয়মমাফিক তদন্ত শুরু করে দিল।

যে-লোকটি খুন হয়েছে সে একজন ভবঘুরে ভিখারি। তাকে খুন করার কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে বের করাটাই বেশ মুশকিলের। তা ছাড়া খুনটা কোনও মানুষের কাজ, না কি কোনও হিংস্র জন্তুর, সেটা নিয়েও চায়ের দোকানে, সেলুনে, বাজারে, বেশ তর্ক বেধে গেল। কেউ-কেউ খোঁজ করতে লাগলেন এ-এলাকার দু-চার মাইলের মধ্যে কোনও সার্কাস পার্টি এসে ঘাঁটি গেড়েছে কি না। আর তাদের দলে বাঘ কিংবা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আছে কি না।

তবে বেশিরভাগ মানুষেরই মত হল, মৃতদেহটার যে-ছিন্নভিন্ন বীভৎস অবস্থা দেখা গেছে তাতে এ-কাজ কোনও মানুষের হতে পারে না।

তা হলে এর পরের প্রশ্ন হল, যদি এটা হিংস্র কোনও পশুর কাজ হয় তো সেই পশুটা কী? বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, হায়েনা—নাকি অন্য কিছু?

পরদিন চিকু বাড়ি থেকে আর বেরোয়নি। মা-বাবা দুজনেই ওকে স্কুলে যেতে দেয়নি।

কাল রাত থেকে চিকুর বাড়াবাড়িরকম অবস্থা চলেছে। বারবার ও কেঁপে উঠেছে ভয়ে। মা ওর পাশটিতে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ঘুম আসেনি। কখনও-কখনও তন্দ্রায় ওর চোখ বুজে এসেছে। আবার তারই মধ্যে গোঙানির শব্দ করে চমকে জেগে উঠেছে। তখন মা আধখানা ঘুমের ট্যাবলেট চিকুকে খাইয়ে দিয়েছে।

বাবা ডাক্তার ডাকার কথা বলেছিল, কিন্তু মা রাজি হয়নি। বলেছে, ওর তো জ্বর-টর কিছু হয়নি! মনে হয় ভীষণ ভয় পেয়েছে। আজ রাতটা বিশ্রাম নিক—কাল সকালে যা হয় করা যাবে।

চিকুর শেষ পর্যন্ত ঘুম এসেছিল অনেক রাতে। ফলে ওর ঘুম ভেঙেছে বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ। তারপর থেকে শুধুই বিশ্রাম, আর জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশ, গাছপালা, আর রাস্তা দেখা। আজও বেশ শীত। তবে বৃষ্টি থেমে গেছে।

একা-একা বিছানার লাগোয়া জানলার পাশে বসে চিকু ভাবছিল, কাল রাতে ও যা দেখেছে তা সত্যি কি না। এখনও পর্যন্ত মা-বাবাকে ও কোনও কথা বলেনি। বললে ওরা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, ব্যাপারটা একটা বাজে দুঃস্বপ্ন নয় তো!

চিকুর শরীরটা ভালো নয় দেখে ওর বাবা আজ অফিসে বেরোয়নি। তাই হাতে সময় পেয়ে বাজার-দোকান সেরে নিচ্ছিল। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাস্তা থেকে ফিরে বাবা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। মায়ের সঙ্গে চাপা গলায় কীসব কথা বলতে লাগল।

চিকু বুঝতে পারল, ওকে আড়াল করে বাবা-মা কোনও আলোচনা করছে। ওর হঠাৎ করেই মনে হল, আলোচনার বিষয়টা ওর বোধহয় জানা।

একটু পরে মা চিকুকে স্নানের গরম জল দিল। স্নান হয়ে যাওয়ার পর তোয়ালে নিয়ে যত্ন করে মাথা মুছিয়ে দিল। তারপর খেতে দিল।

মায়ের ভাবভঙ্গিগুলো এমন যেন চিকু এখনও সেই পাঁচ-ছ'বছরের ছোট খোকাটিই আছে।

খেয়েদেয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই ঘুম এসে ওর দু-চোখ জড়িয়ে ধরল। চিকু ঘুমের জগতে ডুবে গেল একেবারে।

ঘুম ভাঙল সেই চারটের পর। মেঘ ফিকে হয়ে আকাশটা এখন বেশ আলো-আলো লাগছে। তবে রাস্তা এখন ভিজে। দুপুরে বোধহয় আর-এক দফা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মা চা তৈরি করে বাবাকে দিল, নিজে নিল—তারপর চিকুকেও একটু সাধল : 'দুটো বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দে, শরীরটা বেশ তাজা লাগবে।'

বাবা আড়চোখে কেমন যেন খুঁটিয়ে-দেখা চোখে চিকুকে দেখছিল। চিকু চুপচাপ বসে চা-বিস্কুট খেতে লাগল।

চিকুর চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। বাবা তাড়াতাড়ি এসে রিসিভার তুলল। তারপর 'হ্যালো' বলেই রিসিভারটা এগিয়ে ধরল চিকুর দিকে : 'তোর ফোন। কথা বলতে পারবি?'

চিকু ঘাড় নেড়ে নেমে এল বিছানা থেকে। বাবার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে 'হ্যালো—' বলল।

প্রিয়াংকা।

'আজ স্কুলে যাওনি? আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় জনতা কেবিনের সামনে তোমাদের দেখলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো শরীর-টরির খারাপ হয়েছে—।

রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় চিকু একটা বাঁকের মুখে ওর আরও দু-বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে 'জনতা কেবিন' নামে একটা ভাতের হোটেল আছে। হোটেলের সামনে তিনজন জড়ো হওয়ার পর ওরা দল বেঁধে স্কুলে যায়। মোটামুটি সেই সময়টায় প্রিয়াংকাও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একজোট হয়ে স্কুলের পথে হেঁটে যায়। বেশিরভাগ দিনই ওদের দেখা হয়।

চিকু বলল, 'না, আজ স্কুলে যাইনি...শরীরটা ভালো নেই...ভীষণ টায়ার্ড লাগছে।'

'"মোহাব্বতে"-র ক্যাসেটটা শুনেছ?'

'না, এখনও শোনা হয়নি। আজ সন্ধেবেলা শুনব।'

'কাল তোমার ফেরার সময় কোনও প্রবলেম হয়নি তো?'

একটু ভেবে নিয়ে চিকু ছোট্ট করে বলল, 'নাঃ...।'

'আসলে কাল জলাপুকুরের কাছে একটা মার্ডার হয়েছে। ব্রুটাল মার্ডার। সবাই বলছে কোনও ডেঞ্জারাস অ্যানিম্যালের কাজ। সেইজন্যেই চিন্তা হচ্ছিল। ভাবছিলাম তুমি কাল ঠিকমতো বাড়ি ফিরেছ কি না। আমি স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই তোমাকে ফোন করছি...।'

চিকু সারাদিনে বাবা কিংবা মায়ের মুখে খুনের কোনও খবর শোনেনি। যদিও ও জানে, এই ছোট্ট আধা-টাউন এলাকায় খবরটা এর মধ্যে সবাই জেনে গেছে। বাবা-মা হয়তো চিকুর ভালোর জন্যই খবরটা ওকে জানায়নি। ওরা তো আর জানে না, চিকুর খবর জানার কোনও প্রয়োজন নেই—কারণ, 'খবর'টা ও কাল রাতে নিজের চোখে দেখেছে!

কাল রাতের দৃশ্যটা মনে পড়তেই চিকু একবার শিউরে উঠল। এখনও পর্যন্ত মা-বাবা কাউকে ও কিছু বলেনি। কাল মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মা বহুবার জিগ্যেস করেছে, 'কী রে, ভয় পেয়েছিস? কী হয়েছে বল—আমাকে বল—।'

কিন্তু চিকু কোনও কথা বলেনি। ওর মনটা কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য এখন অনেক ভালো লাগছে। মন আর শরীরের দুর্বল ভাবটা মোটামুটি কেটে গেছে। কিন্তু কাল রাতে খুন হওয়া মানুষটা কে?

সে-কথাই ও প্রিয়াংকাকে জিগ্যেস করল, 'কাল রাতে কে মার্ডার হয়েছে জানো?'

'সবাই বলছে একজন ভ্যাগাবন্ড—ভিখারিগোছের লোক।'

'ও–।'

'নেক্সট উইকে বাংলা পড়তে যাচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ—যাব।'

প্রিয়াংকার সঙ্গে একমাত্র বাংলা কোচিংটাই ওর কমন। অন্যান্য সাবজেক্টের টিচাররা প্রিয়াংকাকে বাড়িতে এসে পড়ান। হরিহরবাবু কারও বাড়িতে গিয়ে পড়ান না—তাই প্রিয়াংকা ওঁর কোচিং-এ এসে পড়ে।

কথা শেষ করে চিকু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মুখ ফেরাতেই চিকু খেয়াল করল মা আর বাবা কেমন অদ্ভুত চোখে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

বাবা অবাক হয়ে বলল, 'তুই মার্ডারের ব্যাপারটা জানিস! খবর পেলি কী করে?'

চিকু আঙুলের নখ খুঁটল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'আমি সব জানি। সব আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেইজন্যেই কাল রাতে অমন ভয় পেয়েছিলাম।'

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

মা প্রায় ছুটে এল চিকুর কাছে : 'কী দেখেছিস কাল রাতে!'

একটু সময় নিল চিকু। তারপর নিচু গলায় ধীরে-ধীরে সব ঘটনা বলে গেল।

মা আর বাবা ফ্যাকাসে মুখে চুপচাপ শুনতে লাগল। চিকুর কথা শেষ হলে মা-বাবা দুজনেই ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল। চিকুও সেগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করল। তারপর ওরা দুজনে কেমন গুম হয়ে গেল। স্থির চোখে চিকুকে দেখতে লাগল।

ওরা মনে-মনে কী ভাবছে সেটা চিকু খানিকটা আঁচ করতে পারছিল। তবে বাবা এরপর একটা প্রশ্ন করতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল।

'তুই...তুই ভুল দেখিসনি তো!'

চিকু একটু বিরক্ত গলায় বলল, 'না, ভুল দেখিনি। বানিয়ে-বানিয়ে এরকম গল্প তৈরি করে আমার কী লাভ!'

একটু চিন্তা করে বাবা বলল, 'যাকগে, এসব কথা আর কাউকে বলিস না। শেষকালে পাঁচকান হতে-হতে পুলিশের কানে গেলেই মুশকিল।'

মা চিন্তার গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তখন আবার টানাহ্যাঁচড়া শুরু হবে, হাজারটা প্রশ্ন করবে। না, না, এসব কথা তুই কাউকে বলিস না।'

'ঠিক আছে, বলব না।'

চিকু কথাটা বলল বটে, তবে ওর সবাইকে বলতে ইচ্ছে করছিল। ইচ্ছে করছিল জলাপুকুরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয় খুনের জায়গাটা একবারে দেখে আসতে। ওখানে গেলে কি প্রাণীটার পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে? অথবা গায়ের লোম?

চিকুর মধ্যে একটা গোয়েন্দা জেগে উঠতে চাইছিল।

ও আর কোনও কথা না বলে পড়ার টেবিলে গিয়ে পড়তে বসল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পড়ায় মন বসাতে পারল না। বারবার কাল রাতের ঘটনাগুলো ওর মাথায় ঢুকে পড়ছিল।

হঠাৎই ওর চোখ গেল টেবিলের এক প্রান্তে পড়ে থাকা ‘মোহাব্বতে’-র ক্যাসেটটার দিকে। কী ভেবে চিকু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের পাশ থেকে ওয়াকম্যানটা তুলে নিয়ে এল।

তারপর হেডফোন কানে লাগিয়ে ‘মোহাব্বতেঁ’-র ক্যাসেটটা শুনতে শুরু করল। জানলার বাইরে তখন অন্ধকার পা টিপে টিপে নেমে আসছে।

চার

শেষ পর্যন্ত চিকুর ব্যাপারটা আর পুরোপুরি গোপন রইল না। এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপার ও নিজের চোখে দেখেছে, এটা কাউকে না বলতে পারলে ও কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিল না। সবাই এ-কথা জানতে পারলে চিকুকে ঘিরে কত হইচই হত, ওর সাহসকে কত লোক প্রশংসা করত, একই গল্প ওকে কতবার না শোনাতে হত!

ভেতরের এই সাঙ্ঘাতিক টেনশান চিকু অতিকষ্টে তিনদিন সামলে রাখতে পারল। তারপর একদিন খবরটা ও ভাঙল প্রিয়াংকার কাছে। সেদিন ও ‘মোহাব্বতে’র ক্যাসেটটা ফেরত দিতে প্রিয়াংকাদের বাড়িতে গিয়েছিল। খবরটা শুনে প্রিয়াংকা তো একেবারে বোবা হয়ে গেল। ও অবাক হয়ে চিকুকে দেখতে লাগল।

‘মাই গুডনেস! কী ডেঞ্জারাস! এতবড় একটা ব্যাপার তুমি আমাকে বলোনি।’

‘কাউকে এসব কথা বোলো না। মা-বাবা কাউকে বলতে বারণ করেছে।’

প্রিয়াংকা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল চিকুকে। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চিকু মনে-মনে পূর্ণিমার সেই ভয়ঙ্কর রাতটায় ফিরে যাচ্ছিল।

সন্ধে সাতটা বাজতে না বাজতেই প্রিয়াংকা একরকম জোর করে চিকুকে বাড়ি রওনা করে দিল।

প্রিয়াংকার পর স্কুলের বন্ধু সোহনের কাছে গোপনে মুখ খুলল চিকু। স্কুল থেকে ফেরার পথে সোহনকে জলাপুকুরের গল্পটা শোনাল ও।

এরপর কানাকানি আর জানাজানির ব্যাপারটা নিউক্লিয় শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মতো ক্রমে বাড়তে শুরু করল। এবং দশ-বারোদিনের মধ্যেই জাঙ্গিকুলের প্রায় সকলেই জেনে গেল পূর্ণিমার রাতে জলাপুকুরের কাছে চিকু কী দেখেছে।

একদিন সন্ধেবেলা দেশপ্রিয় সুইটস থেকে মিষ্টি কিনে ফিরছিল চিকু। হঠাৎই শুনতে পেল কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকছে। সাইকেল থামিয়ে ঘাড় ঘোরাতেই চিকু রোহনদাকে দেখতে পেল। বিশুদার চায়ের দোকানে বসে আছে।

শিবতলার উলটোদিকেই বিশুদার চায়ের দোকান। রাস্তার একপাশে বাঁশের খুঁটি আর দরমা দিয়ে তৈরি। দোকানের মাথায় টালির ছাউনি। আর আলো বলতে হুক করে জ্বালানো একটা ষাট পাওয়ারের বাল্‌ব।

বিশুদা একা মানুষ। দোকানের পিছনদিকটায় থাকার মতো একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। আর দোকানের সামনে আধ-ফালা বাঁশ পেরেক দিয়ে ঠুকে খদ্দেরদের বসার জন্য একটা বেঞ্চি মতন তৈরি করে দিয়েছে।

বিশুদার দোকানটা নামে চায়ের দোকান হলেও ডিম-পাঁউরুটি, বিস্কুট, সিগারেট, হজমিগুলি, পান-পরাগের প্যাকেট আর বাচ্চাদের খেলার প্লাস্টিকের বলও পাওয়া যায়।

দোকানের সামনের বেঞ্চিতে রোহন আর ছোটকু বসে ছিল। ছোটকু রোহনের সব সময়ের সাথী। কালো, রোগাপটকা চেহারা, চোখগুলো বড়-বড়, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল।

সাইকেল থেকে নেমে পড়েছিল চিকু। সাইকেলটা পাশে-পাশে হাঁটিয়ে ও চলে এল রোহনের সামনে।

রোহন বলল, 'বোস, কথা আছে। বিশুদা, তিনটে ছোট চা বানাও তো!'

চায়ে আপত্তি করল না চিকু। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রোহনের পাশে বসে পড়ল ও।

'অ্যাই, তুই নাকি জলাপুকুরের মার্ডারটা হতে দেখেছিস? জাঙ্গিকুলে পুরো চাউর হয়ে গেছে—।'

চিকু আবার বলতে শুরু করল। এ-ক'দিনে গল্পটা বলে-বলে ও বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিল। ফলে ব্যাপারটা খুঁটিনাটিসমেত বলতে ওর কোনও অসুবিধে হল না, একবারের জন্যও হোঁচট খেল না।

গল্প শেষ হতেই ছোটকু চোখ বড়-বড় করে বলে উঠল, 'আরিব্বাস! কী ডেঞ্জারাস কেস, বস!'

বিশুদা হাঁ করে চিকুর গল্প শুনছিল। গরম চা উথলে পাতা উনুনে পড়তেই 'ছ্যাঁক' শব্দ হল। বিশুদা চমকে উঠে উনুনের কাছে গেল। তিনটে কাপে চা ঢালতে লাগল।

রোহন চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর ও জিগ্যেস করল, 'মার্ডারারের গায়ে লোম ছিল? না কি ওভারকোট পরে ছিল?'

বিশুদা ওদের চা এগিয়ে দিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চিকু বলল, 'না, কোট বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া কোট পরে ওই রাতে কি কেউ জলে ঝাঁপ দেয়!'

চায়ে চুমুক দিয়ে 'হুম' করে ছোট্ট একটা শব্দ করল রোহন। তারপর : তুই কি লোকটার মুখ দেখতে পেয়েছিলি?'

'না, শ্যাওলা আর কচুরিপানায় মুখটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তবে হাতের আঙুলে লম্বা-লম্বা বাঁকানো নখ ছিল। আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

'পুরো ব্যাপারটা ছদ্মবেশ হতে পারে, বুঝলি। ফাঁড়ির বড়বাবুকে আমি গতকাল সেটাই বলেছি। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায় জানিস? মার্ডারের মোটিভটাই কেউ বুঝতে পারছে না। একটা ভিখিরির কাছে আর কী-ই বা টাকাপয়সা থাকবে।'

'সুড়ৎ' শব্দ করে চা শেষ করল ছোটকু। তারপর হাত-পা নেড়ে রোহনকে বলল, 'বস, এমন কেস নয়তো যে, লোকটা রাত্তিরবেলা খুন করা প্র্যাকটিস করছিল?'

রোহন বিরক্তভাবে হাতের ইশারায় ছোটকুকে থামতে বলল। তারপর অনেকটা যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, 'আমার এলাকায় মার্ডার করে সটকে পড়বে...এত বড় বুকের পাটা কার?'

চিকু রোহনকে দেখছিল।

লম্বা চওড়া ব্যায়াম করা চেহারা। গায়ের রং মাজা। মাথায় ছোট-ছোট করে ছাঁটা চুল। চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। চোয়াল শক্ত। জামার নিচে বুকের মাসল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

চায়ের কাপটা 'ঠকাস' করে নামিয়ে রেখে রোহন বলল, 'তুই এ-ব্যাপারে আর কোনও খবর পেলে বা কিছু দেখলে আমাকে জানাবি।'

চিকু ঘাড় কাত করে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর শেষ হয়ে-যাওয়া চায়ের কাপটা বিশুদার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সত্যিই তো! রোহনদা ঠিকই বলেছে। খুনের উদ্দেশ্যটাই তো কেউ বুঝতে পারছে না! তা হলে কি এ কোনও পাগল খুনির কাজ? অনেক সিনেমায় যেমন দেখায়!

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরে এল চিকু।

পাঁচ

নাটোর মোড়ের কাছে মিস্টার ফক্স খেলা দেখাচ্ছিলেন। পরনে একটা শতচ্ছিন্ন কালো রঙের কোট। তার নানান জায়গায় রঙিন কাপড়ের তালি মারা। কোটের ওপরে তেলচিটে ময়লার আস্তরণ। ফলে ঝকঝকে রোদে কোটটা চকচক করছে।

মিস্টার ফক্সের বয়েস কত কেউ জানে না। চিকু ছোটবেলা থেকেই দেখছে, মিস্টার ফক্স পথে-পথে ঘুরে ভানুমতীর খেলা দেখান।

মিস্টার ফক্সের মাথায় কালো হ্যাট। বয়েসের ভাঁজ পড়া মুখে পাউডার মাখা। চোখে সুর্মার টান। আর ঠোঁটে লিপস্টিক।

মিস্টার ফক্স একটা ছোট মাপের পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান বাজাচ্ছিলেন, আর সেই তালে তালে মাথা নাড়ছিলেন। তাঁর সামনে বিশাল ঢোলা হাফ প্যান্ট পরা একটি ছেলে ডিগবাজির কসরত দেখাচ্ছিল। ওর নাম মাস্টার পটল।

অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে-বাজাতে মিস্টার ফক্স হাঁক পেড়ে বলছিলেন, 'ওয়েলকাম, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। দেখে যান মিস্টার ফক্সের শো। মিস্টার ফক্স—দ্য গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ছাত্র মিস্টার ফক্স। এখন আপনাদের ডিগবাজির খেলা দেখাচ্ছে মাস্টার পটল। চলে আসুন...দেখে যান দ্য গ্রেট শো অফ মিস্টার ফক্স...।'

অনেকে বলে মিস্টার ফক্সের মাথায় ছিট আছে। আর মাস্টার পটল তো হাবাগোবা আধপাগল!

ব্যাপারটা সত্যি বলেই মনে হয় চিকুর। নইলে দোলের দিন সকালে কেউ ভানুমতীর খেলা দেখাতে বেরোয়!

আজ দোল। পথে-ঘাটে অলিতে-গলিতে শুধু রং খেলা চলছে।

চিকুও রং খেলতে বেরিয়েছে রাস্তায়। খেলতে খেলতে নাটোর মোড়ের কাছে এসে দ্যাখে দোলের মধ্যেই মিস্টার ফক্সের 'শো' চলছে। মাস্টার পটল প্রাণপণে ডিগবাজি খেয়ে চলেছে।

মাস্টার পটলের বয়েস আঠেরো কি উনিশ হবে। গোলগাল মুখে বোঁচা নাক। চোখজোড়া চিনেম্যানদের মতো। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল ওর মাথার চুলের ছাঁট। ন্যাড়া মাথার চার-পাঁচ জায়গায় উলের বলের মতো একথোকা করে চুল।

মিস্টার ফক্সের গায়ে অনেকে রং দিচ্ছে। মাস্টার পটলকে তাক করে কেউ-কেউ রং-ভরা বেলুন ছুড়ে মারছে। কিন্তু ওঁদের কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

'আসুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন! ইউনিক শো-ম্যান মিস্টার ফক্স, আর তাঁর ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট মাস্টার পটল—ওঁদের ইউনিক খেলা দেখে যান। হোলির স্পেশাল অ্যাট্রাকশন! আসুন, আসুন...।'

আশেপাশে লেডিজ খুব একটা কেউ ছিল না। আট থেকে বারো-চোদ্দো—এই বয়েসের কয়েকটি রোগাসোগা রং মাখা বালিকা কিংবা কিশোরী মাস্টার পটলের তুমুল ডিগবাজি দেখছিল। আর থেকে-থেকেই হেসে উঠছিল, এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল।

পটলের ডিগবাজি শেষ হলে তবেই মিস্টার ফক্স তাঁর বিচিত্র খেলা শুরু করেন।

তাসের হাতসাফাই, চার-পাঁচটা পিংপং বল লোফালুফি, কোটের পকেট থেকে অনন্ত রুমালের চেন বের করা, জ্যান্ত সাপ জল দিয়ে গিলে নিয়ে আবার উগরে দেওয়া, আরও কত কী!

পালা করে মিস্টার ফক্স আর মাস্টার পটলের খেলা চলতে থাকে। তারই ফাঁক-ফোঁকরে মিস্টার ফক্স ভিড় করে দাঁড়ানো মানুষজনের কাছে আবেদন রাখেন : 'আমার খেলায় খুশি হয়ে যদি কিছু বখশিশ দিতে ইচ্ছে করে তা হলে দিন। পুয়োর ম্যান। প্লিজ হেল্প।'

বাড়ির জানলায়, বারান্দায় কিংবা ছাদে মেয়েদের ভিড়। সেদিকে হাত তুলে মিস্টার ফক্স বলে ওঠেন, 'মা-জননীরা, একজন আর্টিস্টকে হেল্প করুন। আমি জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের ছাত্র মিস্টার ফক্স। আপনারা আমার মাদার এবং সিস্টার। প্লিজ হেল্প।'

মিস্টার ফক্সের সামনে টুং-টাং পয়সা পড়ছিল। মাস্টার পটল 'থ্যাংক য়ু...থ্যাংক য়ু' বলে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। আর মিস্টার ফক্স টুপি খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে সাহেবি কায়দায় সাহায্যকারীকে অভিবাদন জানাচ্ছিলেন।

দোলের দিনে এই মজার খেলা অনেকেই উপভোগ করছিল। মিস্টার ফক্সের ভোজবাজির খেল এতই অদ্ভুত যে, আগে বহুবার দেখা হলেও আবার দেখতে ইচ্ছে করে। মাসদুয়েক আগেও মিস্টার ফক্সের সঙ্গে একটা বাদামী রঙের নেড়ি কুকুর থাকত—তার গলায় ফুলের মালা, কপালে লাল তিলক। নাম ছিল ভণ্ডুল। মিস্টার ফক্সের পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানের তালে তালে দু-পায়ে খাড়া হয়ে নাচ দেখাত। ভণ্ডুল এখন নেই। লরি চাপা পড়ে মারা গেছে।

বেলা একটা বেজে গেলে মিস্টার ফক্স বাড়ি ফিরে যান। স্নান-খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে আবার বেরোন খেলা দেখাতে। তারপর সন্ধের আঁধার নামলেই খেলার পালা শেষ হয়। শুধুমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া মিস্টার ফক্সের রোজই এক রুটিন। অসুখ-বিসুখ না হলে একটি দিনও কামাই নেই।

দোলের দিন বিকেলেও মিস্টার ফক্সের খেলা চলল। সঙ্গে মাস্টার পটলের ডিগবাজি। মাস্টার পটলের মাথায়-মুখে গোলাপী আবির। যখন সে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাসছে তখন কেমন অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী। তাকে ঘিরে জমজমাট ভিড়। সকালে যারা রাস্তায় বেরোয়নি, তারাও এখন হাজির। মিস্টার ফক্সের ভানুমতীর খেলা সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।

খেলার পালা শেষ হতে হতে সন্ধে নামল। তারপর অন্ধকার।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে মিস্টার ফক্স আর মাস্টার পটল আমবাগানের পথ ধরল।

মিস্টার ফক্সের একটু-আধটু নেশা করার অভ্যেস আছে। তাই আমবাগানের ভেতরে ঢুকে তিনি একটা বড়সড় গাছের গোড়ায় গুছিয়ে বসলেন। তারপর ম্যাজিকের সরঞ্জামের কালো ঝোলাটা মাস্টার পটলের হাতে দিলেন। বললেন, 'তুই যা, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কর গিয়ে। আমি ঘণ্টাখানেক পরে যাচ্ছি। ও. কে.?'

অনুগতের মতো ঘাড় নাড়ল মাস্টার পটল। মাথায় দুবার হাত বুলিয়ে ম্যাজিকের ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর রওনা হল আস্তানার দিকে। আস্তানা বলতে রেললাইনের ওপারে একটা ঝুপড়ি।

হঠাৎই পূর্ণিমার গোল চাঁদটাকে দেখা গেল। ছোট-ছোট বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে, গাছপালার আড়াল সরিয়ে হাজির হয়ে গেছে আকাশে।

দূর থেকে হোলির উৎসবের ঢাক-ঢোল করতালের আওয়াজ ভেসে আসছিল। দোলের পূর্ণিমা তিথিতে কীর্তনের দল পথে-পথে বেরিয়ে পড়েছে।

মিস্টার ফক্স কোটের পকেট থেকে একটা ছোট মাপের বোতল বের করলেন। আমবাগানের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই। শুধু দুজন ম্যাজিশিয়ান হাজির : এখানে গাছতলায়—মিস্টার ফক্স, আর আকাশে চাঁদ। চাঁদকে মিস্টার ফক্স ম্যাজিশিয়ান বলে মানেন। ছোটবেলায় বাবার কাছে যখন হাতসাফাইয়ের ম্যাজিক শিখতেন তখন বাবা বলতেন, চাঁদ হচ্ছে এ-ক্লাস ম্যাজিশিয়ান। সারা মাস ধরে কেমন ছোট-বড় হওয়ার খেলা দেখায়! তারপর অমাবস্যায় একেবারে ভ্যানিশ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ খেলা সে দেখিয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে! ভাবা যায়! বোতলের ছিপি খুলতে খুলতে চাঁদের দিকে তাকালেন মিস্টার ফক্স।

কিন্তু দেখলেন, চাঁদটা আর নেই!

একটা কালো ছায়া চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে।

'মিস্টার ফক্স, ভালো আছেন? কেমন যেন ভাঙা কর্কশ গলায় কালো ছায়াটা জিগ্যেস করল।

মিস্টার ফক্স একটু অবাক হয়ে গেলেন। বহুদিন ধরে এই এলাকায় তিনি ম্যাজিক দেখান। তাই এলাকার মানুষজনদের মধ্যে অনেককেই চেনেন। কিন্তু কারও সঙ্গেই খুব একটা আলাপ করেন না। বরং বলা যায় একটা দূরত্ব রেখে এড়িয়ে চলেন। এখন, এই জ্যোৎস্না রাতে, তাদেরই কেউ আচমকা এই নির্জন আমবাগানে এসে তাঁর কুশল জিগ্যেস করবে—এটা বেশ অস্বাভাবিক।

একটু সময় নিয়ে মিস্টার ফক্স বললেন, 'হ্যাঁ—ভালো আছি। কিন্তু আপনি কে?'

উত্তরে চাঁদের দিক থেকে ছায়াটা একটু পাশে সরে গেল। তখনই ওটা ছায়া থেকে কায়া হয়ে গেল। জ্যোৎস্নার আলো মানুষটার চোখেমুখে এসে পড়ায় মিস্টার ফক্স তাকে চিনতে পারলেন। এই এলাকারই পরিচিত একজন মানুষ।

মিস্টার ফক্স অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি!'

মানুষটা কেমন ধরা গলায় বলল, 'আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাতে এসেছি। এ-ম্যাজিকের কৌশল আপনিও জানেন না।'

মিস্টার ফক্স অবাক চোখে মানুষটাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল। তিনি কোনও কথা বলতে পারছিলেন না। শুধু ভাবছিলেন, এই লোকটা কি সত্যি ম্যাজিশিয়ান? কই, কখনও তো এরকম শোনেননি! তা হলে নিশ্চয়ই মজা করছে।

'এবার ভালো করে দেখুন...আমার ম্যাজিক শুরু হচ্ছে...।' সত্যি-সত্যিই যেন ম্যাজিক শুরু হল।

মানুষটা চওড়ায় বাড়তে লাগল। ওর জামা-প্যান্টের সেলাইগুলো সেই চাপে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। বোতামগুলো খই ফোটার মতো ছিটকে গেল এদিক-ওদিক। তারই সঙ্গে মানুষটার মুখ দিয়ে একটা পাশবিক গর্জন বেরিয়ে এল।

ম্যাজিক তখনও চলছিল।

লোকটা মাথায় খানিকটা লম্বা হয়ে, কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ল—যেন ওর শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেল। ওর চোয়ালটা কুকুরের মতো লম্বাটে হয়ে এগিয়ে এল সামনের দিকে। চোখ দুটো এতক্ষণ দেখা যায়নি—এবার দেখা গেল। হালকা সবুজ রঙের দুটো মার্বেল—অন্ধকার কোটরে ধকধক করে জ্বলছে।

মানুষটা চোখের সামনে একটা লোমশ জন্তুতে বদলে গেল। তার হাত-পায়ের আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে এল হিংস্র বাঁকানো নখ। কান দুটো ছুঁচলো হয়ে মাথাচাড়া দিল। মুখ হাঁ করতেই দেখা গেল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। তার মধ্যে শ্বদন্ত দুটো মিস্টার ফক্সের হতভম্ব চোখের সামনেই মাপে বড় হতে লাগল!

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সত্যিই যেন এক অলৌকিক ম্যাজিক!

মানুষটা—অথবা, অমানুষটা—শূন্যে হিংস্র কামড় দিয়ে হাঁ বন্ধ করল। 'খটাস' শব্দ হল। নির্জন রাত সেই শব্দে কেঁপে উঠল। ভয়ঙ্কর নেকড়ে-মানুষটা যখন এক থাবার ঘায়ে মিস্টার ফক্সের চোয়ালের অর্ধেকটা উড়িয়ে দিল, তখনও তাঁর দু-চোখ অবাক বিস্ময়ে এই নতুন ম্যাজিকটা দেখে চলেছে।

একটু পরে মিস্টার ফক্সকে ছিন্নভিন্ন করে হোলি খেলার পর, তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে অমানুষটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মিস্টার ফক্সের ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চোখজোড়া তখন নিষ্প্রাণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে।

এক ম্যাজিশিয়ান আর-এক ম্যাজিশিয়ানকে অপলক চোখে প্রাণভরে দেখছে।

ছয়

এবারের হইচইটা বেশ বড়সড় চেহারা নিল। গত পূর্ণিমায় খুন হওয়া মানুষটা কারও চেনা ছিল না। এমনকী হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ তার আত্মীয়স্বজন কাউকেই খুঁজে পায়নি। কিন্তু মিস্টার ফক্সের ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা। তাঁকে সবাই চিনত। সাহেবি পোশাক পরা নিরীহ চেহারার এই মানুষটিকে সবাই পছন্দ করত। আর ছোট-বড় সকলের কাছেই ওঁর ম্যাজিকের আকর্ষণ ছিল চুম্বকের চেয়েও বেশি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সবাই একমত হল যে, দু-দুটো খুনই একই লোকের কাজ—যদি অবশ্য খুনিকে আদৌ 'লোক' বলা যায়। জাঙ্গিকুল ফাঁড়ি থেকে বড়বাবু অবিনাশ মাইতি একজন সেপাইকে সঙ্গে নিয়ে একদিন চলে এলেন চিকুদের বাড়িতে।

প্রথম খুনের ফাইলটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় খুনটা হওয়ার পর সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া ফাইল আবার খুলতে হয়েছে। আর একইসঙ্গে তাঁর কানে এ-খবরও পৌঁছেছে যে, প্রথম খুনটা চিকু নামে এলাকার একটি ছেলে নিজের চোখে দেখেছে।

তার দু-চারদিন পরেই তিনি হাজির হয়েছেন চিকুদের বাড়িতে। কিন্তু চিকুকে নানান প্রশ্ন করেও তাঁর সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। শুধু চিকুর জবানবন্দি তাঁর ফাইলে গেঁথে দিয়েছেন।

খুনির পরিচয় নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা আবার নতুন করে শুরু হল।

কেউ বলল, খুনি কোনও ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু।

তখন প্রশ্ন উঠল, তা হলে সে মৃতদেহটা ফেলে রেখে চলে গেল কেন?

কেউ বলল, খুনি পশুর মতো নৃশংস কোনও মানুষ।

তখন প্রশ্ন উঠল, তা হলে খুনের উদ্দেশ্য কী?

কেউ-কেউ বলল, খুনি ভিনগ্রহের কোনও হিংস্র প্রাণী।

তাতে কে যেন জিগ্যেস করল, এর মহাকাশযানটা তা হলে কোথায় নেমেছিল? একটা মহাকাশযান কি সকলের চোখের আড়ালে নামা সম্ভব?

হরিহরবাবুর বাংলা কোচিং-এ গিয়ে চিকুরা জোর আলোচনায় মেতে ওঠে। আর সেই আলোচনায় চিকুই হল মধ্যমণি—কারণ, প্রথম খুনটা দেখার সুবাদে ও এখন বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

হরিহরবাবু ঘরে এসে ঢুকতেই ওদের চাপা গুঞ্জন পলকে থেমে গেল।

হরিহরবাবুর বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মাথার চুল ধবধবে সাদা, তবে গোঁফ কাঁচা-পাকা। লম্বা রোগা চেহারা। গাল সামান্য ভাঙা, টানা-টানা চোখ শান্ত। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ভাঁজ পড়া কপালে ছোট্ট চন্দনের টিপ। গলায় গোলমরিচের দানার মাপের রুদ্রাক্ষের মালা। পাঞ্জাবির গলার কাছে মালার খানিকটা উঁকি দিচ্ছে।

হরিহরবাবু ধার্মিক মানুষ। ধর্মগ্রন্থ চর্চা তাঁর নেশা। বাংলা পড়াতে-পড়াতে প্রায়ই সংস্কৃত সাহিত্যের উদাহরণে চলে যান। তবে চিকুদের কখনওই একঘেয়ে লাগে না। স্যারের পড়ানোটা এত সুন্দর যে, ভীষণ কাছে টানে।

হরিহরবাবু মেঝেতে গুছিয়ে বসলেন, তারপর কৌশিককে লক্ষ করে বললেন, 'কৌশিক, পাখার রেগুলেটারটা এক পয়েন্ট কমিয়ে দে তো। আমার কেমন যেন শীত-শীত করছে।'

বারকয়েক কাশলেন হরিহরবাবু। ওঁর একটু কাশির ধাত আছে। কৌশিক রেগুলেটার ঘুরিয়ে জায়গামতো বসে পড়তেই হরিহরবাবু পড়াতে শুরু করলেন।

'এবার তোদের গা-ঝাড়া দিয়ে বসতে হবে। সামনের বছরটা পেরোলেই বলতে গেলে মাধ্যমিক। রেজাল্ট যেন সবার ভালো হয়। নইলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। নে, খাতা-পেন নিয়ে সব রেডি হয়ে নে। আজ আমরা পড়ব ভারতচন্দ্রের "অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি"। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। সেই

রাজার অনুরোধে লিখেছিলেন “অন্নদামঙ্গল” কাব্য। এ জন্যে রায়গুণাকর উপাধি পেয়েছিলেন। সেই “অন্নদামঙ্গল”-এর একটা অংশ হল “অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি”—বুঝলি?’

চিকুরা সবাই ঘাড় নাড়ল। এরপর হরিহরবাবু শ্রাবণীকে কবিতাটা জোরে-জোরে পড়তে বললেন।

কবিতা পড়া শেষ হলে তিনি আলোচনা শুরু করলেন।

‘এই জায়গাটা খেয়াল কর। দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনিকে তাঁর স্বামীর পরিচয় দিচ্ছেন। যেহেতু সে-সময়ে স্ত্রীরা স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করত না সেহেতু দেবী তাঁর স্বামী মহাদেবের পরিচয় দিতে গিয়ে কৌশল করে বলছেন—

“অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥”

‘দেবী এখানে স্বামীর নিন্দার ছলে তাঁর গুণের কথা বলছেন। তাঁর স্বামী মহাদেব “বৃদ্ধ” মানে আসলে জ্ঞানবৃদ্ধ। দেবী বলছেন, তিনি “সিদ্ধিতে নিপুণ”। এর একটা অর্থ হল মহাদেব সিদ্ধির নেশা করেন। আর আসল অর্থ হল, তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ। এরপর “কপালে আগুন”। মহাদেবের কপালে একটি চোখ আছে। রেগে গেলে সেই চোখ দিয়ে আগুন ঝরে...।’

পড়ানো চলতে লাগল।

তারই মাঝে কাকিমা এসে স্যারকে চা-বিস্কুট দিয়ে গেলেন। আর ওদের জন্য একটা প্লেটে আটটা সিঙাড়া রেখে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ‘তোমরা পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে খেয়ে নিয়ো কিন্তু।’

পড়ানোর সময় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ করেই তিতুন আর প্রদীপ্ত মিস্টার ফক্সের খুন হওয়ার কথাটা তুলল।

হরিহরবাবু নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর মন দিয়ে ওদের কাছ থেকে দোলপূর্ণিমার খুনের ঘটনাটা শুনতে লাগলেন।

শোনা শেষ হলে তিনি একটু কেশে নিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি শুনেছি। তোরা ওসবে মাথা ঘামাস না। বোধহয় কুকুর-টুকুরের কাজ।’

চিকু আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রতিবাদের গলায় বলে উঠল, ‘না, স্যার, কুকুর নয়। ওই হিংস্র জানোয়ারটাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি!’

হরিহরবাবু আগ্রহ নিয়ে চিকুর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলেন। তারপর বললেন, ‘আগেই কিছু-কিছু কথা আমার কানে এসেছিল। এখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। তবে জানোয়ারটা ঠিক কী ধরনের সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।’

‘অনেকটা মানুষের মতো, স্যার।’ চিকু উত্তেজিত হয়ে বলল।

‘মানুষের মতো!’

‘হ্যাঁ, স্যার—তবে মাপে অনেক বড়। গায়েও নিশ্চয়ই অনেক জোর হবে। হাতের নখগুলো লম্বা-লম্বা, বাঁকানো...।’

হরিহরবাবু কেমন যেন বিব্রত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কী ভাবলেন—তারপর বললেন, ‘এ যেন শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার! ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে নৃসিংহ অবতার সেজে ভগবান হিরণ্যকশিপুকে নিধন করেছিলেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য...।’

শ্লোকটা শেষ করে স্যার বললেন, '...বলা তো যায় না, যে- দুজন মানুষ খুন হয়েছে তারা হয়তো ভালো লোক ছিল না। সেইজন্যেই ভগবান পশুর রূপ ধরে তাদের বিনাশ করেছেন।'

কথা শেষ করতে-করতে কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন হরিহরবাবু।

বোধহয় ভগবানকে প্রণাম জানালেন।

চিকুর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল স্যারের ব্যাখ্যা ওর পছন্দ হয়নি।

ওরা চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

সাত

পরের পূর্ণিমায় আর-একটা খুন হতেই ত্রাসের ভয়ঙ্কর ছায়া নেমে এল জাঙ্গিকুলে। নানান গুঞ্জন, আলোচনা আর বিশ্লেষণ থেকে পূর্ণিমার সঙ্গে খুনের সম্পর্কের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে গেল। সবাই বলল, পূর্ণিমার রাতেই খুনির মাথায় খুনের পাগলামি দেখা দেয়।

এবারে খুন হলেন একজন বিধবা ভদ্রমহিলা।

রাত সাড়ে ন'টার সময় তিনি সাইকেল-রিকশা করে ফিরছিলেন। জাঙ্গিকুলের একমাত্র নার্সিংহোম 'আরোগ্য নিকেতন'-এর কাছাকাছি এসে রিকশাওয়ালা দেখতে পায় পথের ওপরে একটা মাঝারি মাপের গাছের গুঁড়ি আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। রিকশাওয়ালা বেশ অবাক হয়ে যায়। কারণ, কাঁচা রাস্তার ওপরে গাছের গুঁড়ি ফেলে কে আর ডাকাতির চেষ্টা করে! সাইকেল-রিকশা থামিয়ে ক'পয়সাই বা পাওয়া যাবে!

এইসব কথা আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে সে রিকশা থেকে নেমে পড়ে। তারপর গাছের গুঁড়িটা সরাতে এগিয়ে যায়।

ঠিক তখনই পাশের একটা পোড়ো জমির অন্ধকার আগাছার জঙ্গল থেকে একটা পাশবিক গর্জন ভেসে আসে।

রিকশাওয়ালা আর দেরি করেনি। আগের দু-দুটো খুনের কথা তার বেশ মনে ছিল। সুতরাং একমাত্র আরোহীকে রিকশায় ফেলে রেখে সে প্রাণপণে ছুট লাগায়।

তখন গর্জনটা কাছে এগিয়ে আসতে থাকে।

আরোহী ভদ্রমহিলার আর কিছু করার ছিল না। পরদিন ভদ্রমহিলার ছিন্নভিন্ন দেহটা বীভৎস অবস্থায় পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে পাওয়া গেল সাইকেল-রিকশাটার ধ্বংসাবশেষ।

পঞ্চাশতলা একটা বাড়ির ছাদ থেকে রিকশাটা আছড়ে পড়লে সেটার যে দশা হত, কেউ স্রেফ গায়ের জোরে রিকশাটার সেই হাল করেছে। যেন রাগে আক্রোশে অন্ধ হয়ে কোনও ক্ষিপ্ত জানোয়ার রিকশাটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করার চেষ্টা করেছে।

এই খুনটার পর খুনির পরিচয় নিয়ে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। খুনি কি কোনও পশু, না কি মানুষ?

এতদিন অনেকেরই ধারণা ছিল খুনি কোনও শক্তিশালী পশু। কিন্তু পশু কি বুদ্ধি খাটিয়ে পথের মাঝে গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখতে পারে! তা হলে খুনি নিশ্চয়ই পশুর আড়ালে কোনও মানুষ।

সুতরাং পূর্ণিমার সঙ্গে সম্পর্কটা সকলে মেনে নিলেও খুনির পরিচয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই লাগল।

থানার বড়বাবু বেশ ফাঁপরে পড়লেন। মৃতদেহ নিয়ে নিয়মমাফিক দায়দায়িত্ব পালন করার পর আর কিছু করার আছে কি না সেটাই ভাবছিলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই খুনের তদন্তের ফলাফল হবে ঠিক আগের খুন দুটোর মতোই—শূন্য।

রোহনরা কিন্তু প্রায় খেপে উঠল। কিছু একটা করার জন্য ওরা অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল। এলাকার লোককে সতর্ক করার প্রথম ধাপ হিসেবে ওরা মাইক নিয়ে প্রচার শুরু করল। সাইকেল-রিকশায় ব্যাটারি আর মাইক লাগিয়ে রোহনের দলের দু-চারজন এলাকায় ঘুরতে লাগল।

রোহনদের ঘোষণা শুনতে-শুনতে চিকুর মনে হচ্ছিল, ভোট এসে গেছে। আর মাইকে ঘোষণা কে করছে কে জানে! 'স'গুলো সব ইংরেজি 'এস'-এর মতো করে উচ্চারণ করছে। তবে রোহনদের দলের বেশিরভাগই 'স্যামবাজারের সসীবাবু'। মাইকে তখন শোনা যাচ্ছিল :

'পূর্ণিমার রাতে সন্ধের পর সবাই সাবধানে থাকবেন। একা-একা রাস্তায় বেরোবেন না। বিপদ হতে পারে।...পল্লীবাসীগণ, আপনারা জানেন, গত তিন-তিনটে পূর্ণিমায় আমাদের এলাকায় তিন-তিনটে খুন হয়ে গেছে। তাই আপনাদের সাবধান করে বলছি, আগামী পূর্ণিমার রাতে রাস্তায় কেউ বেরোবেন না। সন্ধের পর সবাই সাবধানে থাকবেন...নইলে বিপদ হতে পারে।...পল্লীবাসীগণ, আপনারা জানেন...।'

শুধু যে মাইকে প্রচার তা-ই নয়, রোহনরা ঠিক করল পরের পূর্ণিমার রাতে ওরা আর্মস নিয়ে এলাকায় টহল দেবে। সে-কথা চিকু জানতে পারল ছোটকুর কাছে। ছোটকু তখন যথারীতি বিশুদার চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারছিল।

চিকুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ছোটকু হঠাৎ বিশুদার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল, বিশুদা, তুমি রাতে দোকানে আর থেকো না। মানে, পূর্ণিমার রাতে কারও পাকা বাড়িতে গিয়ে শেলটার নিয়ো। এ-খুনিকে বিশ্বাস নেই।'

উত্তরে বিশুদা একগাল হেসে জবাব দিল, 'আমার কী আছে যে আমাকে কেউ খুন করবে? আমাকে যমেও নেবে না।'

কিন্তু পূর্ণিমা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই বিশুদার সাহস কমতে লাগল। শুধু বিশুদা কেন, জাঙ্গিকুলের প্রায় সকলেই ভাবতে লাগল, এবার কার পালা?

বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বিকেলবেলা প্রবল ঝড় উঠল।

আকাশের একটা কোণ মেঘে মেঘে কালো হয়ে গেল। বৃষ্টিও পড়ল কিছুক্ষণ। গত ক'দিন ধরে গুমোট গরম যেভাবে চেপে বসেছিল তাতে জাঙ্গিকুলের সকলেই একটা কালবৈশাখীর জন্য অপেক্ষা করছিল। তার সঙ্গে বৃষ্টির আশাও ছিল।

বিকেল পাঁচটার পর ঝোড়ো হাওয়া আচমকা ধুলোর ঝড় তুলে সবাইকে অন্ধ করে দিল। কাপড়ে, রুমালে কিংবা হাতে মুখ-চোখ ঢেকে পথচারীরা যে যার মতো আশ্রয় খুঁজে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশুদা ঝড় ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়েছিল। যে-দুজন খদ্দের চায়ের কাপ হাতে বেঞ্চিতে বসে ছিল তারা একছুটে চলে এল দোকানের ভেতরে।

আকাশে মেঘ ডেকে উঠল 'গুড়ুম-গুড়ুম'।

তার একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হল।

মরুভূমিতে তেষ্টায় গলা-বুক যখন শুকিয়ে কাঠ তখন কয়েকফোঁটা মিষ্টি জল পেলে তৃষ্ণার্ত পথিক ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায়, তার চোখে জল এসে যায় আনন্দে। এখন রুক্ষ শুকনো মাটি ভগবানের দেওয়া এই আকাশ-জলকে প্রাণভরে শুষে নিচ্ছিল, আর মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠছিল।

বাঁখারির ঝাপ-ফেলা দোকানের ভেতর থেকে বিশুদা এই গন্ধ পাচ্ছিল। খদ্দেররা বিশুদার সঙ্গে বৃষ্টি, চাষবাস নিয়ে আলোচনা করছিল। বলছিল, বেশ কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি হলে দারুণ হয়। কিন্তু একটু পরেই বৃষ্টি থেমে গেল।

বরুণদেবের হয়তো খেয়াল হয়েছে এখন বর্ষাকাল নয়—ভুল করে তিনি বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছেন।

বৃষ্টি থামতেই খদ্দের দুজন চলে গেল।

তারপর রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা হয়ে এল।

রোহনদের ঘোষণা, পূর্ণিমার রাতে অজানা খুনির শিকার হওয়ার ভয়, আর শেষ পর্যন্ত এই ঝড়বৃষ্টি—সব মিলিয়ে জাঙ্গিকুল যেন কারফিউর আওতায় চলে গেল।

সিগারেট কিনতে এসে পাড়ারই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে গেলেন, রাজবাড়ির দিকে একটা বড় তেঁতুলগাছ ঝড়ে উলটে পড়েছে। তাতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে স্টেশনের দিকটা লোডশেডিং হয়ে গেছে।

সুতরাং সাতটা বাজতে না বাজতেই বিশুদা পাতা উনুনে কড়াই বসিয়ে রাতের রান্না শুরু করে দিল। রসুন পেঁয়াজ দিয়ে আলু-বেগুনের তরকারিটা হয়ে গেলে তারপর পাঁচখানা আটার রুটি। ব্যস। এর সঙ্গে একটুকরো কাঁচা পেঁয়াজ আর একটা কাঁচালঙ্কা। সব মিলিয়ে দারুণ ভোজ।

বিশুদার ভীষণ একঘেয়ে লাগছিল, আর বারবার হাই উঠছিল। অন্যদিন খদ্দের থাকে রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত। কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না। আর আজ থেকে-থেকেই চোখ টানছে।

রান্নার কাজ মিটে যেতেই বিশুদা পাতা উনুনে জল ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে দিয়েছে। কাল ভোরে উঠে উনুন পরিষ্কার করতে হবে। ছাই ঘেঁটে না-পোড়া কয়লাগুলো বের করে নিয়ে নতুন করে উনুন সাজাতে হবে। তারপর আবার একটা নতুন দিনের শুরু।

সাড়ে আটটার সময় বিশুদা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। সুইচ টিপে বাল্‌বটা নিভিয়ে দিতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। একটু পরে, অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই, বাঁখারির ফাঁকফোকর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো দেখা গেল। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে নানান কথা ভাবতে লাগল বিশুদা।

গতবারে যখন দেশের বাড়িতে যায় তখন ছোট ছেলেটার সর্দি-জ্বর দেখে এসেছিল। পরে চিঠিতে জেনেছে, ছেলে ভালো আছে। আর বড় মেয়েটার বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্রের খোঁজ চলছে। সাড়ে চার বিঘে ধানজমি নিয়ে শরিকি মোকদ্দমা চলছিল—সেটার কোনও হেস্তনেস্ত হয়নি। আরও ক'বছর এভাবে ঝুলে থাকবে কে জানে!

ভাবতে ভাবতে বিশুদা আনমনা হয়ে গিয়েছিল। দেশের বাড়ির মাঠেঘাটে মনে-মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই একটা চাপা গুড়গুড় শব্দ বিশুদার স্বপ্ন ভেঙে দিল।

মেঘ ডাকল নাকি?

শব্দটা শোনা গেল আবার!

না—মেঘ তো নয়! তবে কী?

ঠিক তখনই—বিশুদার প্রশ্নের জবাবেই যেন একটা হিংস্র গর্জন শোনা গেল।

তেলচিটে বিছানায় চমকে উঠে বসল বিশুদা। তার বুকের ভেতরে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানছিল কেউ। সারা শরীর কুলকুল করে ঘামতে লাগল।

বেড়ার গা ঘেঁষে একটা বিশাল কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। ছায়াটার আড়ালে জ্যোৎস্না কোথায় হারিয়ে গেছে।

বিশুদা পলকে বুঝতে পারল পূর্ণিমার মৃত্যু তার দোকানের ঝাঁপ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, গর্জন শোনা ছাড়াও নাকে একটা পাশবিক গন্ধ আসছিল—চিড়িয়াখানায় যেরকম গন্ধ পাওয়া যায়।

দোকান থেকে বেরোনোর পথ সামনের দিকে। পিছনদিকে বাঁশ, দরমা, টিন দিয়ে শক্তপোক্ত দেওয়াল। বছর সাতেক আগে একবার পিছনের দরমা ভেঙে বিশুদার দোকানে চুরি হয়েছিল। তারপর বিশুদাই ওটাকে মজবুত করেছে। এখন দরমা, টিন ভেঙেচুরে সেদিক দিয়ে পালানোর উপায় নেই। পালাতে পারলে বিশুদা

হয়তো বেঁচে যেত। কারণ, পিছনে ঢালু নালা। তার পাড়ে বড়-বড় দু-চারটে গাছ। গাছ পেরিয়ে মজুমদারদের বাগানবাড়ির পাঁচিল। কোনওরকমে সেই পাঁচিল ডিঙোতে পারলে আর ভয় ছিল না।

বিশুদা বিছানায় বসে ঘামছিল। তার হাত-পা অবাধ্যভাবে কাপছিল। তবু তারই মধ্যে পশুটাকে দেখার একটা দুরন্ত কৌতূহল মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

বেড়ার গায়ে আঁচড় কাটার খচর-খচর শব্দ হচ্ছিল। ছায়াটা অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ চলে বেড়াচ্ছে। আর হিংস্রভাবে গজরাচ্ছে। বিশুদা কাঁপতে কাঁপতে সামনের বেড়ার কাছে গেল। বেড়ার ফোকরে চোখ রাখল। চিড়িয়াখানার গন্ধটা আরও জোরালোভাবে নাকে এল। অস্পষ্টভাবে একটা লোমশ শরীরকে দেখতে পেল বিশুদা। ঠিক দেখতে পেল নয়—বরং যেন অনুভব করল।

হাঁটুর কাছটা সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় দুটো লোমশ পা হেঁটে বেড়াচ্ছে—শিম্পাঞ্জি দু-পায়ে হেঁটে বেড়ালে যেমনটি দেখায়।

তবে কি এসব কোনও হিংস্র শিম্পাঞ্জির কাজ?

এ-কথা ভাবতে-না-ভাবতেই একটা জোরালো থাবা এসে পড়ল বেড়ার গায়ে। কাগজের দেওয়ালের মতো বেড়ার দেওয়াল ফুঁড়ে একটা লোমশ হাত ভেতরে ঢুকে এল। সেই হাতের লোমশ আঙুলে লম্বা-লম্বা বাঁকানো নখ।

বিশুদা একটা মারাত্মক চিৎকার করে উঠল।

চিৎকারটা বিশুদাকেই অবাক করে দিল। তার ভেতরে যে এত তীব্র, এত শক্তিশালী, এত ভয়ঙ্কর চিৎকারের ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তা বিশুদা নিজেই কোনওদিন জানত না।

চিৎকার করেই বিশুদা দোকানের পিছনদিকে একটা কোণে চলে গেল। সেখানে দুটো টিনের মাঝে সামান্য একটু ফাঁক আছে। একটা খাটো বাঁশের টুকরো নিয়ে বিশুদা সেই দুর্বল জায়গায় পাগলের মতো গুঁতো মারতে লাগল।

ক'দিন আগেই না বিশুদা ছোটকুকে বলেছিল, '...আমাকে যমেও নেবে না!' এখন দোরগোড়ায় যম এসে গেছে। হিংস্রভাবে দাপাদাপি করছে, গরগর করছে।

বাঁশের গুঁতোয় বেড়ার দেওয়ালে গর্ত হতে সময় লাগল না। সেই গর্তে বিশুদা শরীরটা জোর করে গলিয়ে দিতে চাইল। বেড়ার খোঁচায় গেঞ্জি ছিঁড়ে গেল, গায়ে ধারালো আঁচড় পড়ে রক্ত ঝরতে লাগল, লুঙ্গি ফেঁসে গেল কয়েক জায়গায়।

কিন্তু বিশুদার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওই বড়-বড় বাঁকানো নখে ফালা ফালা হওয়ার চেয়ে বাঁখারির আঁচড় অনেক ভালো! বিশুদা যখন ফোকর দিয়ে শরীরটাকে প্রায় অর্ধেকটা গলিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই শুনতে পেল দোকানের সামনের ঝাঁপ ভেঙে পড়ার শব্দ। তারপরই গর্জনটা লাফিয়ে চলে এল বিশুদার বিছানার কাছে।

হাঁকপাঁক করে শরীরটাকে কোনওরকমে দোকানের বাইরে নিয়ে এল বিশুদা। তারপরই ঢালু জমিতে গড়িয়ে পড়ে গেল চওড়া নালার দিকে।

চাঁদের আলোয় নালার জল চিকচিক করছিল। বিশুদা টাল সামলাতে না পেরে তার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

কয়েক সেকেন্ড বিশুদার মনে হল, সে চিৎ হয়ে একটা নরম বিছানায় শুয়ে আছে। আকাশের গোল চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁসফাঁস করা গরমে নালার ঠান্ডা জল যেন বাতানুকূল রাজশয্যা।

তারপরই দেখল তার দোকানের পিছনের দেওয়ালটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। আর একটা প্রকাণ্ড কালো শরীর দোকানের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

বিশুদা ভয়ার্ত খরগোশের মতো লাফিয়ে উঠে পড়ল নালা থেকে। নালার দুর্গন্ধ সারা গায়ে মাখামাখি হলেও বিশুদার নাক তেমনভাবে কাজ করছিল না। শুধু একটা জান্তব প্রবৃত্তি বিশুদাকে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে

বলছিল, 'পালাও! পালাও!'

নালার ওপারে উঠে তাড়াহুড়ো করে ছুটতে গিয়ে একটা গাছের গুড়িতে বিশুদা ধাক্কা খেল। কোনওরকমে টাল সামলে নিয়ে ছুটল মজুমদারদের বাগানবাড়ির পাঁচিলের দিকে। একলাফে পাঁচিলে উঠে ওপারে ঝাপ দিয়ে পড়ল বিশুদা। একইসঙ্গে শুরু করল কানফাটানো আর্তচিৎকার।

জ্যোৎস্নার আলোয় প্রাণীটা থমকে দাঁড়াল। মাথা তুলে একবার পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাল। তারপর চাপা গর্জন করে বড়-বড় পা ফেলে নেমে এল নালার দিকে।

অনায়াসে লাফিয়ে নালা পেরোল প্রাণীটা। তারপর ক্ষিপ্রভাবে ছুটে গেল বাগানবাড়ির পাঁচিলের দিকে। বাঁ হাতে পাঁচিলটা আঁকড়ে ধরে পোলভল্টের ভঙ্গিতে একলাফে শরীরটাকে নিয়ে ফেলল বাগানের ভেতরের স্যাঁতসেঁতে জমিতে।

আর ঠিক তখনই দুটো টর্চের জোরালো আলো প্রাণীটার মুখে এসে পড়ল। বিশুদার চিৎকারে ছুটে এসেছে মজুমদারদের দুই দারোয়ান। দূর থেকে ওরা খুনিকে লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলেছে। হঠাৎ কী যে হল, প্রাণীটা একটা গর্জন করে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দারোয়ান দুজন সাহস জোগাড় করে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এল পাঁচিলের কাছে। আঙুলের ওপরে দাঁড়িয়ে শরীরটা উঁচু করে ওরা পাঁচিলের বাইরেটা চোখ বুলিয়ে দেখল।

জ্যোৎস্নার সাদা আলোয় সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা দেখল, একটা বিশাল কালো ছায়া সামান্য কুঁজো হয়ে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে চলেছে। একটু পরেই ওটা কয়েকটা গাছের আড়ালে চলে গেল।

ওরা দুজন ফিরে এসে দেখল বাগানবাড়ির চাতালে বিশুদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

আট

পরদিনই বিশুদার কাহিনি জাঙ্গিকুলে ছড়িয়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শোনার জন্য বহুলোক আসতে লাগল বিশুদার দোকনে। দোকানের বিক্রি একলাফে বেড়ে গেল।

রোহনরা সন্ধেবেলা চা খেতে বসে সব শুনল বিশুদার কাছে। রোহন বলল, 'বিশুদা, পরের পূর্ণিমায় তুমি আমার বাড়িতে থাকবে। এর যেন কোনও নড়চড় না হয়।'

বিশুদা চোখ বড় করে বলল, 'সে আর বলতে! ওই গোরিলার হাতে আমার মরার কোনও সাধ নেই। কাল ওই ডাকাবুকো দারোয়ান দুজন না থাকলে ওই গোরিলাটা আমাকে নির্ঘাত খতম করে যেত।'

ছোটকু বলল, 'গোরিলা কেমন করে বুঝলে?'

'যা সাইজ, আর যা গন্ধ!'

রোহন কী যেন চিন্তা করছিল। একটু পরে বলল, 'বিশুদা, তুমি দোকানটা রিপেয়ার করে নিয়ো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।'

'তুমি আর আমার জন্যে কত করবে!'

বিশুদা অভাব অনটনে পড়লে রোহনের থেকে টাকা ধার নেয়। কিন্তু রোহন কখনও সে-ধার শোধ নেয় না। বিশুদা কৃতজ্ঞতায় ওকে বিনাপয়সায় চা-বিস্কুট খাওয়াতে চায়, কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। রোহন সবসময় জোর করে পয়সা দেয়। আর বলে, 'এভাবে দানছত্র খুললে তোমার ব্যবসা লাটে উঠবে। তখন বড় মেয়েটার বিয়ে দেবে কী করে!'

ছোটকু রোহনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস, অটো করে পাবলিসিটিটা তা হলে চালিয়ে যাই—কী বলো?'

'না, না—ওটা থামাবি না। যেভাবে হোক মার্ডার ঠেকাতেই হবে।'

সুতরাং রোহনদের প্রচার আরও জোরদারভাবে শুরু হল। এবং পরের পূর্ণিমার দিন সন্ধে হতে না হতেই রাস্তাঘাটে লোকজন একেবারে কমে গেল।

সময়টা গ্রীষ্মকাল হলেও সাতটা সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতে দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে গেল ঝপাঝপ। ফলে রাত আটটার সময় মনে হল যেন রাত বারোটা বেজে গেছে। শুধু শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দিরটাই ছিল ব্যতিক্রম।

আজ স্নানযাত্রা পূর্ণিমা। আকাশের চাঁদ অন্যান্য পূর্ণিমার মতোই শান্ত, ধ্যানে মগ্ন। তবু মনে হয় যেন সে ভয়ঙ্কর কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

হর-পার্বতীর মন্দিরে ঘণ্টা বাজছিল। চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত আর কোনও শব্দ না থাকায় সেই ঘণ্টার শব্দের রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে লেগে রইল।

মন্দিরের ভেতরে পুরুতমশাই পুজো করছিলেন। অথচ পুজো দেখার জন্য আজ আর কেউ বসে নেই। ভয় এমনই জিনিস! দেবতার চেয়েও ভয়কে বেশি সমীহ করে মানুষ। আজ তা হলে কে-ইবা প্রসাদ নেবে, আর কে-ইবা নেবে শান্তির জল!

পুরুতমশাই ঠিক খেয়াল করেননি। তিনি দেবতার আরতিতে ব্যস্ত ছিলেন। একজন ভক্ত মন্দিরের দরজায় মসৃণ শ্বেতপাথরের ওপরে বসে ছিল। দু-চোখে তার মুগ্ধ দৃষ্টি। ভক্তির আবেগে চোখের কোল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। দেবতার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল সে।

পুজো শেষ করে পুরুতমশাই পিছনে ফিরতেই তাকে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে গেলেন তিনি। আজ মন্দিরের বারান্দা, শান-বাঁধানো চাতাল, সব খাঁ-খাঁ করছে। অথচ অন্যান্য দিন কত ভক্ত সেখানে ভিড় করে থাকে।

পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে এই সাহসী ভক্তের কাছে এলেন পুরুতমশাই। লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রদীপশিখার তাপ নিয়ে মাথায় বোলাল। পুরুতমশাই অবাক হয়ে বললেন, ‘এ কী, আপনি! আজ কেউ আসেনি—অথচ আপনি এসেছেন!’ হাসলেন পুরুতমশাই : ‘আপনার কি ভয়ডর নেই?’

উত্তরে ভক্ত স্মিত হেসে বলল, ‘আমার কাছে ভয়ের চেয়ে ভগবানের টান বেশি। মুক্তির আশায় আশায় আমি খ্যাপা কুকুরের মতো এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে ঘুরে বেড়াই...।’

‘মুক্তি কি অত সহজে পাওয়া যায়! আমরা সবাই তো মুক্তির আশাতেই বসে আছি।’

পুরুতমশাইকে পাশ কাটিয়ে ভক্ত দেবতার মূর্তির দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে আবেগ-ভরা গলায় বলে উঠল, ‘আমায় মুক্তি দাও, ভগবান—এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দাও...।’

পুরুতমশাই খানিকটা করুণার চোখে এই কষ্ট পাওয়া ভক্তকে দেখছিলেন। ভাবছিলেন, এর জীবন অভিশপ্ত কেন? আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন।

ভক্ত মানুষটি তখনও গড় হয়ে প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে ঠাকুরকে ডাকছিল। সেই অবস্থাতেই তার শরীরটা ফুলতে শুরু করল। জামা ছেঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। আর লোকটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল পশুর গোঙানি।

কয়েক সেকেন্ড পর সেই মানুষটা, কিংবা অমানুষটা, সোজা হয়ে দাঁড়াল—ঘুরে তাকাল পুরুতমশাইয়ের দিকে। পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে হতভম্ব পুরুতমশাই তাঁর বদলে যাওয়া ভক্তকে দেখছিলেন।

কী ভয়ঙ্কর বীভৎস চেহারা! ঘন কালো লোমে ঢাকা কোনও আদিম মানুষ যেন! হিংস্র চোয়াল পশুর মতো লম্বাটে। দু-পাটি ধারালো দাঁত আলো পড়ে ঝকঝক করছে। দাঁত থেকে সুতোর মতো সরু হয়ে লালা ঝরে পড়ছে।

অমানুষটা সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু দুটো কিছুটা ভাঁজ হয়ে থাকায় পা দুটো টানটান সোজা হতে পারছে না। দুটো লোমশ হাত দু'পাশে ঝুলছে। হাতের আঙুল বাঁকানো, নখও একইরকম।

একটা চাপা গর্জন করে প্রাণীটা তার ছেঁড়া আলুথালু পোশাকে এক টান মারল। তারপর পায়ের এক ঝটকায় সেটা দূরে ছিটকে ফেলে দিল। এবং পুরুতমশাইয়ের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। দুটো হলদে সবুজ চোখ। নিশাচর পশুর মতো জ্বলজ্বল করছে। অথচ সেই চোখে মানুষের মতো দৃষ্টি।

পুরুতমশাই বেশ বুঝতে পারছিলেন, মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষা করছে।

তাই তিনি আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না।

অমানুষটাকে অবাক করে দিয়ে তার শরীরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুঃসাহসী পুরুতমশাই। জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপটা চেপে ধরলেন তার মুখে : 'শয়তান!'

বীভৎস রক্ত-হিম-করা গর্জন শোনা গেল। নাকে এল লোম এবং চামড়া পুড়ে যাওয়ার গন্ধ।

পুরুতমশাই তখন পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করছিলেন আর চিৎকার করছিলেন, 'তুই পাপী! তুই ছদ্মবেশী পাপী! ভগবান তোকে বিনাশ করবে!'

অমানুষটা বোধহয় কথা বলতে চাইল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে শুধুই পাশবিক গর্জন বেরিয়ে এল। এক ঝটকায় সে পুরুতমশাইয়ের দেহটা সজোরে ছিটকে দিল শ্বেতপাথরের দেওয়ালে। পিতলের পঞ্চপ্রদীপ দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ঠং-ঠং করে ধাতব শব্দ হল। আর তার ঠিক পাশাপাশি শোনা গেল একটা ভোঁতা শব্দ। পুরুতমশাইয়ের ভারি দেহটা ঠিকরে পড়েছে মেঝেতে।

যন্ত্রণায় গজরাতে গজরাতে পুরুতমশাইয়ের কাছে এগিয়ে এল প্রাণীটা। সামান্য ঝুঁকে পড়ে নিথর দেহটা অবলীলায় তুলে নিল। তারপর পশুর মতো ক্ষিপ্রতায় একলাফে শ্বেতপাথরের বারান্দা পেরিয়ে মন্দিরের শানবাঁধানো চত্বরে নেমে এল।

প্রাণীটা এবার রাতের আকাশের দিকে মুখ তুলল। তাকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। তারপর এক আকুল দীর্ঘ গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল।

জাঙ্গিকুলের অনেকেই শুনতে পেল সেই গর্জন। রোহনরাও শুনতে পেল। ওরা তখন রাজবাড়ির কাছাকাছি ছিল। গর্জনটা শুনতে পেয়েই ওরা শব্দের নিশানা ধরে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতেই রোহন কোমর থেকে রিভলবার বের করে নিল।

জলাপুকুর, দেশপ্রিয় সুইটস, বিশুদার চায়ের দোকান পেরিয়ে ওরা মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল শিবতলার হর-পার্বতীর মন্দিরের কাছাকাছি।

এদিক থেকেই তো গর্জনটা এসেছে বলে মনে হল! অথচ চারদিক শুনশান, চুপচাপ।

শুধু আশপাশের দু-একটা বাড়ির বারান্দায় কৌতূহলী কয়েকটা মুখ দেখা গেল। সবক'টা মুখই ভয়ে ফ্যাকাসে। মন্দিরের দিকে চোখ পড়ল রোহনের।

শানবাঁধানো চত্বরে ঢোকার গ্রিলের দরজাটা হুড়কো দিয়ে আটকানো। তবে মূল মন্দিরটা খানিকটা উঁচুতে হওয়ায় রাস্তা থেকেই ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দরজা হাট করে খোলা। ঝকঝকে আলোয় দেবতার মূর্তি প্রাণবন্ত উজ্জ্বল। অথচ পুরুতমশাইকে দেখা যাচ্ছে না।

গোটা মন্দিরটা কেমন যেন নিঝুম। ঠিক কোথা থেকে ভেসে এল গর্জনটা?

কিছুক্ষণ এলোমেলো খোঁজাখুঁজির পর রোহনের কেমন যেন সন্দেহ হল। পুরুতমশাইকে দেখা যাচ্ছে না কেন? অথচ ঘণ্টাখানেক আগে এ-পথ দিয়ে টহল দেওয়ার সময় রোহনরা তাঁকে দেখেছে! তাঁকে জিগ্যেস করলে হয়তো গর্জনটার কোনও হদিস পাওয়া যেতে পারে।

রোহন রিভলবার উঁচিয়ে ধরল। ওর সঙ্গে যে আরও চারজন শাগরেদ ছিল তারাও নিরস্ত্র নয়। কারও হাতে রড, কারও হাতে ভোজালি। ওরা সবাই তৈরি। খুনিকে হাতের কাছে পেলে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।

ওরা মন্দিরের গ্রিলের দরজার কাছে এগিয়ে গেল। গ্রিলের গেট খুলে রোহনরা মন্দিরের শানবাঁধানো চত্বরে ঢুকে পড়ল। এবং পুরুতমশাইকে ওরা খুঁজে পেল।

মন্দিরের চত্বরে বেশ কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আর শিমুল গাছ রয়েছে। তাদের গোড়াগুলো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে বেদির মতো করা। বেশিরভাগ সময় ভক্তরা এখানে বসে থাকে, নামকীর্তন শোনে। সেইরকমই একটা বেদির ওপরে পুরুতমশাইয়ের ছিন্নভিন্ন দেহটা শোয়ানো। মাথাটা বেদি ছাড়িয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। হাঁ করা মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

গোটা বেদিটা রক্তে মাখামাখি। রক্তের দাগ গড়িয়ে এসেছে নিচে। শানবাঁধানো চত্বরে রক্তের ধারা তৈরি হয়ে গেছে। রক্তের ছাপ চত্বরের নানান জায়গায়, মন্দিরের সিঁড়িতে, এমনকী মন্দিরের ভেতরেও।

রোহনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। এরকম দুঃসাহসী খুনি! দেবতার সামনে খুন করতেও সে ভয় পায় না! খুনি আশপাশে কোথাও লুকিয়ে নেই তো!

রোহনরা মন্দিরের প্রতিটি জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। ওদের বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ হচ্ছিল। একইসঙ্গে রোহনের ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এত চেষ্টা করেও খুনটাকে ওরা ঠেকাতে পারল না!

মন্দিরের ভেতরে অবহেলায় পড়ে থাকা পঞ্চপ্রদীপটা রোহনের চোখে পড়েছিল। সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখল ও। প্রদীপের তেলের গায়ে কয়েক গোছা লোম লেপটে রয়েছে।

খুঁটিয়ে নজর করতেই ও দেখল, বেশ কয়েকটা লোম আধপোড়া। তা হলে কি পঞ্চপ্রদীপের আগুনে খুনির গায়ের লোম পুড়ে গেছে? পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে খুনির কি ধস্তাধস্তি হয়েছে?

ঠিক তখনই রোহনের এক শাগরেদ নান্টু মেঝেতে ঝুঁকে পড়ে কী যেন তুলে নিল। তারপর রোহনকে ডেকে বলল, 'এগুলো কী দ্যাখো তো, রোহনদা—।'

রোহন কাছে এসে ভালো করে দেখল।

মটরদানার মতো গোল-গোল তিনটে বিচি। সেগুলোয় ফুটো করা—বোধহয় মালা গাঁথা ছিল। খুলে পড়ে গেছে।

রোহন বিচিগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। ওর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

মন্দিরের ভেতরেও অল্পবিস্তর রক্তের ছাপ ছিল। কিন্তু কোনও ছাপই হাতের কিংবা পায়ের বলে স্পষ্ট চেনা যায় না।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও রোহনরা খুনির কোনও চিহ্ন পেল না। কেউ কোথাও নেই। মন্দিরের পিছনদিকে একটা পোড়ো জমি আছে—গাছপালা আর কাঁটাঝোপে ভরা। খুনি হয়তো সেদিক দিয়ে সরে পড়েছে।

হতাশ হয়ে রোহনরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। দেখল, কয়েকজন কৌতূহলী মানুষ সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন রোহনের কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, রোহন? গর্জনটা কীসের কিছু বুঝতে পারলে?'

রোহন ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে 'না' বলল। তারপর : 'পুরুতমশাই খুন হয়েছেন। আমরা ফাঁড়িতে খবর দিতে যাচ্ছি—।' রোহনের বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে রোহন আর ছোটকু রওনা হল থানার দিকে।

যেতে-যেতে ছোটকু বলল, 'বস, আজ হেভি প্রেস্টিজে লাগল মাইরি। আমাদের এরিয়ায় নাকের ডগায় মার্ডার করে মার্ডারার হাওয়া হয়ে গেল!'

রোহন ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল। ওর ভেতরে অপমানটা টগবগ করে ফুটছিল।

নয়

স্কুলের লাগোয়া এক অপরূপ বাগানে হরিহরবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাগানে ঝকঝকে সবুজ সব ফুলের গাছ। তাতে ফুটে রয়েছে নানান রঙিন ফুল। সেই ফুলের মেলার মাঝে আরও এক ঝাঁক রঙিন ফুল ছুটোছুটি করছিল। একদল ছেলে-মেয়ে।

ওরা এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে। নিজেদের মধ্যে হইচই কলরোল তুলে বাগানটাকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে ফুলের মতো স্কুলপড়ুয়ার দল।

বাগানের একটা বেদিতে বসে মুগ্ধ চোখে ওদের দেখছিলেন হরিহরবাবু। তাঁর কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তবে তার জন্য কোনও দুঃখও নেই। ছাত্র-ছাত্রীরাই তাঁর সন্তান।

বিকেলের রোদ মরে এসেছিল। কিন্তু সন্ধের ছায়া তখনও নামেনি। হরিহরবাবু দেখলেন, দূরে, পুবের দিগন্তে, তালগাছের সারির ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ।

ছুটোছুটি করা ছেলেমেয়ের দলও চাঁদ দেখতে পেল।

কী যে হল, হঠাৎই ওরা খেলাধুলো ছেড়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই একইসঙ্গে হাঁ করে তাকাল পূর্ণিমার চাঁদের দিকে। হরিহরবাবু বেদি ছেড়ে উঠে পড়লেন। ওরা সবাই কেন অবাক হয়ে চাঁদ দেখছে সেটা বুঝতে চেষ্টা করলেন।

ওদের নিষ্পাপ মুখগুলো দেখছিলেন হরিহরবাবু। না, ওরা ফুল নয়—বরং ফুলের চেয়ে কিছু বেশি। 'ছোটবেলা'র মতো দারুণ জিনিস আর হয় না! মনে-মনে ভাবলেন তিনি। আর ঠিক তখনই একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

ছেলে-মেয়েগুলোর মুখ বদলে যেতে লাগল। নিষ্পাপ মুখগুলো বিকৃত হয়ে জন্তুর চেহারা নিল। চোয়াল লম্বাটে হয়ে গেল। সারি সারি ধারালো দাঁত তৈরি হয়ে গেল সেখানে। হাতে পায়ে ঘাড়ে লোম গজিয়ে উঠল। কানের ওপর দিকটা ছুঁচলো হয়ে গেল।

তারপর ওরা সমস্বরে এক দীর্ঘ গর্জন তুলে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে দিল।

হরিহরবাবু ভয়ে কাঁপছিলেন আর কুলকুল করে ঘামছিলেন। চিৎকার শেষ করে ছেলে-মেয়েগুলো হরিহরবাবুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এক বিচিত্র পাশবিক স্বরে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে...' সুর করে গাইতে শুরু করল। যেন স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত গাইছে।

এবং ওরা হরিহরবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হরিহরবাবু বাঁশপাতার মতো থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন।

একইসঙ্গে মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগলেন। ঠিক তখনই তাঁর ঘুমটা ভেঙে গেল।

উঃ, কী বিশ্রী স্বপ্ন!

সারা শরীর ঘামে ভেজা। বিছানার চাদরটাও ভিজে গেছে। অবসন্ন চোখে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন হরিহরবাবু। সন্ধে প্রায় ছ'টা। আর ঠিক তখনই স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। তাঁর মাথার কাছটিতে দাঁড়িয়ে। মুখে কৌতুকের হাসি।

'সেই তখন থেকে ডাকছি। ওরা সব পড়তে এসে গেছে।'

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন হরিহরবাবু। দেওয়ালে টাঙানো মা-কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকালেন। মা—মা-গো!

'ঘুমের মধ্যে অমন গোঙাচ্ছিলে কেন? তোমাকে কি বোবায় ধরেছিল?'

'কে জানে!' বিছানা থেকে নেমে পড়লেন হরিহরবাবু : আসলে একটা বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন...।'

'তোমার তো আবার অল্পেতেই ভয়!' হরিহরবাবুর স্ত্রী হাসলেন : 'শরীর ভালো না লাগলে আজ আর পড়াতে হবে না—।'

হরিহরবাবু প্রস্তাবটাকে আমলই দিলেন না। কোচিং ক্লাস কামাই করা তিনি একেবারে পছন্দ করেন না।

পোশাক পালটে নিয়ে বাইরের ঘরে এলেন তিনি। চিকু, প্রিয়াংকা, কৌশিকের দল হাজির। ওদের দিকে একপলক তাকিয়েই দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। সংকোচের হাসি হেসে বললেন, 'দুপুরের ঘুমটা একটু লম্বা হয়ে গেছে...।'

চিকু হাঁ করে হরিহরবাবুকে দেখছিল। ওর শরীরের ভেতরে শিরায় শিরায় বরফকুচির স্রোত বইতে শুরু করল। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল।

চিকু টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে পাশে বসা প্রিয়াংকাকে ধরে নিজেকে সামলে নিল।

প্রিয়াংকা টের পেল চিকুর হাত বরফের মতো ঠান্ডা। ও অবাক হয়ে চিকুর চোখে তাকাল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, কী হয়েছে?'

চিকুও নিচু গলায় জবাব দিল, 'আমি সব বুঝতে পেরে গেছি।'

'কী বুঝতে পেরেছ?'

চিকু কোনও উত্তর দিল না। চোখের ইশারায় হরিহরবাবুকে দেখাল। তারপর ডানহাতের দুটো আঙুল ভাঁজ করে আর দুটো আঙুল টানটান করে রিভলবারের আদল তৈরি করল। সেই রিভলবারটা স্যারের দিকে তাক করে মুখে চাপা শব্দ করে স্যারকে মিছিমিছি 'গুলি' করল চিকু।

প্রিয়াংকা কিছু বুঝতে না পেরে ঠোঁট উলটে প্রশ্নের ভঙ্গি করল।

চিকু হেসে বলল, 'এখন না—আগে পড়া শেষ হোক—তারপর। তুমি আমার সঙ্গে থেকো—তা হলে সব বুঝতে পারবে।'

চিকুর উসখুস ভাবটা হরিহরবাবু লক্ষ করেছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন, 'চিকু, কিছু বলবি?'

চিকু মাথা নাড়ল : 'না, স্যার।'

'প্রিয়াংকার সঙ্গে কী কথা বলছিস?'

হরিহরবাবুর কৌতূহলটা চিকুর কানে বড্ড বাড়াবাড়িরকম ঠেকল। তাই ও অম্লানবদনে বলে বসল, 'পুরুতমশাইয়ের মার্ডারটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, স্যার।'

গত পূর্ণিমার পর মাত্র তিনটে দিন পার হয়েছে। পুরুতমশাইয়ের হত্যাকাণ্ড জাঙ্গিকুলের ছোট-বড় সবাইকে একেবারে ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে। লোকজনের কথাবার্তা আলোচনায় এখন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আগামী পূর্ণিমায় সন্ধে হলেই যে যার ঘরে ঢুকে পড়বে। দরজায় খিল এঁটে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকবে। অপঘাতে কেউ আর মরতে চাইবে না।

চিকুর কথায় কোচিং সরগরম হয়ে উঠল। সুযোগ পেয়ে সকলেই পূর্ণিমার খুনগুলো নিয়ে নানান মন্তব্য করতে লাগল।

হরিহরবাবু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইশারা করলেন। একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'শোন, এই খুনগুলো নিয়ে আমিও অনেক ভেবেছি। তোদের তো আগে একদিন বলেছি, এ যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার। তা ছাড়া, যারা খুন হয়েছে তাদের সবারই নিয়তি ছিল মৃত্যু। তবে জানবি, তাদের আত্মার মৃত্যু হয়নি। গীতায় আছে, আত্মা অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়। আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। আত্মার আসল রূপ হল...।'

চিকু স্যারের কথা শুনছিল। কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই ওর হাসি পাচ্ছিল। কারণ রোহনদার কথাগুলো ওর মনে পড়ছিল।

গত পূর্ণিমার পরের দিন বিকেলে রোহনের সঙ্গে চিকু দেখা করেছিল। দেখা করার জন্য রোহনই ওকে খবর পাঠিয়েছিল।

বিশুদার চায়ের দোকানে বসে মন্দিরের খুন নিয়ে চিকুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল রোহন। তারপর মন্দির থেকে পাওয়া মটরদানার মতো তিনটে বিচি চিকুকে দেখিয়েছিল।

'এগুলো কী বল তো! সকাল থেকে অনেককে দেখিয়েছি। ওরা বলছে...।'

বিচিগুলো দেখামাত্রই চিনতে পারল চিকু। রুদ্রাক্ষ। রোহন কথা বলে যাচ্ছিল : '...মনে হয় খুনির সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় পুরুতমশাইয়ের গলার মালাটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে।'

চমকে উঠল চিকু। কখনও না! কারণ, মন্দিরে ও প্রায়ই যায়। পরীক্ষার আগে তো বেশ ঘন-ঘন যায়। পুরুতমশাইকে ও বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে। ওঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল না। বরং লকেটওয়ালা একটা সোনার চেন ছিল। মৃত্যুর পরেও সেটা ওঁর গলায় ছিল।

তা হলে?

বিধবা ভদ্রমহিলা খুন হওয়ার পর থেকেই সকলের ধারণা হয়েছিল যে, খুনি আসলে কোনও মানুষ। আবার তার বাইরের চেহারাটা অনেকটা পশুর মতো হওয়ায় কারও কারও ধারণা হয়েছিল, সে মানুষ এবং পশুর মাঝামাঝি কোনও প্রাণী। তার সঙ্গে পূর্ণিমার সম্পর্কটা জুড়ে দিয়ে কে যেন প্রথম ওয়্যারউল্ফ বা নেকড়ে মানুষের কথা বলেছিল।

বিশুদা বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে শুধু শব্দ শুনেছিল—কাউকে তেমন স্পষ্টভাবে দেখতে পায়নি। তবে পশু বলেই মনে হয়েছিল।

কিন্তু পুরুতমশাইয়ের খুনের পর নেকড়ে-মানুষের ধারণাটা জোরালো চেহারা পেয়ে গেছে। নেকড়ে মানুষ। যে-মানুষ প্রতি পূর্ণিমার রাতে ভয়ঙ্কর হিংস্র অমানুষে বদলে যায়, হয়ে যায় অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু। তারপর, পূর্ণিমা কেটে গেলেই, সে আবার সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

চিকু মনে-মনে এরকম একজন অসুস্থ মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

রুদ্রাক্ষের মালা...রুদ্রাক্ষের মালা...রুদ্রাক্ষর মালা...। একটা সন্দেহের ছায়া মনের কোণে উঁকি দিতে শুরু করল। এরপর রোহন পঞ্চপ্রদীপের কথা বলল। বলল, প্রদীপের গায়ে লোম পাওয়া গেছে। তাতে আধপোড়া লোমও আছে। হয়তো পঞ্চপ্রদীপের শিখায় খুনির শরীর পুড়ে গেছে।

বেশ উত্তেজিতভাবে রোহন আর চিকু প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিল। শেষে রোহন বলল, 'ফাঁড়ির মাইতিবাবু বলছিলেন এবার কলকাতা থেকে গোয়েন্দার দল আসবে। সঙ্গে ফোরেনসিক এক্সপার্টরাও থাকবে। সে ওরা যা পারে করুক। তবে ওদের আগে মার্ডারারকে ধরতে পারলে আমার মনটা ঠান্ডা হত।'

'রোহনদা, তুমি আমাকে দু-চারদিন সময় দাও।' চিকু বলল।

'কেন রে?'

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে...।' রোহন অবাক হয়ে চিকুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন স্যারের দিকে তাকিয়ে রোহনের মুখটা মনে পড়ল চিকুর।

স্যারের আত্মার কচকচি তখনও চলছিল। আর চিকু অবাক হয়ে স্যারকে দেখছিল।

স্যারের গলায় রুদ্রাক্ষের মালাটা নেই। স্যারের বাঁ গালে চোখের নিচে নাকের পাশে তুলো আর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

হরিহরবাবু পড়াতে আসামাত্রই ওঁর মুখের ব্যান্ডেজ সকলের চোখে পড়েছে। তিতুন, সুকান্ত, প্রদীপ্তরা জিগ্যেসও করেছে, 'স্যার, মুখে কী হয়েছে?'

উত্তরে স্যার হেসে বলেছেন, 'ও কিছু নয়—সামান্য একটু পুড়ে গেছে।'

চিকু কোনও কথা বলতে পারেনি। ওর শরীরের ভেতরে বরফকুচির স্রোত বইতে শুরু করেছিল।

হরিহরবাবুই কি তা হলে পূর্ণিমার নরপিশাচ?

'...গত পূর্ণিমার রাতগুলোয় যারা মারা গেছে ভগবান তাদের ভবিতব্য আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। মারে কৃষ্ণ রাখে কে! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হাজির হয়ে অর্জুন যখন বিষাদে কাতর হয়ে বলেছিলেন, আত্মীয়স্বজনকে আমি হত্যা করতে পারব না, তখন শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেছিলেন, হে পার্থ, তুমি ওদের হত্যা করবে কী, আমি তো ওদের আগেই মেরে রেখেছি! জাঙ্গিকুলের ঘটনাটাও ঠিক একইরকম, বুঝলি? এখানে ওই খুনি স্রেফ নিমিত্ত মাত্র। ভগবান ওই চারজনকে আগেই মেরে রেখেছিলেন...। আর, একজন বেঁচে গেছে কারণ...রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বেঁচে যাওয়া তার কপালে ছিল।'

জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা শেষ করে হরিহরবাবু আবার লেখাপড়ায় ফিরে এলেন। বই আর খাতা খুলে ওরা সবাই পড়ায় মন দিল।

কিন্তু চিকুর বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছিল। কিছুতেই ওর পড়ায় মন বসছিল না।

পড়ানোর মাঝে কাকিমা একবার ঘরে এলেন। হরিহরবাবুকে চা-বিস্কুট দিলেন। আর চিকুদের দিলেন একটা করে কেক।

কাকিমা বোধহয় বিকেলে স্নান করেছেন। ফরসা টলটলে মুখ, কপালে বড় মাপের সিঁদুরের টিপ, গালে লাল আভা। কাকিমাকে দেখলেই কেমন কাছের মানুষ বলে মনে হয়। আর হরিহরবাবু? ওঁকে কাকিমার স্বামী বলে ভাবতে চিকুর বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

পড়ানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যখন বই-খাতা-ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল, চিকু তখনও বসে রইল। ওর ভেতরে কেমন একটা রাগ আর জেদ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্যারকে ও কয়েকটা কথা জিগ্যেস করতে চায়। বুঝতে চায় ওর সন্দেহটা সত্যি কি না।

'কী রে, চিকু—তুই যে বসে রইলি—বাড়ি যাবি না? স্নেহের সুরে হরিহরবাবু জিগ্যেস করলেন।

'আপনার সঙ্গে....ক কয়েকটা ক-কথা আছে, স্যার।' আমতা-আমতা করে চিকু বলল।

বন্ধুরা সব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। শুধু প্রিয়াংকা জুতো পায়ে দিয়ে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কাকিমা ভেতরের ঘরে হয়তো সংসারের কাজে ব্যস্ত।

'কী কথা?'

অন্দরে কোথাও টেলিফোন বেজে উঠল। কাকিমা ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন। বাইরের ঘর থেকে চিকু আবছাভাবে কাকিমার গলা পাচ্ছিল।

'আপনার গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা কোথায় গেল, স্যার?' পলকে চারপাশটা কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু সিলিং পাখার ভনভন শব্দ কানে বাজছিল। হরিহরবাবুর বাঁ চোখটা একবার কেঁপে উঠেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'কোথাও বোধহয় খুলে পড়ে গেছে। আ-আমি ঠিক খ্-খেয়াল করিনি....।'

'আপনার মুখ পুড়ে গেল কী করে?'

'বললাম তো, সামান্য একটু পুড়ে গেছে!' হরিহরবাবু হঠাৎই রেগে উঠলেন।

'না, স্যার—ঠিক কীভাবে পুড়ল আপনাকে বলতে হবে।' জেদি গলায় বলল চিকু।

'এতবড় তোর স্পর্ধা। আমার কাছে জবাবদিহি চাস।' হরিহরবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর গলার স্বর থরথর করে কাঁপছিল। দরজার কাছ থেকে প্রিয়াংকা চিকুকে ডাকল, 'চিকু কী হচ্ছে! চলে এসো!'

ওর দিকে না তাকিয়েই হাতের একটা ইশারা করল চিকু। বই-খাতা-ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফস করে বলে বসল, 'আপনার বাঁ গালে পঞ্চপ্রদীপের ছাপ পড়ে গেছে।'

চিকুকে অবাক করে দিয়ে হরিহরবাবুর বাঁ হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে গালে পৌঁছে গেল। ওঁর হাতের আঙুল আন্দাজে ভর করে পঞ্চপ্রদীপের ছাপটাকে খুঁজতে চাইল।

একইসঙ্গে চিকুর প্রমাণ খোঁজার পালা শেষ হল। অসুস্থ নরপশুটাকে ও খুঁজে পেয়ে গেছে।

কিন্তু ও এতটুকুও ভয় পেল না, কারণ, এতদিনে ও বুঝে গেছে, পূর্ণিমার রাত ছাড়া এই মানুষটাকে ভয় করার কোনও কারণ নেই। ও টান-টান গলায় বলল, 'আপনার রুদ্রাক্ষের মালাটা গত পূর্ণিমার রাতে শিবতলার মন্দিরে ছিঁড়ে পড়ে গেছে, স্যার। আর সে-রাতে পুরুতমশাই বোধহয় আপনার সঙ্গে একটু ধস্তাধস্তি করেছিলেন...।'

'চিকু! চিকু, তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ! এসব আজেবাজে কথা বলার সাহস তুমি কোথা থেকে পেলে! অসভ্য, ইতর...।' স্যার রেগে গিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বটে, তবে সেগুলো কেমন যেন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। আর স্যারের মুখ-চোখও কেমন অপরাধীর মতো ফ্যাকাসে লাগছিল।

ঠিক এই সময়ে অন্দরমহল থেকে কাকিমা বেরিয়ে এলেন। কাকিমাকে দেখে চিকুর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। নিপাট ভালোমানুষ কাকিমা বোধহয় হরিহরবাবুর আসল চেহারাটা জানেন না। জানলে তিনি হয়তো শোকে-দুঃখে আত্মহত্যাই করবেন।

কাকিমার সামনে আর কোনও কথা বলতে পারল না চিকু। হরিহরবাবু চিকুর দিকে দু-পা এগিয়ে এলেন, মুখের ভাব মোলায়েম করে বললেন, 'তোর বয়েস অল্প। তোর না জানার জগৎটা বড় বেশি। জানবি পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহ অবতার হিরণ্যকশিপুকে ধ্বংস করেছিল...'

চিকু চোয়াল শক্ত করে বলল, 'আমি কোনও পাপ করিনি...।'

কাকিমা স্বামীকে জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে? ভেতর থেকে চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিলাম...এত শোরগোল কীসের?'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিহরবাবু হাসলেন : 'ও কিছু নয়। চিকুকে একটু শাসন করছিলাম। তবে ছোট ছেলে...আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি—।' চিকু ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রিয়াংকা এতক্ষণ ওর হাত ধরে টানছিল। বাইরে এসেই প্রিয়াংকা চিকুকে জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার বলো তো! তোমাদের কথাবার্তার আমি কোনও মিনিং খুঁজে পাচ্ছি না। স্যারের সঙ্গে পঞ্চপ্রদীপ আর পুরুতমশাইয়ের রিলেশান কী?'

'চলো—যেতে-যেতে সব বলছি। তবে তুমি এখন কাউকে কোনও কথা বলতে পারবে না। প্রমিস?'

চিকুর হাত ছুঁয়ে প্রিয়াংকা বলল, 'প্রমিস।'

ওরা সাইকেল চালাতে শুরু করল।

বাতাসে অনেকক্ষণ ধরেই একটা ঝড়ের গন্ধ টের পাওয়া যাচ্ছিল। গুমোটের মধ্যে ঠান্ডা বাতাস মাঝে-মধ্যেই খেলে বেড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, শিগগিরই একটা কালবৈশাখী হবে। তবে তার সঙ্গে একটু বৃষ্টি হলে ভালো হয়, চিকু ভাবল।

দশ

চিকুর কাছে সব শোনার পর প্রিয়াংকা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ও বলল, 'আমি আর বাংলা কোচিং-এ পড়তে যাব না।'

চিকু বলল, 'আমি যতটুকু বুঝেছি, পূর্ণিমার রাত ছাড়া স্যারকে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ যেরকম কথাকাটাকাটি হয়ে গেল তাতে আমার আর বাংলা কোচিং-এ যাওয়া হবে না। বাড়িতে মা-বাবাকে কী বলব তাই ভাবছি...।'

'তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই প্রুফ চাইবে। বলবে, এ হতে পারে না—ইমপসিবল।'

প্রিয়াংকার কথাগুলো চিকু কিছুক্ষণ চিন্তা করল। ওর মনে হল, প্রিয়াংকা ঠিকই বলেছে। হরিহরবাবুর মতো ধার্মিক সাত্ত্বিক মানুষকে কেউ রক্তপিশাচ বলে ভাবতে পারবে না। তা ছাড়া সবাই হয়তো জানতে চাইবে, হঠাৎ করে মানুষটা এরকম হয়ে গেল কেমন করে। উনি জাঙ্গিকুলে বহুবছর ধরে আছেন—এতদিন তো পূর্ণিমার রাতে কোনও খুন হয়নি! তা হলে চার-পাঁচমাস আগে হঠাৎ এমন কী হল যে, মানুষটা অমানুষ হয়ে গেল!

চিকু এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রমাণের কথা ভাবতে-ভাবতে ওর মাথার ভেতরটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সত্যিই তো, ওর মুখের কথা কেউ একবর্ণও বিশ্বাস করতে চাইবে না! তা ছাড়া চিকু নিজেও হরিহরবাবুকে নৃশংস ভয়ঙ্কর একটা অমানুষ বলে ভাবতে পারছিল না।

সুতরাং, অকাট্য একটা প্রমাণ চাই। আর তার জন্য বোধহয় আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কিন্তু পূর্ণিমা আসতে তো এখনও অনেক দিন বাকি! এতগুলো দিন কি স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায়? ঠিক তখনই চিকুর মাথায় বুদ্ধিটা এল।

ও প্রিয়াংকাকে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ সবাই প্রমাণ চাইবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য আমার মুখের কথা সবাই মানবে কেন। ধরো, স্যার নিজে যদি সব স্বীকার করেন?'

'স্যার হঠাৎ কনফেস করতে যাবেন কেন?

'কারণ আমি আর তুমি স্যারকে ফোন করে করে পাগল করে মারব।'

'ওরে বাবা!' প্রিয়াংকা ভয়ে আঁতকে উঠল।

চিকু ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি রোজ একবার ফোন করবে—আর আমি একবার। তাতেই আশা করি অ্যাকশন হবে।'

আরও মিনিট পনেরো আলোচনার পর চিকু বাড়িতে ফিরে এল। রাতে শোওয়ার আগে ও মাকে বলল, বাংলা কোচিং-এ ঠিকমতো পড়া হচ্ছে না। ও অন্য বাংলা স্যারের কোচিং-এ ভরতি হবে।

মা খানিকটা অবাক হলেও রাতে আর কথা বাড়াল না। পরদিন সকালে বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর চিকু হরিহরবাবুর বাড়িতে ফোন করল।

কাকিমা ফোন ধরে 'হ্যালো' বলতেই ও খুব মোলায়েম গলায় বলল, 'স্যার আছেন?'

'ধরো, দিচ্ছি—।'

কাকিমা চিকুর গলা চিনতে পারেননি। অবশ্য পারার কথাও নয়। কারণ, চিকু এর আগে স্যারের বাড়িতে মাত্র একদিন ফোন করেছে।

'হ্যালো' হরিহরবাবুর গলা শুনতে পেল চিকু।

ও রিসিভারের খুব কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার পাপের বোঝা তোমাকে শেষ করে দেবে...।'

'কে? কে?'

'আমি সব জানি।' ধীরে-ধীরে ফিসফিস করে চিকু বলল, 'গত চারটে পূর্ণিমায় তুমি চারজন মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করেছ। আর একজনকে খুন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পারোনি।'

'কে, চিকু?' চাপা গলায় জানতে চাইলেন হরিহরবাবু।

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিকু বলে চলল, 'আমি সব দেখেছি। সব জানি। সামনের পূর্ণিমায় কাউকে আমি খুন হতে দেব না।'

'চিকু, তুই আমাকে মিছিমিছি সন্দেহ করছিস। আমি কোনও পাপ করিনি। তুই খুব ভালো ছেলে। মিছিমিছি আমাকে ভুল বুঝিস না...।'

'অন্য কাউকে খুন করার চেয়ে নিজেকে খুন করা অনেক সহজ। তোমার সুইসাইড করা উচিত। তোমার মতো পাপীরা আত্মহত্যা করলে সেটা মহাপাপ হয় না। সামনের পূর্ণিমায় তুমি নিজেকে খুন করো—সেটা সবার পক্ষে ভালো হবে।'

ও-পাশ থেকে আবেগে থরথর গলা শোনা গেল, 'তুই ভুল করছিস। আমি পাপী নই। আমি কোনও পাপ করিনি।'

'পূর্ণিমার রাতে তুমি কী করো জাঙ্গিকুলের সবাইকে আমি জানিয়ে দেব। রাস্তা-ঘাটে লোকে তোমাকে দেখলে "ছি-ছি" করবে, তোমার গায়ে থুতু দেবে। সুইসাইড করা ছাড়া তোমার আর কোনও পথ নেই...।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল চিকু। ওর বুকের ভেতর টিপটিপ করে শব্দ হচ্ছিল। বড়-বড় নিঃশ্বাস পড়ছিল। আবার কাল সকালে ও স্যারকে ফোন করবে।

কিন্তু এভাবে ফোন করলে কি কাজ হবে? স্যার কি পুলিশের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করবেন? তা ছাড়া এ রকম ভয়ঙ্কর অলৌকিক ঘটনা পুলিশ কি বিশ্বাস করবে?

এইসব নানান কথা ভাবতে-ভাবতে স্কুলের জন্য তৈরি হতে লাগল চিকু। আজ জনতা কেবিনের সামনে প্রিয়াংকার সঙ্গে ও দেখা করবে। বলবে, টেলিফোনে স্যারের সঙ্গে ওর কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছে। তা হলে প্রিয়াংকার ফোন করার কাজে খানিকটা সুবিধে হতে পারে।

সাইকেল নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে দেশপ্রিয় সুইটস-এর কাছে রোহনকে দেখতে পেল চিকু—সঙ্গে দু-চারজন বন্ধুবান্ধব দাঁড়িয়ে আছে। চিকু রোহনের কাছে গিয়ে সাইকেল থামাল।

'রোহনদা, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে—' উত্তরে রোহন পকেট থেকে রুদ্রাক্ষের একটা দানা বের করল: 'এই বিষয়ে?'

মাথা নাড়ল চিকু : 'হ্যাঁ।'

'এখন বলবি?'

'না, স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলব।'

সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল চিকু।

সন্ধেবেলা ওর কাছে সব কথা শুনে রোহন একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। ও আপনমনেই বলল, 'এ-কথা তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না!'

'হ্যাঁ—প্রিয়াংকাও তাই বলছিল। বলছিল, প্রমাণ চাই।' দেশপ্রিয় সুইটস-এর কাছে একটা শিরীষ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে রোহন আর চিকু কথা বলছিল। বিকেলের দিকে একটা কালবৈশাখী হয়ে দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই রাস্তায় কাদা আর জল। স্কুটার বা গাড়ি গেলে কাদা-জল ছিটকে আসছে। তাই পথচারীরা এবড়োখেবড়ো রাস্তার পাশ ঘেঁষে হাঁটছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে চিন্তা করতে-করতে রোহন বলল, 'হু প্রমাণ চাই। রুদ্রাক্ষের মালা আর মুখের পোড়া দাগ তো ঠিক প্রমাণ নয়...।'

'সেইজন্যেই তো আমি আর প্রিয়াংকা উড়ো ফোন করে স্যারকে কনফেস করতে বলছি!'

'তাতে কী লাভ! ধর ফোনে হরিহরবাবু সব স্বীকার করলেন—তাতে তো আর ওঁকে অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না! যুক্তি-বুদ্ধির বাইরে এরকম আজগুবি ব্যাপার কে বিশ্বাস করবে!'

'কেন, লাস্ট পূর্ণিমার রাতে সেই অমানুষটার ফেরোশাস গর্জন অনেকেই তো শুনেছিল!'

'শোনা এক জিনিস, আর চোখে দেখা এক জিনিস...' রোহন আনমনাভাবে বলল।

রোহনের কথাটা চিকুর মনে বারবার প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। শোনা এক জিনিস, আর চোখে দেখা এক জিনিস...শোনা এক জিনিস, আর...।

কিছুক্ষণ পর চিকু বলল, ‘টেলিফোনে কাজটা ক’দিন চালিয়ে যাই...দেখি, মাথায় আর কোনও আইডিয়া আসে কি না। তুমিও ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দ্যাখো...তবে এখনই কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, কী বলো?’

‘মাথা খারাপ! তুই তোর অপারেশান চালিয়ে যা। কোনও আইডিয়া এলে আমাকে বলিস।’

রোহনের কথায় ঘাড় নেড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলল চিকু। প্রমাণ চাই—প্রমাণ।

রাতে বিছানায় শুয়ে চিকু ছটফট করতে লাগল। কিছুতেই ওর ঘুম আসছিল না। ওর ভয় হচ্ছিল যে, ঘুমিয়ে পড়লেই ও হয়তো হরিহরবাবুকে স্বপ্নে দেখবে। দেখবে সৌম্যকান্তি মানুষটা ধীরে-ধীরে কীভাবে বদলে যাচ্ছে অমানুষে। তারপর এগিয়ে আসছে চিকুর দিকে। সামনে দুটো হাত বাড়ানো। সেই হাতের দশ আঙুলে লম্বা-লম্বা বাঁকানো নখ।

চিকু টের পাচ্ছিল, প্রিয়াংকা ওকে হাত ধরে প্রাণপণে টানছে আর চিৎকার করছে, ‘পালাও, চিকু, পালাও!’

চিকুর ঘুম ভেঙে গেল। নানান কথা ভাবতে ভাবতে কখন ওর তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল কে জানে! প্রিয়াংকার কথা মনে পড়ল ওর। রাত আটটা নাগাদ প্রিয়াংকাকে ও ফোন করেছিল। তখনই প্রিয়াংকা ওর উড়ো ফোনের কথাবার্তা চিকুকে জানিয়েছে। কথাগুলো চিকুর মনে ভেসে উঠল আবার।

ও-প্রান্তে ফোন বেজে উঠতেই হরিহরবাবুর স্ত্রী ফোন ধরেছেন। ‘হ্যালো।’

‘স্যার আছেন?’ প্রিয়াংকা স্বাভাবিক গলায় জিগ্যেস করেছে। ‘ধরো—দেখছি...।’

একটু পরেই ফোন ধরে স্যার ‘হ্যালো’ বলতেই প্রিয়াংকা চিকুর পরামর্শ মতো বলে উঠেছে, ‘ “অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।” ’

‘কে? কে কথা বলছ?’ হতচকিত হয়ে হরিহরবাবু জিগ্যেস করলেন।

ফিসফিস করে প্রিয়াংকা বলল, ‘সামনের পূর্ণিমায় তুমি বাড়ি ছেড়ে বেরোবে না। বেরোলেই তোমাকে খতম করে দেওয়া হবে।’

‘আমি...আমি...আমার কোনও দোষ নেই। এটা...এটা...আমার অসুখ। অসুখের ওপর আমার কোনও হাত নেই...।’

‘তুমি শিক্ষকদের কলঙ্ক। জাঙ্গিকুলের কলঙ্ক...।’

‘না-না, না, আমি কোনও অন্যায় করিনি...কোনও পাপ করিনি। আমার আত্মা পবিত্র।’

‘তোমার আত্মা বলে কিছু নেই। তুমি প্রেতাত্মা।’

হরিহরবাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন, ‘বিশ্বাস করো, আমার কোনও দোষ নেই! একটা শয়তান ছল করে আমাকে দিয়ে কীসব করিয়ে নেয়। আমার তখন জ্ঞান থাকে না।’

‘আর কাউকে খুন করার চেয়ে নিজেকে খুন করা অনেক সহজ। তোমার সুইসাইড করা উচিত...তোমার সুইসাইড করা উচিত...।’

‘তুমি কে?’ আচমকা প্রশ্ন করলেন হরিহরবাবু। তাঁর গলার স্বর দিব্যি স্পষ্ট। কান্নার কোনও ছোঁওয়া সেখানে নেই।

তা হলে কি স্যার এতক্ষণ অভিনয় করছিলেন? প্রিয়াংকা মনে মনে ভাবল।

‘তুমি কে? চিকুর বন্ধু?’ কিছুক্ষণ ও-প্রান্ত চুপচাপ। তারপর : ‘তুমি কি প্রিয়াংকা?’ সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়াংকা ভয় পেয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। ওর হাত থরথর করে কাঁপছিল।

সত্যিই কি এটা স্যারের অসুখ? চিকু নিজেকে যেন প্রশ্ন করল।

এই অসুখের ওপরে কি স্যারের কোনও হাত নেই? সত্যিই কি একটা শয়তান ছল করে স্যারকে দিয়ে প্রতি পূর্ণিমায় জঘন্য কাজ করিয়ে নেয়?

এইসব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল চিকু।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই চিন্তাগুলো আবার চিকুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একইসঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল, স্যারকে আবার ফোন করতে হবে।

এগারো

হরিহরবাবুর কাছ থেকে নেমন্তন্নটা এল একেবারে আচমকা। এরকম ভয়ঙ্কর নেমন্তন্ন চিকু জীবনে কখনও পায়নি। পূর্ণিমার রাতে স্যার ওকে বাড়িতে আসতে বললেন। সঙ্গে প্রিয়াংকাকেও নিয়ে আসতে বললেন।

উড়ো টেলিফোনের ব্যাপারটা তিন-চারদিন চলার পরই নেমন্তন্নটা পেল চিকু।

রোজকার মতো সেদিন সকালে স্যারের বাড়িতে ফোন করেছিল চিকু। রিং বেজে ওঠামাত্র স্যার নিজেই ফোন ধরলেন।

'হ্যালো, চিকু?'

চিকুর মনে হল, স্যার বোধহয় ওর টেলিফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। চিকু ফিসফিসে গলায় বলল, 'সামনের পূর্ণিমায় কোনও মানুষ যেন খুন না হয়।'

'না, না, আর কেউ খুন হবে না, আর কেউ খুন হবে না।'

স্যারকে বাধা দিয়ে চিকু বলল, 'কিন্তু একটা সুইসাইড যেন হয়।'

'সুইসাইড!'

'হ্যাঁ। একটা নরপিশাচ যেন আত্মহত্যা করে। এ-আত্মহত্যায় কোনও পাপ নেই।'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে হরিহরবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর কান্না-ভাঙা গলায় বললেন, 'নিজেকে খুন করতে আমি পারব না। তা হলে তোদের কাকিমাকে কে দেখবে! ওকেও হয়তো আমার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে। আর সেটা তো সম্ভব নয়! এটা যে কী কষ্ট তা তুই বুঝবি না। এ-অসুখের জ্বালা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে...।'

চিকু স্যারের কান্নায় নরম হল না। কোথা থেকে যেন এক দুর্জয় সাহস ওর ভেতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। ও বলল, 'যাদের তুমি খুন করেছ তাদের আত্মীয়স্বজন তোমার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে। তোমাকে আত্মহত্যা করতেই হবে!'

'চিকু, চিকু—শোন—শোন—।'

'কী?'

'সামনের গুরুপূর্ণিমায় তুই আমার বাড়িতে আয়। তোকে সব খুলে বলব। তখন তুই আমার অসুখের ব্যাপারটা বুঝতে পারবি...।'

আগামী পূর্ণিমায় স্যার ওঁর বাড়িতে যেতে বলছেন! চিকু বেশ অবাক হল। তা হলে কি সামনের পূর্ণিমায় কেউ খুন হওয়ার ভয় নেই?

'...সন্ধের পর তুই আসিস...' স্যার তখনও কথা বলে যাচ্ছিলেন, '...আর প্রিয়াংকাকেও সঙ্গে নিয়ে আসিস...।'

কেন, প্রিয়াংকা কেন!

প্রিয়াংকার নাম শুনে চিকু যেন ইলেকট্রিক শক খেল। স্যার কি তা হলে ওদের দুজনের গলাই ধরে ফেলেছেন।

সুতরাং আর লুকোচুরি করে কোনও লাভ নেই। তাই চিকু এবার স্বাভাবিক গলায় কথা বলল, 'প্রিয়াংকাকে সঙ্গে নিয়ে আসব কেন?'

উত্তরে স্যার হাসলেন : 'তুই সেদিন সন্ধেবেলায় আমার সঙ্গে যখন তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছিলি, প্রিয়াংকা তখন তোর সঙ্গে ছিল। ওর মনে হয়তো নানারকম কৌতূহল হচ্ছে। হয়তো তোরই মতো ও আমাকে শয়তান, পিশাচ, কিংবা অমানুষ বলে ভাবছে। আর তুই তো জানিস, তোরা দুজন আমার সবচেয়ে প্রিয় স্টুডেন্ট। তোদের মনে কোনও ব্যথা দিতে আমি চাই না।'

চিকু কেমন যেন দোটানায় পড়ে গেল। ওর চিন্তাগুলো মনের ভেতরে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

হরিহরবাবু একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। ওঁর কথায় সাপ-খেলানো বাঁশির মতো সুর। সেই সুর চেতনাকে অবশ করে দিতে চাইছে। চিকুর মাথা ঝিমঝিম করছিল।

'...চোখের সামনে যদি সব দেখিস, তবে তোরা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারবি। বুঝতে পারবি, আমার আসলে কোনও দোষ নেই। সবই নিয়তি...।'

শেষ পর্যন্ত চিকু রাজি হল। কারণ, জলজ্যান্ত প্রমাণ চাইলে এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। তবে রোহনদাকে ও সঙ্গে নিয়ে যাবে। যদি সত্যি-সত্যি কোনও বিপদ হয় তা হলে রোহনদা বাঁচাবে। সুতরাং, রোহনকে নেমন্তন্নের খবরটা জানাল চিকু।

'কী করি বলো তো, রোহনদা? যাব?'

'নিশ্চয়ই যাবি! তা না হলে কেসটা প্রমাণ হবে কী করে!'

'যদি স্যারের বাড়িতে সাঙ্ঘাতিক কিছু হয়?'

খদ্দরের পাঞ্জাবির তলায় হাত ঢোকাল রোহন। তারপর একটা দোনলা-শাটগান বের করে চিকুকে দেখাল : 'এই দ্যাখ, নলকাটা দোনলা মেশিন। দেশি, তবে কাজে বিদেশিকে টেক্কা দেবে। কিছুদিন ধরে শুনছিস না, পাশের নলডাঙ্গায় খুব ডাকাতি হচ্ছে! তাই গত মাসে এটা কিনেছি। এটা কাছ থেকে ফায়ার করলে বডি ফুটো করে একজোড়া গুলি বেরিয়ে যাবে।' চিকুর কাঁধে হাত রাখল রোহন। মন-কেমন-করা গলায় বলল, 'তুই, প্রিয়াংকা, তোরা পড়াশোনায় এ ক্লাস। আমাদের দেশের ফিউচার। আর আমার কাজ কী জানিস? যে শয়তানের বাচ্চারা তোদের মতো ব্রাইট ছেলেমেয়েদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের খতম করা। হয় জানে, নয় মানে, খতম করে দেব।' শটগানটা উঁচিয়ে ধরল রোহন, আকাশের চাঁদের দিকে তাকাল : 'তোর কোনও ভয় নেই। চাঁদটা পুরোপুরি গোল হতে দে, তারপর দেখবি...জাঙ্গিকুলের সব গোলমাল ভসকে দেব।'

চিকু অবাক হয়ে রোহনকে দেখছিল। বিশুদার দোকানের বালবের আলোয় রোহনের চোখ চকচক করছিল। মন্দকে খতম করার জন্যই ও মন্দ হয়েছে।

পূর্ণিমার দিন কীভাবে ওরা যাবে, কখন যাবে, সেসব চাপা গলায় আলোচনা করে নিল রোহন আর চিকু। চিকু বলল, প্রিয়াংকার সঙ্গে ও এ-ব্যাপারে কথা বলে নেবে। তারপর ওরা পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পূর্ণিমার তখনও ষোলো দিন বাকি ছিল। চিকুরা ষোলো, পনেরো, চোদ্দো করে দিন গুনতে লাগল।

বারো

পূর্ণিমা এসে পড়ার দু-চারদিন আগেই বর্ষা জাঙ্গিকুলে উকিঝুঁকি মারতে শুরু করল। জলাপুকুরের জল বেড়ে উঠল। আগাছার ঝোপঝাড়গুলো প্রকৃতির আশকারা পেয়ে আবার মাথাচাড়া দিতে লাগল। পথঘাটে খানাখন্দে ঘোলা জল জমতে লাগল।

বর্ষার সময় সবুজ গাছপালা থেকে এক অদ্ভুত গন্ধ পায় চিকু। সেই গন্ধে আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল। বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, বুলবুলি, মাছরাঙা পাখিগুলো ঝকঝকে রং নিয়ে এখানে-সেখানে উড়ে বেড়াতে লাগল।

গুরুপূর্ণিমার দিন সন্ধে সাতটা নাগাদ চিকু আর প্রিয়াংকা যখন সাইকেল চালিয়ে হরিহরবাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছল, তখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। আশপাশ থেকে ব্যাঙের গ্যাঙোর-গ্যাঙ ডাক কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।

গ্রিলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চিকু আর প্রিয়াংকা। সাইকেল দুটো একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর পিছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকাল।

একে বৃষ্টি, তার ওপরে রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তা সত্ত্বেও ওরা রোহন আর ছোটকুকে দেখতে পেল। একটা আমগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে হাত নাড়ল। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হরিহরবাবুর বাড়ির কাছে চলে এল। ভেতরে ঢুকে পড়ল। রোহন একটা বর্ষাতি পরে এসেছে। আর ছোটকুর মাথায় নীল রঙের পলিথিন শিটের ঘোমটা। তার ওপরে বৃষ্টি পড়ে চড়বড় চড়বড় শব্দ হচ্ছে।

রোহনের ইশারায় ছোটকু সুপুরিগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। চিকু আর প্রিয়াংকার খুব কাছে এসে রোহন চাপা গলায় বলল, 'তোরা ভেতরে যা। আমি আর ছোটকু দরজার কাছেই আছি। কান পেতে সব শোনার চেষ্টা করছি। কেস ডেঞ্জারাস হয়ে উঠলেই আমাকে ডাকবি—।'

কথাগুলো বলে রোহন আর ছোটকু আড়ালে সরে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চিকু কলিংবেল বাজাল।

কাকিমা এসে দরজা খুলে দিলেন। স্নেহের গলায় বললেন, 'ইস! অনেকটা ভিজে গেছ দেখছি! ভেতরে চলো, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছে নেবে।'

কাকিমার পিছন পিছন ওরা দুজনে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে পাথর হয়ে গেল।

হরিহরবাবু মেঝেতে বেশ আয়েস করে বসে আছেন। খুব ধীরে-ধীরে পান চিবোচ্ছেন। চোখে শান্ত নিশ্চিন্ত দৃষ্টি। যেন শিকার খুব কাছাকাছি, একেবারে আওতার মধ্যে চলে এসেছে।

স্যারকে দেখামাত্রই চিকু আর প্রিয়াংকার সব সাহস উবে গেল। সাঙ্ঘাতিকভাবে মনে পড়ে গেল, আজ পূর্ণিমা—যদিও আকাশে মেঘ থাকায় চাঁদ চোখে পড়েনি। তাতে হরিহরবাবুর কি কোনও অসুবিধে হবে? বোধহয় না। আকাশে গোল চাঁদ কোথাও একটা থাকলেই হল। তা হলেই অমানুষিক অসুখটা মাথাচাড়া দিতে পারবে।

ওর দুজনে কুলকুল করে ঘামছিল আর ফ্যালফেলে চোখে হরিহরবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'আয়, আয়—বোস।' একগাল হেসে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন হরিহরবাবু, 'বসে একটু জিরিয়ে নে। তারপর সব বলছি। তোরা যা-যা জানতে চাস, জিগ্যেস করবি, আমি তোদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব।'

শতরঞ্চি পাতাই ছিল। ওরা স্যারের কাছ থেকে একটু দূরত্ব রেখে জড়োসড়ো হয়ে বসল। কাকিমা একটা তোয়ালে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন : 'এই নাও, এটা দিয়ে গা-মাথা একটু মুছে না—ও' তোয়ালেটা প্রিয়াংকার হাতে দিলেন কাকিমা, আড়চোখে একবার স্বামীর দিকে দেখলেন : 'আজ আর কেউ পড়তে আসবে না?'

'না। আজ ওদের দুজনকে স্পেশাল ক্লাস করাব বলে ডেকেছি।'

কাকিমা বললেন, 'তোমরা পড়ো। আমি পেঁয়াজি আর বেগুনি ভাজছি—খেয়ে যাবে।'

কাকিমা আড়ালে চলে যেতেই হরিহরবাবু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'তোদের আজ খোলাখুলি সব বলব। আমার একটা মারাত্মক অসুখ হয়েছে। এমন অসুখ যে, সবাইকে এটার কথা খোলাখুলি বলা যায় না। তা সত্ত্বেও আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। তাঁদেরকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অসুখটার আভাস দিয়েছি। তাঁরা ওষুধ দিয়েছেন...কিন্তু সেসব ওষুধে কোনও কাজ হয়নি...।'

চিকু আর প্রিয়াংকা দম বন্ধ করে শুনছিল। ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে ব্যাঙের ডাকও। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় চিকুর কেমন শীত-শীত করছিল।

আনমনা চোখে একটা বন্ধ জানলার দিকে তাকিয়ে হরিহরবাবু বলে চললেন, 'অসুখটা আমার আগে ছিল না। গতবছর পুজোর সময় আমি আর তোদের কাকিমা—আমরা দুজনে মিলে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কুলু-মানালি ওইসব আর কী! সেখানে একদিন এক পাহাড়ি পথে একজন ট্রাইবালের সঙ্গে—মানে, উপজাতির লোকের সঙ্গে—আমাদের আলাপ হয়। লোকটা পথের ধারে একটা ছোট্ট ঝুপড়িতে বসে উলকি কাটার কাজ করছিল। আমি আর তোদের কাকিমা সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটির কাজ দেখছিলাম। লোকটা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে আমাকে বলল, "বাবুজি, আপনারা উলকি কেটে গায়ে ছবি এঁকে নিন। আমার কাছে নানান ধরনের ছবি আছে। এমন ছবিও আছে যার মধ্যে অনেক ক্ষমতা আছে—মানুষকে তেজি করে দেয়। সব মুশকিল আসান করে দেয়। এইসব উলকি মন্ত্র-তন্ত্র করে আঁকতে হয়। মাত্র একশো টাকা দিলেই এঁকে দেব।"

'কী যে হল আমাদের! লোকটার কথায় রাজি হয়ে গেলাম।' কথা বলতে-বলতে পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে ফেললেন হরিহরবাবু। ওটার গলার কাছটা ধরে বাঁদিকে টেনে নামলেন।

'এই দ্যাখ—।'

ঘরের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, স্যারের বাঁ বাহুতে একটা লোমশ পশুর ছবি আঁকা। পশুটা কেমন যেন কুঁজো হয়ে রয়েছে—যেন এক্ষুনি শিকার লক্ষ্য করে লাফ দেবে।

পাঞ্জাবিটা আবার ঠিকঠাক করে নিলেন স্যার।

'...তারপর থেকেই আমার ক্লান্তি ক্রমশ কমতে লাগল। সবসময় শরীরের ভেতরে একটা চনমনে ভাব টের পেতে লাগলাম। বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে কিছু একটা করার নেশায় একেবারে খেপে উঠতে লাগলাম। সেইসঙ্গে কেমন জ্বর-জ্বর লাগত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলেন হরিহরবাবু : 'বেশ মনে আছে, গত ডিসেম্বরের পূর্ণিমায় আমি প্রথম খুন করেছি। না, না, মানুষ নয়—একটা ছাগলকে মেরেছিলাম। তারপর...ধীরে-ধীরে অসুখের তেজটা বাড়তে লাগল। আর...আর...গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম একজন ভবঘুরে ভিখিরিকে খুন করলাম।

'তোরা হয়তো বলবি আমি মহাপাতক, পাপী। কিন্তু আমি বলব, আমি নির্দোষ। আমার একটা অসুখ হয়েছে—যে-অসুখটা ডাক্তাররা সারাতে পারছে না। তোরা আমাকে ভুল বুঝিস না। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি অপরাধী। মনে হয়, আত্মহত্যা করে এই নোংরা জীবনটাকে শেষ করে দিই। কিন্তু তারপরই আবার মনে হয়, আমার তো কোনও দোষ নেই।' মুখ তুললেন হরিহরবাবু। ওঁর চোখে জল। কান্না-ধরা গলায় তিনি বললেন, 'আসলে এই অসুখটা আমার নিয়তি...।'

কথা বলতে-বলতে হরিহরবাবুর গলাটা কর্কশ হয়ে যাচ্ছিল।

'...আমার ভবিতব্য...আমার নিয়তি...তোদেরও বোধহয় নিয়তি...।' তারপরই সব অর্থহীন কর্কশ জড়ানো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওঁর মুখ দিয়ে। এবং ভয়ঙ্কর পরিবর্তনটা শুরু হয়ে গেল।

চিকু আর প্রিয়াংকা এত ভয় পেয়ে গেল যে, ভয় বোধটাই ওদের মন থেকে উবে গেল। ওরা হাঁ করে স্যারের পালটে যাওয়া দেখতে লাগল। যেন মুগ্ধ হয়ে কোনও হরার সিনেমা দেখছে।

স্যারের দেহটা ফুলতে লাগল। চোয়াল লম্বা হয়ে গেল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে পান-চিবোনো ছিবড়ে বেরিয়ে এল। দাঁতগুলো হয়ে গেল ধারালো আর লম্বা।

ফুলে ওঠা শরীরের চাপে পাঞ্জাবি ফেটে গিয়ে কাপড়ের টুকরোগুলো এখান ওখান থেকে ঝুলে রয়েছে। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় সেগুলো পতাকার মতো উড়ছে।

বর্ষায় আগাছা গজিয়ে ওঠার মতো স্যারের সারা শরীরে বড়-বড় লোম গজিয়ে উঠল। হাত-পায়ের নখগুলো মাপে লম্বা হয়ে বাঁকানো ছুরির ফলা হয়ে গেল।

চোখের সামনে হরিহরবাবু মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে গেলেন। প্রিয়াংকা ভয়ে থরথর করে কাপতে কাপতে উঠে দাঁড়াল। চিকুর হাত ধরে প্রচণ্ড এক টান মারল।

চিকু অনেকক্ষণ ধরে একটা চিৎকার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। স্বপ্নের মধ্যে যেমন দৌড়তে চাইলেও দৌড়নো যায় না, এই মুহূর্তে চিৎকারটাও চিকুকে নিয়ে সেইরকম খেলা খেলছিল।

ভয়ঙ্কর অমানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে মাথা ঝাকাল। লালা ছিটকে পড়ল ওটার মুখ থেকে। তারপর চাপা গর্জন করে চিকুদের দিকে এক পা এগিয়ে এল। কোমরের কাছে ধুতিটা এলোমেলোভাবে জড়িয়ে থাকায় প্রাণীটাকে ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

হঠাৎই চিকুকে অবাক করে দিয়ে প্রিয়াংকা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। যে-প্রমাণ ওরা এতদিন ধরে খুঁজছিল, সেই প্রমাণ এখন ওদের চোখের সামনে। কী ভয়ঙ্কর প্রমাণ!

'...চোখের সামনে যদি সব দেখিস তবে তোরা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারবি। বুঝতে পারবি আমার আসলে কোনও দোষ নেই। সবই নিয়তি...।' টেলিফোনে শোনা স্যারের কথাগুলো মনে পড়ে গেল চিকুর।

এই অমানুষটাকেই ও জলাপুকুর থেকে শ্যাওলা আর কচুরিপানা মাথায় নিয়ে উঠে আসতে দেখেছিল।

অমানুষটা এক হিংস্র গর্জন করে উঠল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ হল।

তারপরই চিকুরা শুনতে পেল দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজ। কাকিমা ভেতর থেকে পড়িমরি করে ছুটে এলেন পড়ার ঘরে।

অমানুষটার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের দরজার ছিটকিনি ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল রোহন আর ছোটকু। ওদের সারা শরীর জলে ভেজা। বড় বড় শ্বাস ফেলে হাঁফাচ্ছে। ওদের গায়ে বর্ষাতি বা পলিথিন শিট নেই। বোধহয় বাইরে কোথাও খুলে এসেছে।

ওদের দেখেই কাকিমার মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কোনওরকমে তিনি বললেন, 'কে—কে তোমরা?'

উত্তরে রোহন শটগানটা বের করে উঁচিয়ে ধরল।

চিকু আর প্রিয়াংকা তখন ঘরের এক কোণে দেওয়ালে মিশে যেতে চাইছে। এ ওকে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে।

বিশাল চেহারার অমানুষটার ছায়া ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়েছে। ওটার হলদেটে সবুজ চোখ রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির মতো ধকধক করে জ্বলছে। ওটা কী বুঝল কে জানে। চিকুদের দিক থেকে ঘুরে তাকাল রোহনদের দিকে।

ছোটকুর চোখ যেন ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে। ওর মুখ হাঁ করা। সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। কিন্তু রোহনের চোখে ঠান্ডা দৃষ্টি। ও যেন আগে থেকেই জানত এইরকম কিছু একটা হবে। রোহন আর দেরি করল না। প্রাণীটার মুখের দিকে শটগান তাক করে ঠান্ডা বলায় বলল, 'তোমার আত্মাকে মুক্তি দিলাম।'

তারপর ফায়ার করল।

শব্দটা বন্ধ ঘরে তেমন জোরালো শোনাল না। তবে দুটো গুলিই প্রাণীটার মুখে গিয়ে লাগল : একটা বাঁ চোখে, একটা কপালে।

এক বুক কাঁপানো গর্জন করে বিশাল অমানুষটা ভূমিকম্পে ধসে পড়া বহুতল বাড়ির মতো মেঝেতে পড়ে গেল। ওটার হাত কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। কাকিমার শাড়ির ভাঁজে ওটার বাঁকানো নখ আটকে গেল। ফলে সেই টানে কাকিমাও পড়ে গেলেন মেঝেতে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

শটগানে নতুন গুলি ভরে নিল রোহন। তারপর সতর্ক পায়ে প্রাণীটার কাছে এগিয়ে এল।

চিকু আর প্রিয়াংকাও নিজেদের সামলে নিয়ে প্রাণীটার দিকে কৌতূহলের নজরে দেখতে লাগল।

আর কাকিমা সেই ভয়ঙ্কর লোমশ শরীরটাকে আঁকড়ে ধরে বিলাপ শুরু করলেন। সদ্যবিধবার সেই বুকফাটা কান্না পাথরকেও গলিয়ে দিতে পারে।

প্রাণীটার মুখের খানিকটা অংশ শটগানের গুলির দাপটে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। মুখ আর কপাল রক্তে মাখামাখি। সারা শরীর নিথর।

বোঝাই যাচ্ছিল, পূর্ণিমার রাতে জাঙ্গিকুলে আর কখনও কেউ খুন হবে না।

হঠাৎই একটা অবাক কাণ্ড ওদের চোখে পড়ল। প্রাণীটার দেহের লোমগুলো শরীরের মধ্যে ধীরে-ধীরে ঢুকে পড়ছে। বাঁকানো লম্বা নখ আবার ঢুকে যাচ্ছে আঙুলের ভিতরে। দাঁতগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়ায় ঠোঁটজোড়া টান-টান অবস্থা থেকে ক্রমশ ঢিলে হচ্ছে, আবার ঢেকে দিতে পারছে দাঁতের পাটিকে।

ধীরে ধীরে মৃতদেহটা বদলে গেল। অমানুষ থেকে আবার মানুষ হয়ে গেল।

ওদের চোখের সামনে এখন পড়ে রয়েছে হরিহরবাবুর মৃতদেহ। সেই মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হাউহাউ করে কাঁদছেন। চিকু আর প্রিয়াংকা কাছে এগিয়ে গেল। অস্বস্তি হলেও কাকিমাকে ওরা সান্ত্বনা দিতে চাইল।

‘কাকিমা, কাঁদবেন না। স্যারের শরীরে পিশাচ ভর করেছিল। স্যারের আত্মা এবার শান্তি পাবে।’ চিকু নরম গলায় বলল।

উত্তরে কাকিমা স্বামীর মৃতদেহ থেকে মুখ তুললেন। ঘুরে তাকালেন চিকু আর প্রিয়াংকার দিকে।

‘কিন্তু আমাকে শান্তি দেবে কে? আমিও তো হাতে উলকি কেটে ছবি এঁকেছি!’

চিকু অবাক হয়ে দেখল কাকিমার দু-চোখের মণিতে দু-টুকরো লাল আগুন জ্বলছে। আর ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে দুটো লম্বা শ্বদন্ত। খলখল করে হেসে কাকিমা উঠে দাঁড়ালেন।

প্রিয়াংকা চিৎকার করে উঠল।

‘আমরা দুজনে বেশ ছিলাম। পিশাচ বর, আর পিশাচ বউ। ও শিকার করে রক্ত খেয়ে আসত। আর আমি ওর শরীর থেকে রক্ত খেতাম। এমনই ছিল আমাদের রক্তের সম্পর্ক। এখন কী হবে! একা-একা আমি বাঁচব কী করে!’

রোহন হতবাক হয়ে গিয়েছিল। চিকু, প্রিয়াংকা, ছোটকুরও একই দশা। এরকম একটা আশ্চর্য ঘটনার জন্য ওরা কেউই তৈরি ছিল না।

কাকিমা আচমকা বনবেড়ালের মতো লাফ দিলেন। ওঁর লক্ষ্য ছিল রোহন। কিন্তু ছোটকু পলকে ছিটকে এসে রোহনকে আগলে দাঁড়াল।

ফলে রাগে শোকে অন্ধ পিশাচী খ্যাঁক করে কামড়ে ধরল ছোটকুর গলা। ওর ধারালো দাঁতে ছোটকুর গলার নলি ছিঁড়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সেইসঙ্গে চাপা ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল।

সম্মোহনের ঘোর কাটিয়ে রোহন শটগান তুলে ধরল। ছোটকুর ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা কাকিমার ঘাড়ে শটগানের নল ঠেকিয়ে ফায়ার করল।

ছোটকু আর কাকিমা দুজনেই জড়াজড়ি করে খসে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ছোটকুর রক্তমাখা দেহ ছেড়ে আহত কেউটের মতো রোহনকে ছোবল মারতে চাইলেন কাকিমা। শরীরটাকে দু-পাক গড়িয়ে ধারালো দাঁতে রোহনের পা কামড়ে ধরলেন।

রোহন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকারে সকলের কানে তালা লেগে গেল।

বাইরে বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

আর রোহন অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে শটগানের বাঁট হাতুড়ির মতো বসিয়ে দিল কাকিমার মাথায়।

ও পাগলের মতো চিৎকার করছিল আর রাগে অন্ধ হয়ে শটগানের বাঁট দিয়ে উন্মাদ পিশাচীর মাথাটা থেঁতো করছিল।

একসময় কাকিমার দেহটা অসাড় হয়ে গেল। থেঁতলানো মাথাটা চুলে রক্তে মাখামাখি। আর হরিহরবাবুর মতোই কাকিমার শ্বদন্ত মাপে ছোট হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। চোখের মণির লাল বিন্দু দুটোও মিলিয়ে গেল।

রক্তে ভেসে যাওয়া ঘরে তিনটে মৃতদেহ পড়ে রইল।

রোহন ছোটকুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদছিল। ওর পা থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল।

প্রিয়াংকা রোহনের পিঠে হাত রেখে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিল। তারপর খেয়াল হতেই একটা রুমাল নিয়ে রোহনের পায়ের কাটা জায়গাটা বাঁধতে লাগল।

চিকু কোনওরকমে টলতে টলতে ভেতরের ঘরের দিকে এগোল। ফোন করে সবাইকে খবর দিতে হবে। ফাঁড়িতেও একটা খবর দেওয়া দরকার।

বাইরে বৃষ্টির তেজ হঠাৎই আরও বেড়ে গেল।

কান-ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল আবার।



সমাপ্ত